পারিজাত পারিং

মাপ

এ কী ! হাতল দুটো এরকম করলেন ?

আঁজ্ঞে ?

কী যে সব সময় আঁজ্ঞে আঁজ্ঞে করেন নিলুবাবু ! আপনাদের কি আক্কেল বলে কিছু নেই ?

আঁজ্ঞে ?

আবার আঁজ্ঞে ? দেখছেন যে, কী রকম মোটা হয়ে গেছি । পা দুটো জোড়া করে দিনে দশ ঘণ্টা বসে থাকা যায় মশাই ?

না, আঁজ্ঞে ।

কমোন সেন্স, যা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে আনকমোন ; তাইই নেই মশাই আপনাদের একটুও ।

আঁজ্ঞে ।

এই হাতল দুটো অনেক ছোট করতে হতো, যাতে পা দুটো একটু ছড়িয়ে বসতে পারি । কতবার বোঝালাম আপনাকে, তবুও আপনি বুঝলেন না ?

আঁজ্ঞে । কিন্তু কারিগরের স্ত্রীর মেয়েলি অসুখ হয়েছে । সে তো পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে ডায়মন্ড-হাবরাতে চলে গেছে ।

জাহান্নামে যাক মশাই । আপনাদের মতো বুড়ো-হাবড়াদের দিয়ে আমার কাজ চলবে না । কাজের লোক তার অফিসে, তার চেয়ারে বসেই জীবনের তিন-চতুর্থাংশ সময় কাটিয়ে দেয় । সেই চেয়ারটাই যদি একটু আরামের না হয় তা হলে····

আঁজ্ঞে । আমি পনেরো দিন পরে আবার আসব হাত দুটো ছোট করে কেটে দেব ।

থ্যাঙ্ক য়্যু । আপনাকে আর আসতে হবে না । ততদিনে আমার দুটি উরুতে ফাংগাস গজিয়ে যাবে মশাই । আপনি এবারে আসুন ।

আঁজ্ঞে ।

হরিপদ । বলে, ডেকেই, বড়বাবু কলিং বেল টিপলেন ।

হরিপদ এলো ঘরে ।

কি ? তোমাদের ব্যাপারটি কি ?

কি স্যার ?

কি স্যার ? একটা চেয়ার নিয়ে আর কতদিন ধস্তাধস্তি করব বলতে পারো ? যে চেয়ারে বসে কাজ, যে চেয়ারটিই সব ; সেটিকেই ঠিক মতো করে দিতে পারছো না । এই দ্যাখো,

এই যে ! বলেই বড়বাবু যেই সজোরে বসতে গেলেন অমনি রিভলভিং চেয়ারের পায়ার নিচের একটি ক্রোমিয়াম-প্লেটেড লোহার বল গড়গড়িয়ে চলে গেল টেবিলের নিচে। বড়বাবু কাত হয়ে পড়লেন ডান পাশে। সামান্য হেলে গেল। ডানে ! মাই গুডনেস !

বলেই, উনি লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হরিপদও লাফিয়ে উঠল।

অফিসের সবাই বলে যে, হরিপদ বড়বাবুর ছায়া। বড়বাবু লাফালে হরিপদও লাফায়, বড়বাবু রেগে গেলে হরিপদ রাগে ; বিষণ্ণ হলে বিষণ্ণ। হরিপদরই মতো অনেক সাফারি-স্যুট পরা বড় বড় অফিসারও আছেন এই মস্ত কোম্পানিতে। তাঁরাও বড়বাবুকে দেখে ঐ রকমই করেন অনেকটা। মোসাহেবির শিল্পে তবু হরিপদ এক দারুণ শিল্পী। বড়বাবু সেটা জানেন। এবং জেনেও, পুলকিত হন। প্রত্যেক মূর্খ বড়বাবুই মোসাহেবির শিকার হয়ে থাকেন। স্বয়ং ভগবানই হন, বড়বাবুরা তো কোন্ ছার !

কিন্তু চেয়ারটা ?

বড়ই ব্যতিব্যস্ত বড়বাবু এক বছর হলো এই চেয়ার নিয়ে। মনের মতো, নিজের জন্য আরামসই একটা চেয়ার ; কিছুতেই যোগাড় করতে পারছেন না তিনি।

এসব নিলুবাবু ফিলুবাবুকে দিয়ে হবে না হরিপদ। বাঙালীর এই জন্যই ব্যবসা হয় না। সেলসম্যান যদি যে জিনিস বিক্রি করছেন নিজে সেই জিনিস সম্বন্ধে হাতে-কলমের জ্ঞান না রাখেন, তা হলে সেলসম্যান-শিপে আর প্রডাক্ট-এর মধ্যে একটা ফাঁক থাকতে বাধ্য। এই জন্যই বাঙালীর ব্যবসা হয় না। মালিক আর সেলসম্যানরা খালি কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছেন, আর কাজের বেলায় ডায়মন্ডহাব্‌রার যদু ছুতোর। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

হরিপদ !

স্যার !

চিনে মিস্ত্রী নেই এ পাড়ায় ?

টেরিটিবাজারে আছে।

শোনো। মিস্ সেনকে বলো এক্ষুনি পার্ক স্ট্রীটে ফোন করবে। বেয়ারাদের কাউকে পাঠাও চেয়ারের লিটারেচার নিয়ে আসবে।

স্যার।

চিনে ছুতোরের কাছেও যাও। মাপমতো একটা চেয়ার এনে দিতে পারলে না তোমরা। ওয়ার্থলেস সব ! যে কোম্পানির বড়সাহেবের চেয়ার ঠিক থাকে না, তা উঠে যেতে বাধ্য। লালবাতি জ্বলে যাবে।

বলেই, ঘরের লালবাতির সুইচ টিপে দিলেন ; ঘরে এখন কারোই ঢোকা মানা। অত্যন্ত আপসেট তিনি। চেয়ারে বসলেই ডাইনে কাত হয়ে যাচ্ছে চেয়ারটা। ডিসগ্রেসফুল। মনে মনে তিনি একজন লেফটিস্ট। ইনটেলেকচুয়াল মানুষ তো ! ডাইনে এমন কেতরে বসে থাকতে দেখলে লোকে কি বলবে ? ছ্যাঃ।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হরিপদ পার্ক স্ট্রীট থেকে ছবিটবি আঁকা লিটারেচার নিয়ে এল। একজিক্যুটিভ চেয়ার। সিংহাসনের মতো। এতো উঁচু যে, তাতে বসে, তাঁর টেবিলের সামনে উল্টোদিকে যাঁরাই বসবেন, তাঁদেরই পিগমি বলে মনে হবে। মডার্ন ম্যানেজমেন্টের এও একটা ভাঁওতা। মানুষের ভিতরের জিনিস যতই কমছে তার চেয়ারের উচ্চতা ও প্রস্থ ততই বাড়ছে।

নাঃ। বড়সাহেবের চেয়ারটা বেঁটেখাটো গোলগাল। ঐ চেয়ারে বসলে তিনি নিজেই

চেয়ারটার পটভূমিতে বেপাত্তা হয়ে যাবেন। চলবে না।

হরিপদ।

স্যার।

চিনে মিস্ত্রী!

স্যার।

চিনে মিস্ত্রী এল ঘণ্টাখানেক পর। দর্জিকে যেমন করে ট্রাউজারের মাপ দেন তেমন করে তাঁর পশ্চাৎদেশ, উরু, কোমর, ঘাড় ইত্যাদির মাপ দিলেন বড়বাবু। মিস্টার চুং ফিংকে বলে দিলেন যে, এমন একটা চেয়ার তিনি চান, যে চেয়ারে বসে চাকরি-জীবনের বাকি আটটা বছর নিশ্চিন্তে, আরামে কাটিয়ে দিতে পারেন।

থ্যাঙ্ক য়্যু। বলে, চুং ফিং চলে গেলেন।

২

আজ চুং ফিং কোম্পানির চেয়ার আসবে। সকালে দাড়ি কামাতে কামাতেই উত্তেজিত বোধ করতে লাগলেন বড়বাবু। চাপা উত্তেজনা ; পরকীয়া প্রেমে যেমন হয়।

অফিসে যেতেই, সেক্রেটারি মিস সেন বললেন, গুড মর্নিং স্যার। বিহারের ডিলারদের সঙ্গে কনফারেন্স আছে এগারোটায়।

কনফারেন্স রুমে বসিয়ে কফিটফি খাওয়াতে বলবেন ওঁদের। আই মে বী আ লিটল লেট।

নিজের ঘরে ঢুকেই দেখলেন চেয়ারটাকে। বাঃ! ঝরাপাতার মতো ফিকে হলুদ রঙ। ফোম-লেদারের কুশান। ক্রোমিয়াম প্লেটেড পায়া, হাতল, পায়ার নিচের চারটে বল। রিভলভিং চেয়ার তো? ঠেলে দেখলেন একটু পেছনে হেলিয়ে। বাঃ। বসে বসে স্বপ্নও দেখা যায়, এমন চেয়ারে।

ইনটারকম চিঁ চিঁ করে উঠল হঠাৎ।

শাট্ আপ্।

চেঁচিয়ে উঠলেন বড়বাবু। লালরঙা রিসিভারটা তুলে মিস সেনকে বললেন, আধ ঘণ্টা কোনও কল দেবেন না আমাকে। নট ইভিন ইন্টারনাল কলস্।

ঠাক্ করে রিসিভারের গর্তে রিসিভারটাকে নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন চেয়ারটার দিকে। এমনভাবে, চেয়ারটা যেন ফুলশয্যার রাতের বউই!

চেয়ারটার সামনে অ্যাটেনশানে দাঁড়ালেন একবার, মনে মনে স্যালুট করলেন। তারপর ঘুরে আস্তে আলতো করে পশ্চাৎদেশ নামালেন ; হাঁস তার শরীরকে যেমন করে জলে নামায়।

আটকে গেছেন বড়বাবু। চেয়ারটায় একেবারেই আটকে পড়েছেন। অক্টোপাসের মতো চীনে চেয়ারটা একেবারে কামড়ে ধরেছে তাঁকে। নড়তে-চড়তে পারছেন না পর্যন্ত। এ কী চক্রান্ত মিস্টার চুং ফিং-এর? বেল টিপলেন পাগলের মতো। ঝড়ের মতো হরিপদ এসে ঢুকল।

স্যার!

আমাকে ওঠাও।

স্যার ?

আমাকে চেয়ার থেকে তোলো। চেয়ারের সঙ্গে আটকে গেছি আমি।

হ-রি-প-দ !

স্যার।

বলেই, রোগা-সোগা হরিপদ আপ্রাণ চেষ্টা করল বড়বাবুকে চেয়ার থেকে ছাড়াতে। কিন্তু পারলো না। মনে হলো, জীবনের মতো আটকে গেছেন।

বড়বাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বললেন, চেয়ারটা ঘুরিয়ে দাও তুমি। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাও আমার। হ-রি-প-দ।

হরিপদ সামান্য গায়ের জোরের সমস্তটুকু খরচ করে ঘুরিয়ে দিল চেয়ারটাকে। সহজেই ঘুরে গেল সেটা।

যাও হরিপদ।

হরিপদ চলে যাচ্ছিল ঘর ছেড়ে। বড়বাবু ডাকলেন, বললেন, শোনো, কাউকে কিন্তু বোলো না।

স্যার।

কাউকেই বোলো না যে আমি আটকে গেছি আমার চেয়ারে।

না স্যার !

রুম-এয়ারকন্ডিশানারের ফিসফিস শব্দ আসছিল। অনেক নিচে ক্যামাক স্ট্রীট দেখা যাচ্ছে। গাড়ি যাচ্ছে সারি দিয়ে। লোহালক্কড়, শেয়ার, ফাউন্ড্রি, চা ও মার্বেলের এক্সপোর্ট। অনেকই ব্যবসা এই কোম্পানির। অনেক মাইনে বড়বাবুর। পারকুইজিটস। দালালি, কমিশন, খাতির, উপরি, ডানে এবং বাঁয়ে। বড়ই আঠা।

আকাশে চিল উড়ছে। এই ঘরে বসে চিলের কান্নাও শোনা যায় না।

কলকাতার আকাশে এখনও অনেক নীল। মানুষের দেখারই সময় নেই শুধু।

নিজেই তো মাপ দিয়ে বানালেন চেয়ারটাকে। এই চেয়ারের চেয়ে নিজের মাপটা বোধ হয় বড় বলে ভেবেছিলেন উনি।

লাটু খড়িয়া এবং একটি দারাজ সাপ

হাতিগুলোর সামনে আগুন জ্বলছিলো.।

পাশাপাশি বাঁধা ছিল মেঘাঙ্গিনী, বাতাসী, সুলোচনা, প্রিয়ংবদা ! মেয়ে হাতিগুলোর পাশে পুরুষগুলো ; চন্দ্রচূড়, নীলকান্ত, রাজকান্ত ।

তখনও পুবে-আলো ফোটেনি। হলং নদী থেকে ঠাণ্ডা ধুঁয়ো উঠছে। শীত ; বড় স্যাঁতসেঁতে শীত। আগুনের পাশে বসে মাহুতরা হাত সেঁকছিলো। এনামেলের চা-এর গ্লাস হাতে ধরে দু'হাতের পাতা দিয়ে গরম গ্লাস থেকে উষ্ণতা শুষে নিচ্ছিলো স্নায়ুতে স্নায়ুতে। হাতিগুলোর ছায়া পড়েছিলো পেছনের ডাঙা জমিতে। ঐ অন্ধকার রাতের শীতার্ত নির্মোকি ফুঁড়ে এক স্বয়ম্ভূ স্বরাট দিন শিগগিরই ভূমিষ্ঠ হবে, এমন আশা ছিলো।

লাটু খড়িয়া চা-এর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে একটা বিড়ি ধরালো। অন্ধকারকে ভয় করে লাটু। দুর্ধর্ষ ডাকাত বীরেন কাঠামের বংশধর শ্যামসুন্দর কর্মকারও অন্ধকারকে বড় ভয় করে। এমনকি এই পাহাড়-পাহাড় অন্ধকারের-দূত হাতিগুলোও অন্ধকারকে ভয় করে।

শাল, শিমূল, হাতি সবকিছুই গ্রাস করে নেয় এই বিপুল অন্ধকার।

কিন্তু লাটু খড়িয়া এই অন্ধকারের চেয়েও বেশি ভয় করে আগুনকে। আগুনটা অন্ধকারকে ভেঙে টুকরো করতে পারে তো নাই-ই,উল্টে অন্ধকারটাকে আলোর বৃত্তের বাইরে আরো বেশি রহস্যময় গভীর ও ভয়াবহ করে তোলে। এই অন্ধকার ওর মেরুদণ্ডের রঙ কালো করে দিয়েছে।

মাহুত ধনবাহাদুর দর্জি ওদের ডেকে বললো, আর দেরী ক্যান্ ?

অন্যান্য মাহুতরা সাড়া দিলো না।

হাতিগুলো তো নয়ই !

রঘু খড়িয়া বিবক্ত গলায় ওদের শুধোলো, কি করেন বাহে ?

লাটু নিরাসক্ত গলায় বলল, না করি কোনো !

বলেই, উঠে পড়লো বিড়িটা ফেলে দিয়ে। তারপর তার হাতিটাকে বসতে বললো।

একে একে সব হাতিগুলো বসলো। মাহুতরা তাদের পিঠে উঠে বসলো। কেউ গামছা, কেউ মাফলার গলায় জড়িয়ে, গুঁজে নিলো ভালো করে।

অন্ধকার হাতিগুলো, অন্ধকারতর শেষ রাতে, হলং ফরেস্ট বাংলোর দিকে এগিয়ে চলল সারিবদ্ধ হয়ে।

লাটু মনে মনে আবার বললো ; না করি কোনো।

অর্থাৎ ও কিছু করছে না. এবং হয়ত করার ইচ্ছেও নেই।

একে কি কিছু করা বলে ? এই এককালীন স্বাধীন, জংলী, বলশালী হাতিগুলোকে মাথার উপর ডাণ্ডা মেরে মেরে ওরা অবশ করে দিয়েছে। দারিদ্র্য, ভীরুতা, শীত, স্ত্রী-পুত্র, নেশা-ভাঙ এই পুরুষ মাহুতগুলোর মস্তিষ্কও বিবশ করে দিয়েছে। শিশির-ভেজা নরম ধুলোর উপরে হাতিদের প্রায় নিঃশব্দ পায়ের আওয়াজে, নিজেদের মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত চলাচলের ক্ষীণ ঝিন্‌ঝিনি অনুভূতিতে একটাই সুর বাজছে :

"না করি কোনো।"

হলং নদীর সাঁকো পেরুলো ওরা।

বড় বড় মাছগুলো এই ঠাণ্ডায় ডিগবাজি খাচ্ছে। মাছেদের কি শীত নেই ? সাঁকোর ডানদিকের জঙ্গলে যে দারাজ সাপটা থাকে, সে এখন কোথায় কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে কে জানে !

হঠাৎ লাটুর মনে হল, ওর নিজেবই মাস্তিষ্কে। দারাজ সাপ নির্বিষ, ঠাণ্ডা। কোনও মানুষই ভয় পায় না দারাজ সাপকে।

ওরা সব দারাজ সাপ হয়ে গেছে। এমনকি এককালীন দুর্ধর্ষ ডাকাত বীরেন কাঠামের বংশধর শ্যামসুন্দর কর্মকারও। ওদের কেউই আর ভয় পায় না। কিন্তু ওরা পায়। ডি-এফ-ও-র জীপের শব্দকে ওরা ভয় পায়। আই জি-র ট্যুর প্রোগ্রামকে ওরা ভয় পায়। ভয় পাওয়ার কারণ নেই কোনও। কিন্তু ভয় পায়। আর তাড়া-খাওয়া দারাজ সাপের মতো গুটিয়ে যায়। গর্ত খোঁজে। ভয়ের শীত ওদের কাঁপায়। ওদের চাকরি, ওদের সংসার ; ওদের সামান্যতা ওদের বড় ভীরু করে দিয়েছে।

লাটু খড়িয়া আবার মনে মনে বললো, না করি কোনো।

বাংলোর সামনে হাতিগুলো সার দিয়ে দাঁড়ালো। এখন বিভিন্ন কাঠ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ঘরে বাবুরা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে বেড-টি খাচ্ছেন। এরপর, বাথরুমে বাথরুমে জলের আওয়াজ হবে। তারপর বিচিত্র পোশাক পরে নারী-পুরুষ সব কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবেন। অন্ধকারে কথার ফুলঝুরি ঝরিয়ে। মাথায় বাঁদুরে টুপি, কোট, জার্কিন, গলায় মাফ্‌লার। কাঁধে ক্যামেরা। জলদাপাড়ার বাঁদরগুলোর চেয়েও বেশি বাঁদুরে মনে হয় এই বাবুগুলোকে।

লাটু একটা হাফ-হাতা শার্টের উপরে ডিপার্টমেন্টের কোট পরেছে। গলায় গামছাটা জড়িয়ে নিয়েছে ভাল করে। হাতির পিঠে বসে বড় শীত লাগে। এর চেয়ে নিজের পায়ে হাঁটা ভালো। শরীরে রক্ত চলে, রক্ত ছোটে; রক্ত বাড়ে। গরম লাগে শরীর।

কতরকম লোক আসে এই জঙ্গলের জানোয়ার দেখতে। লাটুদেরও দেখতে। বেঁটে, মোটা, লম্বা, রোগা, সভ্য, অসভ্য, গর্বিত, বিনয়ী, সাহসী, ভীরু। কতরকম মেয়ে : পদ্মিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনীও ; মেঘাঙ্গিনী, বাতাসী ও সুলোচনাদের মতো।

ওঁরা জানোয়ার দেখেন, লাটুরা ওঁদের দেখে। মাঝে মাঝে লাটুর ইচ্ছে করে হাতির পিঠ থেকে কিছু লোককে নামিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে কিছু জানোয়ারকে হাতির পিঠে তুলে নেয়। ভগবান শালা কতো মানুষকে জানোয়ার করে, কত জানোয়ারদের মানুষ করে পাঠায়। লাটুর কি করার আছে ?

'না করি কোনো।'

বাবুরা, মায়েরা, সায়েবরা, মেম-সায়েবরা সব একে একে এলেন। হাতিগুলো বসল এক এক করে। ওঁরা উঠলেন, বিচিত্র সব শব্দ করে।

এখনও অন্ধকার। লাটুরা এখন তাদের সওয়ারীদের শুধু আবছা আবছা দেখতে পায়।

দলে কোনও সুন্দরী থাকলে লাটু প্রার্থনা করে, যেন সে অন্য হাতিতে ওঠে, যাতে তার হাতির মাথার দুদিকে দু-পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে ডাঙ্গস্ হাতে করে সে ডাগর মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে জলদাপাড়ার শীতের স্যাঁতসেঁতে সকালে হেলতে-দুলতে উষ্ণ হয়ে উঠতে পারে।

হাতিগুলো একে একে উঠলো। তারপর সারবন্দী চললো।

বাংলোর কাছেই একটা বুড়ো শিমুল। বিরাট বড়। বুড়ো হলে কী হয়, ফুল এখনও ফোটে। বুড়োর নাক দিয়ে মাথার চুল দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে শিশির ঝরে। হাতি চলে। মানুষ দোলে। লাটু বুকের দু'পাশে দু'হাত আড়াআড়িভাবে রেখে ডাঙ্গস্‌টা দু'পায়ের মাঝে রেখে একটু ঘুমিয়ে নেয়।

হাতি চলতে থাকে। হলং নদী পেরোয়। মানুষগুলো দোলে, পুবে ধীরে ধীরে কিশোরী মেয়ের মনের মতো, পুঁটিলেখা ফুলের মতো ; একটি মাঘের সকাল খোলে।

কাশিয়ার নরম, রূপোলি, বিদেশিনীর লোমের মতো মসৃন শিশির-ভেজা রেশমী-ফুলে প্রথম রোদের সোনা এসে হীরে জ্বাললো। পাখিরা জাগলো। টিয়া উড়ে গেলো প্রথম ভোরের আকাশে সবুজ আবীর ছুড়ে দিয়ে। বুলবুলি শিমুলের উঁচু ডালে বসে শিস দিলো। ধনেশ পাখি গ্লাইডিং করে করে রোদ পোয়াতে লাগলো।

রোদ উষ্ণতর হলো। ফিকে গোলাপি থেকে সোনালি। সোনালি থেকে বাদামি। বাদামির পরেই হলুদ। হলুদ হয়েই, হঠাৎ দিন হয়ে গেলো। দিনের কোনও রঙ রইল না। কখনও থাকে না। দিনের রঙের প্রদীপ ধরেই অন্য রঙ চেনা। দিন পটভূমি ; ইজেল। তারই উপর অন্য সব কিছু স্থাবর-জঙ্গমের ছবি।

হাতি চললো। কোমর দুললো। ঘাস নড়লো। পাখি উড়লো। শিশির ঝরলো। হাতি চললো। দিন তখন হাসনুহানার মত ফুটতে লাগলো। দিনের প্রহরে প্রহরে গন্ধ। সে বাস আলাদা। প্রতি প্রহরের বাস আলাদা। আদুর গায়ের নারীর বাসের মতো। যে জানে, যার নাক আছে ; সেই-ই জানে।

পড়াশুি ঘাসের পাতা নড়লো। শিমুল তরুর মূল ভাঙলো হাতির পায়ের চাপে। হাতির গায়ের গন্ধ, রাই-সেগুনের গন্ধ, শিমুলের ঋজু শরীরের পুরুষালি গন্ধ, শিশু গাছের গোল গোল মিষ্টি পাতার মেয়েলি গন্ধ, কাশিয়ার গন্ধ, ঢাড্ডার গন্ধ, ফেলে-যাওয়া পথে যাযাবর চিরপুরুষ তোর্ষা নদীর গায়ের গন্ধ, নদীর বুকের নুড়ির গন্ধ, শিকারী বাজের শক্ত ডানার গন্ধ, হাতির পিঠে কোলকাতার মেয়ের পারফ্যুমের গন্ধ, লাটু খড়িয়ার বগলের গন্ধ, হাতির পুরীষের গন্ধ, সমস্ত মিলেমিশে ভোরটা, এই সমস্ত সকালটা ম-ম করে উঠল গন্ধে গন্ধে।

লাটুর নেশা লাগলো। ঘুম পেতে লাগলো।

এমন সময় শ্যামসুন্দর তার আগের হাতি নিয়ে 'নুনী'তে নামলো জলদাপাড়ার পথ ছেড়ে। এখানে ডিপার্টমেন্ট নুন ছড়িয়ে রাখে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে। গাউর আসে, শম্বর আসে, হরিণ আসে, কোটরা আসে, আর আসে গেঁড়া। এক-শিঙের গণ্ডার। জলদাপাড়ার গর্ব। হলং-এ বাবুদের আসার কারণ।

'নুনী'র প্রতি ইঞ্চি মাটি পরীক্ষা করে মাহুতরা গেঁড়ার পায়ের দাগের জন্যে। তারপর পায়ের দাগ দেখে আবার হাতি নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে।

যখন একেবারেই চুপচাপ থাকার কথা, ঠিক তখনই লাটুর পুরুষ সওয়ারী কথা বলে ওঠে।

খুব থ্রিলিং। ঘোষ সায়েবকে একবার নিয়ে এলে হয় এখানে, কি বলো ?

কি জন্যে ? ঘুষ ? মেয়েটি বললো।

ছিঃ ছিঃ কি যে বলো ?

তবে ?

নাঃ, ব্যাটা মহা ঝামেলা লাগাচ্ছে। একটু তেল না দিয়ে উপায় নেই। কনফিডেন্সিয়াল ক্যারেকটার রিপোর্টটা এবার খারাপ করলে প্রমোশন নির্ঘাৎ আটকে যাবে। এই প্রমোশনটা হলে তোমার কোনও শখই আর অপূর্ণ থাকবে না। বুজেচো ?

—ওঃ।

মেয়েটি বললো।

ঘোষ সাহেব তো তুমি বলতে অজ্ঞান। একবার এসো না দুজনে এখানে। কোনও রিসক থাকে না আমার।

লাটু বাংলা বোঝে। লাটু বাঙ্গালীই। আমাদের বঙ্গদেশ অনেক বড়। কোলকাতার কূপমণ্ডুক বাঙ্গালী খোঁজ রাখে না।

মেয়েটি বললো, এ-কথা বলতে তোমার লজ্জা করলো না ?

—লজ্জা ? লজ্জা কিসের ? তুমি কি আমার ভাল চাও না ?

—ভাল চাওয়ার সঙ্গে যে কথা বলছ তার কি সম্বন্ধ ? তোমার ভাল চাই বলে, একটা কাঁকড়ার মতো লোকের সঙ্গে রাত কাটিয়ে তাকে নিয়ে গণ্ডার দেখতে হবে আমার ? তুমি কি পুরুষ ?

লাটু একটা বিড়ি ধরাল ; মনে মনে বলল, দারাজ সাপ। শালা, চিকনি আলু।

শ্যামসুন্দর মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করল। আওয়াজটার মানে হাতিগুলো বুঝল। সওয়ারীরা বুঝল না। হাতিগুলো যার যার মাহুতের কাছ থেকে চাপা আওয়াজ শুনে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

লাটুর সওয়ারী শুধোল কি ? কি ? কি ?

লাটু, চাপা গলায় বলল, গেঁড়া।

গেঁড়া মানে কি ?

গণ্ডার।

তাই ? লোকটি বললো।

মেয়েটি বলল, কী মজা।

পুরুষটি ভয়-পাওয়া গলায় বললো, কথা বোলো না। দড়ি ধরে থাকো শক্ত করে।

একটু পরই হাতিগুলো গেঁড়াটাকে ঘিরে ফেললো। কাশিয়ার মধ্যে, ঢাড্ডার ফাঁকে, পুড়াণ্ডির সবুজ পটভূমিতে গেঁড়াটা দাঁড়িয়েছিল।

গণ্ডারটাও একট. দারাজ সাপ হয়ে গেছে !

জংলী গণ্ডার অনেক দেখেছে লাটু। কুচবিহারের রাজার শিকারের হাতি চালাতো সে একসময়। স্বাধীন, বেপরোয়া, সাহসী গণ্ডার সে অনেকই দেখেছে। এ-গণ্ডারটা বিটি-ছাওয়া। ম্যাদামারা।

সওয়ারী পুরুষ কাঁপা গলায় বলল, চার্জ করবে না তো ?

লাটু বলল, মনে মনে, এটা দারাজ সাপেদের ভিটে, সব নির্বিষ জলঢোঁড়া, এখানে পুরুষকার নেই, সব ব্যাটার মাথা নীচু, এমন কি গণ্ডারেরও।

হাতিগুলো ঘিরে দাঁড়াল গণ্ডারটাকে।

লাটুর হাসি পেলো। জংলী হাতিও অনেক দেখেছে লাটু। লালজীব হাতি ধরার

ক্যাম্পেও সে কাজ করেছে এক সময়। এই হাতিগুলোও দাবাজ সাপ। ডাঙ্গসের ভয়ে, লাটুদের ভয়ে অস্থির। বন্দীদশায় যে বাচ্চাগুলো পয়দা করছে তারা, সেগুলোও মেরুদণ্ডহীন, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন, স্বাধীনতার বোধ বিবর্জিত।

গণ্ডারটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। ছবি তুললো কেউ কেউ। তার সওয়ারী মেয়েটি বললো, কী মজা!

লাটুর ভাল লাগলো মেয়েটাকে খুব। লাটুও দাবাজ সাপ। ওর সব সাহস গ্রীষ্মের ঘাসের মতো বুকের মধ্যে পুড়ে গেছে বহুদিন আগে।

একসময় অতবড় স্বাধীন সবল সুস্থ স্বয়ংনির্ভর গণ্ডারটা, গণ্ডারজাতের কুলাঙ্গারটা, হাতির জাতের কুলাঙ্গারদের সামনে, মানুষের জাতের কুলাঙ্গারদের সামনে মাথা নীচু করে ঢাডডার গভীরে ঢুকে গেলো।

গেঁড়া দেখে সকলেরই জীবন সার্থক হলো। তারপরই ফিরে আসার পালা।

এখন শিমুলের মাথায় রোদ। বাজের গায়ে রোদ। মাথার উপরে স্বরাট আকাশ। স্বাধীন হাওয়া। বাধাবন্ধহীন আলো। দূরে ফুংসেলিনের পাহাড়শ্রেণী— আদিগন্ত—মুক্তি মুক্তি।

লাটু ভাবলো, কী সুন্দর দেশ আমাদের! একমাত্র অনীকিনী তার হাতির পিঠে। মেয়েটাকে বড় ভালবেসে ফেলেছে লাটু।

লাটু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো।

সওয়ারীদের বাংলোয় নামিয়ে দিয়ে হলং নদীর সাঁকো পেরিয়ে ফিরে আসার সময় দাবাজ সাপটাকে দেখার অনেক চেষ্টা করলো লাটু। এ সময়ে রোজই সাপটা রোদ পোয়ায় নদীর পারে। একটা কাটা-গাছের গুঁড়িতে। আজ সাপটাকে দেখতে পেলো না।

লাটুর মনে হল, সাপটা লজ্জায় কোথাও চলে গেছে।

সাইকেল

তুমুল বর্ষা। চারা রুইবার সময় আসতে না আসতেই যেন ভাদ্রর শেষের মত এক হাঁটু জল মাঠে। গত বছর খরা গেল। এবারে অতিবর্ষণ! মানুষকে আর বাঁচতে দেবে না।

শালোপাড়া গ্রামটা ছোটই। বেশ বেশিই ছোট। কাছেই অবশ্য আছে, হুকলিঝাড়। বিরাট ব্যাপার সেখানে। বড় বড় আড়তদার। চারদিকে শয়ে শয়ে মাইল ধানক্ষেত আর রাইস মিল। এফ সি আই-এর গোডাউন। ট্রেনের স্টেশন। ঐ হুকলিঝাড়ের সঙ্গেই শালোপাড়ার নাড়ি বাঁধা। এখানের লাউটা, কুমড়োটা, মাগুরটা-সিংগিটা, সেই সবই গিয়ে জড়ো হয় শনিবারের হুকলিঝাড়ের হাটে। বদ্দমানের বড়মানষিরা ছুটি-ছাটার দিন হলেই গাড়ি নে চলে আসে ফিসটি করতে, ঘুরতে ফিরতে, মালোপাড়ার নির্জনে। এঁটেল মাটির বর্ডার দেওয়া পিচ-এর রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সন্ধ্যের মুখে জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকে বড়লোকের ব্যাটা-বিটিরা, ছিন-ছিনারি দেকে। কেউ কেউ বোতল খুলে ঢুকুঢুক খায়।

রাত আটটা হয়ে গেলো। এখনও যমুনা ঘরে এলো না।

কেতো বালিশের তলাতে—রাখা ঘড়িটা দেখলো। তার বিয়ের সময় সেনবাবুদের খামারের ম্যানেজারবাবু এটা দেছলেন। এইচ· এম· টি· ঘড়ি একটা। কেতোর জীবনের সব চেয়ে দামী সম্পত্তি। যখের ধনের মত আগলে রাখে ও সব সময় এই ঘড়িটাকে।

যমুনা গেসলো তার বাপেরবাড়িতে নবীনপুর-এ। গেসলো, পড়শু! আজ বিকেল বিকেল যমুনার দাদা তাকে পৌঁছে দে গেছে। এতক্ষণে তো কাজকম্মি সেরে খাওয়াদাওয়া করে ঘরে আসা উচিত। বাইশ বছরের কেতোর ধৈর্য ধরে না। বিছানায় শুয়ে ছটফট ছটফট করে। নতুন জল-পাওয়া মাঠে ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ! গাছে গাছে সবুজ তারার টায়রার মত জোনাকির ফুল দোলে। মাটির ঘরের ছোট্ট জানলা দিয়ে এসব দেকে-টেকে সময় কাটাবার উপায় খোঁজে কেতো। দুসস্ শালা! তবু, সময় কি কাটে? নতুন বউকে দিয়ে এত কী কাজ করায় বাবা আর পুঁটিদি তা তারাই জানে। মোটে ছ মাস বিয়ে হয়েছে কেতোর।

কেতোর মনে পড়ে, হাবা বলেছিলো এক দিন। পাঠশালা তো আজকাল নেই। প্রাইমারি স্কুলে যখন পড়ত ওরা, তখন হাবাকে একদিন মাস্টের জিগগেস করেছিলো, বলতো বাবা হাবা, 'বিহ্বলতা' শব্দের মানেটা কী?

হাবা অনেকক্ষণ হাবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরই মাস্টের বলেছিলো যাঃ বাবা। এ যে দেখছি বিবিই পালিয়ে যাবে! গা গরম করতে করতে, বিবিই পালাবে!

বিহ্বলতা-টিহ্বলতা শেখবার জন্যে হাবা কি কেতোরা স্কুলে যায়নি। আমন-বোরোর

সোজা হিসেব। তাই-চুং, আই· আর· এইট-এর কিলো কষা। ফলিডল, ইউরিয়া, খোল এসব কিছুর হিসেব-নিকেশ করতে পারা। পাইকার যাতে না ঠকিয়ে দেয় তাই গুন ভাগ যোগ বিয়োগটা জানা। স্কুলে, আসলে যাওয়া ; নিজের নামটা ভাল করে সই করতে জানতে। পঞ্চায়েতে গিয়ে খপরের কাগজও পড়ে আসতে পারে। আজকাল অবশ্যি রেডিওর খপর শুনলেই সব জানা যায়। ঘরেঘরে টানজিস্টার, তবু টি·ভি·ও হোয়েছেন হেথা হোথা। কেতো তা পারেই, শ্রীবাবু কার্তিকচন্দ্র পোড়েল বলে নাম সই করতে। এমনকি হাবাও পারে। শ্রীল শ্রীযুক্ত হাবা সাপুই। হাবা তো যেখানেই পারে, সেখানেই একটা করে সই মেরে দেয়। ডিসটিকট বোরডের কাঁচা রাস্তায়, পদ্মদীঘির জলে, এমনকি সনাতন মাঝির বাড়ির উঠোন যখন পাকা করতেছিলো বদ্দমানের রাজমিস্তিরা তখন সেই থকথকে সিমেন্টের মধ্যেও আঙুল চালিয়ে লিকে রেকেচিল শ্রীল শ্রীযুক্ত হাবা সাপুই। সিমেন্ট জমাট বেঁধে যেতেই চিত্তির! সনাতন মাঝির মাথায় হাত! উঠোনে ঢুকতেই বড় বড় করে সিমেন্টের মধ্যে লেখা শ্রীল শ্রীযুক্ত হাবা সাপুই। সনাতন মাঝি রেগে গিয়ে বলেছিলো, শালা! এই ছোটলোক ইনইডুকেটিডদের গেরামে আর লয়! জান কইলা হয়ে গেলো গো!

এমন সময় ঝুনঝুন করে চুড়ির শব্দ হলো। সোনার নয়। লোহা, শাঁখা আর গিল্‌টি করা কেমিক্যাল গয়না তার বৌ-এর গায়ে। যমুনার বাবা মা নেই। দাদা বৌদি যা না দিয়ে পারেনি তাই-ই দিয়েছে। আর কেতোর বাবা হাড় কেপ্পন। তিনিও কিছুই দেননি। খাইয়েছিলেন পঁচিশ জনাকে। তাও অতি সাদামাটা!

কেতো উঠে বসল বিছানাতে। যমুনা একটা কালো আর হলুদ ডুরে শাড়ি পড়েছে। এইটেই তার সব চেয়ে ভালবাসার শাড়ি। আর যা আছে, সবই আটপৌরে। আজ বাপের বাড়ি গেসলো বলে শায়া আর বেলাউজও পরে গেছিলো। অন্য দিন শুধু গায়েই শাড়ি জড়িয়ে থাকে। ঘরে ঢুকেই, তাড়াতাড়ি, দরজা বন্ধ করলো। হ্যারিক্যানের আলোটা পড়েছে যমুনার কুচকুচে কালো মস্ত বড় খোঁপাটাতে আর শাড়ির পেছনে। ছ' মাসের পুরনো বউ, তবু শালা যেন রোজ রাতেই মনে হয় আনকোরা নতুন। যমুনার গায়ে পদ্মদীঘির শাপলার গন্ধ। তার বুকের মধ্যে যখন ওর নিজের ঠোঁট চেপে ধরে কেতো, তখন মনে হয় ডাগর ডাগর পদ্ম দুটির মধ্যে থেকে পদ্মবীজই কুড়িয়ে খাচ্ছে যেন। কত সব গন্ধ, দৃশ্য ; বার বার দেকে-শুঁকেও ফুরোয় না। আলো জ্বালায়ে দেকেছে, আলো নিভায়ে দেকেছে, দিনের আলোয়, চাঁদের আলোয়, কনে-দেখা আলোয় সব রকম করে দেকেও দেকা ফুরোয়নি কেতোর। আশ মেটেনি। কে জানে! নতুন বউ পুরনো হতে কত দিন লাগে? যমুনাকে বড় ভালোবাসে কেতো। যমুনা ছাড়া তার আর কেউই নেই। কেউই তাকে এত ভালবাসেনি।

যমুনাকে কি? নাকি যমুনার শরীরটাকেই? ঐ হলো! অতশত ভাবে না কেতো। ভাবার সময় কুথায়?

যমুনা ঘুরে দাঁড়ালো। দরজাতে পিঠ দিয়ে!

কী? হল কেমন? বাপেরবাড়ি গিয়ে মন ভরল?

উত্তর না দিয়ে যমুনা বলল, গলা নামিয়ে ; বাতিটা নিবোবে? শাড়ি জামা ছাড়তাম।

না, না। ধমক দিয়ে বললো কেতো, চিতি সাপ আছে গো! কাল তুই ছিলি না যমুনে, ঘরে ঢুকেই দেখি, চিতি সাপ' চেঁদো দাদাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নে দুজনে মিলে তাকে মারি।

সত্যি ? ঘরের মধ্যে চিতি ! বল কী গো ?

অবিশ্বাসী গলায় ষোল বছরের যমুনা বললো, কালো ভ্রমরের মত দুটি উজ্জ্বল চোখ তুলে।

না তো কী ? আমি কি তোর ইয়ার্কির পাত্র ?

মুখ নামিয়ে যমুনা বললো, না। তুমি আমার পতিদেব। আমার দেবতা, সর্বস্ব আমার

খোল শাড়ি জামা। আলো আরো তুলে ধরছি আমি। দেখবো। দেখে দেখে আশ মেটে না। কী দিয়ে গড়েছে তোকে রে বিধি ? ভাবি আমি।

লজ্জা পেয়ে যমুনা বললো, কেন ? না। আলো নামাও।

না।

না, না। লক্ষ্মী, নামাও।

না কেন রে ? কেন না ?

কেতো বললো তোকে দেখবো। ভালো করে দেখবো। আজ তোকে শাড়ি জামা জড়ির ফিতে বেণীতে জড়িয়েই এত ভালো দেখাচ্ছে, সব ছেড়ে ফেললে না জানি আরও কত ভালো দেখাবে। না রে !

ধ্যাত্…।

লজ্জা পেয়ে বললো যমুনা।

বলেই, যমুনা ঘরের এক কোণাতে, যেখানে দুটি ছেঁড়া শাড়ির পাড়ের চাদর-ঢাকা তোরঙ্গ পর পর সাজানো আছে, সেখানের আবছা অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে চকিতে অনাবৃত করেই বাড়িতে পরার চাঁপা রঙা একটা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিলো। উদলা গায়ে। বাদলা-রাতে গা-শিরশির করে উঠলো ওব। শিরশির করে নানা কারণে।

কেতো, মনে মনে বললো, বাঃ রে। এ যে দেখি বহুরূপী। কালো আর হলুদ শাড়িতে ছিল বসন্ত-বৌরি আর এখন হয়ে গেলো সাঁঝবেলাকার ফিনফিনে চাঁপারঙা জল-ফড়িং। মস্ত ফড়িং। যাঃ মাইরী !

যমুনা খাটে আসতে গড়িমসি করছিল। বিনুনি থেকে রুপোলি জরির ফিতে খুলছিল। আস্তে আস্তে। ডানদিকের বেণী থেকে খোলা হয়েছে সবে, কেতো একলাফে খাট থেকে নেমে ঝড়ের মত গিয়ে পড়ল তার উপর। পাঁজাকোলা করে যমুনাকে তুলে নে এসে খাটের উপর ফেলল দড়াম করে। মাটির ঘর কেঁপে উঠল যেন।

তারপর ? তারপব, যাহয় তাইই…

মাটির ঘর সোহাগে কাঁপতে লাগল।

বাইরে আবারও মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। এখন ওরা পাশাপাশি শুয়ে আছে। কাত হয়ে, যমুনাকে জড়িয়ে আছে কেতো, পেছন থেকে।

কেতো বললো, সাইকেল ? কথা হলো কি কিছু ?

উঁ ?

সাইকেলটার কথা তোর বড়দাদা কী বলল ?

জানি না।

তার মানে, "না" বলেছে : কী ?

ঠিক তাও না। ঝুলিয়ে রেখেছে। বুঝছে না আমার ভাগ্য, আমার সুখ, সব ঝুলছে সেই সঙ্গে। জোর তো নেই। সং দাদা।

না তো কী ? গত ছ মাস ধরে এমনই ঘুরোচ্ছে তারা। এদিকে বাবা কিন্তু রেগে যাচ্ছে

রোজ রোজ। এক দিন সত্যি করে চটে উঠলেই,কম্মো শেষ।

যমুনার ডান বুকের উপর ডান হাত কেতোর। চাষার হাত। রুক্ষ, কর্কশ, মোটা চামড়ার তেলো। কিন্তু যমুনার শরীরে তো এর আগে অন্য কেউই হাত দেয়নি। যমুনার এইই খুব ভাল লাগে। কেতো তাকে খুব ভালবাসে। অন্তত তার শরীরটাকে। ঐ হলো ! ওতেই খুব খুশী যমুনা। ছোটবেলায় মা-বাবা মরা মেয়ে আদর কাকে বলে তাইই জানেনি কখনও। কোনরকম আদরই নয়। তার কাছে শরীরের আদরও অনেক আদর। কাজকর্ম খাটাখাটুনির মধ্যে ডুবে গিয়ে কখন কেতোর সোহাগ খাবে ঘরে গিয়ে, সেই আশায় প্রদীপের সলতের মত কাঁপে যমুনা।

মাঝে মাঝেই কেতো তাকে ভয় দেখায়। "বাবা যেদিন সত্যিকারের চটে উঠবে" সেদিনই "কম্মো শেষ" বলতে ঠিক কী যে বোঝায় কেতো,তা জানে না যমুনা। কিন্তু কেতোর বাবার মিথ্যা রাগ দেখেই তার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় ভয়ে। পাখিব মত ঢিপ ঢিপ করে তার বুক ! জানে না, সত্যিকারের রাগের দিন কী হবে ?

আজ বাবা কি কিছু বলল ?তোমার দাদাকে ? এসেছিল কোন্ দাদা ? মেজদা ? আমি তো ছিলাম না। যত্ন-আত্তি করা হল কি কিছু ?

যত্ন-আত্তির কথা ছাড়ো। গরিব বৌ-এর বাড়ির লোককে কে যত্ন-আত্তি করে ? তবে বাবা মেজদাকে বললেন, যা বলেন। বিয়ের দিন থেকেই যা বলছেন। কথার খেলাপ তো হয়েইছে। তোমাকে সাইকেল দেবে বলেছিলো, দিতে পারেনি।

ছাড়ো তো ! আমার লাগবে না। আরে পামপটা বসুকই না, তিনচার বছরের মধ্যে ধান করে, গম করে, এমনকি আলুও করে আমি নিজেই একটা ভটভটি কিনে নেব।

সত্যি ? ভটভটি সাইকেল ? হলুদ কালো ডোরা ডোরা।

বিছানাতে উঠে বসার চেষ্টা করলো যমুনা, উত্তেজনায়।

কেতো তাকে কোলবালিশ করে উরু দিয়ে চেপে বলল, শোনোই না।

কী রঙের ? হলুদ-কালো তো ?

যে রঙের চাইবি। কেনার আগে তোকে শুধিয়ে নেব।

পেচনে আমি বসতে পারবো ? কী গো ? ছিট থাকবে তো ?

নিশ্চয়ই !

আমাকে পেচনে বসিয়ে আমাদের গেরামে যেতে পারবে ?

নিশ্চয়ই। পারবো না কেন ? কত জায়গায় যাবো। তোকে ডি· ভি· সি·'র ক্যানাল দেখিয়ে আনবো। দুগগাপুর। কত বড় শহর গো ! আগে যেইতে পথে মস্ত বড় বন পড়তো। ডাকাইতি হত সিখানে। কেঁদো বাঘ ছেলো। দাদুর কাছে শুনেছি।

আচ্ছা ! যমুনা ফিসফিস করে বলল, একটা কথা বলবো, রাগ করবে না বলো ?

কী ?

তোমার দাদু কি ঐ দুগগাপুরের বনে ডাকাতি কইরেই সব জমি-জমা ডাল-ভাঙাই কল, ইসব কইরেছেন ?

তোকে কে বইলেচে ?

আমাদের গেরামের লোকেরা বলে। আরও বলে, তোমার বাবা নাকি এখন চাষ-বাস ছেইড়ে দে ওয়াগন-ভাঙাদের দলে নাম নিকিয়েছে : খুব নাকি লাভ সিখানে। কাঁচা টাকা। ইসব কাজ কারবার নাকি খুবই ডিঞ্জারাস। সবাই বলে। সত্যি ?

এমন সময়ে হঠাৎ ওদের মাথার কাছের জানালার একেবারে পাশেই শব্দ হল একটা।

কেরে ?

বলেই, উঠল কেতো। খাট ছেড়ে, বৌ-এর গায়ের গন্ধ ছেড়ে দরজার খিল খুলল, হাতে বর্শাটা তুলে নিয়েই। যমুনাও দৌড়ে গেছিলো পেছন পেছন। তার পরই সে উদোম এ কথা মনে পড়াতেই খাটের বাজুতে ঝুলিয়ে রাখা শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে বললো, কেতোকে জড়িয়ে ধরে, তুমি যিও না গো।

একটা টর্চ থাকলি।

এটাই লাও।

বলেই, যমুনা তাড়াতাড়ি তার ঝুলি থেকে টর্চটা দিল।

দরজা খুলে চারধারে আলো ফেলে কাউকেই দেখতে পেল না কেতো। শুধু দেখল, দুবার কেশে,তার বাবা উঠোন থেকে ঘরের দিকে যাচ্ছেন খুব আস্তে আস্তে। কেতোর মনে হল, একটা মস্ত খরিশ গোখরো যেন ঢুকছে তার গর্তে গিয়ে।

দরজা খোলার শব্দ হওয়াতে ও পিঠে আলো পড়াতে ঘুরে দাঁড়িয়ে কেতোর বাপ গণশা পোড়েল বলল, কে ? ও কেতো ! কী হল ? এত রাতে ? বউমার শরীর কি খারাপ ?

নাঃ।

কেতো বলল। শব্দ হয়েছিলো একটা।

তুই কি শহুরে হয়ে গেলি বাপ ? গ্রামের রাতে কত শব্দই তো হয় ! শব্দ হলেই রাত-বিবেতে ছেলেমানুষ জোয়ান বউকে একা ঘরে ফেলে কেউ এমন বেরোয় রাতে ? তুই কীরে ? তোর কি আক্কেল হবে না ? কোন দিন ফিরে দেখবি বউই তুলে নিয়ে গেছে ডাকাতে ! তোর বয়স হল দেদার, বুদ্ধি হল না এক ফোঁটা।

না। শব্দ শুনলাম। একেবারে জানলার পাশেই ! তাই।

শ্যাল-ট্যাল হবে।

নাঃ। শ্যাল না।

তবে ?

তবে...

তবে কি বাঘ ?

বাঘ !

হ্যাঁ শ্যাল না হলে নিশ্চয়ই বাঘ। এত ভয় যখন পেয়েছিস !

কেতো কোন জবাব দিতে পারলো না ! চুপ করে রইলো।

ফিরে আসছিলো, এমন সময় বাপ গণশা বললো, কাল বদ্দমান যেতে হবে। মনে আছে তো ?

হ্যাঁ।

সকালে দুটি খেয়েই বেরিয়ে যাস এস· ডি ও· সাবের জন্যে এক হাঁড়ি বড় কই মাছ রেখে দেচি ! মালোকে বলেছিলাম দে যেতে। নে যাস. যাবার সময়।

ঠিক আচে।

বলল, কেতো।

ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করেই খাটে এলো। যমুনা উঠে বসেছিলো। বললো, আমার ভয় করে। খুব ভয় করে গো।

আমারও।

কেতো বললো।

তোমারও ? কেন ? বাঘ-এর জন্যে ?

না।

শ্যাল্‌কে ভয় ?

নাঃ।

তবে ?

আছে।

আমার ভয় করে গো।

সাবধানে থেকো। কাল আমার বদ্দমানে যেতে হবে। বাবার অডডার

পরদিন ভেরে উঠে কেতোকে ডেকে গণশা বললো, সাইকেল-এর কথা কিছু জানিস ?

চমকে উঠল কেতো ? বললো কেন ? যমুনার দাদা কিছু বলেনি ?

সে তো গত ছ মাস ধরে যা বলার বলেই চলেছে। কথাতে তো আর চিঁড়ে ভিজবে না। যমুনের বড়দাদা শুনেছি খুবই ফেবেলবাজ নোক। গণশা পোড়েল-এর ছেলের বে কি ঐ হাভাতে ঘর ছাড়া আমি দিতে পারতাম না ? দ্যাখ কেতো, আমার এবার ধৈযযচ্যুতি ঘটার উপক্কেরম হতিচে। ইর পর, কিছু হলে আমাদিগেব দোষ লাই। কোনো দোষই লাই।

তারপরই বললো, তোর সোজা আর বদ্দমান যেয়ে কাজ লাই। তুই যমুনের বাপেববাড়ি যা আগে তারচে। সিখান থেকে বদ্দমানে চইলে যাস বাসে। একটো চিঠি দে দেবো। ছোট দারোগার বাড়িতে ওলাচণ্ডিপুরে রাতটা থেকে দুজনে একই সঙ্গে ভোর ভোর চইলে আসিস। ছোট দারোগার তো ভট্‌ভটিও আছে। হাওযার মত পৌঁছে যাবি।

কেতো ব্যাপার কিছুই বুঝলো না। তবে কোনো একটা ব্যাপার যে ঘটতে যাচ্ছে, তা অনুমান করতে পারলো। তার মায়ের মৃত্যুর আগের দিন এমন নানা রহস্য ঘটিয়েছিল তার বাবা। এই শালা বাবাকে ভক্তি ছেরেদ্দা তো করেই না. ঘেন্না কবে কেতো। পেচণ্ড ঘেন্না। মাকে খুন করেছিলো বাপ।

যমুনা গত সপ্তাহে একদিন বলেছিলো.পুঁটিদিটা না থাকলে, এ বাড়িতে থাকাই যেতো না। তোমার বাবার স্বভাব-চরিত্তর যেন কী রকম।

কেতো জানে সবই। তবু মুখে অবাক হওয়ার ভান কবে বলেছিলো হেসে, পাগল নাকি ! বউ হয়ে শ্বশুবের চরিত্তর খুঁত ধবছিস ? হয়েছেটা কী ? তোর সাহস তো কম নয় !

না গো ! হয়নি কিছুই। কিন্তুক হতে পারে।

কী ?

কিছু। যকন-তকন হতে পারে।

সাইকেল, বাবা নিজে চড়ে না। আসলে ঝিলের পাশে যে বাগদী দিদির ঘর আছে সেইখানেই যাবে এ সাইকেল। পণের সাইকেল। ঝুমকি বাগদীর বড় ছেলে চড়বে সে সাইকেলে। কানাঘুষোয় শুনেছে কেতো যে, সেই ছেলে, তার নাম লালচাঁদ, নাকি তারই বাপের ছেলে।

শোনে। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দেয়। এখনও স্বাবলম্বী হয়নি কেতো। বাবা যদি সত্যিকারেব রেগে ওঠে, তখন কেস কেচাইন্ হয়ে যাবে। কী করবে ? কেতো নিরুপায়। বাপের বেগার খাটা দিনমজুর। দুটি খেতে পায়, মাথায় ছাদ আছে ;

এইই যা।

যমুনা কাতর গলায় বলল, আমাকেও নিয়ে চলো। তোমার সঙ্গে।

কী করে ? বাবা যদি "সত্যিকারের রেগে যায়" ? থাক তুই। তা ছাড়া আমি কত কত জায়গায় যাবো। রাতে কোতা থাকব তারই ঠিক লাই।

যমুনার চোখে ভীষণ ভয় দেখল কেতো।

একা ঘরে শুতে পারবি ?

ভাবছি, পুঁটিদিদিকে ডেকে নেব।

বাবা বলছিলো, তোমার একা হয়তো ভয় করতে পারে, রাতটা তুই বাবার ঘরেই কাটাস। মস্ত ঘর। মস্ত বিছানা। নইলে, বাবাও এসে থাকতে পারে তোর ঘরে। বাবার কাছে যন্তর আছে।

কী যন্তর ?

চোখ বড় বড় করে যমুনা শুধোয়।

যন্তর ! হিঃ। হিঃ। কোমরে গোঁজা থাকে। তবে লাইসেন্স লাই। আর কেউই জানে না। আমি একদিন দেখে ফেলেছিলাম। যখনই বদ্দমান যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় বাপ আমার।

আমি শোবো না।

কোথায় ?

তোমার বাবার ঘরে।

তাহলে, বাবাই আসবে তোর ঘরে।

একদম না। মানা করে দিয়ে যাও।

কেন ? সে কী ?

না, বলেছি না। তোমার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়নি।

হুঁ। আমাকে অমন বউয়ের আঁচল ধরা মরদ পাওনি যে বউ যা বলবে, তাইই শুনব। আমি নিজের বুদ্ধিতে চলি। হুঁ।

কথাটা, তার বাবা গণশা পোড়েল মাকে উঠতে-বসতে শোনাতো। এই বাড়িতে মেয়েরা খেজুরের রস, জিয়োনো মাগুর অথবা তালক্ষীরেরই মত এক ধরনের খাদ্য-পানীয়-ভোগ্য ব্যাপার ছিল। ছোটবেলা থেকেই দেকেছে। মেয়েদের কতা শুনে চলা, এ বাড়িতে পুরুষত্বহীনতারই সামিল।

যমুনা কিছু না বলে. চেয়ে থাকলো অনেকক্ষণ কেতোর মুখে।

বিড়বিড় করে বললো, আমার চেয়ে একটা সাইকেলের দাম বেশি হলো ?

কেতো বিজ্ঞের মত বললো, সে কতা নয় ! ব্যাপারটা হচ্ছে কথার খেলাপ। তোর বড়দাদা সব জেনেশুনেই, আমার বাবা লোক খারাপ জেনেও তার সঙ্গে মিথ্যাচার কেন করতে গেলে, বলতো ? এতে তোর বা আমার কোন্ উপগারটা হলো ? গণশা পোড়েল এক কথাব নোক। সে যদি বলে কোথাও যাবে, তাহলে সে না যেতে পারলে তার ডেডবডিও সেখানে যাবে। অন্যায় তার তো নয়। তোর বড়দাদা এমন কতা দিয়ে আজ ছমাস ঘোরাচ্ছে কেনো ? মনে হচ্ছে বাবার জিদ চেপে গেছে। কালও যদি সাইকেল না আসে তো বাবা সত্যিকারের নেগে যাবে। বড় জিদ্দি লোক সে। আর অত্যিকারের নেগে···

কাল কেন, কোনোদিনও সাইকেল দেবে না বড়দা।

মুখ নিচু করে যমুনা বললো।

সে কী ? কত্ত কথা আমার সঙ্গে। কোনটা নেবে বলো কেতোবাবু ? হীরো, না

হারক্যুলিস ? এই মত ব্যবহার ভদ্রমানুষের ? ছিঃ ছিঃ ।

দাদা দেবে কেন ? বোনকে যখন তোমাদের গছিয়ে দিয়েছে তখন আর খরচ কেউ করে ? বৌদিরা তোমাকে একদিন খাওয়ালো না পর্যন্ত বিয়ের পর । তুমি কি ভাবো আমি অন্ধ ? সাইকেল ওরা দেবে না । তুমি মিছিমিছি যেও না । তোমাকে অপমান করলে, আমারই অপমান ।

তুই বকিস না যমুনা সারা গাঁয়ের সকলে জানে যে, আমার বিয়েতে আমি সাইকেল পাবো । বাপ আমা চণ্ডীমণ্ডপে, পঞ্চায়েতে, সব জায়গায় বলেছে বড় মুখ করে । আমার মনে হয়, দশজনে দশ কথা বলছে । বাপের দিকটাও ভাব । তার ঈজ্জৎ !

তুমি আমাকে মেরে ফেলে দাও । আবার একটা বিয়ে করো । এবার সাইকেল আগে হাতে পেয়ে তারপর বউ আনবে ঘরে । এমন ভুল দ্বিতীয় বার কোরো না । হ্যাঁ গো ! পেটে যে এসেছে, তার তো এখনও সাত মাস দেরি আছে আলো দেখতে । এই বেলা আমাকে তোমরা শেষ করে দাও । বাপ-ব্যাটাতে মিলে । তোমাদের ঈজ্জৎ কত বড় ! ছিঃ ছিঃ দাদার কথাও ভাবি । মানুষ এত ছোটও করে নিজেকে ? আমাকে বললে, আমি ফলিডল খেয়ে মরে যেত্াম বিয়ে দিতে হতো না গিলটি করা গয়না আর শাঁখা দিয়ে ।

কেতো ঘাবড়ে গেল যমুনাকে দেখে । এ যমুনাকে সে চেনে না ।

তাড়াতাড়ি তার ভেজা চোখের নিচে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, দেখো বাবা । এখানে ওসব কিছু কোরো না । আমাদের বদনাম হবে । বাবার ঈজ্জৎ-এর কথাটাও ভেবো । এ গেরামে আমাদের সকলে ছেরেদ্দা করে ।

॥ ২ ॥

ওলাচণ্ডীপুরে ছোট দারোগার বাড়ির বাইরের ঘরের তক্তাপোশে শুয়েছিল রাতে কেতো । ছারপোকা ছিল খুব । ঘুম হয়নি । তার উপর সারা রাত বেড়াল কেঁদেছে । তবে, ছোট দারোগা, রাতে খেতে দিয়েছিলো ভালই । কচি পাঁঠার ঝোল আর রূপশালী ধানের ভাত । তালক্ষীরও ।

ছোট দারোগা বলেছিলো, ভোর-ভোর রওয়ানা হবো হে কেতো । আমার আবার ফিরতে হবে তোমার বাপকে নিয়ে । জরুরী কাজ আছে বদ্দমানে ।

অন্ধকার থাকতে থাকতেই তৈরি হয়ে ছোট দারোগার লাল মোটরবাইকের পছনে বসে পড়েছিল কেতো । তারপর লাফাতে-লাফাতে এবড়ো-খেবড়ো পথে কিছুটা এসে পিচ রাস্তাতে পড়েছিল । তাদের গ্রামের কাছে এসে আবার ছ মাইল কাঁচা রাস্তা । গরু-বাছুর চলে । কাদা শুকিয়ে এমনি হয়ে আছে যে, হাঁটলেই গোড়ালি আর পায়ের পাতা ভেঙে যাবে বলে মনে হয়, যে কোন সময়ই ।

মনটা ভাল ছিলো না কেতোর । বাপ একটা পত্র দেচিলো ছোট দারোগাকে । সেই মোতাবেকই তিনি চলেচেন । দারোগার সঙ্গে কী মামলাতে যেতে হবে তার বাপকে বদ্দমানে ? এ সব ওর ভাল লাগে না । যমুনা বলছিল ই সব ডিঙ্গারাস্ । কানাঘুষো । যা ক্ষেত-জমি আছে তাতেই সৎভাবে চাষ-বাস করলে তো খাওয়া-পরা চলে যায় বাবুয়ানী করে । এই সব ঘোৎ-ঘাঁৎ-এর পথের বড়লোক হতে যাওয়াই বা কেন ? কেতো ভাবে, তার ডাকাত দাদুর রক্ত বোধহয় বইছে তার বাপের শরীরে । বাগদীর মেয়ে ছাড়া শুয়ে আরাম পায় না, ডাকাতি না করলে ভাত মিঠে লাগে না । এ কেমন রোগ হে !

শেষ রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছিল কেতো। সবে যখন দুচোখের পাতা বুজে এলো ঠিক তখনই। দেখেচিলো, যমুনা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব হাসছে। আর বলছে, তোমার বউ দেখতে নিয়ে যাবে তো আমায় ? আমি কিন্তু বরযাত্রী যাবো। যাব্বোই। ফেলে যেও না যেন !

ঠিক সেই সময়ই স্বপ্নটা ভেঙে গেল। ছোট দারোগার চাকর গঙ্গা এক ধাক্কা দিয়ে তুলেও দিল কেতোকে।

পিচ রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তাতে এসে পড়তেই মোটরবাইক সাংঘাতিক লাফাতে লাগল। আর প্রায় তারই সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে সূর্যটাও উঠল মালোডাঙ্গার জল-ভরা মাঠ লাল করে। বানের জল এখনও নামেনি মাঠ থেকে। পশ্চিমাকাশে মেঘ করে আছে কালো করে। শালিখ আর চড়াই ডাকছে ক্রমাগত। পথের পাশে আকন্দর ঝাড়ে রোদ লেগেছে। কন্টিকারি, কয়েৎবেলের গাছ। বুড়ো ছাতিমের গোল গোল পাতাকে ছোটো ছোটো হাতের পাতার মত দেখাচ্ছে। রোদ লেগে, মনে হচ্ছে লাল লাল ফুল ধরেছে ছাতার তলায়। বাঁদিকে একজোড়া শামুকখোল বসে আছে মাঠে। এক পা এক পা গুনে গুনে ফেলছে পা। অতি সাবধানে।

আর একটু গেলেই ওদের গেরাম। মোড়ের বুড়ো বটগাছটার কাছে ডান দিকে ঘুরলেই কেতোদের বাড়িও দেখা যায়। যমুনা কী করছে কে জানে ? বাবা কি তাকে রাতে পাহারা দিয়েছিলো ? সত্যিই ? না ওইই গেছিল বাবার ঘরে শুতে ? বাচ্চা মেয়ে তো। ভয় পায় বড়।

মোড়টাতে এসেই গতি কমল মোটরবাইকের। ডানদিকে মোড় নিল একটা বিরাট ঝাঁকুনি দিয়ে। এবং মোড় নিতেই, কেতোর গলার মধ্যে কিসের একটা শক্ত দলা উঠল। টাগরা শুকিয়ে গেলো।

কেতো দেখলো, ওদের শোবার ঘরের পেছনের আমড়া গাছটা থেকে হলুদ আর কালো ডুরে শাড়িতে ফাঁস লাগানো যমুনা ঝুলছে।

ছোট দারোগাও দেকেচে।

দেকে, মোটরসাইকেল থামিয়ে, ওদিকে তাকিয়ে বললো, এ কী অঘটন হে ! হায় হায়। এ কে ?

আমার বৌ।

কেতোর গভীর থেকে কেউ বলে উঠলো।

ছোট দারোগা বললো, তাইলে, ভগমানই আমাকে এখানে পাইটেচেন। আমি না এইলে, কী বিপদেই না পড়তে বলো তোমরা লাশ-কাটা ঘরে কতদিন পড়ে থাকতে হতো মেয়েটাকে। ভগমান যাইই করেন, তাইই মঙ্গলের জন্যে।

কেতোর কানে এতসব কথা ঢুকছিলো না। কেতো আবারও তকালো উপরে। বর্ষার জল পাওয়াতে অনেকেই সবুজ পুরুষ্ট সব পাতা ছেড়েছে আমড়াটা। নরম নরম পাতার মধ্যে নরম যমুনা দুলছে অল্প অল্প, পশ্চিমের হাওয়া লাগা ডালের দোলায়। শাড়িটা তার দু পায়ের মধ্যে এমন আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে গেছে যে তার লজ্জাস্থান ঢেকে রয়েছে তা। তার দুপায়ের দু পাশে শাড়ির প্রান্ত ফুলে ফুলে উঠছে ভোরের ভেজা হাওয়ায়।

যমুনা যেন হলুদ-কালো একটা সাইকেল চালিয়ে চলে যাচ্ছে চাপ চাপ নরম মেঘের ঘাসের মাঠ পেরিয়ে···দূরে···দূরের কোনো দেশে··· যে দেশে মেয়েরা জিয়োনো-মাগুর বা খেজুরের রস ; বা তালক্ষীর নয়···

জগন্নাথ

পুলিনবাবু নস্যির ডিবেটা বের করে বড় এক টিপ নস্যি নিলেন।

নীল-রঙা ফুল-হাতা সার্টের কোলের কাছে পড়লো কিছুটা। ঘাড় নিচু করে দেখলেন একবার উদ্দেশ্যহীন চোখে, বাইফোকাল চশমার ফাঁক দিয়ে। বাঁ পকেট থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়া বের করে ঝাড়লেন জায়গাটা

তারপরই, সামনে খুলে রাখা পার্সোনাল লেজারটাতে চোখ দুটি নিবদ্ধ করলেন।

উল্টোদিকের টেবল থেকে তাঁর অল্প-বয়সী সহকর্মী হেমেন বললো, কি সিনেমা দেখলেন দাদা? দেখলেন কিছু? দাদা?

শুনতে পেলেন না পুলিনবাবু।

যখন যে কাজটা করেন তাতে এমনই ডুবে যান উনি যে, তখন পৃথিবীর অন্য কিছু সম্বন্ধেই হুঁশ থাকে না।

হেমেন আবারও বললো এই যে পুলিনদা। কোনো সিনেমাই দেখলেন না এবারে কলকাতায় এসে? গৌতম ঘোষ-এর 'পার'ও না?

মুখ তুললেন উনি।

হেমেনের দিকে একবার তাকিয়েই, মুখ নামিয়ে বললেন, 'পার' অনেক দূরে এখনও। তেষট্টি হাজার দুশো পঁয়ষট্টি টাকার ডিফারেন্স ছিলো ট্রায়াল-বালান্স-এ। মোটে হাজার পাঁচেক টাকা খুঁজে পেলাম কিন্তু সাড়ে ছ'হাজার আবার বেড়ে গেলো। ক্রেডিটে বেশি ছিলো।

ঘরের সকলেই প্রায় হেসে উঠলো একসঙ্গে। পুলিন বাবুর কথা শুনে।

তাদের সম্মিলিত হাসির শব্দে মুখে তুলে চাইলেন পুলিনবাবু। হাসির কারণটা ঠিক বুঝতে পারলেন না।

হেমেন বললো, আপনাকে নিয়ে চলে না দাদা! ট্রায়ালব্যালান্স এর পার তো চিরদিনই দূরে থাকে। 'পার' ছবিটাও দেখলেন না। কলকাতায় এলেন আপনি। গৌতম ঘোষের ছবি। একটা বড় কিছু মিস করলেন জীবনে।

ছবি?

পুলিনবাবু স্বগতোক্তি করলেন। স্বপ্নোত্থিতের মত।

হ্যাঁ হ্যাঁ ছবি! ফিলিম।

উনি কোনো উত্তর দিলেন না। চোখ নামিয়ে নিজের কাজ করতে লাগলেন

বেশিদিন খাতা লিখলে মানুষ সত্যিই আপনার মত মাছিমারা-কেরাণীই হয়ে যায়।

হেমেন বললো।

হেমেনের টেবিলেই বসে যীশু। যীশু বললো, শূয়োর পার করাবার সীনটা দারুণ, না রে?

জবাব নেই!

সমরেশ মজুমদারের লেখা, না?

সমরেশ মজুমনার নয় রে। গুরু সমরেশ বসুর। গল্পর নাম ছিল 'পাড়ি'।

গৌতম ঘোষের সঙ্গে আলাপ থাকলে বলতাম, এবার আমাদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী নিয়ে একটা ছবি তুলতে। এই ধর আমাদের পুলিনদা। এঁকে নিয়ে যদি কোনো লেখক একটি গল্প লিখতো তবে তা কী করুণ হতো বলতো? শুয়োরগুলো তাও পেরিয়ে গেল নদী। কত মানুষ আছে আমাদেরই মধ্যে, যারা চেষ্টা করলো, নাকানি চোবানি খেলো ; কিন্তু নদী আর পেরুনো হল না তাদের।

গোপেন হেসে উঠল হেমেনের কথায়।

কিন্তু হাসাবার জন্যে বলেনি হেমেন কথাটা। অন্যরা স্তব্ধ হয়ে পুলিনদার দিকে চেয়ে রইলো।

স্টিল-ফ্রেমের চশমাটা সরু নাকের ডগায় নেমে এসেছিলো।

পুলিনদা চোখ দুটি লেজার থেকে তুলে ওদের দিকে তাকালেন। বললেন, ঠিকই বলেছো হেমেন। বায়োস্কোপের হীরো-হওয়া শুয়োরের চেয়েও নিকৃষ্ট অনেক মানুষই থাকে। সত্যিই থাকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যেমন আমি।

এমন সময় রণ্টু, হেমেনের সিগারেট আর পুলিনবাবুর পান নিয়ে স্যুয়িংডোর খুলে ঢুকলো।

ঢুকেই বললো, আবার এয়েচে।

কে?

পানটা নিতে নিতে পুলিনবাবু শুধোলেন।

সেই! কম্পু কোম্পানীর লোক।

হেমেন, গোপেন এবং অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সকলেই কাজ ছেড়ে এই নতুন আলোচনায় মেতে উঠল।

রণ্টু, চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে বললো ইনি অন্য কোম্পানীর লোক। সেদিন এসেছিলো এইচ· এম· টি· থেকে।

ছোট সাহেব কি বলছেন?

ছোট সায়েব তো নেবেনই বলেছেন।

সবাই শালা রাজীব গান্ধী হয়ে গেল মাইরী! কম্প্যুটার না বসালে আর এফীসিয়েন্সী বাড়ছে না! সকলেই মডার্ন। ছোটবাবুর বাবা খোদ মালিক যে এতদিন হাফ-হাতা ফতুয়া গায়ে আর ভুঁড়ির নিচে ধুতি পরে এই বিজনেস এত বড় করে গেলো সেই আসল মালিকই এখন ফোতো। কম্প্যুটার না বসালে নাকি এফীসিয়েন্সী বাড়ানো যাচ্ছে না। প্রাগম্যাটিজম্ আনতে হবে। আমরা সকলেই ওয়ার্থলেস। শালা আমাদের শুদ্ধু নাজাই খাতে লিখে দিলে র‍্যা!

ঠিক সেই সময়েই ছোটোবাবু দরজা খুলে ঢুকলেন। চোখে ফোটোসান লেন্সের চশমা। আলো বাড়া কমার সঙ্গে সঙ্গে রং পাল্টে যায়। ছোটবাবুর মুখের খচ্‌রামির রঙেরই মতো। জিন্স এর ওপরে ঘি-রঙা একটা টি-সার্ট। সিল্কের।

ওঁকে দেখেই সকলে চুপ করে গিয়েই দাঁড়িয়ে উঠলেন।

শুধুমাত্র পুলিনবাবু ছাড়া। টেবলের নিচে অদৃশ্য হয়ে-যাওয়া একপাটি চটি খোঁজার জন্যে এদিকে-ওদিকে পা চালাচ্ছিলেন উনি তখন আপ্রাণ চেষ্টায়। বাঁ পায়ের চটিটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই রণ্টু ছোকরা যতবারই ওঁর টেবলের কাছে আসে, ততোবারই লাথি দিয়ে ওর চটিগুলো এদিকে-ওদিকে ছট্‌কে দেয়। ইচ্ছে করে যে করে, তা নয়। ছোঁড়ার পায়ে ক্ষুর লাগানো আছে।

পুলিনবাবু।

ছোটবাবু ডাকলেন।

স্যার।

বলেই, একপায়ে চটি গলিয়েই উঠে দাঁড়ালেন উনি।

কতদূর হলো, আপনার? বাগান থেকে ফোন এসেছিলো। তাড়াতাড়ি দরকার আপনাকে সেখানে। এবারে আবার ট্যাক্স-অডিটের ঝামেলা আছে। অডিটরের ছেলেরা আপনার জন্যে বসে আছে। মিলিয়ে দিয়েই ফিরে যান।

ছোটবাবু প্রায় বাঙালীদের মতোই বাংলা বলেন। অথচ বাঙালী ওঁরা মোটেই নন। বাঙালীরা এই কোম্পানীতে কেরাণীই। যত বড় বড় পোস্ট সবই তাঁর নিজের রাজ্যের লোক।

পুলিনবাবু বললেন, আজ্ঞে। কিন্তু ডিফারেন্স যে বেড়ে গেল এদিকে স্যার। তা আমি জানি না। মিলিয়ে দিয়েই চলে যান। বুঝেছেন?

শেষ শব্দটাতে অসহিষ্ণুতার ছোঁওয়া লাগানো।

ছোটবাবু চলে গেলেন তাঁর নিজের চেম্বারে।

বাবাই বললো, কম্প্যুটার। কম্প্যুটারের কথা আর বলিস না। তার খেল্ দেখলি সেদিন?

কোন্‌দিন?

সকলেই জিগ্‌গেস করলো সমস্বরে। পুলিনবাবু ছাড়া।

আরে! ঐ তো শনিবার না রবিবার রাতে। মিস্ ইউনির্ভাস্-এর সিলেকশন্ দেখালো না টি.ভি.-তে স্টেটস্-এর মায়ামি থেকে? স্যাটালাইটে? একটা কাপড় কোম্পানীর স্পন্‌সরড্ প্রোগ্রাম ছিলো।

আমরা তো দেখিনি!

আমি গেস্‌লুম মামাবাড়িতে। রাত প্রায় পৌনে এগারোটায় ছিলো। কালার টি-ভিতে দেখলুম। সুন্দরী মেয়ে ছিল দুটিই। আর সবই দাঁত বের-করা। কী করতে যে গেছে। একজন মিস্ আয়াল্যান্ডি। আর অন্য জন মিস্ স্পেইন্। কম্প্যুটারে সব জাজদের দেওয়া ডাটা ফীড্ করে তার উত্তর আবার সেখানকার মস্ত এক অ্যাকাউন্টান্সী ফার্ম-এর পার্টনার নিজে নিয়ে এলেন।

কে হল মিস্ ইউনিভার্স?

ঝুল্। পুরো ব্যাপারটাই ঝুল্। ওদের দুজনের কেউই হলো না। হলো বোধহয় মিস্ পুর্‌টোরিকো। সোনাগাছির মাসীর মতো চেহারা মাইরী। দাঁতের পাটির মধ্যে আবার কী একটা মিসিং। এবং মিশি অ্যাডেড। কোনো মানে হয়?

হেমেন বললো, কথাই তো আছে! কম্প্যুটারে যদি গার্বেজ ফীড করো, তো গার্বেজই বেরুবে। মানুষের মাথার কোনোই দাম নেই। সবই নাকি কম্প্যুটারে করে দেবে? আমরা

কি বসে বসে···

বাবাই বললো, আরে ! তোরাও যেমন ! আজকাল আমার ছোটোবাবুর মতো সাহেব ব্যবসাদাররা কি করছে জানিস না ? খাতায় যত দু-নম্বরী তিন-নম্বরী হিসেব সব কম্প্যুটারের ভেতর পুরে দিচ্ছে। ধরো শালা ? রেইড্ করে কি ধরবে ? ইনকাম-ট্যাক্স ডিপার্টের লোক এসে আঙুল চুষবে বসে বসে। নো খাতাপত্তর, নো হিসেব। সব লুকিয়ে থাকবে জ্বলজ্বলে নানা-রঙা ডিজিটালস্-এ···

এবার যতীন বললো, তিন-নম্বরীটা আবার কি মাল মাইরী ? আমাদের দু-নম্বর অবধিই তো জানা ছিলো। তুইও দেখছি কম্প্যুটারের মতোই অ্যাডভান্সড্ হয়ে যাচ্ছিস। আমাদের মোটা বুদ্ধির বাইরে।

সে কীরে ! অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করিস আর তিন-নম্বর কাকে বলে তাই-ই জানিস না ?

না তো ?

সকলেই বললো সমস্বরে।

একমাত্র পুলিনবাবু ছাড়া।

এখানে উনিই একমাত্র মানুষ, যিনি এক নম্বর ছাড়া কিছুই জানেন না। এক নম্বরী মানুষ তিনি, যে যুগের মানুষ, সে যুগে কম্প্যুটারও ছিল না, দু-নম্বর—তিন-নম্বর এ-সবও ছিলো না।

সকলে আবারও বললো, বল্ বল্ বাবাই ! বুঝিয়ে বল্।

বাবাই যীশুকে বললো, আগে একটা সিগারেট ছাড়ো তো গুরু !

সিগারেটটা ধরিয়ে লম্বা একটা টান মেরে বললো, মনে কর্ আমাদের পাঁচজনের একটা পার্টনারশিপ ফার্ম আছে। আমরা প্রফিট করলাম, ধর, পাঁচ লাখ। তার মধ্যে আড়াই লাখ এক-নম্বরে দেখালাম আর আড়াই লাখ দু-নম্বর করে দিলাম। মনে কর্, আমার হাতেই অ্যাকাউন্টস্। এই ব্যাপারটা শুধু আমিই জানি। আমি অন্য পার্টনারদের বললাম, আসলে প্রফিট হয়েছিলো সাড়ে চার লাখ। মানে আড়াই নয়, শুধু দু লাখই দু-নম্বর করা হয়েছে। ঐ দু লাখ পাঁচজনে চল্লিশ হাজার করে ভাগ করে দিলাম। বাকি পঞ্চাশ আমি একা মেরে দিলাম। ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকাটা আমার তিন নম্বর হলো না ?

সকলেই হো হো করে হেসে উঠলো।

যতীন টেবল বাজালো উত্তেজনায়।

শুধু পুলিনবাবুই হাসলেন না।

আরও এক টিপ নস্যি নিয়ে ট্রায়াল ব্যালান্স-এর ডিফারেন্স খুঁজতে লাগলেন। মনে মনে বললেন, এই ছোকরাগুলো পোস্টিং কাস্টিং কিছুই ঠিক করে করবে না তা ডিফারেন্সের কি দোষ ? ডিফারেন্স তো হবেই। একদল দায়িত্বজ্ঞানহীন ছোকরার দল।

হেমেন বললো, তুই এই তিন-নম্বর শিখলি কার কাছ থেকে ?

কেন ? আমাদের যে ফার্ম চায়ের বাক্স সাপ্লাই করে আগরওয়ালার কাছে। তাদের অ্যাকাউনট্যান্ট ভারী কম্পিটেন্ট।

পুলিনবাবু একবার তাকালেন আড় চোখে।

কিন্তু কিছু বললেন না।

মনে মনে বললেন, কম্পিটেন্ট ! চোর হলেই আজকাল কম্পিটেন্ট !

পুলিনবাবু বাগানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে এখন বাঙালীদের বাগান আর

নেই বললেই চলে। সাহেবদের বাগানগুলোও সব কিনে নিয়েছে বড়লোক মাড়োয়ারীরা। ছোট বাগানগুলোও সব কিনে নিয়েছে মাঝারী মাড়োয়ারীরা। তারাই এখন সাহেব।

একটা দুটো বাগান অন্যরাও কিনেছে। যেমন কলকাতার কেনিলওয়ার্থ হোটেলের সিন্ধী মালিক ভরত সাহেব। পরে অবশ্য বাগান ছেড়ে দিয়েছেন উনি।

যারাই তাদের অন্ন দিয়েছে, তাদের চাকরি—খাবার ক্ষমতা যাদেরই হাতে যখনই ছিলো, যারাই লাথি মারার ক্ষমতা রেখেছে তাদের ; বাঙালীদের কাছে তারাই সাহেব। মালিক। চিরদিনই।

সাহেবরা এই দেশ শোষণ করতে এসেছিলো বটে তবুও তাদের একটা রাখ-ঢাক, আদব-কায়দা ছিলো। এখানকার বিভিন্ন-দেশীয় এক-পুরুষ দু-পুরুষের বড়লোক সাহেবদের সেসব কিছুই নেই। চায়ের গাছের ডাল ভেঙে পাতার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। যা-খুশি করছে। চক্ষুলজ্জা ব্যাপারটা জলাঞ্জলি না দিলে বোধহয় পয়সা করা যায় না। পয়সার জন্যে মানুষ এমন হামলে পড়েছে যে, যা-কিছুই ভালো তার সব কিছুকেই ফেলে দিচ্ছে সকলে। যার টাকা আছে সেইই সব। আর কোনো কিছুরই দরকার নেই "সাহেব" হতে। আগে দরকার হতো। যে মানুষই গাড়ি চড়তেন তাঁরই শুধুমাত্র টাকা ছাড়াও অন্য ব্যাপার ছিলোই। বিদ্যা, মেধা, সততা, আভিজাত্য ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

পঁয়ষট্টি বছরের পুলিনবাবুর পক্ষে এই নতুন পরিবেশে খাপ-খাওয়াতে প্রতিমুহূর্ত বড়ই অসুবিধে হয়। উনি এই কম্প্যুটারের যুগের মানুষ তো নন ! সাহেবী আমলের ডানকান ব্রাদার্স-এর একটি বাগানের অ্যাকাউনট্যান্ট ছিলেন তিনি। সেই চাকরী ছেড়ে এসে এই চাকরীতে ঢুকেছেন। তাও বছর দশেক হয়ে গেলো।

ওঁর মনে পড়ে গেলো যে-যেদিন প্রথম একটি অ্যাডিং-মেশিন আসে তাঁদের বাগানে, তার পরদিনই নবীন মুহুরী আত্মহত্যা করেছিলো কৃষ্ণচূড়া গাছের ডাল থেকে গলায় দড়ি বেঁধে। নবীনের সবচেয়ে বড় গর্ব ছিলো যে, চোখের নিমেষে সে ট্রায়াল-ব্যালান্স, ব্যালান্সসীট, ডেটরস্-ক্রেডিটরস্-এর লিস্টের নিচে ডানহাতের তর্জনী দ্রুতগতিতে বুলিয়েই যোগফল বসিয়ে দিতে পারত। নবীনের কোনো যোগে কেউই কখনও ভুল ধরতে পারেনি। সাহেব কোম্পানীর অডিটররা এসে ধন্য ধন্য করতেন সবাই নবীনকে। জীবনের পঞ্চাশ বছর ধরে সে যা গড়ে তুলেছিলো ; খ্যাতি, গর্ব, তার পারদর্শিতা সবই এক নিমেষে একটি সাড়ে সাতশো টাকা দামের সবুজ-রঙা ছোট্ট জার্মান মেশিন গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিলো। এই অপমান, অসহায়তা ; ভবিষ্যতের অনিশ্চিতি কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি নবীন।

নিজেকে মেরেই নিজেকে বাঁচিয়েছিলেন সেদিন। কিছু মানুষ ঐরকমই হয়। জীবনের চেয়েও মানকে বেশি ভালবাসে তারা। পুলিনবাবু নবীনের মত হতে পারেননি।

বৈশাখের সকালে শিমুলের ডাল থেকে ঝুলতে-থাকা সাদা ধুতি-জড়ানো অর্দ্ধ-উলঙ্গ দুলতে-থাকা মৃতদেহটা এখনও দুঃস্বপ্নে দেখেন পুলিনবাবু। মাঝে মাঝে ভাবেন, মরে গিয়ে বেঁচে গেছে নবীনটা !

এতদিন পরে, এই কম্প্যুটার বুঝি তাঁরও মৃত্যুর কারণ হয়ে এল !

অথচ তিনি যে নিজেকে মেরে নিজেকে বাঁচাবেন তার উপায় নেই কোনো। দুটি মেয়ে এখনও বিয়ের বাকি। ছোট ছেলেটা অমানুষই হয়ে গেলো। লেখাপড়া তো করলোই না। এক পার্টির অ্যাকশন্-স্কোয়াডে আছে সে।

শিলিগুড়িতে গিয়ে মাস্তানী করছিলো এতোদিন। এখন নাকি নেপালের ধুলাবাড়ি থেকে

যেসব জিনিস চোরাচালান হয়ে শিলিগুড়িতে আসে রাতারাতি, সেইসব নিয়ে আসে তাদেরই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, যাঁদের মুখ চেনেন না, নাম জানেন না নবীনবাবু অথচ যাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক নীরব অসহায়তার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে তিনি আজও বাঁধা আছেন ; তাঁদেরই মেয়ে বৌ-রাই নাকি রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে জঙ্গলে মাথায়-করে, আঁচলে-বেঁধে, সীমান্তের নদী পেরিয়ে টেপ-রেকর্ডার, মদ, ক্যালকুলেটার, ভি· সি· আর এবং আরও কত সব চকচকে জিনিস, যা নইলে আজকের আধুনিক মানুষদের বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না—সেইসব বয়ে নিয়ে আসে।

সেই মেয়ে-বৌ-এরা শুধু গতরে পরিশ্রম যে করে তাই-ই নয়। তাদের নিজেদের অনেক সময়ই মানুষ-খেখো হিংস্র হায়নাদের হতেও তুলে দিতে হয়। বিনিময়ে, মোটা ভাত-কাপড়ও জোটে না তাদের। আর মুনাফা লোটে ধুলাবাড়ির আর শিলিগুড়ির অবাঙালী ব্যবসাদারে .।

পুলিনববাবুর ছোট ছেলে এখন এইসব চোরা চালানেব কোনো একটি দলের গুণ্ডা হিসেবে ভিড়ে গেছে। তৈরি হয়েই আছেন পুলিনবাবু। যে কোনোদিন শিলিগুড়ি থেকে তার মৃত্যুসংবাদ পাবেন।

বড়টা মানুষ হয়েছিলো। কিন্তু মানুষ হবার পরই অমানুষ হয়ে গেছে। মানুষ-অমানুষ অনেক রকমেরই হয়।

তিন হাজারী চাকরি করে এখন সে কলকাতায়। কিন্তু শ্যামবাজারের একটি মেয়েকে বিয়ে করে সে কুঁদঘাটে নিজের বাড়ি করে ক্যালকেশিয়ান হয়ে গেছে। স্কুটার কিনেছে। বাবা-মা-ভাই-বোন সকলকেই ভুলে গেছে। তার শাশুড়ি আর শালীই তার সব এখন।

পুলিনবাবুবর মনে হয়, এও এক ধরনের মৃত্যু। নবীন মুহুরী, শিমূল গাছ থেকে ঝুলে পড়েছিলো। নিজেকে মেরেছিলো ; নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। তাঁর বড়ছেলেও নিজেকে মারলো। অন্য মৃত্যু। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। মৃত্যুরই মতো, বাঁচাটাও অন্য এক ধরনের বাঁচা জীবন এবং মৃত্যুরও অনেকই রকম হয়।

॥ ২ ॥

বাগানে ফিরে এসেছেন পুলিনবাবু। এক্ষুণি ফিরলেন। বড়ই ক্লান্ত।

যেদিন ফেরার কথা ছিলো, তার দু'দিন আগেই। কলকাতায় যেতে হয়েছিলো, কারণ কলকাতার ট্রায়াল ব্যালান্স ওরা কেউই মিলোতে পারেনি বলেই। আজকালকার ছোকরারা নিজের নিজের কাজ ছাড়া আর সব বিষয়েই পণ্ডিত! লজ্জা করে ওদের দেখে।

মিলিয়ে দিয়ে ফিরে গেছেন উনি। ডান পকেটের নস্যি মাখা লাল রুমালটারই মত নিজের আত্মশ্লাঘায় বুক ভরে। জীবনে তিনি একে একে হারিয়েছেন অনেক কিছুই। স্ত্রী মনোরমাকে। বড়কে, ছোটকে। নিজেব বুকের মধ্যের এই জিনিসটিও হারিয়ে গেলে বেঁচে থাকার মতো আর কোনো অবলম্বনই যে থাকবে না তাঁর!

সকাল থেকেই খুবই বৃষ্টি হয়েছে। উত্তর বাংলার বৃষ্টি! অগাস্টের মাঝামাঝি। বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে তিস্তা আর হিমালয় চমৎকার দেখাচ্ছিলো। নদ এবারেও তাণ্ডব করবে মনে হচ্ছে কাল বাগানের অফিসে শুনছিলেন যে, কাঠামবাড়ির বাংলো নাকি আবারও ভাসাবার উপক্রম করেছে হারামজাদা। চ্যাংমারির চরের অবস্থাও

তথৈবচ।

বিনু বললো, খাইয়া লও বাবা। দুগা খাইয়া লইয্যা ছুটি কইব্যা দ্যাও আমারে। তিনুটার জ্বর তিনদিন থিক্যা। আমারও শরীলডা ভাল ঠ্যাকতাছে না।

রাঁধছস কি ?

কী আব। পোলাউ মাংস তো আব রান্ধি নাই। হেই বর্ষায তরি-তবকাবীবও আকাল পড়ছে। পাওন যায় না কিচ্ছুই। ধোঁকাব ডালনা আব রুটি বাঁইধা থুইছি। দিমু কি না, কও।

চাঁদটা উঠেছিলো বিশ্ব-চবাচর উদ্ভাসিত কবে। কোয়ার্টার্সের বারান্দায বসে বৃষ্টি-ভেজা প্রকৃতি, চাযেব বাগান, কুলি লাইনের টিনের ছাদ, ম্যানেজারেব বাংলো এসব দেখতে দেখতে অনেকই পুরনো দিনে চলে গিয়েছিলেন পুলিনবাবু।

বিনুর কথায বললেন, দিযা দে তবে। তরে ছুটি কইব্যাই দি।

অভিমানেব সুর লেগেছিলো গলায়।

তিনি নিজে যে কবে ছুটি পাবেন চিবদিনের মতো ? কিন্তু ছেলেমেযেরা কেউই বোঝে না তাঁর গলায কখন অভিমান লাগে আর চোখে কখন দুঃখ চমকায। সে সব বুঝতেন, একমাত্র মনোরমাই। একজন পুরুষেব জীবনে তাঁব স্ত্রীর মতো বুঝদাব মানুষ বোধহয় আর কেউই হয় না। হয়তো স্ত্রীব জীবনেও, স্বামীর মতো। মজাব কথা এইই যে, দুজনেই বেঁচে থাকাকালীন ঝগড়াই হয় বেশি। ঝগড়া যে সকলের সঙ্গে করার অধিকার আদৌ নেই, এ কথাটা দুজনেব মধ্যে একজন হঠাৎ চলে গিয়ে অন্যজনকে বুঝিয়ে দিযে যান।

খাওয়া দাওযার পর বারান্দায় বসে ছিলেন পুলিনবাবু। এই কোয়াটার্স্‌টা একেবারে ফাঁকায়। ধারে-কাছে আর কোয়ার্টার্স নেই কোনো। মনোবমা, নির্জনতা, গাছ-গাছালি এসব পছন্দ করতেন বলেই অফিস থেকে এবং অন্য কোয়ার্টার্স থেকে দূব হলেও এই কোয়ার্টার্সই নিয়েছিলেন। একজন মেকানিকের কোয়ার্টার্স ছিল আগে এটি। বাগানেব মোটব, ট্রাকটর সারাতো সে।

নিজেই পান সেজে খেলেন একটা। হাতলভাঙা কাঠেব ইজিচেযারটাতে বসে, বারান্দায় খুঁটির গায়ে দু-পা তুলে দিয়ে, জোনাকি-জ্বলা, ব্যাঙ-ডাকা রাতের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

খেতে যতটুকু সময় গেছে তাবই মধ্যে চাঁদ ঢেকে গেছে মেঘে। ঝুরুঝুরু কবে হাওয়া বইছে। বৃষ্টি নামবে এক্ষুণি। কদম গাছ দুটিতে খুব কদম ধরেছে। কদম আব তাঁর দরজার পাশের যুঁইয়ের লতার গন্ধ মিশে আমেজের মতো লাগছে।

বিনু বারান্দায় এসে বললো, শুইবা না তুমি ?

শুমু আনে! তিনু কই ? তার জ্বর কত দেখছস ?

দেখুম।

বলেই বিনু ঘরে চলে গেলো।

মিনিট পনেরো পর আবারও বিনু এসে বললো, তোমার আজ হইলোডা কি ? শুইয়া পড়ো। রাত তো প্রায় নয়ডা বাজে।

সোজা হয়ে বসলেন পুলিনবাবু চেয়ারে। মেয়ের ব্যবহারটা কেমন যেন বিসদৃশ, সন্দেহজনক ঠেকলো তাঁর কাছে।

কী মনে করে, উনি 'যাইতাছি' বলে, নিজের ঘরে গিয়ে শোবার ভান করে পড়ে রইলেন।

বাইরের বৃষ্টি-ভেজা প্রকৃতি আসন্ন বর্ষণের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। ফিসফিস করছিল

হাওয়া দূরের ঝরনার আওয়াজের মত মৃদু ঝরঝরানি আওয়াজ ভেসে আসছিলো কানে। দূরের তিস্তার আওয়াজ।

পুলিনবাবুর একটু তন্দ্রামতো এসেছিলো। এমন সময় একটা গাড়ির শব্দ শুনলেন তাঁর কোয়ার্টার্সের রাস্তায়। এদিকে এটা ছাড়া দ্বিতীয় বাড়ি নেই। গাড়ি তো আসে না এ পথে কোনো? ক্যার গাড়ি? এত রাতে? হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি এসে থামলো তাঁরই কোয়ার্টার্সের সামনে।

পুলিনবাবু মড়ার মতো পড়ে রইলেন। সস্তা সেন্টের গন্ধ পেলেন হঠাৎ নাকে। বুঝলেন, বিনু তাঁর ঘরে এলো। শাড়ির মৃদু খস্‌খস্‌ও শুনতে পেলেন। শুলেই পুলিনবাবুর নাক ডাকে। বিনু ভাবলো, উনি গভীর ঘুমে আছেন।

এমন সময় একটি চেনা গলা শুনতে পেলেন। তিনু!

তিনু বললো, দিদি! তুই এখনও তৈরি হস্ নাই?

বিনু ধমকে বললো, চুপ! আস্তে ক' ছেমড়ি। বাবায় আইস্যা গেছে গিয়া।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ।

কোথায়?

ঘুমাইতাছে।

পরক্ষণেই স্বগতোক্তি করলো, ঘুমাইছে কী না তাইই বা কমু ক্যামনে? ওরে বরং বইল্যা দে তুই যে, আমি আজ যামু না। বাবায় উইঠ্যা পড়ে যদি তো এক্কেরে পেরলয় বাধাইয়া থুইবে।

কইস কি তুই? গিরধারী তো নেশায় চুর হইয়া গাড়ির পেছনের সীটে বইস্যা আছে। আর বাগানের বাংলোয় বইস্যা আছে জোড়া-খাটে, তাগো বাগানের মালিক। হ্যায় লোকডা একডা জংলীরে!

আস্তে। আস্তে। তবে কইলাম কী আমি?

বিনু বললো, বিরক্ত, ভয় এবং উদ্বেগ। নিচু গলায়।

তিনুর বয়স আঠারো। স্বভাব চঞ্চল, বেপরোয়া। গলার স্বরও জোর। সে তেড়ে বললো, অত চুপ চুপ করতাছিস কির লইগ্যা? বাবায় কিছু বইলাই দেখুক না একবার! কী রাজকন্যাদের মত্তই রাখছে আমাগো! বেশি কিছু কইলে, আমি রাত্তারাতিই চইল্যা যামু আনে।

গলা শুকিয়ে গেল বিনুর।

বললো, যাবি কোন চুলায়?

ক্যান? কোলকাতায়! গিরধারীর মালিক কইছে। কইছে, রানী কইর‍্যা রাখবো আমারে। ভাবছস কি তুই?

এবারে পুলিনবাবু যথাসম্ভব কম শব্দ করে উঠে বসলেন খাটে। গির্‌ধারী তাঁদের বাগানের পাশেই যে মাড়োয়ারীর বাগান, তার ক্যাশিয়ার। আর যে বাঙালী ছেলেটির গলা পেলেন তিনি এক্ষুণি, সে তার ছোট ছেলের বন্ধু। স্টোরস্‌বাবুর সেজ ছেলে বন্ধু।

তাঁর দুই অবিবাহিত মেয়েই তাহলে⋯

বুকের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল তাঁর। বুকের মাঝখানটাতে ব্যথা করতে লাগলো।

এখন উঠে বাইরে গেলে গির্‌ধারী এবং ছোটর বন্ধু বন্ধু জেনে যাবে যে, পুলিনবাবুরা কিছুই অগোচর নেই। অথচ না গেলেও⋯। এবং গেলেও⋯

কিন্তু যাবেনই বা কেন ? কী করে যাবেন ? কোন মুখে ? তার মেয়েরা চলে যাক যেখানে খুশি। ছেলেরা যেমন গেছে।শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ির পাড়ায় ঘর নিয়ে ব্যবসা করুক গিয়ে। নয়তো কলকাতাতেই যাক। তাদের বুড়ো, হতভাগা বাবার ঘরে তারা তো রাজকন্যার মত ছিলো না ! তারা যদি ভাল-খাওয়া ভাল-থাকাকেই সবচেয়ে বড়ো বলে ভেবে থাকে, তবে তাইই থাক তারা। তাইই পাক। এক জীবনে যে যা চায়, তাইই তো পায়। পাওয়া উচিত অন্তত। যে যেমন করে তা পেতে চায়, তেমন করেই পাক।

গাড়ি থেকে গির্ধারীর জড়ানো গলা ভেসে এলো।

আর্‌রে এ বন্ধু ! কিত্‌না দের লাগেগী শালীকি তৈয়ারী হোনেমে ?

বন্ধু তাকে চুপ করবার জন্যে যেন কী বললো, চাপা গলায়। গাড়ির দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হল।

পুলিনবাবু খাটে উঠে বসলেন। পুরোপুরি। পদ্মাসনে বসলেন। একটু পর শবাসন। মনটাকে দু'পায়ের জড়ো-করা-বুড়ো আঙুলে সমাধিস্থ করবেন।

তিনু বললো, যা না দিদি। রাত কাবার কইর‍্যা ফিরিস না তা বইল্যা আবার। আমারও ভীষণই ঘুম পাইছে। বাজে লোক একডা। ঐ মালিকডা। যাচ্ছে তাই ! এমন চট্‌কা-চট্‌কি কর্‌ছে না। আমি পাল্লা ভ্যাজাইয়া দিয়া শুইয়া পড়ুম।

টাকা ? তরে টাকা দিছে ?

বিনু শুধোল তিনুকে।

হ্যাঁ। দিবে না ক্যান্‌ ?

কত দিছে ?

পঞ্চাশ ! তোরেও তাইই দিবে। যা গিয়া এখন।

তিনু, বিনুকে মিথ্যে কথা বললো।

পেয়েছিলো আসলে দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট।

মনে মনে হিসেব করল। একটি টু-ব্যান্ড রেডিও আর একটা ক্যাসেট-প্লেয়ার আর কখানা ভাল শাড়ি সায়া ব্লাউজ এবং একজোড়া সোনার বালা এবং একশিশি বিলাইতি ইন্টিমেট পারফ্যুম··· । এইসব কেনার টাকা জমতে জমতে ও নিজেই ক্ষয়ে যাবে বোধহয়, চন্দন কাঠেরই মত ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

পুলিনবাবু আবারও শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে সবই বুঝিতে পারলেন। তার ছোট মেয়ে ঘরে ফিরলো, বড় মেয়ে চলে গেলো। গাড়িটার শব্দ যতক্ষণ না মিলিয়ে গেলো ততক্ষণ শুয়েই রইলেন খাটে। মড়ার মতো। শবাসনে। তিনি তো মড়াই।—এখন মরে গিয়েও যে বাঁচবেন, সে সময়ও আর বাকি নেই। কিন্তু মনটা কিছুতেই দু'পায়ের জোড়া করা বুড়ো আঙুলে বসে থাকতে চাইছে না।

পাশের ঘরে তিনু শাড়ি বদলাচ্ছিল। শব্দ পাচ্ছিলেন পুলিনবাবু। বিনুর চেয়েও তিনুর ওপরে রাগ অনেকই বেশি হচ্ছিল তার। মাত্র আঠারো বছর বয়স ! এই ছোকরা-ছুকরি গুলান্‌ কত্ত সহজে নষ্ট হইয়া যায়। কত্ত সহজে ! কত্ত সস্তায় ! সহ্য শক্তি কত্তই কম অ্যাদের !লোভও কত বেশি। ছিঃ ছিঃ ! ওদের মূল্যবোধ পুলিনবাবুদের বোধ থেকে কতই আলাদা।

পূর্ব-বাংলার দেশ থেকে যেদিন ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল পুলিনবাবুর তখন তার বয়স এই তিনুরই মতো আঠারো। বাবাকে কেটে ফেলেছিলো তার পরিচিত মানুষেরা। মাকে বিবস্ত্র করে বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তাদেরি মাঠে, এমন

মানুষেরা, যাদের পুলিনবাবু মামা বা চাচা বলে ডাকতেন। মায়ের চীৎকার, "ও খোকন আমারে বাঁচা"। তারপর মাইরাই ফ্যালাও তোমরা। মাইরাই....."

একটা তীব্র ক্রোধ, অসহায় এক বোবা বোধ কাজ করেছিলো তাঁর ভেতর তখন। অসহায়ের নিস্ফল ক্রোধ। যা পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে এই মুহূর্তেও অসংখ্য মানুষের ভিতরে কাজ করছে। সেই বোধটাই আজ তেষট্টি বছর বয়সেও কাজ করে যাচ্ছে। তাঁকে প্রতিমুহূর্ত কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে। কতগুলো অশিক্ষিত, নিপীড়িত, হীণম্মণ্যতায়-ভোগা মানুষ যা করতে পেরেছিলো তার বাবার প্রতি, মায়ের প্রতি, তা তিনি কি করে করবেন ? ভাবতেই পারেননি। প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা পর্যন্ত জাগেনি। তখন ভগবানকে বলেছিলেন, ভগবান ! ক্ষমা করে দিও এদের। ভগবান ! আমাকে আমার চেয়েও অনেক বড় করে দাও। যেন, ক্ষমা করতে পারি সকলকে।

মারামারি, কাটাকাটি, বলাৎকার, চুরি, ডাকাতি, এ-সব করার শিক্ষা তো তিনি বাবা-ঠাকুর্দার কাছ থেকে কখনও পাননি ! তাই সেই আঠারো বছরের নিঃসম্বল অবস্থা থেকে আজকের এক অন্যরকম নিঃসম্বল অবস্থাতে পৌঁছতে কত এবং কতরকম কষ্টই যে করতে হয়েছে তা তিনিই জানেন। কিন্তু কখনওই সম্মান খোয়াননি। মাথা নোয়াননি। মূল্যবোধ হারাননি মোটেই। কষ্টর, সবরকম কষ্টর পরীক্ষাই তিনি পাশ করে এসেছেন। জীবনের এই পর্যায়ে পৌঁছেও তিনি নিজেকে বদলাতে পারলেন না। কিন্তু বদলানো যে দরকার নিজেকে, তা বেশ বুঝতে পারছেন। বিশেষ করে, আজ রাতে। কোনো মানুষেরই পক্ষে চিরদিন গৌতম বুদ্ধ হয়ে থাকা উচিত নয় সারাজীবন মনুষ্যত্ব খুইয়েও।

সারা রাত ঘুম হলো না পুলিনবাবুর। খাটে বসে লুঙিটাকেই চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে নস্যি নিয়ে রাতটা কাটালেন। আওয়াজ পেলেন, রাত তিনটে নাগাদ তার বেশ্যা মেয়েদের মধ্যে বড়জন ফিরে এলো।

ভোরের আলো ভালো করে ফুটতেই দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে, লুঙি পরেই বেরিয়ে পড়লেন পুলিনবাবু তখন তাঁর আদরের, গর্বের, তাঁর জীবনের শেষ অবলম্বন বিনু আর তিনু অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো।

মাধবের চায়ের দোকানে অনেকে চা খাচ্ছেন। কাগজ আসতে আসতে এখানে বিকেল হয়ে যায়। ট্রানজিস্টর খুলে দিয়েছে মাধব। চা খেতে খেতে আরও অনেকেই এল দোকানে। পুলিনবাবুকে দেখে মাধব তো অবাক ! এই বাগানে অনেক বছর এসেছেন। ডান্‌কানের বাগান থেকে রিটায়ার করার পর। একদিনও মাধব দেখেনি পুলিনবাবুকে তার দোকানে আসতে। এতো সকালে তাঁকে দেখে বললো, আরে ! আপনি যে বাবু ?

পুলিনবাবুর মাথা কাজ করছিলো না। কানদুটি ভোঁ ভোঁ করছিলো।

তবু বললেন মাধবের ওরিজিনাল দেশ রংপুরের ভাষাতেই ; বয়স তো হতিছে ! এট্টু মর্নিং ওয়াক্ কইরবার লাগে।

একজন অপরিচিত ভদ্রলোক চা খেতে খেতে অন্যজনকে বললেন, পাঞ্জাব-সমস্যা তো মিটিয়ে দিলেন রাজীব গান্ধী। এবার আসামও মিটবে।

সন্দ আছে। মিটবে কি ? আসামকে উনি দেবেনটা কি ? চণ্ডীগড় ? না, নদীর জল ?

প্রথমজন বললেন, তা জানি না। তবে একটা কথা বুঝে ফেলেছি, যদিও বড় দেরী করেই বুঝলাম।

কি ?

এই পৃথিবী হচ্ছে শক্তর ভক্ত, নরমের যম। এ সর্দারজীগুলো তাব মাকে না মারলে

ছেলের সুর কি এত নরম হতো ? বাংলাতেও তো পার্টিশান হয়েছিলো। আমরা বাঙালীরা, নয় আমাদের যারা তাড়াইলো তাদের সঙ্গে লড়লাম, নয় অন্য কারো সঙ্গেই। মার খেতে খেতে আমাদের ভদ্দরলোকি গুমোর নিয়ে পিছু হটতে হটতে এমন জায়গায় পৌঁছেছি আজ যে, আমাদের এখন পশ্চিমবঙ্গ থেকেও চলে যেতে হয় কি না দ্যাখো !

ঠিকই কইছেন। অন্য সক্কলই হইল গিয়া বীরের জাত, আর আমরা হইলাম গিয়া ভীরুর জাত। সক্কলেই চিন্যা ফ্যালাইছে আমাগো।

হাঁটতে হাঁটতে চললেন পুলিনবাবু, চা খাওয়ার পর, কামারের বাড়ির দিকে। বাসস্ট্যান্ডের পাশেই তার বাড়ি আর কামারশালা। দিবারাত্র হাপর চলে খপর্-খাপর্।

রাধু সবেই দোকান খুলে বসেছিলো।

আরে ! অ্যাকাউন্ট্যান্টবাবু যে ! খবর কি ? এত্ব সক্কালে ? কোন্‌দিকে আইছিলেন ?

তোমারই কাছে।

কন দেহি, কী দরকার ? বঁটি বানাইয়া দিমু একখান্ ? কোদাল লাগবো নিশ্চয় বাগানের লইগ্যা ?

না রাধু। বঁটি বা কোদালে চলবো না। একখান্ রামদা বানাইয়া দাও দেহি। লাইটের উপর। বেশি ভারী য্যান্ না হয় ! বুঝছো !

কাইট্‌বেন কি, তা দিয়া ? তা তো আমারে কইবেন। হেই মতই বানাইয়া দিমু আনে এক্কেরে ফাসকেলাস কইর‍্যা।

কি যে কাট্‌ম, তা এহনো ঠিক করি নাই। তবে, ঘরে একটা থাকনের দরকার বড়। যা দিনকাল ! মানুষই কাইটতে অইবো হয়তো।

তা ঠিকোই কইছেন বাবু। চুরি ডাকাতি তো লাইগাই আছে। চোর-ডাকাইত কাটোনের লগ্যেই বানাইয়া দিমুআনে। লাইটের উপর। ভার অইব না। দুহাতে তুইল্যা বসাইয়া দিবেন। ধড় থিক্যা মুণ্ডুখান সট্ কইর‍্যা খুইল্যা যাইবো গিয়া !

কবে দিবা রাধু ?

তাড়াতাড়িই দিমু।

কবে ?

সাতদিনের মধ্যেই দিমু।

সাতদিন ? কও কি তুমি ? না, না। আমার একদিনের মধ্যেই চাই।

কন কি বাবু ? পাঁঠা বাঁইধ্যা থুইছেন নাকি উঠানে ? এত্ব তাড়াতাড়ি কিসের ?

পেরায় সেই রকমই। বাঁইধাই থুইছি কইতে পারো।

বললেন, পুলিনবাবু।

তারপর বললেন, নিবা কত, তা কও ?

আপনাকে সস্তা কইরাই দিমু। আইজককাল ইস্টিলের যা দাম ! তাও তো র‍্যালকোম্পানীর চোরাই-ইস্টিল বইল্যাই এত হস্তায় দিত্যা পারতাছি ! তা, একশই দিবেনআনে আপনি।

একশ ? এতগুলো টাকা !

চমকে উঠলেন পুলিনবাবু।

তারপরই ভাবলেন, পাক্কা স্টিলের একটা মানুষ-মারা হাতিয়ারই তো ? তাঁর মেয়েদের এক এক্জনের এক-ঘণ্টা দু-ঘণ্টার ভাড়াই যদি একশ টাকা হয়, তাহলে মাধুর এত পরিশ্রম এবং ইস্পাতের বিনিময়ে একশ'টা টাকা তো বেশি চায়নি। যে করেই হোক জোগাড় করে

দেবেন তিনি।

উনি বললেন, দিমু আনে। কিন্তু কাল সন্ধ্যাব পবই লাগব আমার।

কাউবে খুনটুন কইরবেন না তো আবাব? আপনের ভাব-গতিক তো আমার ভাল ঠ্যাকতেছে না!

হাসলেন, পুলিনবাবু। ম্লান হাসি।

বললেন, খুন-খারাবি যদি কইবতেই পাবতাম তাইলে আজ আমাগো কি এই দশা হয় বাধু? আমাবই একলাব ক্যান, পেত্যেক বাঙালীবই কি আজ এই দশা হইতো?

বাধু কথাটাব মানে না-বুঝে চেয়ে থাকলো। কথাটা অস্পষ্ট হলেও তাব মন যেন কথাটাতে সায় দিলো।

আব কিছু জিগগেস কবাব আগেই পুলিনবাবু চলে গেলেন। তাড়াতাড়ি হাঁটাব জন্যে লুঙিটাকে উঁচু ক'বে কোমবে বেঁধে নিযে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুবতে ঘুবতে নদীব ধাবে গিযেই দাঁড়িয়ে পড়লেন পুলিনবাবু।

তর্জন-গর্জন কবা তিস্তা দিযে জঙ্গলেব কাঠ ভেসে যাচ্ছে। সেই প্রবলবেগে ভেসে যাওযা বড় বড় গাছেব গুঁড়িগুলোকে কী দুঃসাহস এবং পবিশ্রমেব সঙ্গে অল্প ক'টি মানুষ তাদেব শক্ত সবল হাত আব হাতে-হাতে জড়ানো দড়ি দিযে বাঁচিযে নিচ্ছে। একটি একটি ক'বে। জীবন বিপন্ন কবেও। দাঁড়িযে দাঁড়িযে দেখছিলেন অনেকক্ষণ পুলিনবাবু।

লোকগুলো চেঁচামেচি কবিছিলো।

উনি শুনলেন, গতকাল ওদেবই মধ্যে একজনকে নাকি নিযে গেছে তিস্তা। নেপালী চাব পাঁচজন। অন্যবা, ভাবতেব অন্য প্রদেশেব লোক।

ভেসে যাওযা কিছুকে বাঁচাতে হলে নিজেদেব মধ্যেও কাবও কাবও ভেসে যাওযাব জন্যে তৈবি থাকতে হযই বোধহয। ভাবলেন উনি। এমনি কবেই, বর্ষাব তিস্তাব স্রোতেবই মুখে ভেসে-যাওযা কাঠেব মতো একটা পুবো জাত তাব ডাল-পালা শিকড়-বাকড় শুদ্ধ ভেসে যাচ্ছে, তাঁব নিজেব এবং সমস্ত জাতেব চোখেব সামনে দিযেই, অথচ একজনও মানুষ, কী একটাও হাত, তাঁকে বাঁচাবাব চেষ্টা কবলো না। প্রাণ দিযে চেষ্টা কবা দূবে থাকুক, একটা আঙুল পযন্ত নাড়ালো না কেউই।

ভেসে যাচ্ছে, শুধু পুলিনবাবুব একাব সংসাবই নয, পুবো একটা জাতেব ভবিষ্যৎ, গত সাঁইত্রিশ বছব ধবে নিশ্চিত সর্বনাশেব দিকে।

সময নেই আব।

শুধু ভিক্ষা চাওযাব জন্যেই পেতে-বাখা দুটি হাত নিযেই বোধহয জন্মেছিলেন পুলিনবাবুবা। ভগবানেব কাছে ভিক্ষা মালিকেব কাছে ভিক্ষা, ভিনবাজ্যেব ব্যবসাদাবদেব কাছে ভিক্ষা, নিজেব বাজ্যে, নিজেব বাজধানীতে থেকেও তৃতীয শ্রেণীব নাগবিক হযে বেঁচে থাকাব ভিক্ষা, কেন্দ্রীয সবকাবেব কাছে ভিক্ষা।

তাঁদেব উদাসীন গালে সকলেই চড় মেবে যায। সংস্কৃতিব দোহাই দিয়ে, ভদ্রতাব দোহাই দিয়ে থুথু গেলেন বাঙালী জাতেব বুদ্ধিজীবীবা। তাঁবা সকলেই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠাব প্রতিযোগিতাতে সদাই সামিল।

হাত কি পুলিনবাবুদেব আদৌ আছে? বা ছিলো? যে-হাত প্রযোজনে সোজা হযে উপবে উঠে সত্যিকাবেব প্রতিবাদ কবতে পাবে? যে-হাত, চড় মাবতে পাবে, যে-হাত নিশ্চিত অন্যাযকাবীব গলা টিপে ধবে, শ্বাসকদ্ধ কবে, তাব দু'চোখেব মণিকে ঠিক্‌বে বাইরে আনতে পাবে?

পুলিনবাবুরা এক ঠুঁটো জগন্নাথের জাত।

কোয়ার্টার্সের দিকে ফিরতে লাগলেন তিনি। বাবুলাইনের পাশ দিয়ে। বাঙালী বাবুরা সবাই ঘুমোচ্ছেন এখনও। কে জানে, কখন ভাঙবে এঁদেব ঘুম। চিবঘুমে পেয়েছে সকলকে।

ব্যালান্সশীট

ছোট্ট একতলা বাড়ি। দুপাশে দুটো পাঁচতলা। বাড়িটার রঙ ফেরানো হয়নি বহুকাল, এজমালি সম্পত্তি বলে। বড় ভাই ও ন ভাই অন্যত্র চলে গেছে। একজন নিজে বাড়ি করে। অন্যজন কোম্পানির ফ্ল্যাটে বাড়ির ভোগ দখলে মেজো, সেজো আর ছোটো। কারও অবস্থাই খুব ভালো নয়।

এখন সাড়ে দশটা বাজে। নবকেষ্ট বাস থেকে নেমে অপরাধীর মত এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে হেঁটে এল।

বাসে চড়ার আগে মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে ফোন করে দিয়েছিল একটা। ও জানতো, ও বাড়ির সেজো ভাইয়ের জন্যে বরাদ্দ যে দিকটা, তার বাইরের খিল নামানো থাকবে।

ফোনে বেশিকিছু বলেনি নবকেষ্ট, বলেছিল, আমি আসছি। পনেরো মিনিটে।

রিসিভারের অপর প্রান্তে নরম, আমন্ত্রণী গলায় মৃন্ময়ী বলেছিল, ঠিক আছে। নবকেষ্ট বুঝেছে যে মৃন্ময়ী যখন ফোন ধরেছিল তখন ফোনের কাছে বারান্দাতে নিশ্চয়ই অন্য কেউ ছিল। তবু, ঠিক আছে কথাটাতেই সবই যে ঠিক আছে সে বিষয়ে নবকেষ্ট নিঃসংশয় হয়েছিল।

দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরে ঢুকেই খিল তুলে দিল নবকেষ্ট।

মৃন্ময়ী পর্দার আড়ালে ছিল। নবকেষ্টর চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী ও সাহসী। তবু জানলার খড়খড়ি একটু ফাঁক করে নবকেষ্টকে ভিতরে ঢুকতে কেউ যে দেখেনি সে বিষয়ে নিঃসংশয় হয়ে নিল। নবকেষ্টর তর সইল না। কখনওই সয় না। তাড়াতাড়ি মৃন্ময়ীর কোমর জড়িয়ে তাকে নিয়ে এসে মৃগাঙ্কর খাটে বসল। কাচ-কলাপাতা-রঙা তাঁতের শাড়ির আবরণের আড়ালে নিটোল থোড়ের মত উরু ঘরময় স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দিল।

মৃন্ময়ী ফিসফিস করে বলল, তুমি বড় আনরোমান্টিক। শুধু কি এই জন্যেই আসো আমার কাছে?

নবকেষ্ট বলল, জানি না।

সত্যিই নবকেষ্ট জানে না ও কেন আসে মৃন্ময়ীর কাছে। কখনও ভাবেওনি এ বিষয়ে তেমন করে। শুধু কি শরীরটুকুর জন্যেই আসে? মৃন্ময়ীর প্রশ্নর সঙ্গে ও নিজেকেও শুধোল।

ছোটবেলায় আইসক্রিম খাওয়ার সময় একটা নার্ভাস টেনশানে ভুগত নবকেষ্ট। ওর কেবলই মনে হতো আইসক্রিমটা এক্ষুনি গলে যাবে। আইসক্রিম কখনও ধীরে সুস্থে না

খেযে ও গিলেই খেত চিবদিন। আজও ওব জীবনেব বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলোতে ও তেমনই নার্ভাস টেনসানে ভোগে।

প্রাযান্ধকাব ঘব। জানলাব খডখডিব ফাঁক দিযে আসা একটু আলো, বাইবে ফিবিওযালাব ডাক, পাখাব চিডিক-চিডিক শব্দ, পাটভাঙা বেডকভাবেব সাবান সোডা গন্ধ, ড্রেসিং টেবিলেব একপাশে বাখা মৃন্ময়ী ও মৃগাঙ্কব বিযেব সমযকাব ছবি। ভালোবাসাব। মৃন্ময়ীব ছোট মেযেব একটা খেলনাব কালো ভাল্লুক। এই সমস্ত গন্ধ শব্দ ও দৃশ্য নবকেষ্টব মগজ আচ্ছন্ন কবে ফেলল।

হঠাৎ পাপোশেব পাশে মৃগাঙ্কব ছাডা জাঙ্গিযাটা চোখে পড়ল নবকেষ্টব। ভযে, অথবা আনন্দে ও জানে না, নবকেষ্ট মৃন্ময়ীকে আবও জোবে জডিযে ধবল। সোহাগে মৃন্ময়ী বিডালছানাব মত মিউ মিউ কবতে লাগল। আডমোডা ভাঙতে লাগল। নবকেষ্টব গাযেব সস্তা পাউডাবেব গন্ধেব সঙ্গে মৃন্ময়ীব শবীবেব সোঁদা গন্ধ মিশে গেল।

ঘুলঘুলিব মধ্যে থেকে চডাই ডাকছিল। কিছুক্ষণ পব নবকেষ্ট বাথকমে গেল। ফ্লাশটা কাজ কবছে না। বালতি কবে জল ঢালল। ফিবে এল।

মৃন্ময়ী আবেশে আবামে তখনও চোখ বুজে পডেছিল খাটে। ওব মেযেব ভাল্লুকটা ড্যাবডেবে চোখে তাব মুখেব দিকে চেযেছিল।

বাথকমে যতক্ষণ ছিল, যতক্ষণ ঘবে ছিল, যতক্ষণ বাসে কবে এসেছিল, এমনকি আজ সকালে যতক্ষণ চান কবছিল ভাল কবে সাবান ঘষে ততক্ষণই ও এক দাকণ উত্তেজনামব আনন্দে ছিল। কিন্তু বাথকম থেকে বেবিযেই নবকেষ্ট হঠাৎ বড বিষন্ন হযে গেল। ওব ভীষণই ঘেন্না কবতে লাগল নিজেকে। তাব চেযেও বেশি মৃন্ময়ীকে।

যে শবীবকে একটু আগে পবমযত্নে আদব কবেছিল, প্রশংসামুখব চোখে যেদিকে চেযেছিল, সেই শাযিতা মৃন্ময়ীব দিকে চেযেই ওব বিচ্ছিবি লাগতে লাগল।

মৃন্ময়ী ওকে ডাকল কাছে। ওকে জডিযে ধবে বলল, কাছে শোও একটু।

নবকেষ্ট গেল। বাধ্য, কিন্তু অনিচ্ছুক কুকুবেব মত। কিন্তু মনে মনে বিবক্তিব সঙ্গে বলল, আবাব এত ঢঙ কিসেব?

তাবপব বেশ কিছুক্ষণ ওবা জানোযাবেব মতো শুযে থাকল। মৃন্ময়ী কি ভাবছিল নবকেষ্ট জানে না, কিন্তু নবকেষ্ট ভাবছিল এই অবস্থায যদি মৃগাঙ্ক কোনওদিন ওদেব দুজনকে আবিষ্কাব কবে তা হলে কি হবে?

মৃন্ময়ীকে সে-কথা বলতেই ও বলল আমি কেযাব কবি না কোনও। আমাব কোনও ফিলিং নেই মৃগাঙ্কব প্রতি। আমাব জীবনে ভ্যাকুযাম ছিল, শূন্যতা ছিল, তুমিই তা পূবণ করেছ। ওব কথা কখনও এনো না আমাদেব কথাব মধ্যে

এসব কথা শুনতে বেশ লাগে, বিশেষ কবে মৃন্ময়ীব গবম নিঃশ্বাসেব সঙ্গে তাব নবম বুকে হাত বেখে তাব পাশে শুযে শুযে শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু ।

নবকেষ্ট, শেষ কবে মাব খেযেছিল, চেষ্টা কবেও মনে কবতে পাবলো না। তাবপবই মনে পড়ে গেল। সবস্বতী পূজাব ভাসানেব সমযে, গঙ্গাব ঘাটে। তখন ওব বযস ছিল চোদ্দ পনেরো। আজ আটত্রিশ। চব্বিশ বছব মাব খাযনি নবকেষ্ট। ভযে নবকেষ্টব তলপেটটা গুডগুড করে উঠল।

কেশরী পুকষসিংহ হঠাৎ একেবাবে গুডে-পডা নেংটি ইঁদুবেব মত নেতিযে পডল।

নবকেষ্ট বলল, তুমি আমাকে ভালোবাসো কেন? আমাকে এত প্রশ্রয় দাও কেন? কি দেখেছ তুমি আমাব মধ্যে? কি পেযেছ মৃন্ময়ী।

কিছু না।

মৃন্ময়ী কাটা-কাটা গলায় বলল।

তারপর ডান হাতের তর্জনীটা নবকেষ্টর ঠোঁটে ছুঁইয়ে ফিসফিস করে বলল, চুপ করো।

মৃন্ময়ীর ভাবসাব দেখে নবকেষ্টর প্রায়ই মনে হয় যে, মৃন্ময়ীর ভিতরে প্রেম করার বড় সখ ছিল। কৈশোরে বাবা-মা, যৌবনে স্বামী ও শ্বাশুড়ী, ও মধ্য যৌবনে ছেলে-মেয়ের জন্যে তা হয়ে ওঠেনি বলেই বোধ হয় ও নবকেষ্টকে পাকড়েছে। ইলিশ মাছ পায়নি বলেই খল্‌সে নিয়ে শর্ষে দিয়ে রাঁধতে বসেছে।

নবকেষ্ট কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভাবল, নাটক নভেলে এরকম পড়েছে বটে। টাইমে প্রেম করতে না পেরেও কিছু ইডিয়ট লোক প্রেম জিনিসটাকে এতই দামী মনে করে যে, বে-টাইমে করতেও পিছপা হয় না।

হাসি পায় ভাবলে। নবকেষ্ট ভাবল।

বাইরে কে যেন কড়া নাড়ল।

নবকেষ্ট তড়াক করে উঠে পড়ে জামাকাপড় পরতে লাগল।

তাড়াতাড়িতে একটা বোতামই ছিঁড়ে গেল। মৃন্ময়ী নির্বিকার।

একটু পর উদাস গলায় বলল, সামনের বাড়ির ঠিকে-ঝি।

সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটার শব্দগুলোর খোঁজ একমাত্র মেয়েরাই রাখে। ভাবল নবকেষ্ট।

নবকেষ্ট মনে মনে করপোরেশনের শ্রাদ্ধ করল। এমন সরু গলি রাখার মানে কি ? কোন্‌ বাড়ির কড়া নড়ে তা পর্যন্ত গুলিয়ে যায় ক্রুশাল মোমেন্টে। হার্ট-অ্যাটাক হতে পারত !

নবকেষ্ট অধৈর্য গলায় বলল. এবার যাই। মৃন্ময়ী শুয়ে শুয়ে বলল, জানি। জানতাম, এ কথা বলবে।

পুরুষ জাতটাই এরকম।

তারপর না বলে, বলল, কেন আসো তাও জানি। চলে যাওয়ার জন্যেই আসো। অথচ তবুও তোমাদের নইলে আমরা অসম্পূর্ণ থাকি। ভাবলেও লজ্জা পাই।

কথা ঘুরিয়ে বলল, যাবে তো বটেই। এতই যদি তাড়া তো আসা কেন ? সবকিছুতে তাড়া ভাল নয়। আমি কি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী ? আমাকে অত হেলাফেলা করা ঠিক নয়।

নবকেষ্ট নিজেই কুঁজো থেকে ঢক্‌ঢক্‌ করে দু গ্লাস জল গড়িয়ে খেল। জবাব দিল না কোনও।

তারপরই মৃগাঙ্কর ছোট ভাইয়ের বাইসেপ্‌স-এর কথা মনে পড়ল ওর। কলেজ স্কোয়ারে সে এখনও কসরৎ করে অফিস থেকে ফিরে এসে।

নবকেষ্ট আবার বলল, চলি।

মৃন্ময়ী উঠে বসল। বলল, পান খেয়ে যাও একটা।

তারপর শাড়ি জামা সামলে পানবাহার দিয়ে পান সেজে দিল যত্ন করে নবকেষ্টকে। নবকেষ্টর হাওয়াই শার্টের বুক পকেটে একটা চুমুও খেল। নবকেষ্টর সুড়সুড়ি লাগল।

হঠাৎ নবকেষ্ট মৃন্ময়ীকে শুধোল, বলবে না, কি দেখেছ তুমি আমার মধ্যে ? কোনওদিনও তো বললে না। বুঝি না তোমাকে।

মৃন্ময়ী হাসল।

নবকেষ্টর মনে হল, আদর খাওয়ার অব্যবহিত পর একমাত্র বেড়ালনী আর মেয়েরাই

এরকম নচ্ছারের মত হাসতে পারে। দেখে গা জ্বলে যায় ; আবার ভালোও লাগে।

মৃন্ময়ী নিজেও পান মুখে দিল, চিবোল ধীরে-সুস্থে ; তারপর ঢোক গিলল।

ঢোক গিলে আরও অনেকক্ষণ সময় নিয়ে বলল, তোমার মধ্যে দেখিনি কিছুই।

মৃগাঙ্ককে আমি ঘেন্না করি তাই তোমাকে কাছে চাই। বহুদিন হল ওকে আমি শরীর মন কিছুই দিতে পারিনি ; দিইনি। দেবোও না। বাইরের লোক যতই যা ভাবুক আমাকে। এই দাম্পত্য জীবনের মত লজ্জার অথবা মিথ্যার, যাই-ই বল, আর কিছুই নেই। নেহাৎ আমি স্বাবলম্বী নই। হলে····।

পান মুখে দিয়ে, নবকেষ্ট দাঁত বের করে হাসল।

ওর আবছা-আবছা মনে পড়ল কথাটা যেন আরও কোথায় শুনেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের সামগ্রিক ব্যর্থতা ও সামান্যতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে একজন দারুণ সাকসেসফুল লোক বলে মনে হওয়াতে, মনে পড়ল না কথাটা কোথায় আগে শুনেছে। একেবারেই ভুলে গেল ও যে, এমার্জেন্সির পর অ্যাটেড্যান্স রেজিস্টার দশটার পরই বড় সাহেবের ঘরে চলে যায়। এবং বড়সাহেব রাগলে তাঁকে মোটেই ভাল দেখায় না।

তবুও সত্যজিৎ রায়ের ছবির শটের মত ও নিজেকে ফ্রিজ করিয়ে দিয়ে ঐ পোজে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর বুকের মধ্যের হতাশার ফ্রিজে যেসব ঠাণ্ডা ভাবনাগুলো এতদিন এত বছর পোকাওয়ালা বেগুনের মত দড়কচা মারা ছিল, সেই ভাবনাগুলো আত্ম-বিশ্বাসের ডি-ফ্রস্টিং-এ দ্রুত গলে যেতে লাগল। নবকেষ্ট অনুভব করতে লাগল যে, ওর বয়স চলে যাচ্ছে বুকের মধ্যে থেকে। ও নবীন হয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

মৃন্ময়ী হাসল।ও-ও হাসল। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে হাসল। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কারণে।

মৃন্ময়ী খড়খড়ি খুলে চকিতে বাইরেটা দেখে নিয়ে অলক্লিয়ার সিগন্যাল দিল।

হাসতে হাসতে নবকেষ্ট পান খেতে খেতে মধ্য কলকাতার সেই সরু গলি দিয়ে অফিসের চামড়ার হাত-ব্যাগটা সজোরে দোলাতে দোলাতে যেন ভেনিসের সরু নালার উপর গণ্ডোলায় চড়ে কোনও ইতালীয় রাজপুত্তুরের মত ভেসে যাচ্ছিল। জল বয়ে যাচ্ছিল, খুশি বয়ে যাচ্ছিল ; নবকেষ্টও বয়ে যাচ্ছিল। চল্‌কে চল্‌কে।

বাস স্টপেজের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ওর মগজের মধ্যে কী যেন একটা অস্ফুট ভাবনা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মত ঘুরপাক খেতে লাগল। খুব শুকনো, জ্বালাধরা যন্ত্রণাময় কোনও ভাবনা। ভাবনাটাকে স্মৃতির খেপলা জাল বারবার ছুঁড়েও ধরতে পারল না ও। ফস্‌কে যেতে লাগল। পরমুহূর্তেই মনে হলো পেয়েছে ; পেয়েছে। মরা চৈত্র মাসের বিস্মৃতির পুকুরে পোলো দিয়ে কৈ মাছ ধরার মত করে ও ভাবনাটাকে খপাৎ করে ধরে ফেলল।

ধরে ফেলতেই, ওর পা দুটো অনড় হয়ে গেল। বাস স্টপেজে আসার আগেই ও একটা লাইট পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বাধ্য হয়েই।

ওর মনে পড়ে গেল যে, ওর স্ত্রী শেফালীও কিছুদিন আগে ওকে ঠিক এই কথাই বলেছিল। মানে, মৃন্ময়ী একটু আগে যা বলল ওকে মৃগাঙ্ক সম্বন্ধে।

এ-জি বেঙ্গলের লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক নবকেষ্টর বন্ধু যোগব্রতর প্রতি নবকেষ্টর সুন্দরী স্ত্রী শেফালীর মনোযোগ দেখে বিদ্রূপের সঙ্গে ও শেফালীকে জিজ্ঞেস করেছিল, কি দেখেছ তুমি ওর মধ্যে ?

মৃন্ময়ী ; সরি, শেফালী : ঠিক মৃন্ময়ীর মত করেই নবকেষ্টকে ঘৃণার সঙ্গে, শ্লেষের সঙ্গে বলেছিল, আমার মধ্যে ভ্যাকুয়াম ছিল ; তোমার কাছ থেকে যা পাইনি, যোগব্রত তা

আমাকে দিয়েছে।

নবকেষ্টর মাথাটা পরিষ্কার হয়ে এল। বহু বহু দিন বাদে ও হঠাৎ যেন শেফালীকে বুঝতে পারল, বুঝতে পারল মৃন্ময়ীকেও। এমনকি ক্যাবলা, ছাতা-হাতে, টাকমাথা ওয়ার্থলেস যোগব্রতরও যেন ও যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারল।

নবকেষ্টর মনে হল মৃন্ময়ী, যোগব্রত, মৃগাঙ্ক, শেফালি এবং প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীই প্রত্যেকে একে অন্যের পরিপন্থী এবং পরিপূরকও। একেব জীবনে শূন্যতা এবং অন্যের জীবনে পূর্ণতা , দুইয়েবই বাহন।

বড় বেদনামিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে নবকেষ্ট আজ প্রাপ্তির মধ্যে রিক্ততাকে আবিষ্কার করল। অথবা, বিক্ততার মধ্যে প্রাপ্তিকে।

আওলাদ্

ডিসেরগড়ের টিম এর কেউই তখন মাঠে ছিলো না। খেলা শেষ হওয়ার পরই খুব জোর বৃষ্টি নেমেছিলো। সবাই দুড়দাড় করে বাড়ি পালিয়েছে। নয়তো মাথা গোঁজার মতো আস্তানার দিকে। বার্নপুরের টিম-এরও বিশেষ কেউ ছিল না। গোলপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে আমি, ফাস্টুমামার বুট, মোজা হোস ও জার্সি খোলা দেখছিলাম।

আমাদের বার্নপুরের টিম-এর অনিলদা খেলা আরম্ভ হবার দশ মিনিটের মধ্যে ফ্রী কিক-এর সুযোগ নিয়ে একটি অতি সাদামাঠা গোল ঢুকিয়ে দিয়েছিলো. হারুদার কিক্-এ তার হেঁড়ে মাথা পেতে দিয়ে। সেই গোলটা অনিলদার শিং নাড়ার কৃতিত্বের যতবড় কীর্তি ছিলো তার চেয়ে অনেকই বেশি লজ্জাকর ছিলো ডিসেরগড়-এর গোলকিপারের পক্ষে।

মোদ্দা কথা, আজ যে বার্নপুর এক গোলে জিতলো ডিসেরগড়ের সঙ্গে খেলায়, লিগের ফিরতি ম্যাচে ; তার পুরো কৃতিত্বই গোলকিপার ফাস্টুমামার একার।

ওদের চাটুজ্যে আর ধাওয়ান কম করে ছ-ছ'বার আমাদের ডিফেন্সকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে চমৎকার শট নিয়েছিলো গোলে। দুটি শট ছিলো অ্যাঙ্গুলার। এমনই সোয়ার্ভ ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো ফুটবল তো নয়, যেন ক্রিকেট বল ! উড়ন্ত ঘূর্ণি-গোলক। এ ছাড়াও দুটি শট করেছিলো ওরা দুজনেই একটি একটি করে, মাটি থেকে ফুটখানেক উপর দিয়ে। এবং সেই দুটি শটের আগে আক্রমণকারীদের চোখ দেখে কারোই বোঝার উপায় ছিলো না যে বল কোনদিকে যাবে। চ্যাটার্জির শটটা, তার শট নেবার পূর্বমুহূর্তের দৃষ্টি অনুযায়ী যে দিকে যাবে বলে সকলেই ভেবেছিলো, তার ঠিক বিপরীত দিকে গেছিলো। তারই মিনিট পাঁচেক পর ধাওয়ান শট নিলো যখন তখন গোলকিপারকে বোকা বানাবার জন্যে আপাতদৃষ্টিতে একটুও চাতুরী না করে চাতুরীর চূড়ান্ত করেছিলো। শেষ মুহূর্তের দৃষ্টি অনুযায়ী যেদিকে বল যাবে বলে সকলেই ভেবেছিলো, বল ঠিক সেই দিকেই গেছিলো।

অন্য যে-কোনো গোলকিপার হলে এই শেষ চাতুরীর খেলাতে হেরে যেতই। কিন্তু ফাস্টুমামা : ফাস্টুমামাই ! আক্রমণকারীদের সব ছল, চাতুরী, দক্ষতা ব্যর্থ করে দিয়ে প্রতিবারই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বর পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গোল বাঁচিয়েছিলো। আজকের খেলাটা, বলা চলে ; ডিসেরগড় ইলেভেন ভার্সাস ফাস্টুমামার একারই খেলা।

গণেশদা, আমাদের বার্নপুরের টিম-এর কোচ বাঁ হাতের পাতা দিয়ে টাকের জল মুছতে মুছতে এবং ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী মোটা সিগারের গায়ে রেখে, সিগার টানতে টানতে বললেন, তূর্য, ঘোষ সাহেব আমাকে গতরাতে বলছিলেন যে, তিনি নিজে

স্যার আর. এন. কে তোমার কথা বলেছেন। লেডি রাণু আর স্যার বীরেন এর পরে যখন বার্নপুরে আসবেন তখন শুধু তোমারই জন্যে তাঁদের বাংলোতে একটি রিসেপশান্ এর বন্দোবস্ত করবেন ঘোষ সাহেব। তুমি হায়ার স্টাডিজ-এর জন্যে যেখানে যেতে চাও তার সব বন্দোবস্তই ওঁরা করে দিতে রাজি। তুমি ছেড়ে যেও না···

ফাস্টুমামা, ঘামে আর বৃষ্টিতে ভেজা হোস, জার্সি, নী-কাপ্, অ্যাংক্লেট ইত্যাদি সব খুলে ব্যাগের মধ্যে রেখে একটি হলুদ-রঙা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম-জল মুছে বললো, ঘোষ সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস না করে, মানে, আমার সঙ্গে আলোচনা না করে এটা না করলেই পারতেন। আমার মতটা আগে নেওয়া উচিত ছিলো। আমার বাবাই এই কোম্পানিতে চাকরি করেন, আমি তো আর করি না! আমার জন্যে কোম্পানির কোনো চিন্তারই দরকার নেই।

গণেশদা বললেন, তুমি বড়ই উদ্ধত তূর্য। তোমার এই অকারণের ঔদ্ধত্যর কোনো মানে নেই। তোমার ব্যাপারটা যেন এক গামলা দুধ-এর মধ্যে একফোঁটা চোনারই মতন। এই এক দোষেই তোমার সব গুণ মাটি হবে।

ফাস্টুমামা হেসেছিলো। বলেছিলো, এটা আমার ঔদ্ধত্য নয় গণেশদা, এটা আত্মবিশ্বাস। আত্মসম্মানও বলতে পারেন।

বলেই, বললো, চল রে বুঁচু! বাড়ি যাবি না?

যাবো তো!

আমি ফাস্টুমামার সামনে সাইকেলের রড-এ বসলাম। তার সাইকেলে কোনো কেরিয়ার ছিলো না। কাদামাখা বুট দুটোর ফিতেতে গিট দিয়ে বেঁধে তা সাইকেলের হ্যান্ডল্ থেকে দুদিকে ঝোলানো ছিলো। ভিজে চামড়ার আর মাটির আর ঘাসের গন্ধ লেগেছিলো বুটে।

বার্নপুরের পথ আর গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড যেখানে মিলেছে, সেই মোড়ের দিকে, ইদানীং যেখানে ইনকামট্যাক্স অফিস হয়েছে, সেই জায়গাটিতে পৌঁছে, বাঁয়ে জি টি রোড ধরে বরাকরের দিকে যাবো আমরা। ডান দিকে পড়বে উঁচু পাঁচিল দেওয়া "এভিলীন লজ।" ফাস্টুমামারা এবং আমরাও সেখানেই থাকতাম। পরপর কয়েকটি বাংলো ছিলো "এভিলীন লজ"-এ। সামনে লন ও বাগান।

বার্নপুরের এলাকা প্রায় ছেড়ে এসেছি, বাঁদিকে কারখানা শেষ হতে চলেছে; এমন সময়ে জোরে বৃষ্টি নামলো আবার। ফাস্টুমামা সুরেলা, উদাত্ত গলায় গান ধরলো, "আজি বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে"।

ফাস্টুমামার বাবা আর আমার দাদু, মানে, মায়ের বাবা। ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির জাঁদরেল অফিসার ছিলেন। আমার মামাদের সমবয়সীই ছিলো ফাস্টুমামা। আমি ওর খুব ফেভারিট ছিলাম কারণ আমার ছোটমাসী পরমার সঙ্গে ফাস্টুমামার একটি মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। তূর্য বন্দোপাধ্যায়ের মনোনীতা হওয়া তখনকার আসানসোল-বার্নপুর-ডিসেরগড়-ধাদকা অঞ্চলে বিশেষ গর্বের ব্যাপার বলেই গণ্য হত। এবং অন্য মেয়েদের গভীর ঈর্ষা এবং দ্বেষের। আমাদের মাতৃকুলের তাই এতে অখুশি হবার কিছু ছিলো না; কিন্তু গভীর চিন্তা ছিলো, শ্রাবণের বাতাসের মতো ফাস্টুমামার মন কখন যে দিক বদলায়; তা নিয়ে।

ফাস্টুমামার পুরো নাম ছিলো তূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়। "ফাস্টু" নামটা "ফার্স্টুর" সহজ সমীকরণ। ওর বাড়ির ডাকনাম ছিলো চুপু। ওঁর ফার্স্টু নামটা প্রথমে দেন বার্নপুরের কারখানার একটি শপ্-এর সীনিয়র ফোরম্যান অশেষকাকা। অশেষ রায়। তখন ফাস্টুমামা

ক্লাস ফাইভ-সিক্স-এ পড়তো, আমি যেমন সেই খেলার দিনে পড়তাম। স্কুলের পরীক্ষায়, সবরকম খেলাধুলো, ডিবেটিং, গান-বাজনা, অভিনয়, সভ্যতা-ভব্যতা, আচার-ব্যবহার, কোনোদিক দিয়েই তূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর মতো একজন ছেলেও ছিলো না ঐ অঞ্চলে। কলেজে উঠেও সেই একই ব্যাপার। তাই অশেষকাকার অশেষ কৌতুকে দেওয়া তূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ফারস্ট্" নামটা অন্য সব নামকে মুছে দিয়ে "ফাস্টু" হয়ে থেকে গিয়েছিলো সকলের মুখে মুখে। "তূর্য" বা "চুপু" নাম আর কারো মনেই পড়ে না।

কারো কাছেই হারব না, কোনো অবস্থাতেই মাথা নোয়াবো না, জীবনে দ্বিতীয় কখনওই হবো না এমন একটা জেদ শিশুকাল থেকেই ফাস্টুদাকে পেয়ে বসেছিলো। এবং সেই জেদ বজায় রাখতে যতখানি সাধনা, অধ্যবসায় এবং যোগ্যতার প্রয়োজন, তার সবটুকুই করবার ও অর্জন করবার জন্যে মরণপণ করত সে। এবং সবসময়ই প্রথমই থাকত। নির্দ্বিধায়। সেইজন্যেই বোধহয় আমার ছোটমাসী, "পরমা"কে অতো পছন্দ ছিলো তার। পরমা যার নাম, সে মেয়েও তো সাধারণ ছিলো না।

বৃষ্টি থামলে গানও থামলো।

আমি বললাম, কোম্পানি নিজে থেকে তোমাকে এমন অফার দিচ্ছে আর সেই সাধালক্ষ্মী পায়ে ঠেলছো ; তুমি কীরকম !

হাঃ !

হাসলো ফাস্টুমামা। তারপর সাইকেলের প্যাড্‌ল চালাতে চালাতে বললো, তুই উ্যলিসিস্ পড়েছিস ? বুঁচু ?

না। আমি কী-ই বা পড়েছি ! তাছাড়া সকলেই যদি তোমার মতো ফাস্টু হতে যায় তাহলে আমাদের মতো ফিফ্‌থু, সিক্সথু, সেভেন্থু কারা হতো ! লাস্টুই বা হবে কে ?

হাঃ।

ফাস্টুমামা আবারও হাসলো।

বললো, ফাজিল হয়েছিস তো খুব :

আমি বললাম, কার কবিতা এ ? আমাদের টেক্সট বইতে তো নেই !

তোর কোন ক্লাস এখন ?

সিক্স।

হাঃ। টেস্ট বইয়ে কতটুকু থাকে রে বুঁচু ? স্কুল কলেজে তো আর কেউ সত্যিকারের বিদ্বান হতে যায় না।

বাঃ। তবে কী হতে যায় ? কেন যায় ?

হাঃ। হাঃ করে হেসেই আবার চুপ করে গেলো ফাস্টুমামা।

আবার হাসলো ফাস্টুমামা।

দূর থেকে এবার গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের মোড়টা দেখা যাচ্ছিলো। বৃষ্টিভেজা পথ বেয়ে ট্রাক যাচ্ছে পিচের উপর পিচ্ পিচ্ শব্দ তুলে।

॥ ২ ॥

আমার ছোটমাসী, পরমাসুন্দরী, বিদুষী, লাস্যময়ী পরমা, অথবা ফাস্টুমামার বাবা চিত্তদাদু অথবা স্যার আর. এন. এবং স্যার বীরেন মুখার্জিও বার্নপুরে বা অন্য কোথাওই তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ফাস্টুমামাকে আটকে রাখতে পারেননি। তূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিগন্ত

প্রতিদিনই প্রসারিত হতে হতে বার্নপুর থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে লানডানে, লানডান থেকে আবার কলকাতা তার পর দক্ষিণ ভারতের নানা জায়গা এবং বম্বে হয়ে শেষকালে দিল্লিতে থিতু হয়েছিলো।

তূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বহুমুখী প্রতিভার একজন বিখ্যাত মানুষকে যে এই বুঁচু বোস এর মতো একজন অতি সাধারণ মানুষ, স্ত্রী-কন্যা-পুত্র পালনকারী, নিছক সাদামাঠা জীবিকার্জনের দায়িত্বেই একেবারে ন্যুব্জ হয়ে থাকা মানুষ যে আদৌ একদিন কাছ থেকে জানতাম তা অন্যে বিশ্বাসই করতে চায় না। আমার স্ত্রী পুত্র-কন্যারাই বলে হ্যাঁ। তুমি ওকে চেনো না ছাই! প্রমাণ আছে কোনো?

প্রমাণ তো কিছু রাখিনি। আগে যদি জানতাম যে প্রয়োজন হবে তাহলে রাখতাম হয়তো। তখনকার দিনে তো টিভি ছিলো না! কিন্তু খবরের কাগজে এর রেডিওতে তূর্য ব্যানার্জির কথা পড়ে এ ং গলা শুনে আমরা যারা ওঁকে জানতাম একদিন তারা সকলেই প্রতিফলিত গৌরবে তৃপ্তি খুশি হতাম

শুনেছিলাম যে উনি চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পরীক্ষাতে প্রথম হয়েছিলেন। প্রথম হয়েছিলেন কস্ট ও চাটার্ড সেক্রেটারীশিপ পরীক্ষাতেও। লিনকনস ইনন থেকে ব্যারিস্টারীও করেছিলেন। আমাদের ফাস্টুমামা যে কখনও দ্বিতীয় হয়ে আমাদের অস্বস্তির কারণ ঘটাননি তা জেনে আমরা আনন্দিত ছিলাম। লানডান স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে বি এস সি (ইকন) করেছিলেন। তাতেও প্রথম হয়েছিলেন। সাসেক্স এর একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হয় ফাস্টুমামার। নাম সীমন। তাকে বিয়ে করে জাহাজে ওঠেন। জাহাজেই হানিমুন করবেন বলে। জাহাজ থেকে নেমেই ডিভোস হয়ে যায়। ডিভোস এর ব্যাপারেও ফাস্টুমামা প্রথম। আমাদের জানাশোনার মধ্যে কাউকেই কখনও 'ডিভোর্স' করতে শুনিনি তখনকার দিনে। একমাসের মধ্যে সাহেবি ভাবাপন্ন উচ্চশিক্ষিত এক পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেন ভালোবেসে। তাঁর নাম ছিলো ফিঙে।

ফাস্টুমামা টেনিস গল্ফ, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, রাইফেল ছোঁড়া, গান-ক্লাবে গিয়ে স্কিট ও ট্র্যাপ শুটিং, পোলো, গান বাজনা, অভিনয় ইত্যাদি সব কিছুতেই খুব নাম করেছিলেন। কবিতাও লিখতেন ফাস্টুমামা প্রবাসীতে, ভারতবর্ষে। মানে, ইচ্ছে করলেও তাঁকে মনে না-রাখা সম্ভবই ছিলো না আমাদের কারো পক্ষেই।

দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পরেপরেই বোধহয় ফাস্টুমামা একবার আসানসোল-বার্নপুরের চেনাজানা সকলের বর্তমান ঠিকানা সংগ্রহ করে বিজয়ায় ও পয়লা বৈশাখে এক লাইনের হলেও চিঠি লেখেন। নিজে হাতে। তখন তিনি বম্বেতে ছিলেন। আরও পরে দিল্লিতে আসেন।

আমি যে সাহেব কোম্পানিতে কাজ করতাম সত্তরের দশকে তার হাতবদল হলো। এক আধুনিক মাড়োয়ারি গোষ্ঠী কিনে নিলো সেই কোম্পানি। তারও বেশ কিছুদিন পরে রিটায়ারমেন্টের সময় যখন এলো তখন রিটায়ার করতে না দিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুজাফ্ফরনগরে তাদের এক নতুন কারখানার ভার দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তাঁরা। সেখানে পাঁচ বছর কাটানোর পর যখন ছুটি চাইলাম তখনও ছুটি মঞ্জুর হল না। আমিও ভাবলাম, রিটায়ার করে বসে গেলেই তো বুড়ো হয়ে যাব যে ক'দিন কাজের মধ্যে থাকা যায়। আমাকে ওঁরা তখন হালকা কিন্তু খুব দায়িত্বের কাজ দিয়ে নৈনিতালে পাঠালেন। পুরো উত্তরপ্রদেশেরই দায়িত্ব দিয়ে। আমাদের এক ছেলে দুই মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। বড় জামাই কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ার, বম্বেতে থাকে। ছোট জামাই ইলেকট্রিক্যাল

এঞ্জিনীয়ার, ফিলিপস্-এ কাজ করে, সে-ও বম্বেতেই থাকে। ছেলে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে স্টেট্স-এ গেছিলো। অ্যামেরিকান মেয়ে বিয়ে করে সেখানেই থেকে গেছে। গ্রীন কার্ডও পেয়ে গেছে। মাত্র একবার এসেছিলো। পিছুটান বলতে কিছু নেই বলেই এসেছি নৈনিতালে। মেয়েরা বছরে নাতি-নাতনীদের নিয়ে একবার আসে। জামাইরা ব্যস্ত। কখনও আসে কখনও আসতে পারে না।

আমাদের কোম্পানির রাণীক্ষেত আলমোড়া কৌসানি ইত্যাদি জায়গার এজেন্ট সত্যকাম নেগি। হিমাচল প্রদেশের লোক। বহুদিন থেকেই বলছে একটি লং উইক-এণ্ডে রাণীক্ষেতে তাদের গেস্ট-হাউসে আমাদের নিয়ে গিয়ে রাখবেন। আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো না। রাণীক্ষেতে তো অজস্রবারই যেতে হয়। কিন্তু ছোটমেয়ে জামাই আসছে এবারে পুজোর সময়ে। তাদের নিয়ে এখানে ক'দিন থাকার ইচ্ছা আছে রুবীর। সে কারণেই সরেজমিনে তদন্ত করার অভিপ্রায়েই এবারে আসা।

চমৎকার গেস্ট-হাউস। 'ওয়েস্ট-ভিউ' হোটেলের কাছেই। শহরের গোলমাল নেই। ক্যান্টনমেন্ট-এর এলাকারও উপরে। কাছেই ঝুলাদেবীর মন্দির। সামনে ঢালু হয়ে নেমে গেছে গড়ানো পাহাড়, পরিচ্ছন্ন, চিড় আর পাইন বনের আঁচল গায়ে। সারাদিন ঝুরঝুর করে হাওয়া দেয়। আকাশে মেঘের খেলা।

বসবার ঘরে বসে আমরা গল্প করছিলাম। সত্যকাম বলল, কাছেই তূর্য ব্যানার্জির বাংলো। তূর্য ব্যানার্জিকে চেনেন নাকি? বাঙালি তো!

কোন তূর্য ব্যানার্জি?

আমি আকাশ থেকে পড়ে বললাম। আমাদের ফাস্টুমামা?

তূর্য ব্যানার্জি তো ভারতবর্ষে একজনই আছেন। ফাস্টুমামা কে?

আমি হেসে বললাম, ফারস্টু। উনি কোনো ব্যাপারেই তো কোনোদিন হার মানেননি। সবেতেই চিরদিন ফার্স্ট। তাই নাম হয়েছিলো ফারস্টু। তার থেকে ফাস্টু। ছেলেবেলায় আমরা প্রতিবেশী ছিলাম। উচি অবশ্য আমার চেয়ে অনেকই বড় ছিলেন।

তা তো জানিই। মানে, বড় যে ছিলেন! সেটা ঠিক। উনি নিজেও হেসে বলতেন, "আই অ্যাম ফার্স্ট বাই প্রফেশান।"

যাবেন নাকি দেখা করতে?

যাবো না! কী বলো! এখুনি যেতে ইচ্ছে করছে! শুনেছিলাম বটে যে, রিটায়ার করার পর তিনি এই অঞ্চলেই সেটল্ করেছেন। একসময়ে আলমোড়ার বশী সেনকে যেমন সকলেই চিনতেন, রাণীক্ষেতের তূর্য ব্যানার্জিকেও তেমন সকলেই চেনে।

সপরিবারেই থাকেন?

মেমসাহেব তো কুড়ি বছর আগেই চলে গেছেন। একটিই তো ছেলে, একমাত্র সন্তান। ছেলে-বৌ। নাতি-নাতনী নেই।

কী করে?

কে?

ফাস্টুমামার ছেলে?

কী আবার করবে! বাবার অনেক থাকলে বাঙালির ছেলেরা আবার কিছু করে নাকি? কিছু মনে করবেন না, কাজের-কালচারই যদি থাকবে তবে কি আর নিজদেশে তাঁরা উদ্বাস্তু হতেন বোস সাহেব?

আমি চুপ করে রইলাম। কথাটা তো মিথ্যেও নয়। তাছাড়া যেটা সত্যকামেরা জানে না,

সেই কথাটা হলো কাজের সংস্কৃতি তো নষ্ট হয়েইছে, যে-সব সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালিদের গর্ব ছিলো সে-সব সংস্কৃতিরও আজ আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই।

বাঙালি, আদমী বনতা বাঙালকা বাহাব যা কর্। প্রবাসী বাঙালিরাই বাংলার গর্ব। বুঝলেন '

আমি চুপ করে রইলাম। এ কথাটাও ঠিক।

এখন যাওয়া যাবে ? ব্যানার্জি সাহেবকে দেখতে ?

সন্ধে হয়ে গেলো। বুড়ো মানুষ। শুয়ে পড়েছেন হয়তো। কালই যাবেন ববং সকালে।

সত্যকাম বললো, আমিও আমার পাঁচ বছর বয়স থেকে ব্যানার্জি সাহেবকে চিনি।

কী করে ?

আমাব বাবা ওঁর দিল্লিব বাংলোর মালি ছিলেন।

সত্যকামের মহত্বে এবং সারল্যে মুগ্ধ হলাম। আজকের দিনের ভান-ভণ্ডামিব আর অতীত-লুকিয়ে-বাখার দিনে, অত্যন্ত শিক্ষিত এবং অশেষ ঐশ্বর্যর মালিক এমন মানুষও যে আছেন তা জেনে খুবই ভালো লাগলো। যদিও সত্যকাম বয়সে আমার বড় ছেলের চেয়েও ছোট তবুও শ্রদ্ধা জাগলো ওর সম্বন্ধে।

বয়স কত হলো ব্যানার্জি সাহেবের ?

রুবী শুধোলো।

তা, পঁচাশি তো হবেই।

অতো হবে ?

পরমা বললো।

আমি বললাম, তা তো হবেই। আমারই তো সত্তর ছুঁই-ছুঁই। মামাদের সমবয়সী ছিলেন তো ফাস্টুমামা। আমার মাতৃকুলে তো কেউই নেই। এক ছোমাসী ছাড়া। ছোটমাসীর বয়সও তো এখন আশি হবে। থুরথুরে বুড়ি। আজকের দিনের ছোটমাসীর চেহারা দেখলে "এভিলীন লজ"-এর দিনের সেই চেহারার কথা মনে পর্যন্ত আনা যায় না। কিন্তু ফাস্টুমামার বয়স হলেই বা কি হবে, তাঁকে দেখলেই তুমি বুঝবে যে বয়সকেও কী করে হার মানাতে হয় তা ফাস্টুমামা জানেন, বুড়ো হবার মানুষ তূর্য ব্যানার্জি নন।

এমন সময়ে বেয়ারা এসে বললো, ফোন আয়া।

কওন ? সত্যকাম শুধোলো।

রেখি সাহাব।

"ওয়েস্ট-ভিউ"-এর মালিক।

সত্যকাম গিয়ে ফিরে এলো। বললো, ব্যানার্জি সাহেব হোটেলে এসেছেন। হল্লাগুল্লা হচ্ছে জোর। আমার কাছে হুইস্কি আছে কিনা জানতে চাইছিলেন রেখি সাহাব।

এখানে তো ওসব মানা। আলমোড়া রাণীক্ষেত তো ড্রাই-এরিয়া। সাধুসন্তদের জায়গা।

তা ঠিক। তবে নিজের ঘরে বসে বা বাড়ি বসে খেলে, দেখছে কে ? তা ছাড়া, গাঁজা-গুলির উপরে তো নিষেধাজ্ঞা নেই!

রুবী হাসলো।

বেবি ব্যানার্জি, মানে টি ব্যানার্জির ছেলেটা একটা মাতাল। তাছাড়া...

তাছাড়া কি ?

আমি শুধোলাম।

নাঃ। কিছু না।

কোথাকার মেয়ে বিয়ে করেছে ?

দিল্লির মেয়ে।

পাঞ্জাবী ?

না। বাঙালি। তবে অনেকের চেয়েও এগিয়ে আছে সব বিষয়ে। দিল্লিতেই সেটলড় কয়েক পুরুষ হলো। বাংলা বলে না।

তাই !

পরমা বললো।

সে আমার ছেলের বউও তো অ্যামেরিকান। এক জামাই মহারাষ্ট্রিয়ান, অন্যজন পাঞ্জাবী। আজকাল আর কেউ ওসব মনে করে না। ভারতীয়তো তাও তারা।

গল্ফ খেলার টুর্নামেন্ট ছিলো আজ। তারপর হোটেলেরই কোনো ঘরে জমায়েত হয়েছে হয়তো।

গল্ফ কি তার বাবার মতোই ভালো খেলে ? বেবি ব্যানার্জি ?

নাঃ। বেবি ব্যানার্জির বাবার সঙ্গে কোনোদিক দিয়েই তার মিল নেই। স্কুল-লিভিং সার্টিফিকেটের পরীক্ষাও তিনবারে পাস করতে হয়েছিলো। কোনো কিছুই ভালো করে করার মানসিকতা নিয়ে সে জন্মায়নি। তবে বড়লোকের ছেলে, বসে খায়। হি নো'জ হাউ টু এনজয় লাইফ।

না খেটে খেলে সেই ভাত কি হজম হয় ?

হয় নিশ্চয়ই ! না হলে এতো দিন তো বদহজম হয়ে মারা যাবার কথা বহুবার।

বলেই বললো আপনি কি সত্যিই ব্যানার্জি সাহেবকে দেখতে যাবেন স্যার ?

কেন বলো তো ? তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে, কালকে।

নাঃ। ব্যানার্জি সাহেবকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। আমার পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছে ওঁরই জন্যে। কিন্তু ওঁর ছেলে আমাকে কুকুর-বেড়ালের মতো দেখেন। তবে এ কথাতো সত্যি যে আমার বাবা ছিলেন ওদের বাড়ির মালি। আমার তো পেডিগ্রী নেই। বেবি ব্যানার্জি আমার সঙ্গে মেশেন না। কিন্তু মদ আছে কি না তার খোঁজ করান অন্যকে দিয়ে। পয়সা লাগে না তো আমার কাছ থেকে নিলে !

তুমি যদি না-ও যাও সত্যকাম, আমাদের যেতেই হবে। আমার স্ত্রী-ও ওঁকে দেখেননি।

আমার মনে পড়লো যে, আমার চাকরি হওয়ার ব্যাপারেও ফার্স্টুদার হাত ছিলো। লালমুখো সাহেবদের সামনে ইন্টারভ্যু দিতে ভয় করেছিলো খুব। কিন্তু এম ডি অ্যান্ডারসন, পাইপ মুখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হাউ ড্যু উ নো টুবীয়া ব্যানার্জি ?

আমি বলেছিলাম, উই ওয়্যার নেবারস্। হি ন্যু মী ভেরি ওয়েল।

দ্যাটস এনাফ ইয়াং ম্যান। হিজ ওয়ার্ডস আর গোল্ড ফর আস। হি স্পোক টু আস বাউট উ্য ফ্রম ডেল্লি।

এই কথাটা আমি স্ত্রীকেও কোনোদিন বলিনি। ভাবছিলাম, কত সহজে আমরা যে কথা কখনও ভোলবার নয়, তা ভুলে যাই ! পাপস্খালন করার জন্যেই সত্যকাম নেগিকে আর ওকেও আজ সবিস্তারে সে কথা বললাম।

ও শুনে একটু অবাক হলো। এতো কথা বলেছি এতোদিন ফার্স্টুমামা সম্বন্ধে অথচ এই কথাটাই বলিনি জেনে।

সত্যকাম বললো, আমার একটু যেতে হবে মেজর-জেনারেলের কাছে। ফিরতে দেরি হবে স্যার। আপনারা খেয়ে নেবেন। কাল সকালেও আমি ভোরে বেরিয়ে যাবো। আমাকে

ড্রপ্ করে গাড়ি ফিরে আসবে পৌনে নটার মধ্যে। আপনারা যাবেন ব্যানার্জি সাহেবের কাছে ব্রেকফার্স্ট সেরে। যাবেনই যখন

ও চলে গেলে, রুবী বললো, সত্যকামের ইচ্ছা নয় কেন বলো তো যে, আমরা ওখানেই যাই ?

কী জানি। হয়তো ফাস্টুমামা ওকে পছন্দ করেন না। এখনকার মালিকদেরও যদি কোনো কথা বলেন ফাস্টুমামা, তবে তাঁরাও তা বেদবাক্য বলে মানবে। কে যে এই সংসারে কিসের জন্যে কী করে তা বোঝা ভারী মুসকিল।

তা ঠিক।

রুবী বললো।

তবে সত্যকাম মনে যাই করুক, ফাস্টুমামার কাছে আমি যাবোই। সাধারণ মানুষ তো নন তিনি। তাঁর একটা নিজস্ব দর্শন ছিলো জীবন সম্বন্ধে। নিজেই যে ফার্স্ট হতেন তাই নয়, আমাদের মতো পেছনের সারিতে ভিড় করা সাধারণ মানুষদের সামনেও ফাস্টুমামা এক অন্য আদর্শ জ্বালিয়ে রাখতেন। জ্বলজ্বল করতো সেই আলো আমাদের সামনে। আমরা হয়তো কেউই ওঁর মতো হতে পারিনি কিন্তু যতটুকু হয়েছি তার ছিটেফোঁটাও হয়তো হতে পারতাম না সামনে অমন একটা দৃষ্টান্ত না থাকলে।

॥ ৩ ॥

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পরই আমরা বেরুলাম। সত্যকাম ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময়েই গাড়ি পাঠিয়েছিলেন।

আমি বললাম খারাপ লাগছে খুব খালি হাতে যাচ্ছি ফাস্টুমামার কাছে। উনি আমাদের বিয়ের সময় বোম্বে থেকে একশ টাকার একটি ড্রাফট পাঠিয়েছিলেন তোমার নামে। তোমার হয়তো মনে নেই। তখনকার একশ টাকার দাম আজকে পাঁচ হাজার টাকা। সে কথা ছাড়াও আমার চাকরিও তো ওরই জন্যে। অন্য ঋণেরও তো কোনো সীমা নেই।

কী নিয়ে যাবে ? কলকাতা হলে দিশি জিনিস কিছু নিয়ে যাওয়া যেতো।

ও বললো।

দিশি জিনিস মানে ?

ইলিশ মাছ হারাণ মাঝির দোকানের রসগোল্লা ভীম নাগের সন্দেশ শান্তিপুরী ধুতি। এখানে কী নেবে ?

তা ঠিক।

ও বলল, শুধু শ্রদ্ধাভক্তি নিয়েই চলো। আমার কিন্তু ভয় করছে। তোমার কাছে ভদ্রলোক সম্বন্ধে এতোই শুনেছি এমন একটা ইমেজ গড়ে উঠেছে মনের মধ্যে এতো বছর ধরে তাঁর সম্বন্ধে তাঁকে দেখে যদি সেটা ভেঙে যায়।

আমি বললাম নিশ্চিন্ত থাকো। অমন একটি ব্যক্তিত্বর সামনে তুমি কখনওই আসোনি। এরকম কনভার্সেনানিস্টও কম দেখেছি। পরিচ্ছন্নতার রসবোধের জীবনবোধের কনসেপ্ট ছিলেন ফাস্টুমামা। জলজ্যান্ত ড্যালিসীস। বুঝেছো। চলো, তোমার ভয় নেই।

তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম। রানীক্ষেত থেকে আলমোড়া যাবার পথের উপরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে দোতলা বাড়িটি। বড় বড় চিড় পাইন ইউক্যালিপটাস গাছের মধ্যে দিয়ে ড্রাইভওয়ে চলে গেছে। প্রথমে উৎরাই নেমে তারপর চড়াই উঠে।

গাড়ি থেকে নামতেই দুটি অ্যালসেশিয়ান কুকুর ঘাউ-ঘাউ করে দৌড়ে এলো। বাগানে সাদা-রঙা বেতের চেয়ারে হালকা কমলা-রঙা শাড়ি পরে একজন মহিলা বসেছিলেন। ভারী সুন্দরী। তিনি উঠে এসে ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা ?

ফাস্টুমামা, মানে তূর্যমামার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। উনি আমার মামাদের বন্ধু ছিলেন, আসানসোলের "এভিলীন লজ্"-এ থাকতাম আমরা, প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে। মানে, প্রতিবেশী আর কী !

বাংলাতেই বললাম আমি।

তা হবে। মহিলা ইংরিজিতে বললেন। কিন্তু উনি তো কারো সঙ্গেই দেখা করেন না। নামেনই না দোতলা থেকে।

সে কথাতে এমনই শৈত্য ছিলো যে আমরা দুজনেই একটা ধাক্কা খেলাম।

তবু সামলে নিয়ে আমি বললাম, উনি কেন নামবেন ? আমরাই যাবো ওঁর কাছে।

জোর করেই যাবেন ? এই সময়ে উনি বাথরুমে থাকেন।

বৌটির কথাতে আমার খুব রাগ হয়ে গেলো ! বুড়ো হচ্ছি। ব্লাডপ্রেসার সব সময়ই বেশি থাকে। ওষুধ খাই রোজ, তবুও হঠাৎ মেজাজ গরম হয়ে যায়।

রাগের গলায় বললাম, তূর্যদার ওপরে আমার জোর কিছুটা খাটে। তাঁর উপরে যখন খাটে, তখন আপনার উপরেও তা খাটবে আশা করি। আপনার পরিচয়টা ?

আমি ওঁর পুত্রবধূ।

একটু চুপ করে থেকে বৌটি বলল, আপনারা যখন শুনবেনই না তখন যান, বাট ট্যু আর অন ইওর ওওন। বীওয়্যার অফ দ্য ডগস্। ওরা খারাপ মানুষদের কামড়ে দেয় কিন্তু। আমি আর থাকতে পারছি না। আজকে "ওয়েস্ট-ভিউ" হোটেলে মেয়েদের একটি কফি-মীট আছে। নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌসানি থেকে অনেকেই আসবেন। আমার এখুনি যেতে হবে। আমি সেক্রেটারী, এখানের লেডিস ক্লাব-এর। ট্যু হ্যাভ টু একস্কিউজ মী। একটা ফোন করে এলেই···

ঠিক আছে। আপনি নিশ্চয়ই যাবেন। ফোন করে নিশ্চয়ই আসা উচিত ছিলো।

ড্রাইভার পেছনের গারাজ থেকে সাদা কন্টেসা গাড়ি বের করে নিয়ে এলো। বৌটি তাতে চড়ে বললো, বাঈ-ই।

আমি আঙুল নাড়ালাম।

ভারী স্মার্ট মেয়েটি। আর শাড়িটার কোনো জবাবই নেই।

রুবী বললো।

মহিলা বলেই বোধহয় পারলো। মেয়েদের লিবারেশানের পথে যদি সত্যিকারের কোনো বাধা থাকে, তা হলো শাড়ি আর গয়না। ওর বোঝার কথা নয় যে, ফাস্টুমামার পুত্রবধূর শাড়ির চেয়ে তার মন এবং ব্যবহারটা আমার কাছে অনেকই বেশি ইমপর্ট্যান্ট ছিলো।

কী শাড়ি ওটা ?

শাড়ি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ আমি শুধোলাম, বোকার মতো।

বালুচরী ! তাও জানো না। তুমি না !

মনে মনে বললাম, কীই-বা জানি !

চলো !

রুবী আর আমি উপরে উঠতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে। কুকুর দুটো বড় বিরক্ত করছিলো। ভয়ও করছিলো। যদি কামড়ে দেয়।

দোতলায় ল্যান্ডিংয়ে একজন গাড়োয়ালি মেয়ে, মাঝবয়সী ; এসে কুকুরগুলোকে বকা-ঝকা করে, অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, কিস্‌কো মাংগতা আপলোগ ?

বললাম, বড়া ব্যানার্জি সাবকো।

তো, চলা যাইয়ে অন্দর। খাড়া কিঁউ হিয়েপর ?

বলেই, মেয়েটি নিজের কাজে চলে গেলো।

ল্যান্ডিং থেকে ঘরে ঢুকলাম। কিন্তু কাউকেই দেখতে না পেয়ে খুব জোরে ডাকলাম, ফাস্টুমামা-আ-আ ! তুমি কোথায় ? আমি বুঁচু। "এভিলীন লজ"-এর বুঁচু।

ঘরটার মধ্যেটা প্রায়ান্ধকার। যদিও বাইরে অনেক আলো। জানালা প্রায় সবই বন্ধ। ঘরের মধ্যে একটি বিরাট খাট। খাটের উপরে একটা লাল-রঙা মশারী টাঙানো। রঙটা আগে বোধহয় লাল ছিলো। এখন কালচে হয়ে গেছে রাণীক্ষেত-এর মতো পল্যুশানহীন জায়গাতেও। কত মাস কাচা হয়নি কে জানে। মনে হলো, সেই মশারীর ভেতরে কেউ শুয়ে আছেন। ঘরের বাইরের বাড়িটার, লনের, বাগানের এবং ড্রাইভের চমৎকারিত্ব অথবা রানীক্ষেত-এর আবহাওয়ার পরিচ্ছন্ন সুস্থতার কোনো রেশই এই ঘরটির মধ্যে পৌঁছচ্ছিলো না। ভীষণ ধাক্কা লাগলো বুকে। আরো কাছে এগিয়ে যেতেই ফাস্টুমামাকে দেখতে পেলাম ? না, তাঁর প্রেতকে ?

নোংরা মশারীর মধ্যে, নোংরা একরাশ ছোটবড় বালিশের উপরে মাথা রেখে নোংরা একটি ছেঁড়া-খোঁড়া লেপ মুড়ি দিয়ে কংকালসার এক বৃদ্ধ শুয়ে আছেন। হতাশার আর শ্রী-হীনতার প্রতিমূর্তি যেন। তাঁর মুখটা হাঁ হয়ে আছে। বেঁচে আছেন কি চলে গেছেন দেখে তা-ও বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ আমার বড় ভয় হলো। ফাস্টুমামাকে দেখতে এসে ফাঁকা-বাড়িতে খুনের দায়ে-টায়ে পড়বো না তো !

ঠিক সেই সময়েই রুবী বললো ফিসফিস করে, আমার কানের কাছে মুখ এনে ; দেখেছো ! পায়ে জুতো। জুতো পরেই খাটে শুয়ে আছেন ? যে-মানুষটার এতো টাকা-পয়সা, আত্মীয়-স্বজন, লোকজন, যাঁর কিছুমাত্রই অভাব নেই, তাঁরও এই অবস্থা ! ঘরের এককোণায় টিভিটা চলছে। কোনো ভ্রূক্ষেপও নেই।

বড় ভয়ে ভয়ে আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে মশারীর কোণা তুলে ডাকলাম, ফাস্টুমামা—আ-আ !

বৃদ্ধ চোখ খুললেন এবারে। চোখ খুলেই বিড়বিড় করে বললেন, ইত্‌না রাতমে কাহে শোর মাচাতা ? মুঝে কুছ না চাহিয়ে। তংক্‌ মত্‌ করো।

বুঝলাম, সময়ও মরে গেছে তাঁর কাছে। লোহা হয়ে গেছে ঘড়ি।

আমি বললাম, ফাস্টুমামা, আমি বুঁচু। আর এই আমার স্ত্রী, রুবী।

বুঁচু ? সেটা কে ?

শুয়ে শুয়েই, মুখটা অন্যদিকেই ফিরিয়ে রেখে বললেন, ফাস্টুমামা।

আমি আসানসোলের "এভিলীন লজ"-এর বুঁচু, ফাস্টুমামা।

উনি বললেন, দাঁড়া। দাঁড়া। হড়্‌বর্‌ করিস না ছোকরা। বুঁচু কী করতে আসবে এখানে ? এতো বছর পরে ? ইয়ার্কি মারার জায়গা পাস না। তুই কে রে ? ইম্‌পোস্টর ?

ফাস্টুমামা !

আমি হতাশ হয়ে জোরে চেঁচিয়ে বললাম !

"ফাস্টুমামা"—এই নামটি শুনে উঠে বসতে গেলেন তূর্য ব্যানার্জি। কিন্তু পারলেন না।

ঘুঁচু ! বলেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে, থেমে গেলেন। পরাজিত সম্রাট বালিশে মাথা নোওয়ালেন।

তারপর বললেন, ঐ তেপায়াতে আমার দাঁতটা আছে। দে তো ঘুঁচু। কাপের মধ্যে জলে ডোবানো আছে। দাঁত ছাড়া, কথা···

আমার খুব আনন্দ হলো। আমার ফাস্টুমামা চিনেছে আমাকে।

দু'পাটি বাঁধানো দাঁত যে কী বীভৎস দেখতে হতে পারে ! টগবগে যৌবনে, কোনো যুদ্ধে না-হারার পণে গর্বিত, সাফল্যে ঋদ্ধ যে-মানুষকে একদিন দেখেছি, পুজো করেছি ; তাকে এমনভাবে যে দেখতে হবে জানিনি কখনও। জানলে, আসতামই না।

পরমা, মশারীর মধ্যে ঢুকে, খাটে উঠে ; ফাস্টুমামাকে জড়িয়ে ধরে উঠে বসিয়ে তাঁর পেছনে ক'টি বালিশ গুঁজে দিলো।

বিছানা-বালিশের যা চেহারা ! ফুটপাথের ভিখিরিও এর চেয়ে পরিষ্কার থাকে। অমন পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে মানুষটা ! আমাব কান্না পাচ্ছিলো। কাকতাড়ুয়ার মতো নড়বড় করে উঠে বসলো ফাস্টুমামা—আনস্টেবল্ ইকুইলিব্রিয়ামের সংজ্ঞা হয়ে।

তোমার নাম কি ?

পবমার দিকে চেয়ে ফাস্টুমামা শুধোলো।

ওর নাম রুবী, ফাস্টুমামা। ভালো নাম পবমা। ছোটমাসীর নামে নাম। "এভিলীন লজ"-এর পরমাকে মনে আছে ?

আমি বললাম।

ফাস্টুমামা শিশুর মতো হাসলো। নিঃশব্দে। স্বর্গীয় এক ভাব ফুটে উঠলো মুখে। ভাবলো একটু। তাবপবে বললো হুঁ। একটু-একটু।

বুঝলাম যে, প্রথম যৌবনেব প্রথম-প্রেম ছোটমাসীর কথা এখনও তাহলে মনে আছে। মানুষ যতই অপারগ হোক না কেন, প্রেম উজ্জ্বলই থাকে।

আশ্চর্য হলাম দেখে যে, মামাদের কথা, দিদিমার কথা, অন্য কারো কথাই জিজ্ঞেস কবলো না ফাস্টুমামা। "এভিলীন লজ"-এব কথা উল্লেখ করায় তাঁর স্মৃতির পাখিরা দ্রুতপক্ষে ফিরেই আসবে ভেবেছিলাম। কিন্তু কিছুই হলো না। পরিণত বয়সের নজরুল ইসলাম-এর চোখের দৃষ্টিব মতো ঘোলা দৃষ্টিতে চেয়ে বইলো ফাস্টুমামা।

কী হলো ফাস্টুমামা ! তুমি তো হেরে যাবার মানুষ নও ! এমন পরাজিতের মতো দেখাচ্ছে কেন তোমাকে ? অ্যাঁ ?

ওঁর মনে জোর জোগাবার জন্যে বললাম।

ঐ।

বলেই, দু'হাতের পাতা "হাত ঘোরালে নাড়ু পাবে, নইলে নাড়ু পাবে না" বললে উলঙ্গ শিশুরা যেমন করে হাত ঘোরায়, তেমন করে হাত ঘোরালেন। বৃদ্ধরাও যে শিশু, একথাটা পড়েছি এর আগে কিন্তু তা যে এমন সত্যি, তা কখনওই বিশ্বাস করিনি। আর ক' বছর পরে আমিও হয়তো শিশু হয়ে যাবো। কিন্তু বড় আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম তূর্য ব্যানার্জির এমন দশা দেখে।

পায়ে জুতো কেন ? ফাস্টুমামা ? রাবারের জুতোই।

ঐ ! কে পরায় বার বার ? বাথরুমে গেছিলাম। লাঠিই সম্বল এখন। কিন্তু লাঠিও লেট-ডাউন করেছে। নিজের দুটি পায়ের মতো বড় বন্ধু আর নেই। অথচ এই পা-দুটিকেই কত কষ্ট দিয়েছি একদিন। তারা থেকেও নেই।

কেন ? ছেলে, বৌমা, চাকর, আয়া এতোজন তো আছে। জুতো পরাবার লোক নেই ?

হ্যাঃ। কেউ কারো নয় রে বুঁচু। সবাই ছেড়ে যায়, সব ছেড়ে যায় ; যশ, মান, গায়ের মাংস, হাত-পায়ের মাংস, হাড় ছেড়ে যায় ; মুখের মাংসও। আর কোনো জোরই নেই অবশিষ্ট।

টাকার জোর তো যায়নি তোমার এখনও ?

হ্যাঃ। বলে হাসলেন। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন মনে হলো।

বারবার এই "হ্যাঃ" হাসিটা শুনে এই মানুষটি যে আমাদের ফাস্টুমামাই সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই রইলো না।

ফাস্টুমামা বললেন, গর্তের মধ্যে পড়ে গেলে হাতিকে গুবরে পোকাও লাথি মেরে যায় বুঁচু। এ সংসারটা বড়ই খারাপ জায়গা, বড় বিবেকহীন, অকৃতজ্ঞ ; চক্ষুলজ্জাহীন। অনেকেই পাপ করলে কাউকে এখানে এতো দীর্ঘদিন কাটাতে হয়।

তুমি এমন করে বোলো না। তোমার নাম না ফাস্টু ! ফাস্টুমামা ?

হ্যাঃ। একদিন তোরাই এই নাম দিয়েছিলি। এখন লাস্টু। "ম্যান প্রোপোজেস, গড ডিসপোজেস্।" ইন দ্যা লাস্ট ল্যাপ, আই অ্যাম রাউটেড বাই ওল্ড এজ। আই অ্যাম টোটালি ডিভাস্টেটেড। সারাজীবন অনেক গোলই বাঁচিয়েছি রে বুঁচু, পাঞ্চ করে, ডাইভ করে, ফিস্ট করে, হুক্ করে, কিন্তু এই শেষের গোলটাকে আটকাতে পারলাম না রে !

বার্ধক্য যে সকলের জীবনেই আসে ; আসবে ফাস্টুদা।

না রে ! সকলের জীবনকে তো এই জরা অভিশপ্ত করে না। তার অনেক আগেই নিরানব্বুই ভাগ মানুষে, ভাগ্যবান মানুষে এই বিচ্ছিরি জায়গা ছেড়ে চলে যায়।

চুপ করে মাথা নীচু করে রইলাম।

রুবী বললো, ফাস্টুমামাকে, পায়ে হাতে দিয়ে প্রণাম করে ; আশীর্বাদ করুন ফাস্টুমামা আমাকে। আমি পরমা। ওকেও আশীর্বাদ করুন। আপনার প্রিয় বুঁচুকে।

ঘোলাটে চোখে পরমার দিকে চেয়ে ফাস্টুমামা বললেন, পরমা ! হ্যাঁ। বুঁচুকে আশীর্বাদ করি, শুধু বুঁচুকেই কেন, পৃথিবীর সব পুরুষমানুষকেই আশীর্বাদ করি, যেন তাদের জীবদ্দশাতে স্ত্রী-বিয়োগ না হয়। বুঝলে পরমা ; তোমরা মেয়েরা, নাতি-নাতনী, রান্নাঘর, তরকারি-কাটা এসব নিয়ে তা-ও সময় কাটাতে পারো। আমরা পুরুষরা অনেকই বেশি অসহায়। চোখ নেই যে পড়বো। পা নেই যে হাঁটবো। ঝগড়া করবার লোক নেই যে, ঝগড়া করবো। সারাজীবনের সব জিত আমার ধুলো হলো।

চোখ যদি নেই তো টিভি দ্যাখো কী করে ?

হ্যাঃ। দেখি না রে। একা থাকতে বড় ভয় করে। তাই যতক্ষণ মানুষের গলার আওয়াজ পাই, শুনি।

ফাস্টুমামা, তোমার কাছে আমি হেরে যাওয়ার কথা শুনতে আসিনি।

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম।

এ বড় গভীর খাদ রে ! দু'পাশেই উঁচু পাহাড়। এই জরা।

পরমা জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলো।

আমি ভাবছিলাম, কেন যে ছাই এসেছিলাম দেখতে।

পরমা বললো, আপনি চলুন। আমাদের সঙ্গে থাকবেন নৈনিতালে। আমরা দুজনে তো একাই থাকি নৈনিতালে। বড় বাড়ি। জায়গার অভাব হবে না। অযত্নও হবে না কোনো।

হ্যাঃ।

হাসলেন ফাস্টুদা।

হাত দুটি আবারও নাড়ু ঘোরানোর মতো নেড়ে বললেন, তা হয় না, পরমা। কার হাতে যে শেষের ভাত খেতে হবে আমাদের প্রত্যেকের, তাও লেখা থাকে। সে-ভাত সম্মানের, না অসম্মানের ; তাও। আমার মতো অ্যাগ্‌নস্টিক, নাস্তিক মানুষকেও শেষে এই ভবিতব্যে বিশ্বাস করতে হলো। তোমাদেরও হবে। ম্যান প্রোপোজেস ; গড ডিসপোজেস্। ছেলে-বৌ ওরা আমাকে নিয়ে যেতে দেবে না তোমাদের বাড়ি।

কেন ?

ওদের ইগোতে লাগবে !

তাই ?

মাথা নাড়লেন, ফাস্টুমামা। বিড়বিড় করে বললেন, আমার আপনজনদের হাত থেকেও আমার মুক্তি নেই। এ এক জেলখানা ! একটা রিভলবার এনে দিতে পারিস রে বুঁচু ?

অন্ধকার ঘরটা আর জরাগ্রস্ত বৃদ্ধর হাত ছাড়িয়ে কোনোক্রমে বাইরে বেরিয়ে এসে আমরা দুজনেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পরমা আর আমি।

সকালবেলার আলো, চিড়-পাইনের ডালে-ডালে ; জীবনের সুগন্ধর সঙ্গে ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার আর ওয়াইল্ড-চেস্টনাট্ গাছের পাতার গন্ধ মিশে ছিলো। পাতায় পাতায় হাওয়ার ঝরঝরানি, উপত্যকা থেকে কাউফল-পাক্কৌ পাখির ডাক ; মনের মধ্যে, প্রাণ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে নতুন করে এক প্রত্যয়ের জন্ম দিচ্ছিলো। আমরা এতোক্ষণ যেন মৃত্যু-দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো নিরুপায় আসামির ঘরের মধ্যেই বসেছিলাম। যাঁর মৃত্যু, ইচ্ছে করেই বিলম্বিত করা হচ্ছে। ভাবছিলাম, জীবনের যদি এই শেষ পরিণতি ; তবে বাঁচা কেন ! মিছিমিছি !

সিঁড়ি দিয়ে আমরা নীচে নেমে এসে যখন গাড়িতে উঠলাম তখন মনে হলো ভূতের বাড়িতে গেছিলাম। ভাবছিলাম, একটু জল চাইলে কে দেবে ফাস্টুমামাকে ? যদি বাথরুমে যেতে চান, কে নিয়ে যাবে ?

গাড়ি ছেড়ে দিলো। রুবী ভিজে চোখে বললো, তূর্য ব্যানার্জির হারটা কার হাতে ? জরার ? না,⋯ ?

আমি মাথা নাড়লাম।

তবে ?

ওর গলায় কান্না ছিলো।

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে উঠতে-থাকা সরীসৃপের মতো ঠাণ্ডা ঘিনঘিনে ভয়টাকেই ভয় পাওয়াবার জন্যে খুব জোরে ধমক্ দিয়ে উঠলাম আমি। রুবীকে বললাম, চুপ করো ! চুপ করো !

উৎসার

সামাজিক অথবা সাংসারিক হিসেবে নন্দা কখনও আমার কেউই ছিল না।

তখন আমি পড়াশুনা শেষ করে সবে চাকরিতে ঢুকেছি। হাতে অবকাশ ছিল, মনে নানারকম রঙীন কল্পনা, আশা। এবং লেখক হওয়ার স্বপ্ন।

সামনের বাড়ির নন্দা তখন সবে কলেজে যাচ্ছে।

ওরা প্রথম যেদিন আমাদের পাড়ায় এলো বাক্স, প্যাঁটরা, লটবহর সব লরীতে চাপিয়ে, পোর্ট কমিশনার্সের অফিসার ব্রজেনবাবুর পরিবারের সকলের মধ্যে সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশী করে ভালো লাগল আমার ওকে।

আমাকে সকলেই নাক-উঁচু বলত। যাকে তাকে আমার ভালো লাগতো না। কিন্তু ওর গলার স্বর, ওর ব্যক্তিত্ব, ওর বুদ্ধিমতী স্বভাব সব মিলিয়ে-মিশিয়ে ওকে হঠাৎই ভীষণ ভাল লেগে গেলো। ও আমার জীবনে দারুণ দুঃখ ও সুখে ভরা ভালবাসার অনুভূতি প্রথম বয়ে আনলো।

আমাদের ডোভার রোডের বাড়ির একতলায় একটা বসবার ঘর ছিলো। কিন্তু সেটা ছাত্রাবস্থায় আমার পড়ার ঘর এবং তারপরে একা বসে ভাবার, সাহিত্যচর্চার, গান-বাজনার এবং কচিৎ আড্ডা-দেওয়ার জন্যে আমারই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানাতে বাবা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবার, মাযের এবং পরিবারের সকলের অতিথিরা দোতলার বসবার ঘরে গিয়েই বসতেন।

সেই একতলার ঘরের কাঁচের জানলার দিকে পিছন ফিরে বসতাম আমি, টেবিলের সামনে, সখের লেখাপড়া করতে। জানলার কাঁচে গলি দিয়ে যাওয়া-আসা করা প্রত্যেকটি মানুষের প্রতিফলন পড়ত। নন্দা যখনই যেতো-আসতো তার প্রতিফলিত ছায়া আমার জানালার কাঁচ থেকে উঠে এসে আমার চোখের আয়নার মধ্যে দিয়ে সটান আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে পৌঁছতো।

সব মানুষের জীবনেই একটা বোকা-বোকা রোমান্টিক প্রেমের বয়স থাকে। আমার সঙ্গে তাদের তফাৎ এই-ই যে, আমার বয়সটা বেড়ে গেলেও এই অয়ন রায় নামক ব্যক্তিটি সেই গো-সুলভ মানসিকতাটা কখনোই কাটিয়ে উঠতে পারলো না। নন্দাদের বাড়ি যখনই যেতাম, নন্দা দৌড়ে আসতো, বসতে বলতো, চা করে আনতো নিজের হাতে। যতক্ষণ থাকতাম, আমার সামনে বসে থাকতো, দ্বিধাহীন ঝকঝকে সরল ব্যক্তিত্ব ঝরিয়ে কথা বলতো। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ তুলে চাইতো আমার চোখে। সাহিত্য-আলোচনা করতো। নন্দার মধ্যে সবচেয়ে যা ভাল লাগতো তা এই-ই যে, ঐ সময়ের ঐ বয়সী মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্যে

যে ন্যাকামি স্বাভাবিক ছিলো, ওর মধ্যে সে সব একেবারেই অনুপস্থিত দেখতাম।

আমাদের পরিবার উত্তরবঙ্গের গোঁড়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পরিবার। ঠাকুর্দা, বাবা, কাকারা সকলেই প্রবল-প্রতাপান্বিত, গর্বিত এবং কিঞ্চিৎ দাম্ভিক তীক্ষ্ননাসা কেউ-কেটা ছিলেন। সেই পটভূমিতে অ-বারেন্দ্রর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপণ ও ভ্রূণহত্যা একই রকম অপরাধ বলে গণ্য হতো।

আমি ঐ বয়সে ভীরু ছিলাম ; এখনও অবশ্য তাই। সামাজিক, পারিবারিক কোনোরকম নিয়ম ভাঙার মত মনের জোর বা ব্যক্তিত্ব আমার ছিলো না। এখনও নেই। স্বীকার করি।

দেখতে দেখতে পড়াশুনো শেষ করলাম, চাকরিতে ঢুকলাম। চাকরিতে উন্নতিও হলো, খুব তাড়াতাড়িই আমার নিজের ইচ্ছা বা চেষ্টা ব্যতিরেকেই।

চাকরির চকচকে মইয়ে আমার উপরে যাঁরা জাঁকিয়ে বসেছিলেন, তাঁদের দুজন পটাপট দৈব-দুর্বিপাকে পটল তুললেন। একজন চুরির অপরাধে জেলে গেলেন। অন্যজন সেরিব্রাল অ্যাটাকে শয্যাশায়ী হলেন। অতি কম সময়ে আমি ফাঁকা মই বেয়ে বেশ উঁচুতে চড়ে পড়লাম। তারপর সব বাঙালির ছেলের যা তাৎক্ষণিক কর্তব্য তাই-ই করতে হলো আমাকেও। অর্থাৎ বিয়ে।

আমরা পাবনার লোক। রাজসাহীব এক নামজাদা উচ্চবিত্ত বারেন্দ্র পরিবারের ডানা-কাটা পরী মেয়ে আমার জন্য গুরুজনেরা অনেক সিঙ্গারা, রসগোল্লা খেয়ে নির্বাচন করলেন। মেয়ের নাম ছিল সিন্ধু-ভৈরবী। ভারতীয় রাগেব নামে নাম। আমার ঠাকুমা, বিয়ের পরই তাঁর নিজেব নামের সঙ্গে মিলিয়ে সিন্ধুর নাম রাখলেন হেম-নলিনী। ঠাকুমার নাম ছিল প্রফুল্ল-নলিনী।

সিন্ধু-ভৈরবী বা প্রফুল্ল-নলিনী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, স্বাধিকারে, স্বীয় সৌন্দর্যে, ক্ষমতাতে এবং শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। সে বিয়ের একমাস পরেই ফতোয়া জাবি করলো যে, নন্দাদের বাড়ি অত ঘনঘন আমার যাওয়া চলবে না। নন্দা কিন্তু ওকে খুবই পছন্দ করতো। সবসময় দৌড়ে আসত বৌদি-বৌদি কবে। সিনেমায় যেতে চাইতো ওকে নিয়ে। কিন্তু মেয়েদের নাক সামুদ্রিক পাখির মত। ভবিষ্যতের ঝড়ের গন্ধ সিন্ধুব নাকে পৌঁছেছিলো।

দেখতে দেখতে বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই সে নন্দার কারণে-অকারণে এবাড়ি আসাই বন্ধ করে দিলো। তখন নন্দা থার্ড ইয়ারে পড়ে। কিন্তু বাড়ি আসা বন্ধ হলেও নন্দা প্রায়ই আমার অফিসে গিয়ে হাজির হতো ।ভীষণ পাগলামি করতো। বলতো:, আত্মহত্যা করবে। ওর জীবনের আমিই প্রথম প্রেমিক ছিলাম। আমাকে হারানোর কথা ও কিছুতেই মেনে নিতে পারত না। ওর জন্যে আর একটু অপেক্ষা করতে পারিনি বলে আমাকে অত্যন্ত হৃদয়-মন্থন-করা অভিমানের কথা বলতো এবং শুনতে শুনতে অনেকই সময় আমার হৃদয় দ্রব হয়ে আসতো।

ওকে অনেক বোঝাতাম ; কানের লতিতে, গলায়, কপালে চুক্ করে আদর করে দিতাম ; কিন্তু ও অবুঝের মতো করত। মধ্যবিত্ত মানসিকতার কারণে ঠোঁটে চুমু খেতে পারতাম না। সেটা গর্হিত অপরাধের মধ্যে গণ্য করা হতো সেই সময়কার মরাল-কোড-এ। দেশ ভাগ হবার আগে আমরা উচ্চবিত্ত বলেই গণ্য হতাম, দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে অবশ্যই মধ্যবিত্ত হয়ে পড়েছিলাম, পরিবারের সব পুরুষ (এক ঠাকুর্দা ছাড়া) রোজগেরে হওয়া সত্ত্বেও।

ছেলেবেলা থেকেই জ্যামিতিক জীবনে এক কড়া রেজিমেন্টাশানের মধ্যে আমার ডাকসাঁইটে ঠাকুর্দা আমাদের মানুষ করেছিলেন।চলন-বিলে নৌকোর উপর গড়গড়া

সাজিয়ে, চার্চিল, জেমস পার্ডি, ডাব্লু· ডাব্লু· গ্রীনার, বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলের, টুয়েন্টি বোরের টলি ইত্যাদি বাঘা-বাঘা বন্দুক সমভিব্যাহারে তাকিয়া-ঠেসান দিয়ে বসে তিনি উড়ো-হাঁস মারতেন। কথা, মুখে বেশী বলতেন না, চোখে বলতেন। তবে মাঝে মাঝে কণ্ঠনালীর ঘড়ড়-ঘড় শব্দেও তেজী, বড় কুকুরেরা যেমন ভাষায় কথা বলে বলতেন। গলার জুয়ারি বড়েগোলাম আলি সাহেবের চেয়েও অনেক জবরদস্ত ছিলো।

পুজোর সময়ে আমাদের বাড়ি রেডিমেড জামা-প্যান্ট আসতো। বাড়ির ছেলেরা, ভাইপো, ভাগ্নে এবং চাকর ঠাকুর জমাদাব সকলেই সেই প্যান্ট-জামা এক এক বার করে গলিয়ে নিয়ে যার গায়ে যেটা হতো সেটাই নিয়ে নিতো। এ ব্যাপাবে আদর্শ সমাজতন্ত্র চালু ছিলো। ব্যক্তিগত রুচি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যাপারটা আমাব ঠাকুর্দা এবং ঠাকুর্দাচালিত একনায়কতন্ত্রে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ বলেই গণ্য হতো। সে যুগের চীন ও অথবা সোভিয়েট বাশিয়াবও অনেক কিছু শেখার ছিলো আমার ঠাকুর্দার কাছ থেকে।

এই সব কাবণে সমস্ত-কিছু রেডিমেড ও জোব করে চাপানো ব্যাপাবেব উপর আমার ছোটবেলা থেকেই এক প্রবল বিদ্বেষ ও ক্রোধ জমে উঠেছিলো। সেই বিদ্বেষের বলি হল বেচারী সিন্ধু-ভৈরবী, ওরফে হেম-নলিনী। সে নিজেও মহাবলী ছিলো। তাই সংঘর্ষ অনিবার্য ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপাব হয়ে দাঁড়ালো। ও চাইত আমি ওব প্রজা হই। কখনও চাইতো, যখন ভালো মুড-এ থাকতো যে, আমি ওর মন্ত্রী হই। কিন্তু যে নিজে রাজা তার কখনও মন্ত্রী হওয়া সাজে? বা মন্ত্রী হওয়ার জন্যে নির্বাচনে দাঁড়ানো সাজে! রাজা-প্রজার সঙ্গে প্রজাপতিব সম্পর্কটাও খুব নিকট নয়। সুতরাং···।

একদিন ঠাকুর্দা গত হলেন। ঠাকুমা, বাবা, তাবপব মা, সকলেই দেখতে দেখতে চলে গেলেন শোভাযাত্রা করে। কিসের অত তাড়া ছিলো জানি না। ঊর্দ্ধ গগনের কোন জ্যোতিবাবু তাঁদের একই সঙ্গে ব্রিগেড প্যাবেড গ্রাউন্ডে পৌঁছতে বলেছিলেন তাও জানা নেই। তবে ঠাকুর্দা কম্যুনিস্টদের দেখতে পারতেন না। বলতেন, বিশ্বাসঘাতক। "ওগুলান মনুষ্য পদবাচ্যই না। থুঃ!"

অতবড় বাড়িতে বয়ে গেলাম আমরা দুই ভাই, আমি আব দাদা। ঠিক করে বললে বলতে হয়, বয়ে গেলাম আমি আব সিন্ধু।

দেখা যায়, একনায়কত্ব বংশপবম্পবায় হস্তান্তরিত হয কিন্তু আমাদেব সংসাবে ব্যতিক্রম ঘটলো। এ সংসাবে এখন সিন্ধুই একনায়ক হলো। এক ছেলে নিয়ে সিন্ধু নিজেতেই-নিজের সম্পূর্ণতায় বিশ্বাসী হয়ে প্রবল দাপটে সংসাব কবাতে লাগলো। তাব সংসারে আমি, এই অধম অযন বায়, সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয় ও বাড়তি ব্যাপাব হয়ে গেলাম।

সিন্ধু সংসার চেয়েছিলো। স্বামী চায়নি।

সিন্ধু আমাব ঠাকুর্দার মতোই অত্যন্ত সক্ষম ও সার্থক নায়ক ছিল। তার সংসাবে কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম কেউ কখনও দেখেনি। পান থেকে চুন খসবাব জোটি ছিলো না। আমার কিঞ্চিৎ অযত্ন হবারও উপায় ছিলো না কোনো। সময়মত খাবার, অফিসের জামা-কাপড় সব হাতের কাছেই পেতাম। অসুখ হলে ডাক্তাব আসত যথাসময়ে। বাড়িঘরে কোথাও এক কণা ধুলো কেউ দেখতে পেত না। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতাব বাইরে,পরিচ্ছন্নতার বাইরে, এই ঝাঁপি-মাপা কর্তব্যবোধের বাইরেও কিছু একটা থাকে প্রত্যেক মানুষের জীবনে, যা সে বড় কাঙালেব মতই প্রার্থনা করে, যা হয়ত ধুলোর মধ্যে বেনিয়মেব মধ্যেই অবহেলায় পড়ে থাকে। সেই সামান্যতার আহ্লাদ অসামান্য সিন্ধুর চোখে কখনও পডলো না। খিদের সময়ে খাবার ও অফিস-যাওয়ার সময়ে জামাকাপড় এবং ঝকঝকে তকতকে ঘর-দোর ছাড়াও

আমার যে ওর কাছে নরম, স্নিগ্ধ, অতি সাধারণ অথচ অসাধারণ কিছু চাইবার ছিলো তা সিন্ধু কখনও বুঝলো না। ও দাবি করলো যে, এই-ই ত যথেষ্ট। এই নিয়েই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যা পাচ্ছি, যতটুকু পাই, তা আমার পুণ্যবান স্বর্গত ঠ্যাঙ্গারে ঠাকুর্দারই আশীর্বাদে। নিজেকে কখনও কখনও অযত্ন ও অনিয়মানুবর্তিতার শিকার করে তোলার অধিকারও যে সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাংবিধানিক অধিকার বলেই গণ্য এ কথা সিন্ধুভৈরবী মানতে তৈরি ছিলো না।

নন্দার বিয়ে হয়ে গেছিলো দিল্লীতে। চাকরি-করা একজন এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমার বিয়ের তিন বছর পর। সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয়েছিলো। গত ছ বছর নন্দা আমার জীবন থেকে মুছে গেছে।

সেদিন হঠাৎ ফোন করলো নন্দা অফিসে। বললো, অয়নদা, আমরা দিল্লী থেকে এসেছি গত সপ্তাহে। ফ্ল্যাট পেয়েছি কোম্পানীর। আপনার বাড়ি ফেরার পথেই পড়ে একেবারে। একদিন আসুন না বাবা। কত্তদিন আপনাকে দেখিনি। আজকেই আসুন।

সেদিনই অফিসফেরতা গেছিলাম। কিন্তু না গেলেই বোধহয় ভাল করতাম। নন্দা কী সুন্দর যে হয়েছে! বিয়ের পর মেয়েরা যে কত বদলে যায়। কী যে রহস্যময়ী, আর গভীর হয়ে যায়; তা বলার নয়। অবাক হয়ে নন্দার চোখে চেয়ে রইলাম। মনে হলো. কাউকে ভালোবেসে, না-পেয়ে থাকলে তার কাছে কখনও যেতে নেই। বড় কষ্ট পেতে হয়; বড় কষ্ট।

নন্দা বললো, কি দেখছেন অমন করে? আমাকে কি কখনও দেখেননি আগে?

এই নন্দাকে দেখিনি।

কেন?

বলেই, নন্দা মুখ নামিয়ে নিল।

দেখলাম. ও স্বভাবেও অনেক বদলে গেছে। সেই চপলতা নেই, ছটফটে ভাব নেই।

হঠাৎ বললো, আপনার চেহারা এরকম বুড়োর মত হয়ে গেছে কেন? কি হয়েছে আপনার?

কি হবে? বুড়ো হয়ে গেছি বলেই বুড়োর মত হয়েছে।

আহা! আপনি মোটেই বুড়ো নন।

তারপর বলল, কি খাবেন বলুন?

কিছু খাবো না। আমি কি তোমার কাছে খাওয়ার জন্যেই এসেছি?

বাঃ তাঃ কী হয়! আমার বাড়ি প্রথমবার এলেন। দাঁড়ান, আমি চা করে আনছি।

একটি ছোট ছেলে ছিলো, ওর কাজ করার। তাকে চায়ের জল চাপাতে বলে নন্দা আমাকে বসিয়ে রেখে চলে গেলো। একটু পরে ফিরে এল হাতে একপ্লেট সন্দেশ আর চা নিয়ে।

বলল, এক চামচ চিনি ত?

আমি হাসলাম। বললাম, এতো বছর পরেও মনে আছে?

সন্দেশের প্লেটটা তেপায়ায় নামিয়ে রেখে বললো, আছে। কিছু কিছু কথা মনে আছে। মনে থাকবে। মনে থাকার যা, তা মনে থাকেই।

তারপর বললো, সন্দেশ খান।

বললাম, প্লিজ; শুধুই চা খাব।

ও বললো, একটু নিন।

আমি এক টুকরো সন্দেশ ভেঙে নিলাম।

নন্দা হাসলো। বললো, এই-ই আপনার দোষ। খুঁটে-খাওয়া আপনার স্বভাব ; কেড়ে খেতে জানেন না। গোটা খেতে জানেন না।

তারপর চা ও প্লেট তুলে নিয়ে বললো, বলুন, আপনার খবর বলুন। বৌদি কেমন আছেন ?

ভালো।

বাচ্চা ?

ভাল।

ছেলের নাম কি রেখেছেন ?

সুনন্দ।

বাঃ। নন্দা বললো। বেশ নন্দা নন্দা গন্ধ আছে তো !

তোমার বিয়ে তো দেখতে দেখতে ছ' বছর হয়ে গেলো। নো এ্যাডিশন ট্যু দা ফ্যামিলি ? কি ব্যাপার ?

বেশ আছি। বললো, নন্দা। খুব হৈ-হৈ করছি।

তারপর যেতে যেতে একটু থেমে বললো, ও আমাকে এতো ভালোবাসে যে, মধ্যে আর কাউকে চায় না। আমিও চাই না।

ফিরে এসে বললো, আমি ফোন না করলেও এর আগে কি একবারও খোঁজ দিতে পারতেন না ? আমাকে এতো তাড়াতাড়ি ভুল যাবেন ভাবিনি। আমরা যে এসেছি, এ খবর নিশ্চয়ই কানে গেছিলো আপনার।

বললাম, ভুলে যাইনি। বিশ্বাস করো। তোমার সঙ্গে আমার এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো যে, তা এ জীবনে ভোলার নয়। কিছু কিছু সম্পর্ক সকলের জীবনেই হয়, থাকে ; যা ভোলার নয়। দেখা হোক কি নাই হোক। কাজের ফাঁকে, অবকাশের মুহূর্তে অনেক পুরোনো কথা মনের মধ্যে ভীড় করে আসে। তখন মনে হয় জীবনটা সম্পূর্ণ নিজমতনির্ভর হলে খুবই ভাল হতো। মনে হয়, সংসারে সামাজিক বাজপাখিরা না থাকলেই জীবনটা অনেক সুন্দর হত। কারো একটু সুখও তারা সহ্য করতে পারে না ; ছোঁ মেরে সেই সুখ কেড়ে নেয়।

নন্দার মুখ গম্ভীর হয়ে এলো।

ও বললো, আমি বিশ্বাস করি না।

আমি চমকে উঠলাম বললাম, কী বিশ্বাস করো না ?

নন্দা বলল, বিশ্বাস করি না যে, নিজের সুখ অন্যে কাড়তে পারে। সুখকে আগলে রাখার মত মনের জোর ও সাহস থাকা চাই। আপনি বড় ভীরু ছিলেন। নিজে জীবনে কি চান কখনও তা নিজেকে জিগগেসই করেননি। অবশ্য তা যদি জানতেনও সেই সুখকে অন্যের কাছ থেকে কেড়ে নেবার মত সাহস আপনার কখনোই হতো না। আপনার সে স্বভাব নয়। তাই-ই দুঃখ পান ও দুঃখ দেন অন্যকে।

আমি মুখ নামিয়ে রইলাম।

বললাম, হয়তো তুমি যা বলছো তাই-ই ঠিক। আমি এরকমই।

স্বাধীন অফিস থেকে ফিরবে কখন ?

সময় হয়েছে। ফিরবে এখুনি। নন্দা বলল।

তারপরই বললো কেন ? আমার স্বামীর অসাক্ষাতে আমার কাছে একা ঘরে বসে আছেন

বলে কি আপনার ভয় করছে ? ভয় কাকে ? নিজেকে না স্বাধীনকে ?

আমি থতমত খেয়ে গেলাম।

বললাম, না না, ভয় নয়। স্বাধীন যদি কিছু মনে করে, ভাবে। স্বাধীন কি তোমার আমার সম্পর্কের কথা জানে ?

জানে মানে, আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি একথা জানে। আপনি আমাকে ভালোবাসেন কিনা তা আমি নিজেই যখন কখনও তেমন করে জানিনি, ওর জানার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ও আমাকে বিয়েই করেছে। বিয়েটা একটা সম্পর্ক বই ত নয় ! ওর সঙ্গে আমার স্ত্রী-সম্পর্ক। স্ত্রীর কাছ থেকে যা যা চাইবার, পাবার তা ও সবই পায়। আমার বিরুদ্ধে ওর কোনো অনুযোগ নেই। কিন্তু এর বাইরে আমার জীবনে কি অন্য কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না ? একজন মানুষ কি একটাই সম্পর্কের খুঁটিতে সারাজীবন বাধ্য ছাগলের মত বাঁধা থাকতে পারে অয়নদা ? আপনি কি বলবেন জানি না, আমার মনে হয়, পারে না। যারা তা থাকে, তাদের কোনো বিশেষ জিনিসের ঘাটতি আছে। তারা হয় ভণ্ড, নয়ত তাদের বোধ নেই। তাদের মানুষের মন নেই।

নন্দাকে যখন কাছ থেকে জানতাম, তখন আমিই সাহিত্যযশপ্রার্থী রোমান্টিক যুবক হিসেবে অনর্গল কথা বলতাম। আমার সমস্ত অপ্রকাশিত ও অপ্রকাশিতব্য গল্পের নায়ক নায়িকার ডায়ালগ আমার মুখ দিয়ে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে নিজের কৃতিত্বের চমৎকারিত্বে নিজেই চমৎকৃত হয়ে যেতাম। তখন নন্দা মাঝে মাঝে শুধু বলত, আপনি ভারী ভালো কথা বলেন।

আসলে, সেই সময়, নন্দাও যে অনেক কিছু ভাবে, ওর মনেও যে গভীর সব ভাবনা নড়েচড়ে তারপর ডিম ভেঙে সকালের আকাশে অনাবিল সহজ পাখির মত ডানা মেলে ওড়াওড়ি করে এসব আমার জানা ছিলো না। মেয়েদের আমি বুঝি না ; জানি না। আমার জীবনে আমি খুব কম নারীরই সংস্পর্শে এসেছি। তাই তাদের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশের স্বরূপ সম্বন্ধে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা কখনোই ছিলো না। কিন্তু সেই স্বরূপের রূপ যে বিভিন্ন, এমন একটা অনুমান চিরদিনই ছিলো। আজ নন্দাকে দেখে, ওর পরিবর্তন দেখে, ওর কথা শুনে মনে হল, কিছু কিছু নারীর মধ্যে গভীরতাও থাকে। আশ্চর্য ! সব নারীই চটুল, খল, জেদী এবং অবুঝ নয় ; স্বার্থপর নয়। সত্যিই আশ্চর্য ! নিজের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কের গভীরতা ও রঙ যুক্তির সঙ্গে হৃদয় মিশিয়ে বিচার করার ক্ষমতাও তাহলে নন্দার মত কোনো কোনো মেয়ে রাখে !

যখন নন্দার খুব কাছাকাছি ছিলাম, যখন একটু কাছে থাকা, একটু শারীরিক সান্নিধ্য, কনুইয়ের সঙ্গে কনুই ছুঁয়ে যাওয়ার শিহরণ, ওর চোখের সামুদ্রিক গভীরে সাঁতার-না-জানা নাবিকের মত অসহায়তার মধ্যে কিন্তু বড় আনন্দে ডুবে যাওয়া—এইটুকুর মধ্যেই তখন আমার ভালোলাগা নিহিত ছিল। তখন ওর নৈকট্যটাই আমাকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ছিলো। আজ অনেক দিন পর যেন হঠাৎই বুঝলাম নন্দার কাছে এসে যে, কাউকে সত্যিই ভালো লাগলে তার বড় বেশী কাছাকাছি থাকতে নেই, তাকে রোজ দেখতে চাইতে নেই। তাকে বারবার দূরত্বের মধ্যে, বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে দিয়ে তাকে আবার তার প্রকৃত সত্তায় খুঁজে পাওয়ার মতো আনন্দ বুঝি বড় বিরল। আমার হতাশ, একঘেয়ে, কর্মক্লান্ত জীবনে, ভালোবাসার মতো কিছুযে আছে, থাকতে পারে ; একথা আমি পুরোপুরিই ভুলে গেছিলাম। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, দৈনন্দিনতা থেকে উত্তোলিত করার জন্যে, মানবিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলোকে নিঃশেষে শেষ না হতে দেওয়ার জন্যে জীবনে স্বার্থহীন

দেনা-পাওনার বাইরের কোনো একটি ; অন্তত একটিও ভালোবাসার সম্পর্ক থাকা বুঝি বড় বেশী প্রয়োজন । মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্যেই প্রয়োজন ।

কৃতজ্ঞতায় আমার বুকের ভিতরে একসঙ্গে এত কথা কলকল করে উঠলো যে, আমি বোবা হয়ে গেলাম ।

নন্দা বলল, দিল্লীতে মাঝে মাঝেই দুপুরবেলা যখন একা থাকতাম তখন অপনারচিঠিগুলো বের করে পড়তাম । আপনি সবশুদ্ধু কতগুলো চিঠি লিখেছিলেন আমাকে জানেন ?

নাঃ ।

আমি বললাম । গুণিনি

পাঁচশোরউপর ।

অবাক হলাম আমি ।

কুড়ি গজ দূরের সামনের বাড়ির নন্দাকে পাঁচশো চিঠি লেখার মত ভাবাবেগ ও মূর্খামি কখনও যে আমার ছিলো একথা ভেবেই লজ্জা পেলাম । একটু দুঃখও হল এই কথা মনে করে যে, এখন তো কাউকে কুশল সংবাদ জানিয়ে একটা পোস্টকার্ড লিখতেও বড় কষ্ট হয় । কি করে, কোন ক্ষমতায় অত বড় বড় পাতার পর পাতা চিঠি লিখতাম তখন ? কে লেখাত ? লিখতো কোন আমি ? আমাকে দিয়ে কি অন্য কেউই লিখিয়ে নিতো ? আমার নিজের মধ্যে সে ক্ষমতা থাকলে আজ তা সম্পূর্ণ উবে গেল কেন ? তাহলে কি চিঠি লেখানোর সব কৃতিত্ব নন্দারই ছিল ? নন্দারই একার ?

আমি লজ্জিত মুখে বসে থাকলাম ।

বললাম, চিঠিগুলো যদি স্বাধীন দেখে ? আমাকে কি বোকাই না ভাববে ।

নন্দা হাসল । বলল, বোকা হতে সবাই পারে না । বোকা হওয়া বড় কঠিন । ভাগ্যিস তখন বোকা ছিলেন ।

তারপর বললো, জানেন অয়নদা, আমার গয়নার বাক্সর চেয়েও এই চিঠির ঝাঁপিটা আমার কাছে অনেকেই বেশী দামী । কী সুন্দর করে ভাবতেন আপনি, কী সুন্দর করে বলতেন, এমন করে আমাকে কেউ কখনও দেখেনি, দেখবেও না আর এ জীবনে । ভীষণ গর্বিত লাগে ; যখন সে কথা ভাবি ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, জানেন, আপনার লেখা-টেখা ছাড়া উচিৎ হয়নি । চেষ্টা করলে, লেগে থাকলে ; আপনি একদিন একজন ছোট-খাটো লেখক নিশ্চয়ই হতে পারতেন ।

বললাম, তোমার ভাল লেগেছে বলে কি অন্য সকলেরও ভাল লাগতো আমার লেখা ? সম্পাদক তো আমার প্রেমিকা নন । আমার লেখার সমস্তটা জুড়েই তো ছিলে তুমিই । তোমার হাসি, তোমার চলা, তোমার বলা তোমার শরীর, মন ; তাই তো সহজেই তোমাকে মুগ্ধ করেছে, তোমার মুগ্ধতাটা সত্যি । কিন্তু তোমাকে যা দিয়েছি তা অন্যেরা গ্রহণ করতো কেন ? তাদের ভাল লাগতো কেন ?

এসব বাজে কথা । আপনার লেখা উচিত । লেখার আসল কথা হচ্ছে আইডেন্‌টিফিকেশান্ । চিঠির মধ্যের আমি, যে আমিকে আপনি এঁকেছিলেন অনেক দরদে, তার সঙ্গে আর লেখকের সঙ্গে হাজার হাজার পাঠিকা এবং পাঠকও, নিজেদের আইডেন্‌টিফাই করতো । এবং তা যদি হতো তবে আপনার লেখা তাদের ভালো লাগতোই ।

দূর। আর হয় না। আর সে জোর নেই, উৎসাহ নেই। লেখা বড় পরিশ্রমের। তাছাড়া, তার চেয়েও বড় কথা,আমার মনে হয়, সব লেখকই ; যাঁরা আনন্দের জন্যে লেখেন, তাঁরা লেখেন কোনো এক বিশেষ জনের জন্যে। লিখতে তাঁকে কেউ অনুপ্রেরণা দেয়, তাঁকে নিজের বুকের খোলসের মধ্যে থেকে বুকের মধ্যের বহুরূপীটাকে কাগজের পাতায় আনতে বলে। তাঁর যে গোপন কথা তা সকলের করে দিতে বলে। তাছাড়া জানো, আমার মনে হয়, লেখকরা বড় গরীবও। তাঁদের বুকের মধ্যে নিজের বলতে আর কিছুই বাকি থাকে না। সবই যে পাঠকদের দিয়ে রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে যেতে হয় ; সেটা বড় দুঃখের। নাঃ। লেখক হওয়ার সাধ আর আমার নেই।

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে নন্দা বললো, আমার এখান থেকে কি সোজাই বাড়ি যাবেন ?

আমি চুপ করে থাকলাম।

নন্দা বললো, কি ? কথা বলছেন না যে ?

বাড়ি ত ফিরতেই হবে। আমরা যদি জানোয়ার হতাম জঙ্গলের, তাহলে কোনো বাঁধা ঠিকানা থাকত না। দিনে রাতে পাহাড়ে বনে চরে-চরে বেরিয়ে এক জায়গায় শুয়ে পড়তাম রাতে। আজ এখানে, কাল সেখানে, নিরুপদ্রবে জাবর কাটতাম। কিন্তু আমার ঠিকানা একটা আছেই, রোজ সেই ঠিকানায় ইচ্ছাতেই হোক, কী অনিচ্ছাতেই হোক, ফিরতেই হয়, পথে-ঘাটে মরে গেলেও আমার মৃতদেহকেও সেখানে ফিরে যেতেই হবে। আমি যে মানুষ। আমি যে ঠিকানাতে বাঁধা আছি নন্দা, শিকলের সঙ্গে ; আবহমানকাল ধরে।

আমি বুঝলাম যে, নন্দার সোজা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অনেক কথা বলে ফেললাম অপ্রাসঙ্গিক। আজকাল এরকমই করি আমি। যেখানে একটা কথা বললে চলে, সেখানে দশটা কথা বলি। শ্লথ হয়ে গেছি বলেই বোধহয়, এরকম অতিকথনের দোষ হয়েছে। অথবা মাথার মধ্যে ভাবনা ও ভাবনা প্রকাশের মধ্যে কোনো সাযুজ্য নেই ; সমতা নেই।

বললাম, বাড়ি ফেরার কথা জিগ্‌গেস করছিলে কেন ?

না! ভাবছিলাম, তাড়া না থাকলে. এখানেই খেয়ে যেতেন। চান করে নিন না। ওর পায়জামা পাঞ্জাবী বের করে দিচ্ছি। চান করবেন ?

না। না। পাগলি একটা তুমি! আমার মিষ্টি পাগলি।

এমন সময় টেলিফোনটা বাজল।

নন্দা ফোন ধরল। বললো, বলো, তুমি এলে না এখনও ? অয়নদা এসেছেন।

তারপর বলল, কি বল্লে ? দেরী হবে। কেন ?

বুঝেছি।

তারপর বললো, আমি তোমার জন্যে বসে থাকবো কিন্তু না খেয়ে।

খেয়ে নেব ? না। অত দেরী করবে ? ভালো লাগে না। আচ্ছা, ঠিক আছে।

ফোন ছেড়ে এসে বললো, ওর কারখানায় ব্রেকডাউন হয়েছে। কাজ পড়ে গেছে। ফিরতে রাত বারোটা হবে। আপনি যাবেন না। যেতে দেবো না আপনাকে। আমার সঙ্গে এখন থাকতে হবে। গল্প করতে হবে। আপনিও বরং জানিয়ে দিন বৌদিকে। নইলে চিন্তা করবেন যে।

তোমার চিন্তা নেই। জানাতে হবে না। আমার জন্যে কেউ চিন্তাও করবে না বরং জানালেই হাজার বিপত্তি। খাবার ঢাকা দেওয়া থাকবে খাবার টেবিলে। যখনই যাই, খেয়ে নেবো।

গলা নামিয়ে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে নন্দা বললো, এতদিন পর আমাকে দেখলেন,

একটুও আদব কবলেন না তো ? আপনি আমাকে একটুও ভালোবাসেন না, না ?

তাবপব নন্দা গিযে দবজাটা ভেজিযে দিলো। দবজার দিকে পিছন ফিবে দাঁড়ালাম আমি। নন্দা এগিযে এল আমাব কাছে।

চান করেছে ও। সুন্দব কবে সেজেছে। কী সাবান মেখেছে জানি না। ওব গাযে লেবুপাতাব গন্ধ। আমি সেই গন্ধে বুঁদ হযে গেলাম।

জোবে জোবে নিঃশ্বাস পড়ছিল ওব।

আমি বললাম, তোমাব বুকেব তিলটাব বঙ বদলে গেছে। কালো ছিলো না আগে ?

নন্দা হাসলো, বললো, অসভ্য।

তাবপব লাজুক মুখে, অন্যদিকে চোখ ফিবিযে বললো, বদলাযনি। ওটা নতুন তিল। আগেবটা কালো ছিলো। এটা লাল। বোকা।

আবাব আমবা মুখোমুখী বসলাম।

ওব সামনে বসে থাকতে থাকতে আমাব বড় কান্না পেলো। আনন্দে এবং দুঃখে। এ জীবনে মাঝে মাঝে ওব সামনে এসে একটু বসে থাকা, কখনও সখনও সমাজেব চোখ বাঁচিযে চোবেব মত ওব গ্রীবায, ওব কানের লতিতে অথবা ওব স্তনসন্ধিতে একটু ঠোঁট ছোঁওযানো। এইই সব—এইটুকুই। বাকি যা, তা দুঃখই, বড় দুঃখ। দুঃখটুকুই সত্যি, স্থাযী। আব সবই মিথ্যা, ক্ষণিক।

এই সম্পর্কেব কোন পবিণতি নেই।

আমি জানি, একটু পবেই আমাকে উঠে যেতেই হবে আমাব বাড়িতে নন্দাব, নন্দাব বাড়িতে আমাব স্থান স্থিব, নির্দিষ্ট। সেই ছোট্ট, অকুলান ফ্রেমেব মধ্যেই আঁট-সাঁট হযে বাকি জীবন কাটাতে হবে আমাদেব। আমাদেব কেউই বুঝবে না, ক্ষমা কববে না, সকলেই শাস্তি দেবে, আঘাত দেবে। কাবণ, সমাজ শুধু আঘাতই দিতে জানে, শান্তি দিতে নয়।

কিছুক্ষণ পব বললাম, আজকে উঠি নন্দা। নটা বেজে গেছে। বড় ভালো লাগলো তোমাকে দেখে। তোমাব কাছে এসে। কী ভাল যে লাগলো। তোমাকে বোঝাতে পাববো না।

বুঝি। বুঝতে পাবি।

নন্দা বলল। তাবপব বললো, নিজেকে দিযে একটু একটু বুঝতে পাবি।

বলেই, হাসলো একটু।

বড় সুন্দব দেখালো ওকে।

ও সিঁড়িব নীচ অবধি এসেছিলো। তাবপব গাড়ি অবধি এলো আমাকে পৌঁছে দিতে।

গাড়ি স্টার্ট কববাব আগে বললাম, পবশু তোমাব জন্মদিন। কী দিতে পাবি তোমায ? দিল্লীতে ত এ ক' বছব ফুল ছাড়া কিছুই পাঠাতে পারিনি। বলো, কী পেলে তুমি সবচেযে খুশী হও ?

নন্দাব চোখে চাঁপাফুলেব মত সুগন্ধি এক হাসি ফুটে উঠলো।

বললো, ফুলেব চেযেও যা দামী, তা-ই দেবেন। যা দিযেছিলেন একদিন, তাই-ই নতুন করে দেবেন।

তাবপব আচমকা চোখ তুলে আমাব চোখে স্থিব দৃষ্টিতে চেযে বললো, অযনদা, আমাদেব এই সম্পর্কটা কি থাকবে ? এ সম্পর্কে কি বাঁচিয়ে রাখতে পাববেন ? আমি পাবব যে, তা জানি। আপনি পাববেন কি ? আপনি বড় ভীরু। আপনাকে নিয়েই ভয়।

হাসবাব চেষ্টা কবলাম।

বললাম, চেষ্টা কববো। সাহসী হতে চেষ্টা কববো।

গডিটা ট্র্যাফিক সিগন্যালেব লাল আলোতে দাঁডিয়েছিলো পথেব মোডে। আলোটাব দিকে চোখ পডতেই আমাব মনে হলো, যে-সব সম্পর্কে সমাজেব শীলমোহব নেই সেই সব সম্পর্কেব পথেই চোখ-ধাঁধানো একটা গোলাকৃতি কুটিল লাল আলো পথ আগলে থাকে প্রতিমুহূর্ত। এই লাল আলোটা সেই অদৃশ্য ডাইনীব বক্ত-চোখ। এই চোখকে আমবা সকলেই ভয পাই। মানতে বাধ্য হই। একে মানতে, মানতে, মানতে আমবা নিজেব নিজেব বুকেব মধ্যে ছোট হতে, হতে হতে, এক সময একেবাবে নগণ্য হযে যাই।

ট্রাফিক পুলিশ হৈ হৈ কবে উঠল।

আমি জোব এ্যাকসিলেবাটবে চাপ দিযে বেবিযে গেলাম সোজা। খুউব জোবে, আইন, নিষেধ, যুগ-যুগান্ত ধবে মেনে-নেওযা বাধাব উল্টো দিকে

উল্টো দিকে।

আমাব মনে হলো, জীবনে এই-ই প্রথম, প্রথম লাল বঙেব চোখটাব মধ্যে দিযে সেই চোখ-বাঙানিকে বিদ্ধ কবে, দীর্ণ কবে এই মুহূর্তে ভীক, ভীষণ ভীক আমি, সাহসেব, স্বাভাবিকতাব নতুন বাজ্যে নতুন জীবনে একেবাবে হঠাৎই নন্দাব বুকেব লাল তিলটিকে মুখে কবে একটি কচি-কলাপাতা বঙা উৎসাবিত টিযাপাখিব মত প্রবেশ কবলাম।

সীমান্তবাসী

চাড্‌ঢা সাহেব বহুদিন হলোই বলছেন, একবার তাঁর কারখানায় বেড়িয়ে আসতে। দিল খুশ হয়ে যাবে।

কোনো কারখানায়ই কেউ বেড়াতে যায় না। কিন্তু এ কারখানার বিশেষত্ব আছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসী এলাকাতে শেল্যাক-এর কারখানা। বন-বনান্তর থেকে আদিবাসীরা পলাশ ফুল আর কুসুম গাছ থেকে কেটে নিয়ে আসে স্টিক-ল্যাক। তা থেকেই এই কারখানাতে তৈরি হয় সীড-ল্যাক। আর শেল্যাক। চাড্‌ঢা সাহেব বহুবারই বলেছেন, খুবই শান্তির জায়গা, একবার ঘুরে আসুন সেন সাহেব।

টিনার পার্ট-ওয়ান পরীক্ষা শেষ হলো এই সেদিন। দুর্যোগের মধ্যে কোনরকমে দিলো পরীক্ষা। এবারে ব্যাপার যে কী তা বোঝা যাচ্ছে না। শ্রাবণের প্রথমে আকাশের দিকে চেয়ে যখনই দেখছি বৃষ্টি আসছে এবং আকাশ নিমেঘ মনে হচ্ছে, আশ্বিনই এসে গেছে বুঝি। কী বৃষ্টি কী বৃষ্টি ?

টিনার পরীক্ষা হতেই বিনা আর টিনা বম্বে বলে গেছে। সেন সাহেবের বড় সম্বন্ধী বম্বেতে আছেন। মার্কেনটাইল ফার্মের নাম্বার ওয়ান। বিরাট ফ্ল্যাট, নেপিয়ান সী রোডে। সাদা রঙা এয়ার-কণ্ডিশান-ভলভো গাড়ি। পার্টি, নাচ, গান , নেমন্তন্ন। বম্বে যেতে পেলে বিনা এবং মেয়ে টিনা আর কিছুই চায় না। অতএব, তাদের গীতাঞ্জলিতে তুলে দিয়েছেন সেন সাহেব।

ভেবেছিলেন, ফাঁকা বাড়িতে স্ত্রী বর্জিত কষ্ট লব্ধ স্বাধীনতা সেলিব্রেট করবেন, পুরনো বন্ধুবান্ধবদের ডেকে বাড়িতে হৈ হৈ করে। বিনা বাড়িতে ড্রিঙ্ক টিঙ্ক করা একেবারেই পছন্দ করে না। এই ই সুযোগ। যত মাদো মাতাল কিন্তু তালে ঠিক বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের এই বেলা একটা গুড-ট্রিট দেবেন ভাবলেন। ইতিমধ্যেই একটা শুক্রবার বন্ধ-এর কারণে উটকো ছুটিও পাওয়া গেল। কলকাতায় আবার বন্ধ কি ? প্রতি দিনই তো কিছু না কিছু বন্ধ থাকে। মিটিমিটি আধ বোজা এখানে জীবনযাত্রা। কাজ ছাড়া এখানে আর সব কিছুই হয়।

বন্ধটি ঘোষিত হবার পরই হঠাৎ মনে হলো চাড্‌ঢা সাহেবের কথা। সেন সাহেব ফোন করলেন একটা।

নো প্রবলেম। আই অ্যাম অনার্ড স্যার। কতদিন থেকে বলছি একবার যাবার কথা।

হ্যাঁ কোন ট্রেনের টিকিট কাটব ? ট্রেন কখন ?

আপনার কিছুই ভাবতে হবে না স্যার। টিকিট আমি পৌঁছে দেবো মেমসাহেবের আর মেয়ের নামটা বলুন। আর বয়স। আজকাল তো আবার বয়স লাগে রিজার্ভেশন করতে।

ওরা কেউই যাবেন না। ইন ফ্যাক্ট কেউই নেই এখানে। সবাই বম্বেতে। আমি একাই যাব।

একা? ঐ জঙ্গুলে জায়গাতে বোর হয়ে যাবেন স্যার।

আমার একা থাকতেই ভাল লাগে।

আমি কি যাবো আপনার সঙ্গে স্যার? টু কীপ উ কোম্পানি? তাস খেলবো, বীয়ার খাবো। যদিও আমার এ সপ্তাহে একটু চায়না, মানে বেজিং-এ যাবার কথা ছিলো।

সেন সাহেব মনে মনে বললেন, সর্বনাশ করেছে। চাটুজ্যে সঙ্গে গেলে তো হয়েই গেলো। এই লোকটি শুধু টাকাই বোঝে। টাকা, সাফল্য, চিৎকার, শোরগোল। ওর জীবনে কোন একটিও মুহূর্ত নেই, যা শূন্য। মানে, এমন একটিও মুহূর্ত নেই যা কোনো পূর্ণতার প্রত্যাশাতেই শূন্য থাকে অন্তত কিছুক্ষণ। পৃথিবীর সব পাওয়াই তার পাওয়া হয়ে গেছে। জীবনের সব চাওয়া তার হিপপকেটে রাখা ফোলা কোলা-ব্যাঙের মত মোটা পার্স-এর মধ্যে বন্দী আছে। পার্সটা শুধু খুললেই হলো।

কি হল? যাবো নাকি? আমি? স্যার?

চাটুজ্যে আবার বলল, তার হাস্কি, সেক্সী গলায়, ফোনে।

না, না।

সেন সাহেব বললেন, আমি একটু একাই থাকতে চাই।

ও কে ফাইন! পরশু পৌনে ন টায় তৈরি হয়ে থাকবেন রাতে, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো। আপনাকে তুলে নিয়ে আমার একজন লোক গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে।

কেন? আমি কি শিশু নাকি? না ইনভ্যালিড?

না স্যার। আপনি ভি-আই-পি। আপনারা শিশুর চেয়েও বেশি যত্ন পেয়ে থাকেন তো। আমারই বা নম্বর কাটা যায় কেন? আমার নিজেরই স্বার্থেই সব সময় আপনার দেখ ভাল করি আমি। পৃথিবীতে স্বার্থ ছাড়া একটা মাছিও ওড়ে না স্যার।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন সেন সাহেব। সি এম ডি এর কাজ হচ্ছে মোড়ে। মাত্র দুজন কুলি গাঁইতি হাতে কাজ করছে। একটু কাজ করেই বসে বিড়ি খাচ্ছে। ততোধিক কুঁড়ে একজন সুপারভাইজার মাঝে মাঝে এসে তাদের কাজের তদারকি করে যাচ্ছে। ঐ মোড়টুকুতে রাস্তার সারফেস এর কাজ শেষ হয়নি বলে প্রতিমুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং হাজার হাজার যানবাহনের কী অশেষ দুর্গতি! কলকাতায় বাস করেন এবং নিজে বাঙালী বলেই বড় লজ্জাবোধ করেন আজকাল সেন সাহেব। এই রাজ্য কিভাবে চলছে তা জানতে সরকারী বিজ্ঞাপন বা বিরোধীদের প্রতিবাদ পড়ার দরকার হয় না সেন সাহেবের। চোখ খুলে চাইলেই তা বোঝা যায়। এই অবস্থা সত্ত্বেও নির্লজ্জ নেতাদের কদর্য আস্ফালনে বমি পেয়ে যায়। সবাই কি ঘুমোয় কলকাতায়?

তাঁর বন্ধু শ্যামল তাঁকে বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা শহরটুকু নিয়েই নয়। হয়তো তা নয়। কিন্তু সারা বাঙলার মস্তিষ্ক, নার্ভ-সেন্টার তো এই কলকাতাই! তাছাড়া, গ্রামেও তো সেন সাহেবকে মাঝে মাঝে যেতে হয়। গ্রাম বাংলার অবস্থাও তাঁর নিজ চোখেই দেখা।

একটা সিগারেট ধরালেন। চ্যাটার্জী দিয়ে গিয়েছিল এক প্যাকেট ভাল বিলিতি সিগারেট। যখন ওর কাছে আসে, তখনই ইচ্ছে করেই নতুন একটা প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট নিজে নিয়ে, প্যাকেটটা যেন ভুল করেই রেখে যায় রোজ টেবিলে। এগুলোকে ঘুষ বলে মনে করেন না সেন সাহেব। তিনি ঘুষ খান না। খেলে, তাঁর অনেক কলীগ এরই মত

তাঁরও বাড়ি গাড়ি থাকতো। তবে এই সব ছোট-খাটো ব্যাপারে "না" করেন না। অতিসতীপনা নেই তাঁর। বিবেকের দিক থেকে পরিষ্কার উনি। সরকারকে ঠকিয়ে কাউকে কোন ফেভার দেন না। কাউকেই হ্যারাসও করেন না বলেই সকলে তাকে ভালবাসে। সৎ বলেই টাকা অফার করার সাহস না পেয়ে এমনি করে গুড-হিউমারে রাখতে চায় সকলেই তাঁকে। বোঝেন। যা বাজাব ! এই সব ছোট-খাটো ফেভারে তাই "না" করেন না।

॥ ২ ॥

অনেকদিন পব বাঁচী এলেন সেন সাহেব। গাড়ি পৌঁছবার কথা আটটা পঁচিশে। আরও চল্লিশ মিনিট লেট ছিল।

চাটচ্চার লোক হাওড়াতে এসে এযারকণ্ডিশানড কোচ-এ তুলে দিয়ে গিয়েছিলো, এয়ারকন্ডিশানড কন্টেসা গাড়ি করে। রাঁচীতেও চাটচ্চার লোক এসেছিলো। সেন সাহেব ট্রেন থেকে নামাব আগেই কোচ অ্যাটেন্ড্যান্ট-এব কাছে নাম জিজ্ঞেস করে কোচ-এ উঠে, রিসিভ করে নিয়ে গিয়েছিলো গাড়িতে, একজন অল্পবয়সী ছেলে। তারপর বি. এন. আর-এ গিয়ে চান সেরে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে ; গাড়িতে উঠে পেছনে বাঁদিকে আরাম করে বসেছিলেন।

গাড়ি ছুটে চলল ফাঁকা পথ দিয়ে, শহব পেরুবার পরই। দু'পাশে চাপ-চাপ সবুজ। চাঁইবাসার পথ এটা। অঝোরধারে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সঙ্গে ঝোড়ো, দমকা হাওয়া। খুঁটি, মুরহু, টেবো ঘাট হয়ে চক্রধরপুব চলে গেছে এই বাস্তা। সেখান থেকে চাঁইবাসাও। বীর্‌সা মুন্ডার উলগুলানের পটভূমির উপব দিয়ে চলে গেছে পথ।

ঘণ্টা দুয়েক চলাব পর চাটচ্চা সাহেবের বাংলোতে এসে পৌঁছলেন। কারখানার লাগোয়া বাংলো। ছোট্ট, কিন্তু সুন্দব। সঙ্গেব ছেলেটি ডাকল, হন্‌সো।

একটি মুণ্ডা মেয়ে এসে দাঁড়ালো। বযস বাইশ-তেইশ হবে বেশি হলে। যেমন সুন্দর ফিগাব তেমনই চোখের ও মুখেব ভাব।

হন্‌সো বললো, বাবু !

সাহাবকা দেখ-ভাল কবে গা।

এই মেযেটিই বাংলোব কেয়াবটেকার স্যার। আমরা কাবখানা থেকে মাঝে মাঝেই এসে খোঁজ নিয়ে যাবো। চৌকিদারও আসবে মাঝে মাঝে। লোড-শেডিং এদিকে খুব। কলকাতার চেয়ে আমবা এ বাবদে পেছিয়ে নেই। তবে আমাদের চাবটি জেনারেটব আছে। সঙ্গে সঙ্গে টেকওভার করে নেয। হ্যভে আ নাইস্ স্টে স্যার।

ছেলেটি চলে গেলো। বেডরুমের পাশে বাগান। ড্রয়িংরুমেব সামনেও তাই। নানারকম সৌখীন গাছ লাগানো। ড্রয়িংরুমেব লাগোয়া একটি বাবান্দা। তার সামনে মস্ত একটি কাঠটগরের গাছ। পাতাবাহার ; লালপাতিয়া, পিছনে করবীব বেড়া, সোনাঝুরি, পেয়ারা, আম, লিচু সব দাঁড়িয়ে আছে সারে সারে আর পাগলা হাওয়ায মাথা দোলাচ্ছে, হাত পা নাড়াচ্ছে পাগলের মত। দু'হাত তুলে জংলীর মত চুমু-খাওয়া বৃষ্টিকে বলছে, এই না, না ; আর নয়। অসভ্য। থামো এবাব !

সাহাব !

কে ?

চমকে উঠলেন সেন সাহেব।

হন্‌সো।

পীনেকা পানি। বলে, বেডসাইড টেবিলের উপর ঝকঝকে স্টেইনলেস স্টীলের জাগ এবং গ্লাস রেখে গেলো হনসো, স্টেইনলেস স্টীলের ট্রের উপর।

এযারকন্ডিশানার ছিল। সেটা বোধ হয় ভোল্টেজে গণ্ডগোলের কারণে খুলে নেওয়া হয়েছে। প্রেসমেসিনে গোলগোল করে কাটা একটা লোহার জাল দিয়ে সিমেন্ট গেঁথে দেওয়া হয়েছে সেই শূন্যে। জল, হাওয়া আলো, চাঁদ সবই আসে।

সেন সাহেবের খুবই ভাল লাগতে লাগল অনেকদিন এমন ভাল লাগেনি। এই পরিবেশ, শান্তি নির্জনতা, এই আবহাওয়া।

কাঠটগরের গাছে বড় বড় সাদা ফুল ধরেছে। বৃষ্টিতে আর হাওয়াতে ফুলগুলোকে কাগজের ফুল বলে মনে হচ্ছে। একটি মুণ্ডা মেয়ে এরই মধ্যে কলসী কাঁখে চলে যাচ্ছে ঘন গাছ-গাছালীর মাঝে মাঝের সুঁড়িপথে। তাকেও আবছা দেখাচ্ছে নরম, গলে যাওয়া কালচে—লাল লাক্ষারই মতো। কাগজের নারী।

কিছুই করবেন না এখানে সেন সাহেব শুধু খাবেন, ঘুমাবেন আর চুপ করে এই নির্জন প্রকৃতির রস নিজের কোষে কোষে ভরে নেবেন। দু'একটি কবিতা লেখার চেষ্টা করলেও করতে পারেন। আত্মরতি এবং কবিতা এই দুটি বদভ্যাসই বহুদিন হল পেছনে ফেলে এসেছেন। মাঝে মাঝে বদ হওয়া ভাল। ভাবলেন সেন সাহেব। তাতে ভালত্বটা ওয়াটার-প্রুফিং পুডিংয়ের প্রলেপের মত সুরক্ষিত হয়।

সাহাব।

কে?

আবার চমকে উঠলেন সেন সাহেব।

হনসো।

হনসো তাঁর শরীরের একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে। মুখে সরল, নিষ্পাপ, স্নিগ্ধ হাসি।

হনসো বলল, সাব, দোপহরমে খানা ক্যা বনে গা?

সেন সাহেব, হনসোর ঐ নৈকট্য সহ্য করতে পারছিলেন না। বৃষ্টি-ভেজা কাঠটগর গাছের মত টাটকা সতেজ যৌবন। তার উদ্ধত অথচ স্বাভাবিক শান্ত বুক, তার দীর্ঘ মরালী গ্রীবা, তার কালো চোখের নির্লোভ চাউনি। এই পরিবেশে, এমন বাদলা, মেঘলা দিনে, এমন নিরিবিলিতে সাহেবের বয়সটাকে দামাল গ্রীষ্ম-দুপুরে খসে-যাওয়া সোনাঝুরি পাতার মত এক ফুৎকারে উড়িয়ে নিয়ে গেল যেন। সেন সাহেবের কষ্ট হতে লাগল। যেসব কষ্টবোধ কলেজে পড়া মেয়ের বাবা, স্ত্রীর পৌঢ় স্বামী এবং ভারিক্কি সরকারী অফিসারের দামী মোড়কে এতদিন ঢাকা ছিলো, যেসব কষ্ট আদৌ এখনও আছে বলেও জানা যায়নি, সেইসব কষ্টগুলোই একই সঙ্গে নকশাল ছেলেদের অসংখ্য ছোরার মত তার বুকে পেটে চোখে মাথায় আঘাত করলো। হুঁস হারিয়ে ফেলার মতো হল ওঁর। সোফায় বসে পড়ে বললেন, তুমি যা বানাবে তাইই।

তারপরেই হুঁশ ফিরে পেয়ে বললেন, তুমি কোথায় থাকো?

গ্রামে।

গ্রামে?

ও। হ্যাঁ। তাতো হবেই। গ্রামীন মানুষ তো গ্রামেই থাকবে।

প্রশ্নটাই বোকার মত হলো। ভাবলেন সেনসাহেব।

কোন গ্রামে?

হাস্সা।
তোমার কে কে আছে?
সবাই। বাবা, মা, ভাই, বোন।
বর?
হনসো হেসে বলল, নাঃ।
সে কি? তোমার বর নেই? বিয়ে হয়নি এখনও?
নাঃ।
এই বাংলোয় কে থাকে আর? রাতে?
আমি।
তুমি একা?
হ্যাঁ। তবে মেহমান থাকলে। কেউ না থাকলে গ্রামে চলে যাই।
ও। তা বেশ। তুমি যখন বিয়ে করোনি তখন । তুমি বিয়ে করবে তো?
হাসলো হনসো। বললো, কে জানে?
তোমাদের বিয়েতে বরের কি দিতে হয়? গরু? দুটো গরু?
নাঃ। টাকা, শাড়ি গয়না।
তা বেশ।
হেসে বললেন, সেন সাহেব।
সেন সাহেব হেসেই বললেন তাকে আমিই তবে বিয়ে করবো তোমাকে।
হনসো মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসলো।
তুমি রাতে থাকবে এইখানে। বেশ। তাহলে তো ভালোই।
কি ভাল, এবং কেন ভাল তা আর বললেন না।
হনসোও কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলো।

আবার জোর বৃষ্টি নামলো। কী জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। এবারে সত্যিই ডিল্যুজ হবে। ঘোর কলি তো। ন্যুহ সাহেবের নৌকো ভাসাবার সময় হলো আবার। এত পাপ, এত অবিচার পৃথিবীর আর বোধহয় সইছে না।

পাপ। পাপ কাকে বলে? হনসোকে এই হঠাৎ চাওয়া কি পাপ? তার কৃপাপ্রার্থী চাড্ঢার অতিথি হয়ে আসা কি অন্যায়? বোগাস। সব ব্যাপারই রিলেটিভ। এই চাড্ঢা ইচ্ছে করে সেন সাহেবকে ফাঁসাবার জন্যে হনসোর কাছে এই ফাঁকা বাংলোতে ভিড়িয়ে দিয়েছে কি তাঁকে? হতেও পারে। সেন সাহেব ভাবলেন। নতুন রিলে স্টেশান হবে অনেকগুলো। কয়েক কোটি টাকার কাজ। টেন্ডার পড়লেও টেন্ডার কমিটি বসলেও, আসল ক্ষমতা সেন সাহেবেরই। বোর্ডও জানে সেনসাহেব ঘুষখোর নন। সেন সাহেবের ভেটো পাওয়ারই এ ব্যাপারে শেষ কথা। মেজরিটি উল্টোদিকে গেলেও তার ডিসিশানই বহাল থাকবে।

রিলে-স্টেশান, চাড্ঢা, হনসো, নির্জন জঙ্গলের মধ্যে বাংলো। সেন সাহেব এই বৃত্তর মধ্যে পড়ে কি ফেঁসে যাবেন। চাড্ঢা আর কি চায়? এমনিতেই তো সব কাজই তাঁকে দেন উনি। কাজ দেন, কারণ চাড্ঢার অনেক লোকজন আছে। পয়সার জোর আছে। টার্গেট ডেটের অনেক আগেই কাজ কমপ্লিট করে দেয়। তবু, তাঁকে এই পরীক্ষাতে ফেলার দরকার কি ছিল তার? এই পরীক্ষায় পাশ কি তিনি করবেন আজ?

ভয় হচ্ছে সেন সাহেবের।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুম লাগালেন একটা। ট্রেনে ভাল ঘুম হয় না, সে যে ক্লাসেই

ট্রাভেল করা যাক না কেন !

বিকেলে উঠে ড্রইংরুমে বসলেন। আবহাওয়ার কোনোই উন্নতি হয়নি। "শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা নিশীথ যামিনীরে ! কুঞ্জপথে সখী কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে" !

কোন্ দিক দিয়ে আসবে হন্‌সো ? বেড-রুমের সঙ্গে একটা দরজা আছে, যেটা বাইরের বারান্দাতে খোলে। রাতের অতিথি সেই পথ দিয়ে আসতে পারে। খাওয়া-দাওয়ার পর খাওয়ার ঘর দিয়েও আসতে পারে। এ কথা ভাবতেই সোফায় বসে দুটি হাঁটুই থরথর করে কাঁপতে লাগল সেন সাহেবের।

বলবেন, কী করে ? কি বলবেন ?

ভাবলেন, একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বলবেন, তুমি কাপড় কিনে নিও। বলবেন কি ? ফিসফিস করে ? রাতে এসো।

যদি চেঁচামেচি করে। চাঢ্ঢা একবার বলেছিলো যে মুণ্ডারা তাদের মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া দূরে থাক, একবার খারাপ চোখে তাকালেও তীর ছুঁড়ে দেয় পিরিং করে। তাকানো শেষ। বিষের তীর। প্রাণ এবং ইজ্জৎ সঙ্গে সঙ্গে খালাস।

তবে ?

বলতে হবে না কিছু। চাঢ্ঢা কি আর এমন নির্জনে একলা মেয়েকে চৌকিদার এমনিই রেখেছে ? অতিথিদের খাতির-টাতিরই করতে। এইসব নইলে নাকি আজকাল বড় ব্যবসা চালানোই যায় না। তাছাড়া মেয়েটার ন্যাকা ন্যাকা ভাবই তার প্রমাণ। ন্যাকা মেয়েগুলো সাধারণতঃ হারামজাদীই হয়।

ভেবেছিলেন, বিকেলে হাঁটবেন একটু। বৃষ্টি ধরলো না। সেন সাহেব রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে নার্ভাস বোধ করতে লাগলেন। সমস্ত শরীরে যেমন রোমাঞ্চ হতে লাগলো তেমনই ভয়ে আবার তার শিরদাঁড়া সরু হয়ে গিরগিটির শিরদাঁড়া হয়ে যেতে লাগলো। এমন করা কি উচিত হবে সেন সাহেবের ? তাঁর মেয়ে টিনা জানতে পেলে ? রিনা জানতে পেলে ? ছিঃ ছিঃ।

এমন সময়ে কে যেন ভিতর থেকে বলে উঠলো, হিন্দু বিধবার মত সবটাতেই ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ কোরো না ইডিয়ট। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ো ধরা। একটাই জীবন ইডিয়ট। একটু মজা করো, লাইফ এঞ্জয় করো, থোর-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোর না খেয়ে, মাঝে মধ্যে একটু দু-পেয়ে মুরগী-টুরগী খাও ইয়ার। আফটার অল, উ্যা ওনলী হ্যাভ ওয়ান লাইফ টু লিভ। বুয়েচো !

কে বললো ?

অ্যান্টি-বিবেক ?

কী জ্বালা !

রাতের খাওয়ার সময়ে সেন সাহেব মুখ তুলে তাকাতেই পারলেন না হন্‌সোর মুখের দিকে। মস্ত বড় জোড়া বিছানাতে দুটি বালিশ ছিলো। বিছানা করতে এসে হন্‌সো দুটি বালিশ দু-পাশে দিলো, দুজনের শোবার জন্যে, বিছানাতে চাঁপা ফুল ছড়িয়ে দিয়ে গেলো। প্রকাণ্ড মশারী টাঙিয়ে দিয়ে গেলো। দুই বালিশের মধ্যে লাল কোলবালিশ। রমণীরমণ ব্যাপার স্যাপার।

সেন সাহেব লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারলেন না। যেন নিজেই নববধূ ! তাঁর মাথার মধ্যে তাঁর স্কুলের বকা সহপাঠী ফড়িং, চেঁচিয়ে উঠল, মা—স্তু !

খাওয়া শেষ হতে হতে হঠাৎই ঝড় উঠল একটা। এবং আকাশের সব মেঘ উড়ে গেল যেন মন্ত্রবলে। নিষ্কলঙ্ক ঝকঝকে কালো আকাশে তারা ফুটলো। জ্বল জ্বল করে। আঃ।

হন্‌সোর গলার স্বরের সঙ্গে আরও দু'একজনের গলার স্বর শুনলেন সেন সাহেব। তবে কি, বিপদ অনুমান করে হন্‌সো অন্য লোকদের ডেকে নিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে ? পাঁজরে একটি বিষের তীর। উঃ। লাগুক লাগুক। তবু।এসে অবধি কামনার অসংখ্য তীরে তিনি বিদ্ধ। রক্তাক্ত। শুধু পুরুষই জানে পুরুষের কষ্টের কথা ; তার অসহায়তার কথা। এটা ভালো খারাপের প্রশ্ন নয়। আদৌ নয়। পুরুষ মাত্রই হতভাগা। বিধাতা তাকে বড় দুর্বল করে গড়েছেন। বড়ই দুর্বল ! নইলে, সেন সাহেবের মত অক্সফোর্ডের এম. এ, এতবড় সরকারী কর্মচারী ; রাশভারী মানুষ হন্‌সো নাম্নী এক অশিক্ষিতা প্রলেতারিয়েতের তীরে এমন করে ভূলুণ্ঠিত হন ! ছেঃ ! ছেঃ !

খাওয়া-দাওয়ার পর হন্‌সো বললো, দরওয়াজা অন্দরসে বন্ধ্ কর দিজিয়ে গা সাহাব !

ছেনালি ! দরজা, অন্দরবাসী কে আর কবে বাইরে থেকে বন্ধ করেছে রে শালী !

পা কাঁপতে লাগল আবার।

দরজা বন্ধ করলেন সেন সাহেব। ভাবলেন, সঙ্গের লোকজনকে বিদায় করেই আসবে হন্‌সো। শরীরের মধ্যে একদল টাকা-কেন্নো লাল-লাল, লক্ষ-লক্ষ পা-ওয়ালা ; হেঁটে বেড়াচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করলেন শব্দ করেই। ভাবলেন, এই হঠাৎ শব্দে তাঁর ভিতরের হঠাৎ-আসা কাম-পোকাটা যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় ! বিছানাতে শুয়ে ঐ ঠাণ্ডাতেও গরম লাগলো তাঁর। অথচ এমনই ঠাণ্ডা এখন এখানে যে, কম্বল দিয়েছে হন্‌সো পায়ের কাছে ! রসিকতা ! যুবতী শরীর থাকতে কে আর কবে কম্বলে মুড়েছে নিজেকে ?

ঘুম এলো না। উঠে পড়লেন। দরজা খুলে, ভিতরের উঠোনে বান্না ঘরের সামনে পায়চারী করতে লাগলেন।

হন্‌সো এবং আরও দুটি মেয়ে কাজ করছে। এরা আবার কারা ? এলো কোত্থেকে ? ওয়ান ভার্সাস থ্রী ? যাঃ ! উনি কি পারবেন ?

একজন পুরুষের গলা। একটি শিশুর। খাচ্ছে বোধ হয়। খেয়ে খেয়েই ভারতবর্ষ গেলো। সময় নেই, অসময় নেই ; কেবল গেলা : গব-গব্।

কিছুক্ষণ পব সেন সাহেব আবার বন্ধ করলেন দরজা। ফিরে এসে। জোরে শব্দ করে। ভাবখানা এমন. যেন হন্‌সোকে বলতে চাইছেন : পরে পস্তিও না। বন্ধ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে হন্‌সোকে ডাকলেন। অন্যদের চেহারা দেখাতে চান না।

হন্‌সো দরজার কাছে এলে, সবাইকে শুনিয়ে জোরে বললেন, দরওয়াজা বন্ধ কর দেতা।

বলেই, গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস করে হন্‌সোকে বললেন. উধারসে আও।

হন্‌সোর কাছে থেকে কোনোই উত্তর পাওয়া গেলো না।

সেন সাহেব ভাবলেন, ইডিয়ট্। এসব কথার কি উত্তর হয় ? অন্যরা শুনতে পাবে না ! ঠিকই আসবে।

ঘরে গিয়ে, মশারীর মধ্যে ঢুকে ভূতের মত বসে রইলেন কান খাড়া করে। পঁচিশ বছর আগে কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়ার এক বিয়েবাড়িতে মশা ভন ভন বাসরঘরে মশারীর মধ্যে যেমন করে নববধূর অপেক্ষাতে ছিলেন ; তেমন করে। এই দ্বিতীয়বার। দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, আধঘণ্টা, একঘণ্টা। ওদের খেজুরে আলাপ শেষই হয় না। কারখানার পেটা ঘড়িতে এগারোটা বাজলো। এবার লোকজন চলে যাওয়ার শব্দ শোনা গেলো।

আপদেরা বিদেয় হলো। ওদের ভাষায় কি যেন বলে হন্‌সো উঠোনের দরজা বন্ধ করল ভিতর থেকে।

এখন উপরে তারা-ভরা আকাশ, বৃষ্টি ভেজা। হাসনুহানা, মাধবীলতা আর যুঁইলতা ঘেরা মার্বেলের সাদা উঠোন আর হন্‌সো। আর সেন সাহেব। আঃ!

সেন সাহেব তাড়াতাড়ি এসে, দরজা খুললেন ভিতর থেকে।

উঠোনে কেউই নেই। থামে-জড়ানো লতাগুলো দুলছে উথাল-পাথাল হাওয়ায়। তাদের ছায়া নড়ছে। উঠোনের লাগোয়া একটা বটগাছ। দামাল ঠাণ্ডা ভেজা হাওয়াটা তাদের পাতাদের হাতে হাতে ধরে হাততালি বাজাতে বাধ্য করছে। কিসের এই হাততালী? অভিনন্দন, না কৌতুক? নির্জন বাদলা রাতে, উদ্‌লা আকাশের নিচে সেই হাততালিকে কেমন ভূতুড়ে বলে মনে হচ্ছিলো!

হন্‌সো! সে কোথায়?

সেন সাহেব দেখলেন, ফ্রস্টেড কাঁচে ঘেরা একটি ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। মধ্যে একটি নারীমূর্তি। স্পষ্ট তো দেখা যায় না। ফিগার দেখে বুঝলেন যে, হন্‌সো। শাড়ি ছাড়ছে। সারাদিন পর কাজের শাড়ি, বার বার বৃষ্টিতে-ভেজা শাড়ি ছেড়ে, এবার বোধ হয় আদর-খাওয়ার শাড়ি পরে আসবে। খোলবার জন্যেই তো পরা। হেঃ! হিঃ!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন ওখানে সেন সাহেব। ফ্রস্টেড কাঁচের মধ্যে দিয়ে হন্‌সোকে দেখতে দেখতে শিহরণ বোধ করছিলেন তিনি। সারা শরীরে। প্রায় অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যে এখনও এমন ফাস্‌ক্লাস রয়েছে একথা ভেবে নিজেই চমৎকার বোধ করলেন। ফিরে এলেন। এসে দরজাটা ভেজিয়ে রাখলেন। বন্ধ করলেন না। শোবার ঘরের বাইরের দিকের দরজাও ঐরকম করে ভেজিয়ে রাখলেন।

চোরের বা ভূতের ভয় নেই সেন সাহেবের। ভাবলেন, আহা হন্‌সোরও তো প্রস্তুতিতে সময় লাগবে একটু! এত খাটা-খাটনি গেছে সারাদিন। আফটার অল, সেক্স ইজ নাইন্টি পার্সেন্ট সাইকোলজিকাল, টেন পার্সেন্ট ফীজিক্যাল!

মশারীর মধ্যে একটি রাজহাঁসের মত হিস্‌হিস্‌ করতে লাগলেন সেন সাহেব নিখাদ কামে। এই কামে কোন ভেজাল নেই। একটুও প্রেম নেই! দয়া নেই; করুণা নেই, ক্ষোভ নেই, লোভ নেই, ঘৃণা নেই, রাগ নেই; অনুশোচনা নেই। এ একেবারে শতকরা একশো ভাগ কাম। এক পার্সেন্ট ভয় হয়তো আছে। সেটা নেসেসারী ইভিল। পরকীয়া প্রেমে থাকেই!

হাঁস হিস্‌হিস্‌ করতে লাগলো অথচ অন্য হন্‌সো বা হাঁসীর দেখা নেই।

রাত গভীর হতে লাগলো। পেটা-ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যেতে লাগলো।

ঘন অন্ধকার রাতে অন্ধকারতর কালো চকচ্‌কে পেশির মুণ্ডা যুবকেরা সেন সাহেবকে মাটিতে ফেলে তাঁর শরীরের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘেন্নার তীর মারতে লাগলো। অন্ধকার ভিজে হাওয়াটা দমকে দমকে উড়ে এসে তাঁর ঘাড়ে গলায় থাপ্পড় মারতে লাগলো। মশারীর মধ্যে বারংবার পাশ ফেরার কারণে লাল-মখমলের কোলবালিস নিপীড়িত হলো, চাঁপাফুলের সোনা গলে গেলো বিছানার সাদা চাদরে। বড় কষ্ট। বড় দ্বিধা। গিয়ে কি হন্‌সোর দরজায় ধাক্কা দেবেন? যদি চেঁচায়? মিঃ বি. এন. সেন! ছিঃ। ছেঃ। যদি জানাজানি হয়ে যায়?

ইসস্‌।

রাত চলে যায় রাতের মনে।

কারও কাম চরিতার্থ হয়। কারও হয় না। কারও পরীক্ষায় প্রশ্ন কমোন আসে, কারও আসে না। রাত বড় ঢেঁটিয়া ; নির্দয়। তার মন বোঝা দায়। প্রোষিতভর্তিকাকে কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে থাকতে দেখেও রাতের করুণা হয় না। সেন সাহেবকে লাল কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে থাকতে দেখেও হলো না।

রাত চলে যায়, রাতের মনে।

সে রাতও গেলো। হাড়ে কালি মাখিয়ে দিয়ে গেলো সেন সাহেবের।

তিন

কে যেন ডাকছিল সেন সাহেবকে।

সেন সাহেবের মৃত মা কি ? না, রিনা ? সেন সাহেবের স্ত্রী ? না কি টিনা ? সেনসাহেবের মেয়ে ?

কে যেন ডাকছে দূর থেকে। মাথার মধ্যে কাঁপন তুলছে সেই ডাক।

সাহাব ! চায়ে লায়া, সাহাব !

সেন সাহেব ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

পায়জামার দড়িটা খোলা ছিল। রাতের অন্ধকারে এই দড়িই খোলার জন্যে অধীর উৎকট আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আলোয়-ভরা সকালে সেই দড়ি বাঁধার জন্যেই ছটফট করতে লাগলেন। মশারী থেকে বেরিয়ে দেখলেন, হন্‌সো দাঁড়িয়ে আছে চা নিয়ে। মুখে, সেই নিস্পাপ সরল হাসি। চোখে, কোনো পাপ নেই, আবিলতা নেই। শুধু বনহরিণীর মত সরল বিশ্বাস আছে।

মনে পড়লো, কাল রাতে দরজাটা ভেজিয়ে রেখেছিলেন। বন্ধ করেননি।

চা-টা হাতে নিয়ে বসবার ঘরে এসে বসলেন সেনসাহেব।

চা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগলো। সেনসাহেব বসেই রইলেন।

বড় লজ্জা হলো ! কিন্তু পরমুহূর্তেই ঝক্‌ঝকে রোদে ঝল্‌মলে টগর গাছটার দিকে চেয়ে এক দারুণ ভাললাগায় ভরে উঠলোতাঁর মন। কী লজ্জা। কি বিপদ। কী অপমানের হাত থেকে বেঁচে গেছেন তিনি গত রাতে। এ কথা ভেবে মা বগলামুখীকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। বর্ষার রাত বড় খারাপ। অন্ধকার খারাপ। মানুষের ভিতরের অন্ধকার দিকগুলো বড় প্রশ্রয় পায় সেই সময়ে। কাল যা ঘটলে খুবই খুশি হতেন বলে ভেবেছিলেন, তা সত্যিই ঘটলে আজ কি হন্‌সোর চোখে তিনি তাকাতে পারতেন ? না, হন্‌সোই পারতো তাঁর চোখে চাইতে ?

জীবনে, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধহয় কিছু কিছু চাওয়া থাকে, যা পাওয়ায় পর্যবসিত না হলেই এক গভীর আনন্দ বেঁচে থাকে বুকে। যে আনন্দ, মানুষ হওয়ার আনন্দ। অমানুষ হয়ে যেতে যেতেও মানুষ হয়ে থেকে যাওয়ার আনন্দ।

সেন সাহেব, গলা ছেড়ে, নিঃসঙ্কোচে ডাকলেন, হন্‌সো।

হন্‌সো উত্তর দিল মিষ্টি করে, হান্‌জী !

ঔর এক কাপ চায়ে লাও। বেগর চিনি। জাদা দুধ।

লা রহা হ্যায় সাহাব !

উঠোনে এসে দাঁড়ালেন সেনসাহেব। বটগাছের পাতায় পাতায় রোদ ঝিল্‌মিল্ করছে। কী পবিষ্কার আকাশ ! কী নিটোল সবুজ পরিবেশ ! তাঁর মনের মধ্যেও এক সুস্থ পরিচ্ছন্নতা

গভীরভাবে অনুভব করতে লাগলেন তিনি। তিনি যে শিক্ষিত, ভদ্রলোক, এই জানাটা জেনে খুশী হলেন নতুন করে।

বটগাছের পাতাদের দিকে চেয়ে নিরুচ্চারে বললেন, খারাপ-ভালোর কোনো সুচিন্তিত সীমারেখা বোধহয় নেই। প্রত্যেক মানুষেরই প্রান্তসীমাতেই বসবাস। কেউ না জেনে গণ্ডী পেরোয়। কেউ ইচ্ছে করে পেরোতে চেয়েও অপরাগ হয়।

ঘটনা, এটাই।

পরীক্ষা

বৌদি ! দাদাবাবুর ফোন !

রেখা উত্তেজিত গলায় অরাকে ডাকলো।

দিল্লী থেকে ?

শোবার ঘর থেকে শুধোলো অরা। তারপর বললো, দাঁড়া। দাঁড়া। আসছি। তোর সবতাতেই তাড়া।

অরা এসে ফোন ধরলো। বললো, অরা বলছি। কালকে এলে না কেন ? খবরও পাঠালে না কোনো !

আর বোলো না। চাড্ডার ইরেস্‌পন্‌সিবিলিটির জন্যে। একটা টেলেক্সও পাঠাতে পারতো। আমি কি জানি যে জানায়নি !

অফিস থেকে গাড়িও পাঠিয়েছিলো তোমার জন্যে। ড্রাইভার ফিরে এসে আমার উপর হম্বিতম্বি !

কী করবো !

কালকে আসছো তো ?

না। কাল তো নয়ই, আরও কদিন থাকতে হবে। চেয়ারম্যান এসে গেছেন।

কী যে করো না ! মেয়েটার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা আরম্ভ তিন দিন পরে আর মেয়ের বাবা...

তুমি তো জানোই যে আমি অপদার্থ বাবা।

শিমূল, দায়িত্ব তুমি চিরদিনই এমনি করেই এড়িয়ে গেলে। মেয়েকে নিয়ে কিন্তু বড়ই দুশ্চিন্তাতে পড়েছি কী যে করছে, তা কী বলবো !

কী করছে ? কুঁচ ?

রাত দেড়টাতে শুচ্ছে আর ভোর সাড়ে তিনটেতে চারটেতে উঠে পড়ছে আবার। এমনিই করে আসছে গত এক মাস। কলকাতায় থেকেও তো তুমি কত খোঁজ রাখো মেয়ের !

আমি চুপ করেই রইলাম। অপরাধী লাগছিলো নিজেকে। এ কথা সত্যিই যে অনেকই দায়িত্ব-কর্তব্য আমি করি না এই সংসারে।

বললাম, অসুখে পড়ে যাবে যে !

যাবেই তো ! পরীক্ষাই দিতে পারবে না।

অরা বললো, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গলায়।

আমি বললাম, নার্ভাস-ব্রেকডাউন হয়ে যাবে।

যেতে পারে।

দাও তো একটু।

কাকে ?

আহা কুঁচকে।

দিচ্ছি। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগের রাতেও আসতে পারবে না তুমি ?

না। আগের রাতে পারছি না কিছুতেই। তবে বুধবার রাতে ফিরবো। প্লেনে।

বাবা ! বুধবার। বৃহস্পতিবার, আর শুক্রবার বাংলা পরীক্ষা। ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেমেয়েদের ঐ দু-দিন তো সবচেয়ে বেশি চিন্তা। নাও কুঁচ-এর সঙ্গে কথা বলো।

তারপর গলা চড়িয়ে বললো, কুঁ-উ-উ-চ্। বাবা ফোন করেছেন দিল্লী থেকে।

কুঁচ এসে ফোন ধরলো। বললো, কী হলো আবার ! আমি পড়ছি যে !

পড়ছো তো জানিই। কেমন আছো ?

বাবাসুলভ দরদ ফুটিয়ে বললাম, আমি।

জানোই তো ভালোই আছি। খারাপ থাকলে কি খবর পেতে না ?

মায়ের কথা শুনছো না কেন ? মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমুলে অসুখে পড়বে যে !

মা কি আমার হয়ে পরীক্ষা দেবে ? এত বড়ো কোর্স ! দুবার অন্তত রিভাইস্ না করলে পরীক্ষাতে লিখবো কি করে ? এখানে তো আর সেমিস্টারে সেমিস্টারে পরীক্ষা হয় না। দশ বছরে যা পড়েছি তা তো তিন ঘণ্টায় উগরে দিতে হবে। যেমন পরীক্ষার সীসটেম তেমনই তো হবে।

তা বলে, তিন ঘণ্টা ঘুমুবে ?

ঠিক আছে। ছাড়ছি আমি।

মাকে দাও একটু।

মা। নাও। বলেই, চটি ফটফটিয়ে আমার 'ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট' মেয়ে চলে গেলো।

বলো। অরা বললো, রিসিভার নিয়ে।

ওকে ফস্‌ফোমিনটা রেগুলারলি খাওয়াচ্ছো তো ?

কনসার্নড গলায় শুধোলাম আমি।

না। বন্ধ করে দিয়েছি। ভীষণ গরম পড়ে গেছে।

ক্যালিফস্ সিক্স এক্স ? রাতে দু-চামচ করে মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া ? পেটটা এই সময় পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার।

দিচ্ছি। দিচ্ছি।

অরার স্বরে অনেকদিনের জমা ক্লান্তি ঝরে পড়লো। একটু অসহায়তাও। মায়েরাই তো আসল পরীক্ষার্থী। তবে আমার পরিবারে অরাই একমাত্র পুরুষ। যত দায়দায়িত্ব সবই ওর। আমি একটা অপদার্থ। মেয়েও বললে চলে আমাকে। অনেকই ব্যাপারে। আমি এরকমই।

রাতে কি খাবে বাড়িতে ? ফিরে ?

না, না। প্লেনেই খেয়ে আসবো।

কোথায় উঠেছো ? মেরিডিয়েনে ?

না। এবারে মৌরীয়া-শেরাটনে উঠেছি। চেয়ারম্যান এসেছেন তো ! উনিও এখানে উঠেছেন। তাই আমাকেও।

ঐ ক্যারাকটারলেস্ লোকটার সঙ্গে ?

কী করবো ! চাকরি তো !

বেশি ড্রিঙ্কট্রিঙ্ক করছো না তো !

আরে না না। তেমার ঐ এক চিন্তা। কুঁচকে বুঝিয়ে বোলো। নার্ভাস-ব্রেকডাউন না হয়ে যায়।

ওরা রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। ইস্পাত দিয়ে তৈরি। জন্মক্ষণ থেকেই কেরিয়ারিস্টি ; রোবোট। কুঁচরা আমাদের চেয়ে অনেকই বেশি শক্ত, সেল্ফ-কনফিডেন্ট !

আচ্ছা ছাড়ছি তা হলে। কোনো প্রয়োজন হলে হোটেলের ফোন নাম্বারটা রেখে দাও। অবশ্য চ্যাটার্জিকে একটা খবর দিলেও হবে।

ঠিক আছে। একটা ক্লান্তির হাই তুলে বললো, অরা।

॥ ২ ॥

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে চান করতে গেলাম।

ঠাণ্ডাগরম জলের ধারার নিচে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, দিনকাল কত্ব বদলে গেছে !

এখনকার বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের জন্যে কতই না চিন্তা করেন। আসলে আমরাই হচ্ছি, মানে, যাদের বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই, লাস্ট জেনারেশান, যাদের শাঁখের করাতের মতো আগের প্রজন্ম এবং পরের প্রজন্মর মানুষেরা দু'দিক দিয়েই কেটে গেছে এবং যাবে। আমাদের বাবা-মায়েদের প্রতি আমাদের এখনও যতখানি চিন্তাভাবনা, দরদ, কর্তব্যবোধ আছে তার ছিটেফোঁটাও বোধ হয় আমাদের ছেলেমেয়েদের থাকবে না আমাদের প্রতি। তবু, আমরা ছেলেমেয়ে, তাদের কেরিয়ার, তাদের ভবিষ্যৎ ছাড়া কিছু মাত্র চিন্তা করতে পারিনি। যদিও ওরা আমাদের হয়তো পুরোপুরিই ভুলে যাবে।

আমি যখন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিই ঠিক তখনই আমাদের কলিন রোডের ছোট্ট দোতলা বাড়িতে বড়দিদির বিয়ে। আমার জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ে। জ্যাঠামশাই অল্প বয়সে মারা গেছিলেন তাই সব দায়িত্ব ছিল বাবার। দূরাগত আত্মীয়স্বজনেরা, আমার ঠাকুমা যাঁদের বলতেন "নাওরি-ঝিওরি", বিয়ের অনেকদিন আগে থেকেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। শোবার জায়গা নেই বাড়িতে, পড়ার জায়গা তো নেইই। ছাদের সিঁড়িতে বা কাজের লোকদের উগ্র বিড়ির গন্ধ-ভরা ঘরে বসে পড়েছি। পরীক্ষার দিনও ঠাকুরের কাছ থেকে যা রান্না হয়েছে তাই একটু চেয়ে খেয়ে আট নম্বর বাস ধরে জগবন্ধু ইনস্টিট্যুশানে পরীক্ষা দিতে গেছি। বাবা অথবা মায়ের সেই সময় আমার কথা ভাবার সময়টুকু পর্যন্ত ছিলো না। তাঁদের প্রজন্ম বিশ্বাস করতেন "সার্ভিস বিফোর সেল্ফ"-এ।

ভালো হবার হলে ছেলেমেয়ে ভালো হবেই। আর না হবার হলে নয়। এমনই এক ধারণা ছিলো ওঁদের। তবে আমার পরীক্ষার অল্প কিছুদিন আগে বাবা হঠাৎই বিবেকদংশনে তাড়িত হয়ে আমার জন্যে তিনজন মাস্টারমশাই রেখে দিয়েছিলেন। ইংরিজি, অঙ্ক এবং ম্যাথস্-এর জন্যে। কিন্তু ততদিনে গোড়াই উইপোকাতে খেয়ে গেছে। উপরে বারিসিঞ্চন করে লাভ ছিলো না কিছু।

আমার মেয়ে কুঁচ প্রথম থেকেই পড়াশুনোতে ভালো। ব্রিলিয়ান্টই বলা চলে। তার ভালো স্কুল এবং তার মায়ের অতন্দ্র মনোযোগে তার খারাপ হওয়ার উপায়ও বোধ হয় ছিলো না। কিন্তু সবচেয়ে যা বড় কথা, তা হচ্ছে ওর নিজের ভালো হওয়ার তাগিদ এবং

ভেতরের জেদ। যা আমার ছিলো না। আমাদের স্কুল থেকে শেখার ইচ্ছে যাদের ছিলোও তাদেরও শেখার তেমন উপায় ছিলো না।

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে আমাদের সময়ে একজন মানুষের জীবনে পড়াশোনাটাই জীবনের একমাত্র বিবেচ্য বস্তু ছিলো না। স্বভাব, চরিত্র, অন্যর উপকারে আসার গুণও ছোট করে দেখা হতো না। পড়াশোনায় ভালো হওয়াই জীবনের একমাত্র উৎকর্ষ এ কথা একমাত্র প্রণিধানযোগ্য সত্য বলে কখনওই বিবেচিত হতো না। বাবা-মায়েদের কাছেও নয় আমাদের কাছে তো নয়ই! আমাদের শৈশব ও কৈশোরকে আমরা পুরোপুরিই উপভোগ করেছি। পড়াশোনাতে তেমন ভালো ছিলাম না বলে কোনো খেদ ছিলো না আমাদের মনে। ঐ সময়ে যে-সব ছাত্ররা শুধুমাত্র পড়াশোনাতেই ভালো ছিলো তারা পরবর্তী জীবনে অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। পড়াশোনাতে ভালো হওয়া ছাড়াও জীবনে "কিছু" হয়ে উঠতে গেলে যে-সব গুণের দরকার হয় তা হয়তো তাদের ছিলো না। কিন্তু কুঁচদের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে পড়াশোনাতে বিশেষ ভালো না হতে পারলে পৃথিবীর সব দরজাই তাদের জন্যে বন্ধ। আমাদের সময়ে কেউ ইচ্ছে করলে ভ্যাগাবণ্ডও থাকতে পারতো। প্রত্যেক পরিবারই যৌথ পরিবার ছিলো। তখনও মুদ্রাস্ফীতি, আত্মসুখ, বহুবিধ ভোগ্যদ্রব্য এবং পেশাদার রাজনীতির দৈত্যরা বোতল ছেড়ে বেরিয়ে এমন ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধায়নি। যৌথ পরিবারের বীমার ছাতার তলাতে কারো পক্ষেই বাঁচা অসম্ভব ছিলো না তখন। পাগল, হাবা, বোকা, বেকার কাউকেই তার পরিবার সেদিন ফেলে দিতো না। কিন্তু আমার মেয়ে কুঁচেরা যে-প্রজন্মর মানুষ সেই প্রজন্মে বাঁচা ও মরার মধ্যে কোনো "বাফার-জোন" বা মধ্যবর্তী এলাকা নেই। নিরুপদ্রব শান্তিতে যেমন তেমন করে নিজেদের খুশিমতো বাঁচার কোনো উপায়ই নেই ওদের আর। হয় খুব ভালো হও, নয় একেবারেই হারিয়ে যাও। মুছে যাও। কঠিন, জেদী না হয়ে ওদের বাঁচারই উপায় নেই।

আমরা আমাদেরই মতো ছিলাম। কুঁচরা কুঁচেদের মতো। কোন্ প্রজন্ম অপেক্ষাকৃত ভালো তা বিচার করার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা প্রগাঢ় বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি। ওদের জন্যে প্রায়শঃইগর্বিত এবং ক্বচিৎ লজ্জিতও বোধ করি। বড় ভয় হয় যে, ওরা বড় হলে, বিয়ে করলে, আমাদের মতো নিটোল অথচ পার্থক্য-জরজর দাম্পত্য জীবনের দুঃখ এবং সুখ উভয় থেকেই ওরা বঞ্চিত হবে। ওদের জীবনে হয়তো সুখ থাকবে। অথবা দুঃখ। সুখেদুঃখে মেশোনো এমন ইস্টারেস্টিং মিশ্র জীবনে ওরা হয়তো বিশ্বাসই করবে না। শুধুই সুখ অথবা শুধুই দুঃখ যে বড়ই ক্লান্তিকর এবং অসহনীয় এই কথাটাই হয়তো ওরা বিশ্বাস করবে না। এবং করবে না বলেই, বড় চিন্তা হয় ওদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

ভারি খারাপ লাগছিলো মেয়েটার পরীক্ষারসময়েও কলকাতায় থাকতে পারলাম না বলে। বাবা হিসেবে, ওর জন্যে আমার কিছু করা উচিত ছিলো। ওর মা এত কিছু করছেন। কিন্তু কী করতে পারি আমি! তবে এটুকু বলবো, নিজেকেই বলবো যে, একজন আধুনিক মোটামুটি শিক্ষিত বাবা হিসেবে ওদের সঙ্গে প্রায় সব বিষয়েই মতের অমিল থাকলেও ওদের একটি সম্পূর্ণ অন্য এবং ব্যতিক্রমী প্রজন্মর সদস্য হিসেবে মর্যাদা সহানুভূতি ও মমতার সঙ্গে সবসময়েই আমি বোঝার চেষ্টা করি। ওরা আমাদের মতো নরম, অভিমানী, অন্যের প্রতি কন্‌সিডারেট হলে ওরা যে ধনে-প্রাণেই মারা যাবে সে কথা বুঝেই ওদের বড় হয়ে ওঠার প্রকৃতি নিয়ে আর কোনোরকম খুঁতখুঁতানি রাখি.না।

তা ছাড়া, অরার যেমন কুঁচ, আজকালকার সব ছেমেয়েরাই বোধ হয় তাদের মায়েদেরই

ছেলেমেয়ে !

আমাদের সময়ে বাবারা সবসময়ই দূরের মানুষ ছিলেন । আমরাও তাইই হয়ে গেছি । তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে । আমরা, বাবা হিসেবে ছেলেমেয়েদের মাঝে-মধ্যে চিড়িয়াখানা, বা ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে নিয়ে যেতে পারি বা ছুটিতে কোথাও বেড়াতে । কখনও সখনও চাইনীজ খাওয়াতে বা সাঁতার কাটাতেও নিয়ে যেতে পারি কিন্তু ওদের হৃদয়ের মর্মস্থলে আমরা শতচেষ্টাতেও পৌঁছতে পারি না ।

তিন্নি ঘোষ, পুনপুন সেন, জ্যোতি খেতান বা পিংকি মালহোত্রার সঙ্গে আমার মেয়ে কুঁচ-এর মানসিকতা রুচি বা অরুচি, তৃষ্ণা বা বিতৃষ্ণা একই সুরে বাঁধা হলেও লক্ষ করি যে, ওরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব । আমাদের বয়স যখন ওদের মতো ছিলো তখন আমাদের কারোই ঐ রকম ঋজু এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি আদৌ । তাই অবাক বিস্ময়ে আমি ওদের দূর থেকে সম্ভ্রমের চোখে দেখি । ওদের জেদ, জীবনের যুদ্ধে লড়বার জন্যে এই অল্প বয়স থেকেই প্রাণপণ চেষ্টা, আমাকে মুগ্ধ যেমন করে, তেমন দুঃখিতও যে করে না তাও নয় । ওদের এত কম বয়স থেকেই এমন প্রতিযোগিতায় ঊষর জীবনে দীক্ষিত করার মূলে যে আমাদের প্রজন্মর অশেষ দায়িত্ব এবং কর্তব্যজ্ঞানহীনতাই দায়ী সে সম্বন্ধে কোনোই সংশয় নেই আমার ।

বাথরুমের টেলিফোনটা বেজে উঠলো । কতক্ষণ যে নিজের ভাবনায় নিজে বুঁদ হয়েছিলাম তার হুঁশ ছিলো না ।

চেয়ারম্যান বললেন, শিমূল, প্লীজ কাম টু মাই রুম । সামবডি হ্যাজ সেন্ট মী আ বটল অফ্ রয়্যাল-স্যালুট । জারা "পী-পা"কে 'হায়াট্ রিজেন্সীমে' চলেঙ্গে খানাকে লিয়ে । পাঁচ মিনিটমে আ যাও । ডোন্ট বী আ অ্যান্ আন-সোশ্যাল অ্যানিম্যাল ।

চেয়ারম্যানের অনুরোধ ! হিজ উইশ ইজ আ কম্যান্ড টু মী । আমরা পাঁচপুরুষের চাকর । পা-চাটাটা আমাদের অতি সহজেই আসে । সাদা, কালো, বাদামী ; বেতো, ফুলো, নুলো ; কোনো পায়েই আমাদের বিতৃষ্ণা নেই ।

বললাম, ইয়েস্ স্যার ।

জামা-কাপড় পরতে পরতে ভাবছিলাম, গিয়ে হ্যাঃ হ্যাঃ হিঃ হিঃ করতে হবে । অতি স্থূল সব রসিকতা শুনতে হবে । প্রথম দু-তিন মিনিট খাঁটি অক্সোনিয়ান অ্যাকসেন্টে ইংরিজি শুনতে হবে কিন্তু তারপরই অকৃত্রিম হরিয়ানা অ্যাকসেন্ট জবর-দখল নেবে চেয়ারম্যানের জিভের । এই হচ্ছে শ্রীশিমূল বোসের সাফল্যের চূড়ান্ত রূপ । আমাদের মতো মানুষদেরই কষ্টার্জিত আয়ের উপর ট্যাক্স দেওয়া সঞ্চয় যে-সব জাতীয় লগ্নিতে থাকে সেইসব জাতীয় লগ্নির টাকা মেরে যে-সব মানুষ ক্যাডিলাক লিমুজিন চড়ে এবং রয়্যাল-স্যালুট হুইস্কি খায় তাদের পায়ে তেল দিয়েই হ্যাঃ ! হ্যাঃ ! হিঃ ! হিঃ ! করে আমাদের সংসার প্রতিপালন করতে হবে । দিস ইজ আওয়ার লট ।

আমি ঘেন্নার সঙ্গে রয়্যাল-স্যালুট হুইস্কি খেতে খেতে ভাবছিলাম, কুঁচদের জীবনের মানে,সার্থকতার ব্যাখ্যা কি কিছু অন্যরকম হবে না ? যদি নাইই হয়, তাহলে আমরা কী রাখার মতো রেখে যাবো ছেলে-মেয়েদের জন্যে ? আমিও কি "বাবা" ডাকের যোগ্য ? আসল উত্তরাধিকার যে ব্যাঙ্কের টাকা নয়, সম্পত্তি নয়, তা চরিত্রর শুদ্ধতা, সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থা, মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার ; এ কথা তো আমরা নিজেরাই বুঝিনি । কাউকে বোঝাবারও চেষ্টা করিনি । এই উত্তরাধির কুঁচদের দেবার জন্যেও বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করিনি । তাই আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবন হয়তো কুকুর-বেড়ালের জীবনেরও

অধম হবে।

॥ ৩ ॥

প্রথম পরীক্ষার দিন, সোমবাব সকালে ঠিক সাতটাতে কলকাতাতে ফোন কবলাম। কুঁচকে বললাম, অল দ্যা বেস্ট কুঁচ।

সে হেসে বললো, থ্যাঙ্ক উ্য বাবা।

খুব গর্ব হলো আমাব ওব সপ্রতিভতা ও সাহস দেখে। ওদেব তুলনাতে আমবা সত্যিই ম্যাদামাবা ছিলাম। নাভার্স, আত্মবিশ্বাসহীন।

বাতেও আবাব ফোন কবেছিলাম। শুধোলাম, পবীক্ষা কেমন হলো কুঁচ?

মেযে মনোসীলেবল্-এ বললো, ঠিকই আছে।

বুঝলাম যে, ভালো পবীক্ষা দিযেছে। ওদেব ভোকাব্যুলাবিব বকমই এমন।

॥ ৪ ॥

ফ্লাইট অনেক ডিলেড ছিলো। বাডি ফিবলাম গভীব বাতে। অবা, এক নম্বব পবীক্ষার্থী, ঘুমিযে পডেছিলো। দু নম্বব পবীক্ষার্থী কুঁচই এসে দবজা খুললো। কুঁচ তখনও পডছিলো। হাউসকোট পবা। দু-দিকে দুটি কঠো বেণী ঝুলছে। বড বোগা হযে গেছে মেযেটা আমাব এই ক'দিনে। চোখেব কোণে কালি জমেছে।

বসবাব ঘবেব দেওযাল-ঘডিতে দেখলাম বাবোটা বাজে।

বললাম, তুমি শোবে না কুঁচ?

শোবো। পডা হলে। দুটোব সমযে।

কাল কি পবীক্ষা?

বাংলা।

উঠবে কখন আবাব?

চাবটেতে।

এলার্ম দিযে বেখেছো?

হ্যাঁ।

তুমি অসুখে পডে যাবে কুঁচ। পরীক্ষাই দিতে পাববে না। তুমি যদি ফেল কর তাহলে তোমাকে সোনাব মেডেল দেবো আমি।

ঠিক আছে। কিন্তু খাবাপ বেজাল্ট করলেও তুমি কি আমাকে পাথে প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি কবতে পাববে বাবা? নিজেব পাযে দাঁডিযে আছি তা দেখতে পাবে? তুমি বিটাযার করার পবও কি আমাকে এমন সুখে বাখতে পাববে বাবা?

অসহায বাবা, আমি মুখ নামিযে নিলাম। এত বাতে একজন অন্তঃসারশূন্য বাবাব পক্ষে এই অন্তঃসাবশূন্য দেশ ও সমাজেব প্রেক্ষিতে এমন সাংঘাতিক সব প্রশ্নব জবাব দেওয়া সম্ভব ছিলো না।

কুঁচ বসবাব ঘবেব তীব্র আলোর মধ্যে আমাব চোখেব গভীবতম প্রদেশে তার চোখ বেখে তাব ঘরে চলে গেলো। নিজের ঘবে পৌঁছনোর পূর্ব মুহূর্তে ঘুবে দাঁডিয়ে বললো, যেসব কথার কোনো মানে হয না, সে সব কথা বলো কেন বাবা?

চান-টান করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে আমি শুয়ে পড়লাম। কলকাতায় বেশ গরম পড়ে গেছে।

আমার কুঁচ, অঙ্ক করার সময় কানে হেড-ফোন লাগিয়ে ওয়াক্‌ম্যানে ইংরিজি গান শোনে। তাতে নাকি "কনসেনট্রেশান" ভালো হয়। ওদের রকমসকমই আলাদা। বাংলা গন সে ভালোবাসে না। বাংলা বই পড়ে না। ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের কোনো খোঁজ রাখে না অথচ বাখ্‌, বীটোভেন, মোৎজার্ট, মেন্ডল্‌হেনসন তাদের হীরো। রক, পপ, জ্যাজই তাদের ক্রেইজ। ওরা ওদেরই মতো। আমাদের মতো একেবারেই নয়।

আমাদের ছেলেবেলায় পড়াশুনো না করার জন্যে বকুনি শুনতে হয়েছে কিন্তু বেশি পড়ার জন্যে কখনও শুনতে হয়নি। ওরা এক আশ্চর্য প্রজন্ম। ওদের পুরোপুরি বোঝা আমাদর পক্ষে অসাধ্য। ওরা এত বেশি শক্ত এবং জেদী আমাদের তুলনাতে যে, ওদের ভাঙার চেয়ে নিজেদের ভাঙা অনেকই সোজা।

প্রায় একটা বাজে এখন। এপাশ ওপাশ করছিলাম। নানা কথা ভাবতে ভাবতে। ঘুম আসছিলো না। রাতের ফ্লাইটে ফিরলে আমার ঘুম আসতে দেরি হয়।

অরার সঙ্গেই শোয় কুঁচ, অরার ঘরে। যদিও পড়াশোনা করে তার নিজেরই ঘরে। অনেক রাত অবধি আমার আলো জ্বালিয়ে পড়াশোনা করার অভ্যেস। সেই কারণে কুঁচ আসার পর থেকেই অরা কুঁচকে নিয়ে আলাদা ঘরে শোয় রাতে। সপ্তাহে দু একদিন রাত গভীর হলে বা শেষ রাতে আমার ঘরে আসে। এখন তো বানপ্রস্থে যাবার সময়ই এগিয়ে এলো।

নিশুতি রাতে হঠাৎ আমার বাহুর সঙ্গে অন্য নরম বাহুর ছোঁয়া লেগে ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পেলাম যে-আমার পাশে শুয়ে আছে, সে আমার স্ত্রী অরা নয়, আমার মেয়ে কুঁচ।

যে-মেয়েকে রোজ রাতে শোওয়ার আগে শতবার একটি "আব্বা" দিয়ে যাবার জন্যে ডাকলেও সে হেসে চলে যায়। বলে, কাল সকালে। আর সকালে ডাকলে, দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে : রাতে দেবো। সে মেয়েই কী না বিনা আমন্ত্রণে আমার পাশে এসে চুপিসাড়ে শুয়েছে মাঝ রাতে! অবাক কাণ্ড!

ফিসফিসে গলায় আমি বললাম, কী রে, কুঁচ?

কুঁচ উত্তর দিলো না কোনো।

অন্ধকারে তার মুখে আমার বাঁ হাতের আঙুলগুলি বুলাতেই দেখি তার দু চোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে।

আমি উঠে বসে বললাম, এ কী! কি হয়েছে কুঁচ?

কথা না বলে, হঠাৎই চাপা কান্নায় ভেঙে পড়লো কুঁচ। তারপরই আমার দিকে পাশ ফিরে আমার গলা জড়িয়ে ধরে অস্ফুটে বললো, বাবা!

সেই মুহূর্তটিতে কী যে ঘটে গেলো এই অপদার্থ, কর্তব্যজ্ঞানহীন, মেরুদণ্ডহীন শিমূল বোসের মধ্যে ; একজন বাবার মধ্যে! যে-অপত্যস্নেহ প্রকাশ—ক্ষেত্রের অভাবে, দু পক্ষরই সময়ের অভাবে, বাঁধ-বাঁধা নদীর ফেনিলোচ্ছ্বাসেরই মতো নীরবে গর্জন করছিলো এত বছর আমার নির্জন ঊষর বুকের মধ্যে, তা সহসা বাঁধ ভেঙে কুঁচের প্রতি এতদিনের পুঞ্জীভূত অপ্রকাশিত অভিমানকে ঠেলে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো এক মুহূর্তে। নিঃশব্দে আমার চোখ ভেসে যেতে লাগলো জলে। মায়ের মৃত্যুর পরে এমন করে কখনও কাঁদিনি। বুকের মধ্যে এয়ার-বাসের এঞ্জিন চালু হলো। হঠাৎ। মধ্যবয়স্ক শিমূল বোস, এই আমি, আমার চোখের

ধারার মধ্যে দিয়ে আমার অপদার্থতার গ্লানিকে মাড়িয়ে গিয়ে আশ্চর্য সুন্দর শিহরিত এক উত্তরণে পৌঁছোলাম।

কুঁচ বললো, আমার বড় ভয় করছে বাবা! আমি বাংলাতে ফেল করবো।

আমার খুব আনন্দ হলো এ কথা জেনে যে, কুঁচ আমার অতি-মানবী নয়। ও আমাদেরই মতো সাধারণ। ভয় বলে কোনো ব্যাপার তারও অভিধানে তাহলে আছে!

আম ওকে দু বাহু দিয়ে জড়িয়ে রইলাম। তারপব বললাম, তোমাকে তো বলেইছি আমি যে, ফেল করলে সোনার মেডেল দেবো।

কুঁচ কথা বলছিলো না। ওব চোখ দিয়ে সমানে জল বইছিলো।

ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আমি ভাবছিলাম যে, আমি ওকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছি। ওকে যেমন করে হোক ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। এই নিষ্ঠুব নখদন্তময় পৃথিবীতে ওকে সারা জীবনের নিবাপত্তা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। হয়তো ওর বন্ধুদের বাবাদেরও কারো নেই। আমার অসহায়তায যেমন আমার কষ্ট হতে লাগলো তেমনই আমার মেয়ে যে ভয় পেয়ে তার বাবাব ঘরে উঠে এসেছে, তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে, এই ভাবনাটাই এক দারুণ অনভ্যস্ত শ্লাঘাতে আমাকে ভরে দিলো। আমি জানলাম যে, মানুষ হিসেবে আমি ব্যর্থ হতে পারি, নিজের জীবনে যা হতে চেয়েছিলাম, তা না হয়ে উঠতে পারি; কিন্তু আমি একজন সার্থক বাবা। এই সার্থকতাটুকুই বা বড কম কী!

কুঁচ এবারে বললো, আমি পবীক্ষা দেবো না বাবা।

আমি বিছানা থেকে নেমে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। যাতে অরার ঘুম না ভেঙে যায়। এখন "ফাদারিং টাইম"। বিপন্ন-কন্যা কুঁচ এখন শুধুই আমার একার। পিতাপুত্রীর এই কথোপকথনে মাযের কোনোই ভূমিকা নেই। এমন এমন গর্বময় মুহূর্ত আজকালকার বাবাদের জীবনে বড় বেশি আসে না।

আমি বললাম, কোন্ পবীক্ষাব কথা বলছিস রে কুঁচ?

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা! আবার কোন পবীক্ষা। কাল-পবশু বাংলা আছে।

ওঃ। ওই পবীক্ষা। স্কুল ফাইন্যাল? তা নাইই বা দিলি।

দেবো না? তুমি··

ও পরীক্ষা না দিলেও চলবে। কিন্তু অন্য সব পরীক্ষা?

কি? হিস্ট্রী, জিওগ্রাফী?

না, নাবে। প্রতিদিনকাব পরীক্ষারে মা। বক্সাব জো লুই কি বলেছিলেন একবার জানিস?

কি?

বলেছিলেন, "ইউ ক্যান বান বাট উ্যা ক্যানট হাইড"। পবীক্ষাবই আবেক নাম যে জীবন মা। তুই পালাবি কোথায? এই যে আমি দিল্লীতে গেছিলাম, তাও তো একটি পরীক্ষাই দিতে! তোর বড়মামা যে এত বড়ো সার্জন, রোজ সকালে যে তিনি এতগুলো করে অপারেশন করেন, প্রত্যেকটি বোগীর অপাবেশানই তাঁব এক একটি পরীক্ষা। তোর মা সকাল থেকে যে বাত অবধি আমবা কী খাব, কী পবে অফিস এবং স্কুলে যাব, তোর পড়াশুনো আমাব কাজ এই সব এবং আবো কত ভাবনা নিয়ে থাকেন তাই প্রত্যেকটি দিনই সকাল থেকে বাত তাঁরও তো পবীক্ষা। বোজকার পরীক্ষা। ড্রাইভার কাউলেশ্বর সিং যে রোজ সকাল সাড়ে আটটাতে এসে গারাজ থেকে গাড়ি বার করে এবং রাত সাড়ে আটটাতে গাড়ি ঢোকায় এই বারো ঘণ্টা তারও পরীক্ষা। একটি অ্যাকসিডেন্ট হলেই তার নিজের

কাছেই সে ফেল। তোর ভালোমানুষ 'স্যার', তোর অঙ্কের মাস্টারমশাই, যিনি তোকে এত যত্ন করে পড়ান ; তাঁর পরীক্ষাও যে তোর পরীক্ষার সঙ্গে জড়ানো। প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষাই তাঁর পরীক্ষা। কারণ তাঁর বিবেক আছে, দায়িত্ব-কর্তব্যজ্ঞান আছে। কালকের এই বাংলো পরীক্ষা তুই না দিতে চাস, তো দিস না। কিন্তু হার-জিতটা বড় কথা নয়। পরীক্ষাতে বসাটাই সবচেয়ে বড় কথা। তোর রমেশকাকা যে রোজ সকালে শামলা-গায়ে হাইকোর্টে যান তিনি কি প্রত্যেকটি মামলাতেই যেতেন ? হয়তো হারেন অনেক মামলাই। কিন্তু যে মামলাতে জিতবেন তারই শুধু ব্রিফ নেবেন আর যাতে হারবেন তার ব্রিফ নেবেন না, এমন ডিসিশান নিলে তো কোনোদিনই উনি বড় উকিল হতে পারতেন না। তোর গাডলুকাকা, যে কিছুই না করে হেসে খেলে জীবনটা কাটিয়ে গেলো, আমাদের ঠাট্টা করে, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ"-এ বিশ্বাস করে, তার জীবনেও প্রত্যেকটি দিনই পরীক্ষা। পাছে, সে চাকরি নিতে বাধ্য হয়, তার বোহেমিয়ান জীবনের দফারফা ঘটে ; এই তো তার সর্বক্ষণের ভয়। তোর স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা এইবার না দিতে চাস তো দিস না। কিন্তু জীবনে পরীক্ষাকে যারা এড়িয়ে যেতে চায় তারা যে মানুষই নয় রে মা। এ জীবনের প্রত্যেকটি ঘণ্টা, প্রত্যেকটি পদক্ষেপের আরেক নামই যে পরীক্ষা !

টেবলের উপরের টাইমপিসটার রেডিয়াম দেওয়া কাঁটাগুলি তখন রাত দুটো দেখাচ্ছিলো। টিক্‌টিক্ শব্দ করে সেই মধ্যরাতের নৈঃশব্দকে ফুটো করে যাচ্ছিলো ঘড়িটা।

কুঁচ একটি খুব বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

বড় বেশি কথা বলে ফেললাম কি ? যাত্রাদলের নায়কের মতো ? মেয়ের কাছে "বাবা" হওয়ার সুযোগ পেয়ে কি "ওভার-ডু" করলাম ?

কুঁচ আরেকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেই বললো, তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরো বাবা !

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে ওর গালে একটি চুমু খেয়ে বললাম, আজকে ভোরে উঠবে না তুমি। অমার কাছে শুয়ে থাকো। যেমন পারবে, তেমনই দেবে পরীক্ষা। ভুলে কিছুই যাওনি তুমি। সবই মাথায় ধরা আছে। প্রশ্নপত্র পেলেই দেখবে কলমের মুখে তরতর করে শব্দ আসছে। এ সব পরীক্ষা তো খেলার পরীক্ষা ! এমন অনেক পরীক্ষা দেবার পরই তো আসল পরীক্ষাতে বসতে হবে তোমাকে। জীবনের পরীক্ষা।

কুঁচ আমার কানের মধ্যে গরম নিঃশ্বাস ঢেলে দিয়ে বললো ; "ব্যাটল্ অফ লাইফ।"

বললাম, হ্যাঁ মা। ব্যাটল অফ লাইফ। তার জন্যে অ্যাডমিট কার্ড, আগে থেকে ঠিক করা পরীক্ষাকেন্দ্র ; কিছুই থাকবে না। কোথায়, কখন, কার সঙ্গে যে সেই যুদ্ধ লড়তে হবে তা আগে থেকে কিছুই জানা যাবে না। অথচ লড়তে হবে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। সে-পরীক্ষার প্রায় সব পেপারই "আন্‌সীন"।

এতক্ষণ কুঁচের সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে ছিলো। এবারে ওর শরীরের সব মাংসপেশী ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এলো। নিজেকে, নিজের ভয়কে সে নিঃশর্তে সমর্পণ করলো তার বাবার বুকে।

কুঁচ আবার বললো, বাবা। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরো।

হ্যা রে মা। ধরেছি জড়িয়ে।

আমি বললাম।

কুঁচের চোখের জল শুকিয়ে গেছিলো ততক্ষণে। কিন্তু আমার দু চোখ আরো সিক্ত হলো।

কিণ্ডারগার্টেন ক্লাস থেকে অরাই কুঁচের পড়াশোনার সব দায়িত্ব বহন করেছিলো। আমি কিছুই করিনি। আমার মেয়ে এতদিন আধো-চেনাই ছিলো আমার কাছে। মনে মনে বললাম, শিমূল বোস, ভাগ্যিস তোমার মেয়ের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা চলছিলো। ভাগ্যিস বাংলা পরীক্ষার আগের রাতে সে ভয় পেয়েছিলো। তাই তুমিও আজ হঠাৎ এক মস্ত পরীক্ষাতে পাস করে গেলে।

টাইমপিস আর পাখার শব্দে শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো-মাখা কলকাতার রাতের দুধলি অন্ধকার চারদিকে চারিয়ে যাচ্ছিলো। ফুলের গন্ধ আসছিলো সেনদের বাড়ির বাগান থেকে। গভীর আনন্দে, আমি আমার মেয়েকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে রইলাম।

পাল্‌সা

হুস করে একটি হলুদ-বসন্ত পাখি কেদগাছটার সরু ডালে কাঁপন তুলে উড়ে গেল টুটিলাওয়ার দিকে।

পাখিটি ফিসফিসে বৃষ্টিতে ভিজছিলো এতক্ষণ। ঠোঁট দিয়ে ভিজে পালক পরিষ্কার করছিলো। একটি পাহাড়ি-বাজ কোথা থেকে এসে তার খুব কাছ দিয়ে উড়ে গেলো। তরঙ্গিত হাওয়ায় তার ডানার আঁশটে গন্ধ পেলো হলুদ বসন্ত পাখিটা। ছটফট করে উঠলো ও ভয়ে।

তারপরই উড়ে গেলো, হুস করে।

লাওয়ালঙের পুরানো ভাঙা বাংলোর চৌপাইয়ে শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে শ্রাবণের বৃষ্টিভেজা সকালের সুবাস নিচ্ছিলাম। আজকাল এ সমস্ত জায়গাই ন্যাশনাল পার্ক হয়ে গেছে। চোরা শিকারীরা ছাড়া এ জঙ্গলে পাহাড়ে কেউই ঢোকে না। মাঝে মাঝে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জীপ গুবরে পোকার মত দূর দিয়ে গুড়গুড়িয়ে চলে যায়।

গুররা এবং আমি চুরি করেই এখানে এসেছি। ধরা পড়লে নির্ঘাত জেল এবং রাইফেলের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হবে। চুরি করে শিকার করা যে নিতান্তই খারাপ তা আমরা জানি তবু জেনেশুনেই নিরুপায় হয়ে এসেছি। প্রকাশ্যে পারমিট নিয়ে দাবানলের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কিছুই পাওয়া যায় না জেনেই চুরি করতে হয়। এখন অবশ্য সর্বত্রই ক্লোজড্ সীজন। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই।

কাল রাতে আমার জ্বর হয়েছিলো। এখনো একটু একটু জ্বর আছে।

এখন এই জঙ্গলে পাহাড়ে হাজারীবাগ জেলার শ্রাবণমাসে রীতিমত ঠাণ্ডা। পরশু মাচায় বসে বৃষ্টিতে খুব ভিজেছি। প্রায় তিন চার ঘণ্টা। তাতেই জ্বর হয়েছে।

গুররা ভোর পাঁচটায় উঠে আদা দিয়ে আমাকে এক মগ চা করে দিয়ে পালসা শিকারে বেরিয়েছে। বলেছে, চুপ করে শুয়ে থাকতে। শাসিয়েছে, বাংলোর বাইরে বেরোলে পয়েন্ট টু টু রাইফেল দিয়ে চুতর চিরে দেবে। ও বলে গেছে যে, বেলা হলে, মুন্নী এসে আমাকে বার্লি খাইয়ে যাবে। মুন্নীর বাবা এই জঙ্গলের কেঁদ পাতার ইজারাদার। জঙ্গলের মধ্যেই কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে মাটির দোতলা বাড়ি বানিয়ে সে থাকে। মুন্নীর নাম শুনেছি আমি গুররার কাছে। এখনো চোখে দেখিনি।

গুররার বয়স তিরিশ হবে। রাঁচীতে একটি মার্চেন্ট অফিসের কেরানী। যে লোকটা সুগঠিত কাঁধের ওপর রাইফেল ফেলে সকাল থেকে রাত অবধি বনে পাহাড়ে অবলীলাক্রমে ঘুরে বেড়ায় তাকে প্রায়ান্ধকার অফিসের ডেস্কে ঘাড় নিচু করে বসে লেজার যোগ দিতে

দেখলে বড় কষ্ট হয়। তখন ওকে যত বিমর্ষ দেখায়, সার্কাসের বাঘকেও অত বিমর্ষ দেখায় না। জঙ্গলে পাহাড়ে এলেই ডিজেল-লোকোমোটিভের মতো, ওর ভিতরে একটি বহু অশ্বশক্তিসম্পন্ন জেনারেটার গোঁ গোঁ করতে থাকে। ও যত বেগ সইতে পারে না তার চেয়েও অনেক বেশি বেগ ও বয়ে বেড়ায় তখন। লাল-গা, কালো-মুখ বুনো কুকুরের মতো ও হন্যে হয়ে ওঠে। নগ্ন হয়ে ঝর্ণায় চান করে, মহুয়া কুড়োনো ওঁরাও কিশোরীকে জোর করে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। পাহাড়ের ওপরের চিতার গুহায় বন্দুক বগলে বিনা দ্বিধায় ঢুকে পড়ে। মানে, নিজের সবগুলি অবদমিত ইচ্ছাকে অনেকগুলি বেগুনি ললিপপের মত নির্লজ্জ ছেলেমানুষ হয়ে একসঙ্গে চুষে চুষে খায়।

গুর্‌বার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। যেখানেই ওর সঙ্গে গেছি, দেখেছি ; মুহূর্তের মধ্যে খিদ্‌মদ্‌গারীর লোক জোগাড় হয়ে গেছে। মাথা রাখার ঠাঁই জুটেছে, মোরগা আণ্ডা জুটেছে, যত্ন আত্তি হয়েছে, কোনোরকম অসুবিধাই হয়নি। শহরে ইনকামট্যাক্স অফিসার এবং গ্রামে দারোগাসাহেবের যা প্রতিপত্তি, এই ছেলেটার এই বনে পাহাড়ে তার চেয়েও অনেক বেশি প্রতিপত্তি আছে।

দেখতে, গুর্‌বা ভালো নয় ! মানে, বেশ খারাপই। অনেকটা মাঝারি সাইজের ভাল্লুকের মত। কালো ; গাঁট্টাগোট্টা। সামনের পাটির দুটো দাঁত ভাঙা। চোখদুটো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। একমাথা এলোমেলো কোঁকড়া চুল। কোনোরকম নেশা নেই ওর। পান সিগারেট পর্যন্ত খায় না।

বাংলোটা বন বিভাগের নয়। কাঠের এক বড় ঠিকাদার বহুদিন আগে একসময় বানিয়েছিলেন। এখন ভেঙে পড়েছে। বন-বিভাগের বাংলোয় থেকে চুরি করে শিকার করা যায় না। এ বাংলোর চারদিকে ঘন শালবন। হাতায় বড় বড় ঘাস গজিয়েছে। এদিকে ওদিকে কেলাউন্দা ও পুটুসের ঝোপ্।

মংলুর বড় খয়েরী-সাদাতে মেশানো কুকুরটা ইঁট-ওঠা বারান্দায় শুয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে খচ্-খচ্ খচ্-খচ্ আওয়াজ করে গা চুলকাচ্ছে। আঠালী লেগেছে মনে হয়। চৌপায়াতেও বড় খট্‌মল্। কুটুস্ কুটুস্ করে কামড়াচ্ছে ! নড়াচড়া করলেই ক্যাঁচ-কোঁচ করে উঠছে চৌপাইটা। ঘরটা ছুঁচোয় ভরতি। রাতে আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা সত্ত্বেও বাস্কেটবলের মতো ছুঁচোগুলো আমাদের কম্বলাবৃত শরীরের উপর লাফালাফি করে বেড়িয়েছে।

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলাম। তারপর আবার ঘরের ভিতরে তাকালাম।

এক কোণায় গর্ত করে উনুন বানিয়েছে গুর্‌বা। অন্য পাশে ওর চারপাই। কাল বিকেলে দুটো মোরগ মেরেছিলাম আমরা। একগাছা দড়িতে ঝুলিয়ে রেখেছে সে দুটোকে উপর থেকে ! মোরগ দুটোর ঠোঁট চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়েছে মেঝেতে। রক্ত জমে রয়েছে। একটা ছুঁচো চুপি চুপি এসে সেই রক্ত চাটছে।

আমি শুয়ে শুয়েই ধম্‌কে বললাম, এই !

একটি অতর্কিত চিক্ আওয়াজ করেই ছুঁচোটি দৌড়ে গুর্‌বার চৌপাইর নীচে মেঝের গর্তে ঢুকে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রূপোর গয়নার রিনঠিন্ আওয়াজ শুনলাম বারান্দায়। মেঘলা আকাশেও যে আলোর আভা থাকে, সেই আলোয় দরজার পাশে একটি সুরেলা ছায়াকে চকিতে সরে যেতে দেখলাম।

মাথা উঁচু করে বললাম, কওন্ ?

মৌটুসী পাখির মতো একটি গলা বাইরের বৃষ্টির সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, ম্যায় মুন্নী হুঁ।

উঠে বসে বললাম, আও অন্দর আও, শর্‌মাতা কিঁউ।

মুন্নী এসে চৌকাঠে দাঁড়ালো।

জল-পাওয়া বোগোনভোলিয়া লতার মত ঋজু কমনীয় চেহারা, মাজা মাজা রঙ, মুখ-নাক যে খুব সুন্দর এমন নয়। ঠোঁটের গড়নটাও কেমন অস্বাভাবিক। কিন্তু চোখ দুটিতে ভারী, একটি দুষ্টুমিভরা বুদ্ধিদীপ্ত চঞ্চলতা। দুহাতে ধরে আছে এনামেলের বার্লির গ্লাসটি। একটি সতেজ রুক্ষ বেণী কাঁধ বেয়ে সামনে উরু অবধি পৌঁছেছে। মনে হল, বেণীটিরও যেন একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। তার মধ্যে জঙ্গলের গেরুয়া পথের মতো একটি গতি আছে। যৌবন ও কৈশোরের দুই আঙিনার মাঝের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে মুন্নী।

মুন্নী কথা খুব কম বলে। তাও বেশির ভাগ হুঁ হাঁ দিয়েই সারে। কথা যা বলার, তা চোখ দিয়েই বলে।

মুন্নী উবু হয়ে বসে, বেণীটাকে পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে, উনুনটা জ্বাললো। সস্‌প্যানে বার্লিটা ঢাললো। গরম করলো। গরম হলে, আবার গেলাসে ঢেলে চোখ তুলে আমায় শুধালো, নিম্বু ?

এ জঙ্গলে কে আমাকে লেবু এনে দেবে ?

বললাম, নিম্বু কাঁহা ইঁহা ?

অমনি মুন্নী ডান হাতটি ওর হাটিয়াতে-কেনা সস্তা ছিটের ব্লাউজের মধ্যে সটান ঢুকিয়ে দিয়ে ঠিক ওর শরীরেরই রঙের একটি ছোটো সুডৌল লেবু বের করলো, করে, গুর্‌বার ছুরিতে কেটে বার্লির গেলাসে নিংড়ে দিলো। আমি যখন গেলাসটি হাতে নিলাম, তখন মনে হলো মুন্নীর বুকের সুগন্ধ ও উষ্ণতার সবটুকুই ঐ পানীয় শুষে নিয়েছে। অত ভালোবেসে কেউ বার্লি খায়, তা আমি নিজে না খেলে জানতাম না।

গেলাসটি ফেরত দিলাম। মুন্নী হাত বাড়িয়ে নিলো। বারান্দার কুকুরটাকে মুন্নীর বিবেক দরজায় পাহারা দিতে ডেকেছিলো। একা ঘরে সুরাতীয়া মেয়ে কী করছে চোরা শিকারীর সঙ্গে তা দেখার জন্যেই বোধহয় ?

কুকুরটা ঘরের হাওয়া শুঁকে অপবিত্রতার গন্ধ না পেয়ে দরজার সামনে জোড়ো পায়ে বসলো। মুন্নী যেন লজ্জা পেয়ে চুড়ি রিন্‌ঠিনিয়ে, বেণী ইন্‌বিনিয়ে হাতের এক ঝট্‌কায় কুকুরটাকে যেতে ইশারা করলো। বললো, চল্‌ ! হঠ্‌।

কুকুরটা ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশীর মত দুঃখিত মুখে ফিরে গেলো।

বাইরে তখনো বৃষ্টি পড়ছিলো।

মুন্নী শুধালো, আপ্‌ আপ কোয়সে হ্যায় ?

খাস্‌ কুছ খরাব নহী।

আমি বললাম।

মুরুব্বীয়ানার সঙ্গে মুন্নী বললো, শিকার খেল্‌নে আজ বাহার মাত যাইয়ে গা।

তারপর ফিস্‌ফিসে বৃষ্টিতে শালবনের ঝরা ফুল-পাতা বিছানো গেরুয়া পথের বাঁকে মুন্নীর হলুদ শাড়ি মিলিয়ে গেলো।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনে নেই। এই বনে-পাহাড়ে বর্ষণসিক্ত আষাঢ় শ্রাবণের দুপুরের যে আমেজ, সে আমেজের তুলনা করি এমন কিছু আমার অভিধানে নেই। এ

আমেজ যদি বিক্রি করা যেতো, তাহলে প্রতি পল হাজার হাজার টাকায় বিকোতে।

সুবেলা দুপুর কাঁপতে কাঁপতে কখন যে ম্লান বর্ষাবিধুর বিকেলে পৌঁছে গেছে টেরও পাইনি। ঘুম দিয়ে শরীরটা বেশ ঝরঝরে ও সুস্থ মনে হচ্ছে। শুয়ে শুয়েই অনেক লোকের গলা এবং তার সঙ্গে গুববার গলাও শুনতে পেলাম। ওরা বটগাছের নিচ দিয়ে বনদেওতার থান ঘুরে এদিকে আসছে। শালটা জড়িয়ে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, এক প্রকাণ্ড শিঙ্গাল শম্বরকে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে কাঁধে তুলে প্রায় দশ বারোজন লোক নিয়ে আসছে। আর গুববা রাইফেল কাঁধে তাদের আগে আগে আসছে।

ওরা কাছে আসতেই গুববা বলল, কেয়া ইয়ার ? দেখা ? একদম বিলকুল নবপাঠঠা। একদম মস্তীমে থা।

বললাম, এত বড় জানোয়ার মারলে কেন ? জানাজ্যানি হয়ে গেলে যে বিপদ হবে।

গুববা ধমকে বলল, ছোড়ো ইয়ার যো হোগা সো হোগা। দিল্ তো খুশ হো গায়া।

সারাদিন খায়নি গুববা বাতে মুরগী রান্নার কথা। মংলুকে ডেকে বেশি করে চায়ের জল চাপাতে বললো। সবাই খাবে।

বোধহয় হঠাৎই মনে পড়লো ওর। শুধোলো, মুন্নী এসেছিলো ?

এসেছিলো। আমায় বুকে বাখা লেবু চিপে বার্লি খাইয়ে গেছে।

গুববার চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো। স্পট লাইটের আলোয় রাতে ভাল্লুকের চোখ যেমন জ্বলে। ফিসফিস করে বললো, মুন্নার বুক তো নয় যেন একটি আস্‌কল পাখি। নরম উষ্ণ আবেশে ধুকপুক করছে। ঐ পাখিকে একবার মুঠিতে ধরবার জন্যে আমি হাজার বার পৃথিবীতে আসতে পারি। তারপর বিড়বিড় করে বললো।

'নীগাহ যাযে কাঁহা সীনেসে উঠ কর।

হুয়া তো হুসন কি দৌলত গড়া হ্যায়।

অর্থাৎ চোখ যে সরাতে পারি না ইয়ার, সুন্দরীদের সমস্ত দৌলত তো খুদা ঐখানেই গড়ে রেখেছেন।

মংলু মুরগীটা ভাল রাঁধতে পারলো না।

গুববা রাত দশটা অবধি শম্বরের রক্তাক্ত শরীরে থকথকে রক্তে, নাড়িভুঁড়ির বদবুতে, প্যাৎপেতে রক্তমাখা চামড়ায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ালো। হাতে একটি ধারালো ছুরি, পরনে ছোট, কালো শর্টস, খালি-গা, মাথা-ভরা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল চওড়া-চওড়া থাবা। মনে হচ্ছিলো একটা কালো বাঘ মাচার নিচে মড়িতে বসে মাংস চিবোচ্ছে। একজন অনুচর ধুঁয়ো ছড়ানো হ্যারিকেনটা নিয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে পিছোচ্ছে।

শম্বরের পিলেটা গুববা টেনে বার করে দু'হাতে বেলুনের মত জোরে টিপলো। ভসস্ শব্দ করে একটা তীব্র দুর্গন্ধ বেরোলো। মংলু শম্বরের দাঁত দুটো ফাঁক করে দেখালো, বর্ষার সতেজ সবুজ জাবর কাটা ঘাসে তার মুখ ভরে রয়েছে। গলার নিচের থলিতেও।

মংলুর কুকুরটা মংলুর ধমক খেয়ে উদার ও নির্লিপ্ত চোখে অন্যদিকে চেয়ে বসে রইলো। কিন্তু উত্তেজনায় লোভে, অসংযমে ওর লেজটা কাঁপতে থাকলো থর থর করে, মুখ দিয়ে অসংযত একটি কুঁই-কুঁই, কাঁপা-কাঁপা আওয়াজ বেরোতে লাগলো।

শম্বরের চামড়া ছাড়ানো হল টাঙ্গী দিয়ে। কুপিয়ে কুপিয়ে টেংরী ফাড়া হল। পুরো গাঁয়ের লোক শালপাতা মুড়িয়ে "শিকার" নিয়ে গেলো। মংলুও ছুটি নিয়ে চলে গেল আজকের মত গাঁয়ে। এই বছরে আবার করে ওরা মাংস খাবে কে জানে। বড় গরীব তো ওরা। ওদের "প্রোটিন" বলতে এইটুকুই। নমাসে, ছমাসে চোরা-শিকারীর মারা মাংস।

এরাই পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের আসল নাগরিক। ওদের নেতারা দিল্লীতে থাকেন। হেলিকপ্টারে করে দুগ্ধফেনিভ খদ্দরের পোশাকে পাঁচ বছর অন্তর দেবদূতের মতো দেখা দিয়ে যান।

সব সারতে সারতে রাত এগারোটা হলো।

বিকেল থেকেই আমি খুব ভালো আছি। জ্বর একেবারেই নেই। এমন কি গুববার সঙ্গে মুরগীর ঝোল দিয়ে একটি হাত রুটিও খেয়েছি। আমরা দুজনে বাংলোর বারান্দার হাতল ভাঙা চেয়ার দুটোতে বসে আছি। শালটা জড়িয়েই বসেছি। পাছে আবার ঠাণ্ডা লাগে। খালি গায়ে বসে আছে গুববা। নির্বিকার। ওর গা দিয়ে শম্বরের রক্তের গন্ধ বেরোচ্ছে।

এখন আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে। এক ফালি চাঁদ উঠেছে সীমারীযার দিকের আকাশে। বর্ষণসিক্ত বনপাহাড় চাঁদের আলোয় চকচক করছে। চোখের মণি লাফিয়ে ওঠে সেদিকে চাইলে।

আমাদের বাংলো থেকে প্রায় একশো গজ দরে দূরে লাওয়ালঙের পুরানো ভাঙা রাস্তাটি চলে গেছে বাংলোর তিনপাশ ঘুরে। এ পথে গাড়ি চলে না। তবে মংলু বলছিলো, আজকাল শহরে সৌখিন বাহাদুর শিকারীরা রাতের শিকারের জন্যে জীপ নিয়ে এই রাস্তায় প্রায়ই ঘোরাঘুরি করে। জীপের যান্ত্রিক গোঙানিতে জঙ্গলের গভীরের গ্রামের লোকে ঘুম ভেঙে যায়। তারা নাকি এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। সেদিন, কার মোষের গায়ে গুলি লেগেছিলো। জানোয়ার বিচার করে না। মদ্দা মাদী বিচার করে না। আলোতে চোখ জ্বলে উঠলেই গুলি চালায়। হিংস্র জানোয়ারদের গুলি করে, আহত অবস্থায় ফেলে পালায়। খুঁজে বের করে মারবার সাহস রাখে না। গর্ভবতী মাদী হরিণের পেটে গুলি করে জঙ্গলে ফেলে রেখে যায়।

গুববার ভারী রাগ এই শিকারীদের উপর। গুববা এদের বলে, ভিখারি। বাহাদুরীর ভিখারি। বাহাদুরী অর্জন করার মতো বল ওদের বাহুতে নেই, তবু ওরা বাহাদুরী কুড়োবার জন্যে জীপে করে রাতের পর রাত বন-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ড্রয়িংরুমে শিং ও মাথা টাঙাবে বলে যেনতেন প্রকারেণ কিছু না কিছু জানোয়ার মারতে চায়। খাটাশ মেরে বলে, বাঘ মেরেছি। যেখানে সেখানে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো বিপজ্জনক জানোয়ারদের আহত করে দেয়। যার দণ্ড দিতে হয় জঙ্গলের নিরীহ বাসিন্দাদের। গত বছর একটা চিতা এই জঙ্গলে আহত হবার পর থেকে নরখাদক হয়ে গেছে। তখন থেকে এ জায়গায় একটা ত্রাসের রাজত্ব চলছে।

আসলে আমরা সেই চিতাটির খোঁজেই এখানে এসেছি।

চুপচাপ বসে আছি। দূর থেকে খাপু পাখি ডাকছে খাপু। খাপু। খাপু। খাপু।
বাংলোর পিছনের ঝর্ণার শব্দ এই অপার্থিব রাতের ভয়াবহতায় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঝর ঝর ঝর ঝর করে বয়ে চলেছে ঝর্ণাটা। টুটিলাওয়ার দিক থেকে কতগুলো চিতল হরিণ থেকে থেকেই ডেকে উঠছে। টাঁউ টাঁউ টাঁউ। সমস্ত সিক্ত বনে পাহাড়ে সেই শব্দ ছড়িয়ে যাচ্ছে কোথায় কোথায়। রাস্তাটা একটি ঘুমন্ত সরীসৃপের মত শুয়ে রয়েছে নির্জীব হয়ে। মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়া উঠছে বনে। কত দীর্ঘশ্বাস, কত ফিসফিসানি। এই রকম হাওয়া-বওয়া রাতেই যত কাটনেওয়ালা জানোয়ার শিকারে বের হয়।
তখন তাদের পায়ের শব্দ ও গায়ের গন্ধ বুঝতে পারে না। সেই সময়ে পাতায় হিস হিস ফিস্ ফিস শব্দ ওঠে, সেই শব্দের পটভূমিতে সাবধানী পা ফেলে হিংস্র জানোয়ারেরা শিকার ধরে।

আমাদের বাংলোর ঘরের দরজাটা ভাঙা। একটা পাল্লা নেই। তাই দু'জনেই সজাগ হয়ে ঘুমোই ঘুমোবার সময়ে। হাতের কাছে গুলিভরা রাইফেল নিয়ে। কাঁটা গাছের বড় বড় ক'টি ডাল কেটে হাঁ-করা দরজার মুখে দিয়ে রাখি শোবার সময়ে। এ অঞ্চলে সেই মানুষখেকো চিতার দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে চারজন মানুষ মেরেছে চিতাটি।

গুর্‌বাকে শুধোলাম, আর কোনো জানোয়ার দেখলে আজ ?

ও বললো, না। শুধুই শম্বর। ঝুড্‌কে ঝুড্। তবে সবই মাদী। তাই মারতে পারলাম না। শেষে ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের মাথায় এই শিঙ্গালটার সঙ্গে দেখা। বেশ দূরে ছিলো। নিশানা নিয়ে মারলাম। শালা একদ্দম গোলি অন্দর : জান্‌বাহার। সাথে-সাথ্।

গুর্‌বার হাত সত্যি ভালো। আমরা যা শিকার করি, তা সবই পাল্‌সা। জঙ্গলে জঙ্গলে পায়ে হেঁটে শিকারকেই "পাল্‌সা" বলে। পাল্‌সা শিকারে দিনে কি রাতে, গুর্‌বার জানোয়ার চেনার ক্ষমতা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম। জানোয়ার কত দূরে, কোন্ ভঙ্গীতে আছে এবং তাকে কোথায় গুলি করলে মোক্ষম মার হবে তা ও একনজর দেখেই বলতে পারতো। পাল্‌সা শিকার গুর্‌বার জান। পায়ে হেঁটে হেঁটে বনে পাহাড়ে রাইফেল কাঁধে বেড়াতে পারলে ও আর কিছুই চায় না। বেসুরো গলায় মাঝে মাঝে ও গুন্‌গুন্ করে পাকীজার গান গায় : "চলতে····চলতে"

গুরবা প্রায়ই বলে, "জঙ্গল মেরী মঞ্জিল্ বন গ্যায়া— ।'

চারিদিকে এখন এমন একটা আদিগন্ত নিস্তব্ধ ভয়াবহতা যে চুপ করে থাকলে মনে হয়, এক্ষুণি হয়ত কোনো ভয়াবহ ব্যাপার ঘটতে পারে। এখনি হয়ত নরখাদক চিতাটা এসে আমাদের একজনকে নিয়ে যেতে পারে। গতকাল সকালে আমরা বাংলো থেকে দু'মাইল পুবে গাড়্‌গুলুয়া নালায় চিতাটার পায়ের থাবা আবিস্কার করেছি ভিজে-বালিতে। পিছনের বাঁ পাটা বেশ টেনে টেনে হাঁটে। নিশ্চয়ই আগে গুলি খেয়ে থাকবে।

আচ্‌মকা গুরবা বললো, তোমার একটুতেই জ্বরজারি হচ্ছে, তুমি কি বুড়ো হয়ে গেলে দোস্ত্ ? তাহলে এই বেলা একটা বিয়ে-শাদী করে ফেলো।

বললাম, আমায় বিয়ে কচ্ছে কে ? তার চেয়ে তুমিই বরঞ্চ ঝুলে পড়ো।

ও বললো, মাথা খারাপ ? আমায় ত কেউ বিয়ে করবেই না। তাছাড়া এই বন-পাহাড়ের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন আগে।

মুন্নীকে তুমি ভালবাসো না বুঝি ?

গুর্‌বা চম্‌কে উঠল।

তারপর, ধরা-পড়া ময়নার মত বললো, ভীষণ, ভীষণ ভালোবাসি ! মুন্নীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকার স্বপ্ন দেখি কতোদিন।

বললাম, বুক ত নয়, বুক কম্বল। তোমার ঐ রোমশ বদ্‌বু বুকের কাছাকাছি কোনো মেয়েই ঘেঁষবে না।

গুর্‌বা কোনো উত্তর দিলো না। একটুখন চুপ করে থাকলো। তারপর বললো, আমার ইচ্ছা করে এমনি জায়গায় একটি কাঠের ছোট দোতলা বাংলো বানাই। সারাজীবন এখানেই থাকি। সকাল সন্ধ্যা রাইফেল কাঁধে পাল্‌সা শিকার করি, খরগোসের সঙ্গে ধানীঘাসের বনে বনে দৌড়োই, প্রজাপতিদের সঙ্গে উড়ি, খাপু-পাখিকে নকল করে ডাকাডাকি করি। তারপর দিনশেষে বাংলোয় ফিরে, বারান্দায় চুপ করে বসে থাকি। রাতের অন্ধকারে জোনাকি গুনি।

একলা থাকতে ভালো লাগবে না সারাজীবন।

আমি বললাম।

একেবারে একা তো থাকব না। যখন শরীরের মধ্যে কখনো সখনো কাঁকড়াগুলো কিলবিল করবে, বড় বড় দাঁড়ায় আমাকে ঠুকবে ঠুকবে ব্যথিয়ে তুলবে, তখন নিশ্চয়ই কেউ আসবে মুন্নীর মত। মুন্নীর চুলের গন্ধ আমি ফোটা কার্তুজের বারুদের গন্ধের মতো ভালোবাসি। কোনো হিমেল শীতের রাতে যখন আর শীত মানবে না, তখন তাকে আমার বুককম্বলে শুইয়ে রাখব। আসকল্ পাখির মতো তার উষ্ণ সুগন্ধি শরীর নাড়ব চাড়ব, তাকে সারেঙ্গীর মত বাজাবো, তারপর দু'জনের খুশি শেষ হলে তাকে দু'হাতে আকাশে উড়িয়ে দেবো। সেও মুক্ত থাকবে, আমিও মুক্ত। কোনোদিনই কারো কাছে বোঝার মত ভারী হবো না, কাউকে বোঝার মত বইবও না।

আমি বললাম মুন্নীকে জোর করে ধরে আনতে হবে তোমার।

গুবরা ছিঃ ছিঃ করে উঠলো।

বলল, মুজাক্কর হয়ে তুমি এমন কথা বলছো দোস্ত? জোর করে ধরে আনার মজা কোথায়? তেমন ভালোবাসা তো কড়ি ফেলেই পাওয়া যায়। যেদিন সময় হবে, মুন্নী এমনিই আসবে। চৈত্র মাসে শুকনো শালপাতার আড়ালে আড়ালে মসৃণ চিকন বাদামী শরীরিণী সর্পিণী যেমন আনন্দে হিলহিল করে সাপের কাছে যায়, তেমনি নিঃশব্দে মুন্নী আসবে, এসে আমার খাটে উঠবে, আমার গলা জড়িয়ে ধরবে। তার জন্যে আমি আজীবন অপেক্ষা করে থাকবো। যদি তাকে সত্যিকারের ঐকান্তিকতায় চেয়ে থাকি, তবে একদিন না একদিন আমার আসকল পাখিকে জড়িয়ে ধরে আমি ঘুমুবোই ঘুমোবো। চাঁদনী রাতে আমি একা একা পালসা শিকার করে বেড়াবো, হায়নার হাসি নকল করবো, ঘুমন্ত ময়ূরকে তালি দিয়ে উড়িয়ে দেবো, বাঘ যেমন করে শম্বরের পিছু নেয়, তেমনি করে তার পিছু নিয়ে তাকে ভীষণ রকম চমকে দেবো। গভীর রাতে চাঁদ-মাখা টিলার উপরে দাঁড়িয়ে আমি একা একা হাসবো। হাসবো, প্রাণ খুলে, আগল খুলে হাসবো। উই ঢিপির পাশে রাতজাগা ক্ষুধার্ত ভাল্লুক অন্ধকারে আমাকে আর একটা ভাল্লুক ভেবে বিরক্ত হয়ে ফিরে যাবে।

এই অবধি বলে চুপ করে গেল গুবরা। তারপর কেমন ধরা গলায় আমায় ফিসফিসিয়ে বললে, আমি বড্ডই খারাপ দেখতে, না দোস্ত? আমি জানি, মুন্নী কোনোদিনই আমার মতো ভাল্লুককে ভালোবাসবে না।

এমনভাবে ও বললো কথাটা, আমার মনে হলো এই হতাশ গুবরাকে আমি কোনোদিনও চিনি না জানি না।

ধমকে বললাম, ক্যা ফালতু বকবকাতা হ্যায়?

গুবরা বললো তুমি আমার বন্ধু। আমাকে ভালোবাসো বলেই সত্য কথাটা বলছ না। কিন্তু আমি জানি, ভাল্লুকের মতো কেলাউন্দা ঝোপে ঝোপে ও মহুয়ার নিচে নিচে ঘুরে বেড়ালেই আমাকে মানায়। তোমাদের শহরের ফ্লুরোসেন্ট আলোর আর সুবেশ সুন্দর পরিবেশে আমি শীতের দিনের কালো ব্যাঙের মতই কুঁকড়ে থাকি। যদি কেউ ছোট ভাইটার হোস্টেলের খরচ চালাবার ভার নিতো তাহ'লে আমি আর রাঁচী ফিরতামই না দোস্ত। এখানেই থেকে যেতাম। পালসা খেলতাম। শুধুই পালসা খেলতাম।

বললাম, রাত কাফি হোগ্যয়া ইয়ার। চলো, শো যাও।

গুবরা বলল, তুম যাকে শোও ইয়ার, ম্যায় থোড়ী দের তক হিঁয়া বেঠেগা। ইয়ে রাতসে বড়ী খুশবু নিকলরহি হ্যায়।

কাঁটার বেড়া সরিয়ে নিজের চৌপাইতে শুতে শুতে ভাবলাম, দোস্ত আমার বড় রসিক। ওর নিজের গায়ের বোঁটকা শম্বরের রক্তের গন্ধে আমার বমি উঠছে আর ও নিজে এই রাতের সুগন্ধে বুঁদ। ব্যাটা ভাল্লুক কোথাকার!

ছুঁচোগুলো সংক্ষিপ্ত চিক-চিক আওয়াজ করে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বাইরের নিস্তব্ধ রাতে শুধু ঝর্ণার ঝর-ঝরানি আর খাপু পাখির ডাক।

আমি জানি না কেন, সভ্যতা সংস্কৃতি ভদ্রতা এ সব কথাগুলো শুনলেই গুররা হিক্কা-তোলা কুমিরের মতো আঁৎকে আঁৎকে ওঠে। মনে প্রাণে জংলী! ওর মতে সভ্য মানুষ মানেই ভণ্ড মানুষ। ওর সব কিছুতেই এমন একটা নগ্ন প্রাচুর্য, এমন এক অনন্ত উচ্ছ্বাস যে, শহুরে জীবনের মাপা-হাসি, মাপা-কথা আর পদে পদে বাধানিষেধ একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না ও। বিশেষ করে এই শহুরে শিকারীদের। যারা, ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা দেখায়। ওদের দেখলে গুররা একটা উপবাসী হায়নার মত দাঁত-কড়মড় করে। খালি হাতেই ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এই ব্যাপারে গুররা বুনোকুকুরের মতোই নিষ্ঠুর। অথচ এমন বড় মনের অন্য কোনো মানুষ আছে বলে আমি জানি না। কাঁচপোকার কষ্টে যে গলে যায়, হরিণের খাওয়ার জন্য পাহাড়ের ঢালে ঢালে ও নিজের পয়সা খরচ করে কুলথী লাগায়, সরগুজা লাগায়। ঝর্ণার পাশে একটি একটি করে দবা পোঁতে। সেই সব ক্ষেতে গুররা কিন্তু কখনো শিকার করে না। ও বলে, তা বেইমানির সামিল। কিন্তু একটি শিঙ্গাল হরিণের পেছনে সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার মুখে যদি সে তাকে রাইফেলের পাল্লায় পায় তবে তার মতো খুশি কেউই হয় না। ও একটা পাগল। যে-বাঘ মারতে তাকে বেগ পেতে হয় না, সেই মৃত বাঘের পেটে সে লাথি মারে, থুথু ফেলে, বলে, শালা! বাঘোয়া নেহি, চুহা হ্যায়। ওর ভিতরে যতখানি প্রমত্ত শক্তি ও সাহস আছে ওর প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ও ঠিক ততখানি শক্তি ও সাহসই আশা করে। আর সেই একই কারণে হান্টিং-বুট পরা সুসজ্জিত জীপারোহী শিকারী দেখলে ও বকলেস ছেঁড়া বুলটেরিয়ারের মতো লাফালাফি করে। জানি না ওর কপালে কী আছে। কোনদিন যে ও এই পাগলামির বলি হবে, ওর ভালোবাসার চরিতার্থতায় এই বনে পাহাড়ে বুড়ো হরিণের মতো প্রচারহীন মৃত্যুর কবলিত হবে, তা আমি সত্যিই জানি না। ওকে নিয়ে আমার বড় ভয়। কারণ ওকে আমি ভালোবাসি। ওর জন্যে আমার দুঃখও হয়। কারণ কোনোদিনই কোনো সুগন্ধি মেয়ে গুররাকে ভালোবাসবে না। এমন কি মুন্নীও বাসে না। আমি বাজী ফেলে বলতে পারি। মেয়েরা খোঁটায়-বাঁধা শান্তশিষ্ট পাউডার-মাখা ছেলে চায়। গুররার মত দুর্দম, দুর্গন্ধি, দুর্বার ছেলেকে ওরা দূর থেকে শক্তিরূপে পূজা করতে পারে কিন্তু কখনো তাদের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। ঘরের সঙ্গে যার বিরোধ, সভ্যতার সঙ্গে যার সংঘর্ষ, স্থবিরতার সঙ্গে যার দুশমনি সে এদেশি কোনো মেয়ের ভালোবাসা পায় না। আমাদের মেয়েরা ঐ শহুরে শিকারীদের মতই ভণ্ড। মুন্নী কোনো ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু গুররা মুন্নীকে যেমন করে ভালোবাসে, তেমন করে আমরা কাউকেই কোনদিনও ভালোবাসতে পারবো না।

অনেকক্ষণ পর একবার ঘুম ভাঙ্গল।

বাইরে তখনও একটানা ঝিঁঝির ডাক। চাঁদটা মেঘে ঢেকে গেছে আবার। দেখলাম, তখনও গুররা শুতে আসেনি। ঝর্ণার শব্দ আর ঝিঁঝির শব্দে উতোর-চাপান চলেছে।

শুয়ে শুয়েই বললাম, নেহী শোওগে কেয়া?

গুররা বলল, আয়া ইয়ার, আভভি আয়া। কোই শিকারি আয়া হ্যায়, মালুম হোতা। জীপ্‌কা আওয়াজ মিল্ রহা হ্যায়, দূরসে। পাহাড়ী-পাহাড়ীমে চক্কর লাগা রহা হ্যায় সায়েদ

উন্‌লোগোনে।

আবার ও বললো, আয়া আয়া। আভ্‌ভি আয়া।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনে নেই।

রাত কতো হবে জানি না! হঠাৎ খুব কাছেই একটি শট্‌গানের আচম্‌কা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলো।

ধড়্‌মড়িয়ে চৌপাইয়ে উঠে বসে দেখলাম, ঘরে গুর্‌বা নেই। এবং দরজার কাঁটার বেড়াটা আমি শোবার সময় যেমন ভাবে সরিয়ে রেখেছিলাম, তেমন ভাবেই সরানো রয়েছে।

তার মানে ও ঘরে ঢোকেইনি শুতে।

কম্বলটা চৌপাইতে এক ঝটকাতে ফেলে, রাইফেলটা হাতে নিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরোলাম।

বেরিয়েই দেখি, পুরানো লাওযালঙের রাস্তার উপরে হেডলাইট জ্বালিয়ে একটি জীপ দাঁড়িয়ে আছে। এঞ্জিনের একটানা ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জীপটার স্টার্ট বন্ধ করা হয়নি। এবং গুর্‌বা নিচু হয়ে লেপার্ড-ক্রলিং করে রাইফেল হাতে ঐদিকেই এগিয়ে চলেছে।

কিছু একটা ব্যাপার যে ঘটেছে, বুঝলাম; কিন্তু সেটা কী ব্যাপার হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই মাথায় এলো না। আমিও গুর্‌বাকে ধাওয়া করে ওর পিছু পিছু ঐভাবেই এগিয়ে গেলাম। বিন্দুমাত্র শব্দ না করে। যেখানে শম্বরটার চামড়া-ছাড়ানো হয়েছিলো এবং কাটাকুটি করা হয়েছিলো সেখানে গিয়ে একটি কেলাউন্দা ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়লো গুর্‌বা।

আমিও ওর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ে, কানে কানে বললাম, ক্যা হুয়া?

গুর্‌বা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শহরকা শিকারী শিকার খেলনে আঁযে হেঁ?

সামনে তাকাতেই দেখি মংলুর কুকুরটি শম্বরের রক্তে-ভেজা মাটিতে পড়ে রয়েছে। তার উপরে জীপ-থেকে ফেলা স্পট-লাইটের আলো এসে পড়েছে। লোভী কুকুরটা নিরিবিলিতে নিশ্চয়ই শম্বরের নাড়িভুঁড়ি খাচ্ছিলো। এমন সময় ওরা জীপ থেকে গুলি করেছে। কুকুরটির কান দিয়ে গরম তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জিভটা দাঁতে-কামড়ে আছে। মরে গেছে।

গুর্‌বা আমাকে ফিসফিসিয়ে বলল, শিখলায়গা শালালোগোকো।

আমি ওর হাতে টেনে বারণ করলাম।

কিন্তু ও শুনলো না।

আলোতে যাতে ওকে দেখা না যায়, এমনি ভাবে আলো থেকে সরে গিয়ে অন্ধকারে বুকে হেঁটে হেঁটে জীপের কাছে এগিয়ে যেতে লাগল গুরবা।

কী করি? আমিও ওর পিছু নিলাম।

আমরা জীপটির কাছে প্রায় পঁচিশ গজের মধ্যে এসে গেছি! এতোক্ষণ জীপের আরোহীরা কী করছে জীপে বসে বসে কে জানে? কাছাকাছি পৌঁছে একটা ঘন পুটুসের ঝোপের মধ্যে আমরা চুপ করে বসে থাকলাম। এদিকটা অন্ধকার। ওরা আলো ফেলে আছে তখনো কুকুরটার উপরে। যেদিকে আলো, ওদের সকলের মনোযোগও সেদিকেই।

ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে যতখানি দেখা যায়, মাথা উঁচু করে দেখতে পেলাম যে ড্রাইভার নয়, একজন চাপরাশী স্পটলাইট ফেলে আছে। জীপের হুডটি নামানো। উইণ্ডস্ক্রীন

বনেটের উপর শোয়ানো। সামনে ড্রাইভারের পাশে একটি ফর্সা গ্রে হাউণ্ডের মতো ছেলে এবং তার পাশে আঁটসাঁট করে শাড়িপরা চুড়ো-করে বাঁধা একটি সাদা লেগহর্ন মুরগীর মতো মেয়ে। পিছনে ককার—স্প্যানিয়েলের মতো ঠোঁট মোটা এলো মেলো চুলের চোখ-ঢাকা কালো একটি ছেলে।

মেয়েটি ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে দিচ্ছে ছেলে দুটিকে।

গ্রে হাউণ্ড ককার স্প্যানিয়েলকে বললো আই ডিড নেভার নো দ্যাট ইউ ওয়্যার সাচ আ গুড শট।

ককার স্প্যানিয়েল বিনয়ের সঙ্গে বললো ওঃ শিট। ডোন্ট মেনশান।

মেয়েটি, ডিমে-বসা লেগ হর্নের মত কঁককঁকিয়ে বাংলায় বললো তোমরা যাই বলো চিতাটা কিন্তু বিরাট বড় ছিলো।

গ্রে হাউণ্ড তোষামুদি গলায় বললো, নিশ্চয়ই।

মেয়েটি আবার বললো, আচ্ছা কী রকম একটা ব্যাড স্মেল পাচ্ছো না তোমরা?

গ্রেহাউণ্ড বললো নিশ্চয়ই ব্যাটা কোনো হরিণ টরিণ মেরে পচিয়ে রেখেছে।

আসলে গন্ধটা ছিলো শম্বরের নাড়িভুঁড়ির আমরাও পাচ্ছিলাম হাওয়াটা এদিক থেকেই যাচ্ছিলো মংলুর দিশী কুকুরটার লাজুক মুখ মনে পড়ছিলো আমার।

হঠাৎ আমাকে হতবাক করে দিয়ে গুবর পুটুস ঠেলে উঠে দাঁড়াতে গেলো।

ওর খালি গায়ে বোধহয় কোনো পোকা মাকড় কামড়ে থাকবে। এ ছাড়া উঠে দাঁড়াবার আর কোনো কারণই আমি খুঁজে পেলাম না। কিন্তু এক লহমার মধ্যে যা হবার তা হয়ে গেলো।

অতো কাছে পাতার খসখসানির শব্দ শোনা মাত্র চাপবাতিটি আলো ঘুরিয়ে এদিকে ফেললো। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, ভাল্লুক! ভাল্লুক! এবং আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ককার-স্প্যানিয়েলের শটগানও ঘুরলো। মাজল থেকে আগুনের হল্‌কা বেরুতে দেখলাম। এবং তক্ষুনি কী একটা চাপা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ করে গুবরা প্রায় আমার ঘাড়ের উপরেই পুটুসের ডাঁটা পাতা ভেঙ্গে পড়ে গেলো।

গুবরাকে চিত করে দিতেই দেখি, একেবারে বুকে গুলি লেগেছে। অত কাছ থেকে। ডান বুকে।

ইতিমধ্যে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জীপ থেকে গ্রে হাউণ্ড চেঁচিয়ে উঠল, উণ্ডেড ভাল্লুক। ডেঞ্জারাস্। ডেঞ্জারাস্। পালাও। পালাও। ড্রাইভার তেজ্ চলো। এবং একথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জীপ এগিয়ে গেলো। দেখলাম, নাম্বারপ্লেটের উপর কাদা লেপে দেওয়া আছে।

যত তাড়াতাড়ি পারি রাইফেল তুলে জীপের টায়ার লক্ষ্য করে গুলি করলাম—কিন্তু বুঝলাম যে, গুলি লাগলো না। কারণ জীপটা চলতেই থাকলো। কেবল মেয়েটির চিৎকার শুনতে পেলাম, ডাকাত। ডাকাত। জোরে, জোরে চলো।

মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু শেষ হয়ে গেলো।

গুব্‌রার মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম, মংলুর কুকুরের মতোই ওর জিভটাও বেরিয়ে এসেছে। দাঁতে জিভটা কামড়ে আছে। কুচকুচে কালো লোমে-ভরা বুকে গরম ঘন রক্ত থক্‌থক করছে।

মানুষের রক্তে শম্বরের রক্তের চেয়েও বেশি বদ্‌বু। আগে জানিনি।

এখন কী হবে জানি না। আমি কী করব জানি না। মংলু কখন গাঁ-থেকে ফিরবে জানি

না। তাবপব পুলিশ আসবে, ফবেস্ট ডিপার্টমেন্টেব কর্তাবা আসবে। আমবাও চোবা শিকাবী। ওবাও তাই। ওবা মানুষ মেবে পালিযে গেলো ওদেব কিছু হবে না। আমাদেব শম্বর মেবে জেল হবে। কিন্তু হবে। কেউ বাঁচাতে পাববে না। আমাব সেই মুহূর্তে মনে হলো, গুববা মানুষ না হযে যদি সত্যি সত্যি ভাল্লুক হতো তাহলে ভাল হতো।

শম্ববেব মতো ওব চামডা ছাডিযে ওকে টুকবো টুকবো কবে টাঙ্গী দিযে কেটে কাল দুপুবেব আগেই ওকে শকুন দিয়ে খাইযে দিতাম নিশ্চিহ্ন কবে।

কিন্তু তা হবাব নয। প্রত্যেক মানুষেবই ঠিকানা আছে। অতীত আছে। মবে গেলেও তাকে সেই ঠিকানাতে ফিবে যেতে হবেই।

গুববাব তপ্ত বক্তেব গন্ধেব সঙ্গে পুটুসেব উদগ্র গন্ধ মিশে গেলো। কোথা থেকে একটি টি-টি পাখি এসে টিটিবটি—টিটিবটি—টিটিবটি কবে আমাব আব স্তব্ধ গুববাব মাথাব উপবে চক্কব মেবে বেডাতে লাগলো।

স্বর

দূর থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। যুবক সকালের চোখ ঝলসানো রোদে নীল জলরাশি সাদা ফেনার ভেঙে পড়া গুঁড়ো সমেত প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ছে বেদুইন মেয়ের বুকের রঙের মতো বাদামী বেলাভূমিতে।

সাইকেল রিকশাটা ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর করে চলছিল। এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না বললেই হয়। অরু তার দশ বছরের ছেলে দীপের পাশে বসে রিকশা করে হোটেলের দিকে চলছিল।

দীপের স্কুল খুলে যাবে ক'দিন পর। রেল স্ট্রাইকের জন্যে এর আগে বেরোনো সম্ভব হয়নি। কারোরই নয়। ট্রেনে জায়গাই পাওয়া যায় না। তবুও আসতে হয়েছে অরুর। কারণ দীপকে ও কথা দিয়েছিল যে পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারলে তোমাকে পুরীতে নিয়ে যাব। সোনালি আসতে পারেনি, ওর সেজদির বড় মেয়ের বিয়ে পড়ে গেছে। অতএব একাই আসতে হয়েছে অরুর ছেলেকে নিয়ে।

ছেলের সঙ্গে এর আগে অরু কখনও বেরোয়নি একা একা। বেরিয়ে বেশ ভালো লাগছে। ওর দশ বছরের ছেলের মধ্যে ও রীতিমত একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও বিজ্ঞ লোকের ছবি দেখতে পাচ্ছে। ওর সাধারণ জ্ঞান, ওর সমস্ত বিষয়ে ঔৎসুক্য অরুকে রীতিমত চমৎকৃত করছে। সোনালি আসতে পারেনি বলে ওর এখন একটুও খারাপ লাগছে না

হোটেলটি বেশ ভাল। খাওয়ার হলের পাশেই একটি ঘর পেয়েছে অরু। কলকাতা থেকে চিঠি লিখে, টাকা পাঠিয়ে এসেছিল। ঘরটিও ভালো। ডাবলবেড খাট, পুরনো দিনের অদ্ভুত আকৃতির পাখা একটি, ঘরের কোণায় লেখার টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, লাগোয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম সবচেয়ে যা ভালো লেগেছে অরুর, তা সমুদ্রমুখী এক ফালি ছোট্ট বারান্দা। সারা দিন রাত তাতে বসেই বই পড়ে, চা খেয়ে, আলসেমি করে কাটিয়ে দেবে ঠিক করল ও।

দীপ বলল বাবা, তুমি আমার সঙ্গে সমুদ্রে চান করবে না?

অরু বলল, না বাবা।

কেন? চল না। চান করব দুজনে।

অরু বলল, আমি তোমার সঙ্গে যাব, তুমি নুলিয়ার সঙ্গে চান কোরো আমি বসে থাকব।

অরু মনে মনে বলল, ও টিপিক্যাল বাঙালি—এসব দৌড়ঝাঁপ, সুখী শরীরকে অকারণ এত কষ্ট দেওয়ার পক্ষপাতী নয় ও। তা ছাড়া পাযজামা বা আন্ডারওয়্যার পরিহিত অনেক বঙ্গ-পুরুষকে ও নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনে বড় বড় ঢেউয়ের থাবড়া খেয়ে বালির মধ্যে পড়ে

কালো কুমড়োর মতো অথবা ফ্যাকাশে চিচিঙ্গার মতো গড়াগড়ি যেতে দেখেছে। তা ছাড়া ঐ নুলিয়াদের হাতে হাত রেখে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে 'এই কুমীর তোর জলে নেমেছি' খেলার দিন তার চলে গেছে বলেই অরু বিশ্বাস করে। এই অহেতুক ও উপায়হীন পরহস্তনির্ভরতা তার মোটেই বরদাস্ত হয় না।

এক সময় ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর দীপের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে তাকে যেতেই হল। দীপ একটা কালো স্যুইমিং-ট্রাঙ্ক পরেছে। সোনালি কিনে দিয়েছে ওকে। ওর সুগঠিত ছোট্ট শিশু শরীরে সুন্দর মানিয়েছে পোশাকটা। দেখলেও ভালো লাগে। নিজেদেব জীবনে যা পাওয়া হয়নি, ছেলেমেয়েদের তা দিতে পেরে, সেই সব ছোট্ট ছোট্ট আপাতমূল্যহীন অথচ দারুণ দামী পাওয়া : রথের মেলার পাঁপর ভাজার মতো, বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে একখানা ময়ূরকণ্ঠী ঘুড়ির মতো ; গরমের ছুটিতে পুরী বেড়ানোর মতো—এসব টুকরো টুকরো সুখ তার একমাত্র ছেলেকে দিতে পেরে অরু খুশি। দীপের আজ সকালের অনাবিল আনন্দের হাসিমুখের সুখ অরু তার জীবনের অনেক বড় বড় সুখের সঙ্গে সহজে বিনিময় করতে পারে।

ওরা প্রায় সমুদ্রের কাছে পৌঁছে গেছে। দূর থেকে মাদুরে-ছাওয়া ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। কারা যেন হলুদ আর লাল ডোরা টানা টেরিলিনের তাঁবু খাটিয়েছে বালিতে। হু-হু করে বালি উড়ছে, জলের কণা উড়ছে, ভেজা তটভূমিতে দাঁড়িয়ে-থাকা স্নানরতা মেয়েদের ভিজে চুল উড়ছে। চিৎকার-চেঁচামেচি, উল্টে-পড়া, ভেসে-যাওয়া সব মিলে সমুদ্রের ধারে কেমন একটা মেলা—মেলা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

আনন্দ ও খুশী বড় ছোঁয়াচে। অরু ভাবল। এই মুহূর্তে ওরও ইচ্ছে করছে দীপের সঙ্গে হাত ধরে ও-ও নেমে পড়ে জলে, আছাড় খায়, উল্টে যায়, নিজের অপদস্থ অবস্থায় নিজেই হো হো করে হেসে ওঠে। নিজেকে স্বেচ্ছায় অপদস্থ করে নিজে যা অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় তার তুলনা নেই।

হঠাৎ দীপ বলল, বাবা, রাজীব।

অরু শুধাল, রাজীব কে ?

বাঃ, আমাদের সঙ্গে পড়ে যে ! আমার ক্লাসে ! খুব ভাল সাঁতার কাটে।

অরু ঐদিকে তাকাল। দেখল, সেই লাল-হলুদ ডোরা কাটা তাঁবুর সামনে একজন দারুণ ফিগারের দীর্ঘাঙ্গী শ্যামলা-রঙা ভদ্রমহিলা হালকা গোলাপী সাঁতার কাটার পোশাকে দাঁড়িয়ে আছেন দীপের সমবয়সী একটি ছেলের হাত ধরে। তাঁবুর পাশেই অ্যালুমিনিয়ামের ফোল্ডিং চেয়ারে বসে একজন অত্যন্ত স্থূল ভদ্রলোক পা ছড়িয়ে বিয়ার খাচ্ছেন।

অরুর বুকের মধ্যে সী-গালের আর্ত স্বরের মতো কী এক ব্যথাতুর স্বর হঠাৎ বেজে উঠল।

রাজীব দীপকে দেখে দৌড়ে এল। তারপর ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। অরু বুঝতে পারল যে ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক রাজীবের মা ও বাবা।

সমুদ্রের গর্জনে কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল না। কথাগুলো হাওয়ায় উড়ন্ত জলবিন্দুর সঙ্গে উড়ে যাচ্ছিল। তবু অরু অনুমানে বুঝতে পারল, ভদ্রমহিলা বলছেন, ও তুমিই দীপ, তুমিই ফার্স্ট বয় ? তারপর বললেন, কার সঙ্গে এসেছ ? বাবা ? মা আসেননি ! ও.... !

তারপর রাজীব দীপকে নিয়ে তার বাবার কাছে গেল। রাজীবের বাঙালি বাবা বাংলা বলেন না। ইংরেজিতে দীপকে বললেন, আই সী ! য়ু আর দা ফার্স্ট বয়, আই হ্যাভ বীন হিয়ারিং অ্যাবাউট।

যদিও রাজীবের বাবা মা প্রায় সাহেব-মেম, তবুও কথাগুলো শুনে অরুর ভালো লাগল। ছেলে ভালো হলে বাবার যে কতখানি ভালো লাগতে পারে সে কথা জীবনে এই প্রথমবার জানল অরু। পরমুহূর্তেই আবার খুব অপদস্থ লাগল নিজেকে। কারণ সেই মুহূর্ত থেকে সে শুধু দীপের বাবা হয়েই রইল। তার নিজের আর কোনও পরিচয়ই রইল না। দীপ তার বন্ধুর বাবা মার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিল না, তাই অরু বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল।

ও ভাবল ওঁরা নিজেরা আলাপ করলে করবেন। ওর কি গরজ?

দীপও আলাপ করিয়ে দিল না, ওঁরাও আলাপ করলেন না নিজে থেকে। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। এখন সেই প্রথম অস্বস্তিটা চলে গেছে।

অরুণাভ রায় কলকাতার বিখ্যাত অধ্যাপক, বালির মধ্যে পা-ছড়িয়ে বসে শুধুমাত্র দশ বছরের দীপের বাবায় পর্যবসিত হয়ে বার্টান্ড রাসেলের জীবনী পড়তে লাগল। তার চোখের সামনে, কানের সামনে একটা দারুণ শব্দ-বর্ণ গন্ধর সমারোহ বয়ে যেতে থাকল, দুলতে থাকল, ভাসতে লাগল, উৎসারিত হতে লাগল, কিন্তু ও চোখ তুলে তা দেখল না।

কারণ ও ভয় পেয়েছিল।

তখন থেকেই বুকের মধ্যে সী-গালের আর্তস্বরেব মতো এক করুণ স্বর শুনতে পাচ্ছিল ও। রাজীবের মাকে প্রথম দেখা থেকেই ওর ভালো লেগেছিল। তাই ও ভয় পেয়েছিল। অরুর বুকে সেই মুহূর্তে যে স্বর বাজছিল তা সমস্ত বিবাহিত নারী ও পুরুষের বুকেই বাজে, বিশেষ করে—যখন তাঁরা একা থাকেন। খাঁচার মধ্যে বন্ধ পাখি যেমন দূরের বনের দিগন্তে উড়ে যাওয়া পাখিকে দেখে দুঃখে মরে তেমন এক দুঃখে, অস্বস্তিতে অরুর বুক ভরে গেল।

কিছুক্ষণ পর নুলিয়ার হাত ধরে দীপ ফিরে এল। অরু উঠে দাঁড়াল।

দীপ খুশির গলায় বলল, এই বাবা! তুমি রাগ করেছ বেশিক্ষণ চান করলাম বলে?

অরু অন্যমনস্কভাবে বলল, না। তারপর উঠে পড়ে বলল, চল ফিরি।

দু-তিন দিন এমনিই কাটল। অরু চান করেনি একদিনও। দীপ করেছে রোজ দু-বেলা। হোটেলের লাউঞ্জে, সামনের লনে, খাবার ঘরে বারবার অরুর দেখা হয়ে গেছে রাজীবের মায়ের সঙ্গে। মুখোমুখি হয়েছে, চোখাচোখি হয়েছে; কিন্তু কথা হয়নি কখনও।

দীপ আলাপ করিয়ে দেয়নি।

সেদিন দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় ম্যাকারেল মাছের ফ্রাই খেতে গিয়ে দীপের গলায় কাঁটা লাগল। অরু ওকে বারবার বলেছিল হাত দিয়ে খেতে, পরে ফিঙ্গার বোলে হাত ধুয়ে নিলেই চলত। কিন্তু ওদের টেবিলের অনতিদূরে মা-বাবার সঙ্গে খেতে-বসা রাজীব যেহেতু সবসময় কাঁটা-চামচ দিয়ে খাচ্ছে, অল্পবয়সী দীপও তাই সাহেব হবার লোভ সামলাতে পারেনি।

কাঁটাটা বেশ ভালই বিঁধেছিল। স্টুয়ার্ড দৌড়ে এলেন। বেয়ারারা দাঁড়িয়ে রইল। শুকনো ভাত, কলা, পাঁউরুটি ইত্যাদি নানা কিছু খাইয়ে দীপের গলা থেকে কাঁটা নামানোর চেষ্টা করা হতে লাগল, কিন্তু কাঁটা গেল না। অরু বোকার মতো বসে থাকল দর্শকের মতো। সময়ে সময়ে মেয়েদের প্রয়োজন বড় বেশি অনুভূত হয়। বাবারা কত অসহায়, এমন এমন সময়ে তা বোঝা যায়।

অরু একদৃষ্টে নিরুপায়ভাবে দীপের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চেয়ে ছিল। কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। শুকনো ভাত রুটি কলা খেয়ে খেয়ে বেচারার পেট ফুলে উঠল, কিন্তু কাঁটা নামল না।

এমন সময় ওঁদের টেবিল ছেড়ে রাজীবের মা উঠে এলেন এ টেবিলের কাছে।

এসে লাজুক হাসি হাসলেন অরুণাভর দিকে চেয়ে। অরুও লাজুক হাসি হাসল। বলল, কী ঝামেলা দেখুন তো !

ভদ্রমহিলা বললেন, ঠিক হয়ে যাবে। পরক্ষণেই মুখ ঘুরিয়ে বললেন, ছেলেব মা সঙ্গে না থাকলে কত অসুবিধা দেখেছেন তো ! আপনারা তো এমনিতে বুঝতে পারেন না ! তারপর অরুর কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষা না করেই উনি দীপকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। অরুর ঘর খাওয়ার ঘরের লাগোয়া, সে ঘরেই দীপকে নিয়ে ঢুকলেন উনি।

অরু কি করবে বুঝতে পারছিল না। রাজীব আর তার সবসময় ইংরেজি-বলা বাবা বসে বসে আইসক্রীম খাচ্ছিলেন। এ সময় অরুর যাওয়া ভালো দেখাবে না। বিশেষ করে ভদ্রমহিলা যখন দায়িত্ব নিয়েইছেন। অরু চুপচাপ বসে আইসক্রিম খেল।

রাজীব আব তাব বাবা উঠে চলে যাওয়ার পর অরু উঠল, উঠে আস্তে আস্তে ওর ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

ভিতর থেকে রাজীবের মা বললেন, আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

অরু ভিতরে ঢুকে বলল, কেমন আছে দীপ ?

উনি হাসলেন। বললেন, কাঁটা বেরিয়েছে, কিন্তু ন্যাচারালী জায়গাটা খুবই টেন্ডার আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে ও।

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি কি করবেন ? ঘুমোবেন ?

অরুর কলকাতায় ঘুমোবার অভ্যেস না থাকলেও ভালো-মন্দ খাওয়ার পর এখানে রোজই ঘুমোয়।

বলল, নাঃ ! দুপুরে ঘুমিয়ে কি হবে ?

উনি বললেন, তবে চলুন, লাউঞ্জে বসে গল্প করি। রাজীব আর রাজীবের বাবা নাক ডাকার কমপিটিশন লাগিয়েছেন এতক্ষণ। আমি দুপুরে ঘুমোতে পারি না। দীপের মা ঘুমোন ? দুপুরে ?

অরু বলল, না। ও তো চাকরি করে একটা। ঘুমুবে কি করে ?

তাই বুঝি : বললেন রাজীবের মা।

তারপর বললেন, ছেলের জন্যে আপনার খুব গর্ব ? না ? দীপ তো ওদের স্কুলে রীতিমত লেজেন্ড। সকলে ওকে এক নামে চেনে। বাবার মতো বুদ্ধি পেয়েছে বুঝি ?

অরু লজ্জিত হল। বলল, না না। আমি কখনওই ব্রিলিয়ান্ট ছিলাম না !

তবে কি, মা ব্রিলিয়ান্ট ?

অরু বলল, না। তেমন তো শুনিনি। তবে বুদ্ধিমতী।

এমন সময় অরু ও রাজীবের মায়ের সামনে দিয়ে একটি জার্মান দম্পতি জড়াজড়ি করে খাওয়ার হলে গিয়ে ঢুকল। বালিতে ওদের গা-হাত-পা ছড়ে গেছে। নাক গাল লাল হয়ে গেছে রোদে পুড়ে। ওদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় রাজীবের মাকে ওরা হাত তুলে উইশ্ করল। রাজীবের মা-ও হাত তুললেন।

ওরা চলে গেলে রাজীবের মা ওদের দিকে চেয়ে হাসলেন।

বললেন, বেশ আছে ওরা।

অরু বলল, ভারী লাইভ্লি কাপ্ল। হানিমুনে এসেছে বোধহয়।

রাজীবের মা বললেন. ওদের বিয়েই হয়নি। একজন অস্ট্রিয়া থেকে আর অন্যজন স্টেটস্ থেকে এসেছে। দমদম এয়ারপোর্টে দুজনের সঙ্গে দুজনের আলাপ। দুজনেই

কোণারক দেখতে যাচ্ছে বলে ওরা ঠিক করল কোণারক দেখে এসে মন্দিরের ভাস্কর্যগুলো যাতে ভুলে না যায় তার জন্যে দুজনে দিনকয় একঘরে থাকবে। অতএব থাকল।

অরু রীতিমতো আত্মবিস্মৃত হয়ে বলল, বাঃ, বেশ মজা তো! বলেই, লজ্জা পেল।

রাজীবের মা ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন। ভদ্রমহিলার শরীর, ফিগার, চোখ দুটি সবই দারুণ। একবার চাইলে চোখ ফেরানো যায় না। আজ দুপুরে মহিলা একটি ম্যাক্সি পরে আছেন। স্লীভলেস। সারা গা ছাপিয়ে একটা মিষ্টি গন্ধ উঠছে। হয়তো বিদেশী সাবানের, হয়তো বিদেশী পারফ্যুমের। জানে না অরু।

ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আবার সেই ভয়টা ওর বুকের ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এল। এতক্ষণ সে বুঝি রোদে গা শুকুচ্ছিল।

তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে অরু সমুদ্রের দিকে তাকাল। সমুদ্রই ভালো। সমুদ্রর কোনও চাওয়া নেই। কারও সঙ্গে মিলিত হবার কোনও কামনা নেই—কোনও নদ বা নদীর মত তাকে কোনও সঙ্গমের প্রতীক্ষায় বইতে হয় না। সে নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ। তার পরিপূরকের প্রয়োজন নেই কোনও।

হঠাৎ রাজীবের মা বললেন, আপনাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে?

অরু যেন ঘুম ভেঙে বলল, বারো বছর, এক যুগ। তারপর বলল, আপনাদের?

চোদ্দ বছর। এক যুগ দু বছর। তারপর একটু থেমে বললেন, জীবনটা বড় একঘেয়ে লাগে। তাই না? দীপের মা-ও নিশ্চয়ই এ-কথা বলেন?

অরু বলল, না। ও আশ্চর্য মেয়ে। ওর অদ্ভুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। ও কখনও একঘেয়েমির অভিযোগ করে না। অদ্ভুত স্বভাব ওর।

রাজীবের মা বললেন, তা হলে বাহাদুরিটা বলতে হবে আপনার। আপনিই একঘেয়েমির হাত থেকে তাঁকে বাচিয়েছেন হয়তো।

অরু অপরাধীর গলায় বলল, না না। তা না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার কিন্তু একঘেয়ে লাগে। কি মনে হয় জানেন, মনে হয় খাঁচার মধ্যে আছি। রোজ সকালে জীবনের ভাঁড়ার খুলে দুজনে দুজনকে মেপে মেপে রসদ বের করে দিই—একদিনের মতো। পরদিন আবার সমান মাপে বের করি। বেশিও নয় কমও নয়। কোনওদিনই ঘাটতি পড়ে না কিছুই। উপচেও পড়ে না। একেবারে টায়-টায় সাবধানীর সংসার করি আমরা। এ জীবনে কোনও হঠাৎ-পাওয়া নেই। কোনও আবিষ্কার নেই, অপ্রত্যাশিতের সম্ভাবনা নেই। এখানে দুজনে দুজনের প্রতি কর্তব্য করি—হাসিমুখে। ভাঁড়ার থেকে যা পাচ্ছি, যা প্রতিদিন পাই, তার চেয়ে বেশি কিছু পাওনা ছিল বলে কখনও মনেও হয় না। আসলে এই ভরন্ত রুদ্ধ ভাঁড়ারের মধ্যে বাস করে নেংটি ইঁদুরের মতো আমরা একদিন নিজের অজান্তেই শুকিয়ে মরে যাব। নাকের সামনে তালা ঝুলবে ভাঁড়ারের, মস্তিষ্কের মধ্যে ফসলের গন্ধ, বেহিসাবের খুশি, খোলা জানলার রোদ, মুক্তির নীল আকাশ—এইই সব স্বপ্ন। কিন্তু এমনি ভাবেই শেষ হয়ে যাব একদিন—বাঘবন্দীর ঘরে।

এতখানি একসঙ্গে বলে ফেলে অরু লজ্জিত হল।

বলল, দেখলেন তো, ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে কেমন বক্তৃতাবাজী শিখেছি। আপনি শুনছেন কি না তা না জেনেই একতরফা বলে গেলাম।

রাজীবের মা বললেন, শুনেছি। আমি সমুদ্রের দিকে চেয়ে শুনছিলাম। সমুদ্র আপনার ভালো লাগে?

অরু এতক্ষণে ওর স্বাভাবিকতায় ফিরে এসেছে। অপরিচিত সঙ্কোচের খোলস ছেড়ে ও বাইরে এসেছে।

ও বলল, লাগে না।

কেন ? বলে চোখ তুলে চাইলেন ভদ্রমহিলা।

কারণ সমুদ্রের মধ্যে কোনও দ্বিধা নেই। সমুদ্র বড় আদিম, বড় উলঙ্গ—সমুদ্র কিছু লুকোতে জানে না—তা ছাড়া সমুদ্র বড় একঘেয়েও। কোনও আদিম পুরুষের একাকিত্বর একটানা গোঙানীর মতো মনে হয় সমুদ্রের আওয়াজ। আমার অস্বস্তি লাগে।

উনি বললেন, আমারও ভালো লাগে না। তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কারণটা হল, সমুদ্র বড্ড বড়। সমুদ্রের মতো কাউকে নিয়ে, এত বিরাট ও প্রবল কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধা যায় না, এমন কি ঐ বিদেশী ছেলেমেয়েদের মতো ক্ষণিকের ঘরও বাঁধা যায় না। আমার মনে হয় কোনও মেয়েরই ভালো লাগে না সমুদ্রকে, মনে মনে।

এমন সময় ঐ বিদেশী ছেলেমেয়ে দুটি খাওয়া শেষ করে গলা জড়িয়ে ওদের সামনে দিয়ে নিজেদের এয়ার কন্ডিশান্ড ঘরের দিকে চলে গেল।

রাজীবের মা হঠাৎ বললেন, উঠি, কেমন ? আপনি রেস্ট করুন। আমিও যাই স্বামী-পুত্রের দেখাশোনা করি গিয়ে একটু।

অরু উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর রাজীবের মা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে থাকল বারান্দার ইজিচেয়ারে।

কতক্ষণ বসে ছিল ও জানে না। যখন ওর ঘুম ভাঙল, দেখল বেলা পড়ে গেছে। দীপ ইজিচেয়ারের হাতলের উপর বসে ওর গা ঘেঁষে। সমুদ্রের উপর একঝাঁক সী-গাল ওড়াউড়ি করছে। পাখিগুলোর ঘর আছে। সমুদ্রের ঘর নেই। পাখিগুলো অন্ধকার হলেই সঙ্গিনীর বুকের উত্তাপে ফিরে যাবে ওদের ঘরে। সমুদ্র যেখানে ছিল, সেখানেই থাকবে। সমুদ্রর যাওয়ার মতো কোনও গন্তব্য নেই ; অন্য কোনও শরীর নেই।

দীপ বলল, বাবা, হাঁটতে যাব, চল।

অরু বলল, চল।

পুরী-হাওড়া এক্সপ্রেসটা পুরী স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল।

আজ রাজীবরা ফিরে যাচ্ছে।

দীপ বলেছিল, বাবা চল না, রাজীবদের সঙ্গে দেখা করে আসি একবার। ট্রেন কি ছেড়ে গেছে ?

অরু খুশি হল, দীপ এ কথা বলল শুনে, তারপর ছেলের হাত ধরে তাড়াতাড়ি একটা রিক্‌শা নিয়ে স্টেশনে পৌঁছে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এ-সি-সি কোচের দিকে এগিয়ে গিয়ে সবুজ জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ট্রেনটা এখুনি ছেড়ে দেবে।

জানলায় রাজীবের সঙ্গে রাজীবের মাও গাল লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজীবের সঙ্গে উনিও হাত নাড়ছিলেন। আজ ভদ্রমহিলা একটা হলুদ আর কালো মেশানো সিল্ক শাড়ি পরেছিলেন। সবুজ কাঁচের আড়ালে কেমন রহস্যময়ী মনে হচ্ছিল ওঁকে। ভিতরের কোনও কথাই বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল না। চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছিল শুধু।

দীপ আব দীপেব বাবা, বাজীব আব বাজীবেব মাযেব দিকে চেযে ছিল । জানলাব কাঁচটা ঠাণ্ডা—কি বকম যেন একটা গন্ধ বাতানুকূল গাড়িতে

বেলা পড়ে গেছিল । জানলাব কাঁচেব মধ্যে হঠাৎ অরু কেমন ভাঁড়াব ভাঁড়াব গন্ধ পেল । অরু তাড়াতাড়ি মুখ ঘুবিযে অন্যদিকে তাকাল বাইবেব নীল আকাশে তখনও বোদ ছিল, সমুদ্র থেকে জোব হাওযা আসছিল নানা গন্ধ নিযে । এখানে সাদা নবম সী-গাল নেই । সেই হঠাৎ শোনা বুকেব মধ্যেব স্বপ্ন হাবিয়ে গেছে বরাবরেব মতো । একটা কালো দাঁড়কাক ডাকছিল কর্কশ গলায় হোটেলেব পাশে বসে

দীপ বলল বাবা ওবা কখন কলকাতায় পৌঁছবে

অরুব নাকে আবাব ভাঁড়াবেব গন্ধটা ফিবে এল

অরু বলল অন্ধকাবেই

তাবপবই নিজেকে শুধবে বলল অন্ধকাব থাকতে থাকতেই

শিঙাল

একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এখনও গাছ পাতা থেকে টুপটাপ্ করে জল ঝরছে। মানুষদের গাড়িটার আওয়াজটা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে এক সময় মিলিয়ে যেতেই একরা শম্বরটা আস্তে আস্তে ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে কোয়েল নদীতে নেমে এলো।

এখানে জঙ্গলে রাস্তাটা নদীর উপর দিয়ে চলে গেছে। নদীতে জল এখন বেশি নেই। মানুষদের গাড়িগুলো এলে নদীতে চিরচির করে জল ছিটে ওঠে দুপাশে। আর তার সঙ্গে গোঁ গোঁ করে একটা আওয়াজ। জিপের বা ট্রাকের এঞ্জিনের। আওয়াজটা এখন একেবারেই মিলিয়ে গেছে।

শম্বরটা ওর বিরাট ডালপালা-সম্বলিত শিং পিঠের উপর শুইয়ে দিয়ে মুখ উপরে তুলে হাওয়া শুঁকলো একবার। মিষ্টি গন্ধ। মহুয়ার। কাছাকাছি অবশ্য মহুয়া বেশি নেই। অসময়ের বৃষ্টিভেজা হাওয়ায় হাওয়ায় বাস আসছে। যে কটা মহুয়া ধারে পাশে আছে সে সব গাছের একশ গজের মধ্যেও যাবার উপায় নেই। মানুষগুলো কালো কালো লম্বা লাঠির মত কী একরকম জিনিস—হাতে প্রায়ই গাছের উপর বসে থাকে। কাছাকাছি পৌঁছলেই গুড়ুম্ করে একটা আওয়াজ হয়—আর এক ঝলক আগুন।

ব্যাস, আর সেখান থেকে ফিরতে হয় না।

ভোর রাতে যে এক দৌড়ে গিয়ে ভরপেট মহুয়া খেয়ে আসবে তারও উপায় নেই। সেই অন্ধকার থাকতেই কোথা থেকে মানুষদের মেয়েরা এবং বাচ্চারা ঝুড়ি হাতে এসে পৌঁছয়। মহুয়া কুড়িয়ে নিয়ে যায়। সে মহুয়া থেকে মদ তৈরি করে খায় ওরা। তারপর নাচ হয়, গান হয় ; মাদল বাজে।

সন্ধ্যাবাতের মাদলের গুম্‌গুমানি পাহাড় ছাপিয়ে কাঁপতে কাঁপতে জঙ্গলের প্রত্যেক শম্বরের বুকে এসে পৌঁছয়। ওদের বুকের মধ্যে ভয় গুড়গুড় করে।

এই রকম রাতে, যখন সমস্ত বনে পাহাড়ে, কোয়েলের কাঁচা করম্‌চা-রঙা বালিতে, এক চমৎকার শান্তি বিছানো থাকে, যখন শুকনো পাতা উড়িয়ে বনের বুক মুচড়িয়ে, মচ্‌মচিয়ে হাওয়া বয়, যখন দূরের পাহাড়ে ডুবে-যাওয়া চাঁদকে ধাওয়া করে কোনও টি-টি পাখি ডাকতে ডাকতে, উড়তে উড়তে জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে যেতে থাকে, যখন জীরহুল আর ফুল-দাওয়াইর গন্ধ ভাসে হাওয়ায়, তখন এই একরা শিঙাল শম্বরটা, একা-একা, একা-একা বিস্তীর্ণ বন আর পাহাড়ের নির্জনতায় দাঁড়িয়ে অনেক কথা ভাবে।

মানুষেরা জীপগাড়ি চড়ে রাতের সহলে আসে। জানোয়ারদের রাহান-সাহানের খোঁজ

নিয়ে এসে এদিকে ওদিকে আলো ফেলে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে যায়। তীব্র আলো ছুরির ফলার মতো বনের বুক চিরে এফোঁড় ওফোঁড় করে। মানুষদের গাড়ির ধুঁয়োর বিচ্ছিরি গন্ধে শম্বরদের নাক জ্বালা করে।

শম্বরটা গাছের আড়ালে বোবা-মুখে, শান্তির, পান্নার মতো সবুজ আলোয় দু চোখ ভরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হয়তো দূরের ফেলে-আসা দলের কারও গায়ে গুলি লাগে। সে পুরুষ শম্বরও হতে পারে। মেয়েও হতে পারে। যাব গায়ে লাগে, সে আচমকা পড়ে যায়। তারপরই হয়ত উঠে পড়াব জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। পায়ের নীচের শুকনো পাতা খচ্‌মচ্‌ করে। পাথরে একটা আছাড় পড়াব শব্দ হয়। জিভটা দাঁতে কামড খায়। নইলে ঐখানেই তাকে কেটে তার শরীরের সুস্বাদু অংশগুলো বয়ে নিয়ে যায়। পরের দিন ভোবে শকুনের ঝাঁক সেই মৃত শম্বরের ক্ষতবিক্ষত শরীরের অবশিষ্টাংশ নিয়ে খাবলা-খাব্‌লি কবে। তার জল-ভেজা অর্ধগলিত চোখ দুটিকে বড় বড় ঠোঁটে ঠা-ঠা বোদে ঠপ্‌-ঠপ্‌ করে ঠোক্‌রায়।

তাই, শম্বরটা মানুষদের ঘৃণা করে।

যেদিন মানুষরা আসে না, সেদিন বড় বাঘটা আসে। ছোট বাঘ ওদের বিশেষ ঘাঁটায় না। বড় বড় কালো পাথরের আর ঝুপ্‌বী গাছের ছায়ায় শুকনো পাতা এড়িয়ে পা ফেলে ফেলে গুঁড়ি মেবে বাঘটা একরা শম্বরটার পিছু নেয়। বাঘটা যেমনভাবে প্রায়ই শম্বরটার পিছু নেয়, বেশি দিন ও পালিয়ে বাঁচতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে, বাঁচার ইচ্ছাও ওর আর নেই তেমন।

সব সময় ভয়, কখন কি হয়; কখন কি হয়! তার উপর এখন সে একা। একেবারেই একা। ওর পুরানো দলটা দক্ষিণের পাহাডেব নীচের গভীর নালায় শাকুয়া আর আসন গাছের ছায়ার নিচে নিচে থাকে দিনের বেলায়। ওখানে একদল শুয়োরও থাকে। শুয়োরগুলোর প্রত্যেকেরই মুখ চেনে শম্বরটা।

দোষের মধ্যে, এই দামাল সদা-যুবক শিঙালে শম্বরটা একদিন একটা আমলকি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সেই ফিকে পাটকিলে-রঙা মেয়ে শম্বরটার গলায় একটু মুখ ঘষেছিলো।

মেয়ে শম্বরটা, আরামে, আনন্দে, একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলেছিলো। ওরও খুব ভালো লেগেছিলো। ঠিক এমনি সময়ে দলের সর্দার শম্বর প্রকাণ্ড শিং নিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর শিঙে শিঙে কী খটাখটি। সেই প্রচণ্ড লড়াইয়ের আওয়াজ শুনে টিয়ার দল ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেছিলো। সবুজ টুঁই পাখিগুলো ঘাস ফড়িং-এর মতো উত্তেজনায় টি-টুঁই টি-টুঁই করে চারপাশে লাফাতে লেগেছিলো। এখনো মনে আছে।

একরা শম্বরটা তারপর এক সময় লড়তে লড়তে, লড়তে লড়তে, ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। শিঙাল সর্দারের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠেনি ও। রক্ত চুঁইয়ে পড়েছিলো ওর বড় বড় লোম-ভরা গায়ে। পায়ের নীচের লাল মাটির সঙ্গে রক্ত মিশে কাদা কাদা হয়ে গেছিলো খুরের আঘাতে আঘাতে।

তারপর এক সময় শীতের বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে টলতে টলতে তার সুন্দরী সঙ্গিনীর গায়ের গন্ধ থেকে, তার দুঃখ-সুখের দল থেকে; শম্বরের সমাজ থেকে সে চিরদিনের মত নির্বাসিত হয়েছিলো। পুরুষশাসিত শম্বর সমাজে অন্য সমর্থ অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষের জায়গা হয়নি এক দলে।

তারপর থেকেই শম্বরটা একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে। 'একা' হয়ে গেছে। সমস্ত রাত নদীর চরে দৌড়ে বেড়িয়েছে। শক্ত শাল গাছের সঙ্গে প্রহরের পর প্রহর শিং ঠুকে পরীক্ষা করেছে তার শিং যথেষ্ট শক্ত হয়েছে কিনা। ও দাঁতে দাঁত চেপে বার বার বলেছে, একদিন

না একদিন তাকে দলে ফিরে যেতেই হবে। তাকে লড়তেই হবে সর্দারের সঙ্গে। লড়ে, তার শিঙের আঘাতে আঘাতে সর্দারকে ক্ষতবিক্ষত ভূলুণ্ঠিত করে সর্দার একদিন যেমন করে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো দল থেকে, ঐ ক্ষমতাপিপাসু সর্দারকে ও নিজেও তেমনি করে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের শিঙে ও ক্ষমতালিপ্সার মহার্ঘ মুকুট পরবে। ওর দলের উপর তখন কেবল ওর একারই অধিকার থাকবে। ওর সেই পাটকিলে-রঙা বান্ধবীকে তখন ও পাটরানী করবে। করবেই একদিন। না করতে পারলে, ও জানবে যে ও পুরুষই নয়।

এই রোজকারের ব্যায়াম এবং একা একা, সশব্দ মানুষকে এবং শব্দহীন বাঘকে বাঁচিয়ে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করে করে শম্বরটা আগের থেকে অনেকটা সবল হয়ে উঠেছে। আত্মবিশ্বাসীও হয়ে উঠেছে। যেদিন দল থেকে নির্বাসিত হয়েছিলো, সে দিনের শেষের রাত জঙ্গলে পাহাড়ে একেবারে ওর একা একা কী দারুণ ভয়ে আর আশঙ্কায় যে কেটেছে তা আজও শম্বরটার মনে আছে।

কোয়েল নদীর বালিময় বুকে চাঁদনী রাতে একা একা হাঁটতে হাঁটতে শম্বরটা প্রথম প্রথম দাঁতে দাঁত ঘষতো। সর্দারের উপর ওর প্রথম প্রথম ভীষণ ঘৃণা হতো। কিন্তু ইদানীং ও কেমন যেন বুঝতেও পারে সর্দারকে। একটু যেন শ্রদ্ধাও হয় সর্দারের উপর। শ্রদ্ধা হয়তো হত না, যদি ও এতদিন তিল তিল করে সর্দারের প্রায় সমকক্ষ না হয়ে উঠতো। নিজে একা একা বাঁচার চেষ্টা করে আজ একরা শিউলে শম্বরটা বুঝেছে যে, নিজে বাঁচাই যদি এতো কঠিন হয় তো অত বড় দল, মেয়ে ও বাচ্চা শম্বরে ভরা দলকে বাঁচাবার দায়িত্ব কতখানি!

প্রচণ্ড গরমের সময় সর্দারকে হাতীর দলের পথের চিহ্ন দেখে বাঘ, বাইসন, চিতা সকলের সঙ্গে মরুভূমির মত লু-বওয়া বনে বনে জলের সন্ধানে ঘুরতে হয়। জলের কাছাকাছি থাকতে হয়। জল ছাড়া কোনও প্রাণীরই প্রাণ বাঁচে না। অথচ তখন জলের কাছাকাছি বাঘও থাকে। বাঘের হাত থেকে দলের সকলকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় প্রতি দিন, প্রতি রাত, প্রতি মুহূর্ত। আবার বর্ষার দিনে পাহাড়ী নদীর ঢল বাঁচিয়ে কোথায় কি খাবার আছে তার খোঁজে ফিরতে হয় সকলকে নিয়ে। বুনো কুকুরের দল যখন আসে, তখন দলের ছোট-বড় সকলকে বাঁচাবার দায়িত্ব সর্দারের উপরই পড়ে। তারপরে অবশেষে যখন শীত আসে, পাহাড়ের উপত্যকার ক্ষেতে ক্ষেতে যখন গেঁহু-বাজরা লাগে, কুলথী লাগে, সুরগুজা লাগে, যখন অড়হরের ক্ষেতের গন্ধ শীতের শেষ রাতের কুয়াশায় ভাসতে থাকে, তখন পাহারাদার গাঁওওয়ালাদের পাহারা এড়িয়ে, শিকারী মানুষের চোখ বাঁচিয়ে এত বড় দলকে সামলে নিয়ে ভাল-মন্দ খাবার খুঁজে বেড়াতে হয়। যখন গরম অসহ্য হয়, যখন পাহাড়ে পাহাড়ে দাবানল জ্বলে, জঙ্গলকে-জঙ্গল হু-হু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সেই সময়ে পোড়া গাছ, ধুঁয়ো আর আগুনের তাপ ছাড়িয়ে দূরে, অনেক দূরে, কোনও ঠাণ্ডা ছায়ার উপত্যকায় সারা দলকে নিয়ে যাবার দায়িত্বও তখন সর্দারের উপরেই পড়ে।

শম্বরটা ভাবে, তবু সর্দার হলে, নিজের দায়িত্বে তার দলকে নিয়ে যা খুশি তাও করা যায়। কোনও সুন্দর ছবির মতো শীতের দুপুরে পালামৌর জঙ্গলের আমলকি গাছেদের ছায়াভরা কোনও পাহাড়ী মালভূমিতে সমস্ত দলকে নিয়ে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়ানো যায়। আরও কত কী কত কী করা যায়। একদিন না একদিন শম্বরটা তার দলে ফিরে যাবেই। তার দলের সর্দার সে হবেই।

প্রায় রাতেই এই শম্বরটা স্বপ্ন দেখে যে ও টিলার উপরে শিং-উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সর্দার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত শরীর নিয়ে অপমানের বোঝায় মাথা নিচে নামিয়ে, পিঠের উপরে তার মস্ত শিংকে শুইয়ে ধীরে ধীরে টিলা বেয়ে, তার দল ছেড়ে, কোনও অজানা বনের দিকে

চলে যাচ্ছে। একদিন এই শম্বরটা যেমন সর্দারের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে রক্তাক্ত শরীরে গেছিলো।

অনেকক্ষণ ধরে এসব কথা ভাবছিলো শম্বরটা। ভাবতে ভাবতে ও খুব রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। নিজের মনে একবার হেসে উঠলো ঘ্যাক্ ঘ্যাক্ করে। নিস্তব্ধ রাতে, নদীর কোলের সে আওয়াজ দুধারের উঁচু পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুবের পাহাড়ের নীচের ঝোপেঝাড়ে একটা টীটী পাখি ডাকতে ডাকতে উড়তে লাগলো। একটা কোট্‌রা হরিণের ভয়-পাওয়া ডাক কানে এলো, ব্বাক্ ব্বাক্। শম্বরটা এক দৌড়ে নদীর এপারে এসে গাছের আড়ালে গিয়ে ঐদিকে সাবধানে চেয়ে রইলো বাঘের মতলব বোঝার আশায়।

॥ ২ ॥

সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে একফালি চাঁদ উঁকি মারছে জঙ্গলের মাথায়। তারপর আবারও কালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে খুব জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাথুরে মাটিতে প্রথম জলপড়ার পর থেকে সেই মিষ্টি গন্ধটা মাটি ছেড়ে উঠে জঙ্গলময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। একটা এলোমেলো ভিজে হাওয়া বনের শাখা-প্রশাখা, ঘাস-পাতা উথাল-পাথাল করছে।

শম্বরটা ওদের পুরানো আস্তানার দিকে এগিয়ে চলেছে। দু দুটো পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে।

কতক্ষণ চলেছে মনে নেই শম্বরটার, তবে এখন চেনা পটভূমিতে এসে গেছে। সেই বড় শাকুয়া গাছটা। আসন আর পিয়াশালের জঙ্গল। পশ্চিমের পিটিস ঝোপে-ভরা টিলা। সব—সব। খুবই চেনা মনে হচ্ছে।

শম্বরটার মা-বাবার ঠিক নেই।

যে শিঙাল-সর্দারকে পরাজিত করবে বলে ও আজ দলের কাছে ফিরে এসেছে, সে ওর বাবাও হতে পারে। যে মেয়ে শম্বরটাকে ওর ভাল লেগেছিল—দলের সেই পাটকিলে শম্বরীটা সে তার বোন অথবা মাও হতে পারে। শম্বরদের সমাজে মা-বাবা স্ত্রী-পুত্র ভাই-বোন বলে কিছু নেই। শুধু বাচ্চা আছে আর ধাড়ি আছে। মরদ আছে আর মাদী আছে। মানুষের মেয়েদেরই মতো, যেখানেই মেয়ে শম্বরেরা থাকে, সেখানেই ক্ষমতার প্রশ্ন থাকে। সেখানে একসঙ্গে দুজন পুরুষ থাকতে পারে না। যার শিঙে জোর বেশি, শুধু সেই পুরুষই থাকে। মাত্র একজন নেতা হয়ে। অন্য পুরুষেরা থাকে কিন্তু নেতা তো একজনই হবে!

এবার বেশ কাছাকাছিই পৌঁছে গেছে শম্বরটা। আর একটু গেলেই সেই টিলাটায় পৌঁছে যাবে—তারপরই নালাটা। তবে এই রাতের বেলায় অশান্তি করবে না। কাল সকালে সূর্য উঠলে ও গিয়ে দাঁড়াবে জলের কাছে। হয় এসপার নয় উসপার।

হঠাৎই শম্বরটার নাকে মানুষদের জীপ-গাড়ির পেট্রোলের এবং অন্য কিছু একটা বিচ্ছিরি পোড়া-পোড়া গন্ধ ভেসে এলো। শম্বরটার নাক জ্বালা করতে লাগলো। শম্বরটা সাবধানে আর একটু এগোতেই দেখলো টিলার নীচে, নালার পাশে, জঙ্গলের দিকে ওর পুরানো দলের প্রায় সব শম্বর-শম্বরী অন্ধকারে গোল হয়ে কী যেন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ দূর

থেকে ঐখানে দাঁড়িয়েই সে দলের মধ্যে সর্দারকে খুঁজতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাকে দেখতে পেলো না। তখন তার শিং দুটোকে তার চওড়া কাঁধের উপর শুইয়ে, আত্মবিশ্বাসের ধীর পায়ে শম্বরটা এক পা এক পা করে ওর দলের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। সর্দারের কি কিছু হলো? লড়াই করতে নয়, দলের খোঁজ নিতে গেলো ও।

ওকে দেখতে পেয়েই সকলেই ওকে সসম্মানে জায়গা করে দিলো। শম্বরটা দেখলো যে শিঙাল সর্দার হাঁটু মুড়ে কাত হয়ে আধশোয়া ভঙ্গীতে মাটিতে পড়ে আছে। সর্দারকে মানুষরা গুলি করেছিলো। কিন্তু গুলিটা পেটে লেগেছিলো বলেই বড় রাস্তা থেকে এত দূরে পালিয়ে আসতে পেরেছে সে। শিঙাল সর্দারের নাড়ি-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে গেছে। শাল গাছের চারায় আটকে আটকে আছে। শিঙাল সর্দারের দু চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

শম্বরটা আস্তে আস্তে শিঙাল সর্দারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। শম্বরটার মনে হলো সর্দার যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করেছিলো। সর্দারের চোখে "তোমারই সব রইল। এদের মালিক তুমি" গোছের একটা ভাব ফুটে উঠলো।

পরক্ষণেই সর্দারের লম্বা গ্রীবা ও ডালপালাওয়ালা শিং-সমেত প্রকাণ্ড মাথাটা মাটিতে আছড়ে পড়লো। দলের সব পুরুষ ও মাদী শম্বর নিঃশব্দে মৃত শিঙালটার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

শম্বরটা ওর চারদিকে চেয়ে দেখলো। তার পুরোনো দল, তার পাট্‌কিলে রঙের বান্ধবী, ওরা সকলেই তার আদেশের প্রতীক্ষায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

যে দলের সর্দারী করার স্বপ্ন দেখেছে ও দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, যে সুন্দরী শম্বরীর গায়ের গন্ধ পেয়েছে কল্পনায় সে, তারা সকলে, তারা প্রত্যেকে, তাদের নতুন সর্দারের কাছে বাধ্যতা, আনুগত্য ও শ্রদ্ধার শপথ নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে নির্নিমেষে।

শিঙাল শম্বরটা মেঘলা-আকাশের নীচের এলোমেলো বৃষ্টি-ভেজা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলো। তারপর ধীরে টিলা ছেড়ে নেমে যেতে লাগলো।

সেই সুন্দরী শম্বরী চোখ তুলে নরম করে চাইলো। বোধ হয়, বলতে চাইলো, কোথায় চললে?

শম্বরটা কান নাড়লো। বলল, জানি না।

দলের সকলেই সমস্বরে বললো, তার মানে? তুমি কি আমাদের সর্দার হবে না?

শম্বরটা হাসলো। তারপর বললো, না।

তবে আমাদের সর্দারী কে নেবে?

শম্বরটা নামতে নামতে মুখ ঘুরিয়ে বললো, হয়তো নতুন কেউ আসবে অন্য কোনও দল থেকে বিতাড়িত হয়ে, হয়ত তোমাদের দলেই কেউ সর্দার হয়ে উঠবে। পুরুষ তো আরও অনেকই আছে দলে। আমি জানি না।

ওরা সকলে বললো, না, না। আমরা তোমাকেই চাই।

শম্বরটা হাসলো, ঘ্বাক্ ঘ্বাক্ করে। বললো, চললাম। তোমরা সব ভালো হয়ে থেকো। বাঘটা কাছাকাছিই আছে। মানুষরাও আবার আসতে পারে। বুঝেছো।

সেই পাটকিলে শম্বরী ওর পিছু পিছু অনেকখানি এলো। ওকে বার বার শুধোলো, তুমি কেন চলে যাচ্ছো বলে যাও; কোথায় যাচ্ছো, বলে যাও।

শম্বরটা দাঁড়িয়ে পড়ে, শম্বরীর গলায় জিভ দিয়ে চেটে একটু আদর করে দিলো। তারপর বললো, নতুন দলের খোঁজে যাচ্ছি। যে দলের শিঙাল সর্দার এখনও জীবিত আছে। যে আমাকে দেখেই রুখে দাঁড়াবে। যার রক্তে আমাকে রক্তাক্ত হয়ে তারপরই

সদরী পেতে হবে।

শম্বরী অবাক হয়ে বললো, কেন ? সদরী তো তুমি এমনিতেই পাচ্ছো। তার জন্যে মিছিমিছি রক্তারক্তি করবে কেন নিজেকে ?

শম্বরটা টিলার প্রায় নীচে নেমে এসে বললো, তুমি বুঝবে না। বিশ্বাস করো, বললেও তুমি বুঝবে না। পুরুষ হলে বুঝতে।

ততক্ষণে আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে একফালি চাঁদ আবার উঁকি দিয়েছে। ঝোড়ো বাতাসে শিঙাল শম্বরের তাজা রক্ত ও নাড়িভুঁড়ির গন্ধ ভাসছে তখনও। পাটকিলে মাদী শম্বরের শরীরের গন্ধ।

শম্বরটা টিলা থেকে নেমে এসে, যে পথ দিয়ে এখানে নেমে এসেছিলো সেই পথেই আবার ফিরে চললো। কোথায়, তা ও জানে না।

বাঘটা, পথের পাশের একটা বড় পাথরের আড়ালে এতক্ষণ সামনের দু থাবার উপরে মুখ রেখে শুয়েছিলো। শুয়ে শুয়ে শম্বরের দলটার উপরে নজর রাখছিলো। শিঙালকে একলা এদিকে ফিরে আসতে দেখেই আড়মোড়া ভেঙে উঠে বাঘটা লাফিয়ে পথে নামলো।

তারপর গাছের ছায়ায় ছায়ায়, সাবধানী পা ফেলে ফেলে, শম্বরটার পিছু নিলো।

পহেলি পেয়ার

হাঁটা পথে মাইল ি নক পড়েতা। পয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টাব পথ। টাঙ্গায় গেলে পনেবো থেকে কুড়ি মিনিট।

মাঝে মাঝেই যেতাম। পাশেব বাড়িব ভোমবা ভাবীব জন্যে সুর্মা কিনতে, কী আতব কিনতে। কখনও বা যেতাম, বানাবসী মঘাই পান খেতে।

সন্ধেবেলা পুবো জাযগাটাব চেহাবাটাই পালটে যেতো। গোঁফে আতব মেখে, ফিনফিনে আদ্দিব পাঞ্জাবি পবে, সাদা কালো বাদামী ঘোড়ায টানা একলা এক্কা চালিযে কত শত নবাবেবা আসতেন। নানাবকম নবাব।

দোতলা বাড়িগুলোব মহলে মহলে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলতো। জর্দাব খুশবু,সাবেঙ্গীব গজ-এব গুমবানি, অশান্ত ঘোড়াব পা ঠোকাব পৌনঃপুনিক আওয়াজ এবং তাবই সঙ্গে মাঝে মাঝে বাবান্দায হঠাৎ ঝলক ঝলক দেখা দেওয়া সুগন্ধি শবীবিণী। কেযা ফুলেব গন্ধ যাদেব চুলে, জিন পবীব মাযা যাদেব চোখে পান খেযে ঢোক গিললে যাদেব ফর্সা স্বচ্ছ গলাব নীল শিবা-উপশিবাবা লাল হয়ে যায, সেই সব কত শত নাম জানা না জানা সুন্দবীদেব, গাযিকাদেব।

এবা কেউ সকাল বেলায গান গায না। আশ্চর্য। সমস্ত মহল্লা ঘুমিযে থাকে সকালে। গতবাতেব বাসিফুলেব স্মৃতি নিযে ফবাশে ইতস্তত তাকিযা ছড়ানো থাকে। ক্লান্ত সাবেঙ্গী গা-খুলে শুযে থাকে। জানলা দিযে কোনও ভিনদেশী মাছি এসে তাবে তাবে চমকে চমকে নেচে বেড়ায অলস হাওযায পিড়িং পিড়িং কবে একলা ঘবে ঘবে সুব পাখনা নাড়ে। কোনও তওযাফ-এব পেলব গা ঘেষে শুযে থাকা কাবুলি বেড়ালটি, হযত ঘুম ভেঙে এসে ম্যাযফিলেব ঘবে হাই তুলে বলে মিযাও মিযাও, মুঝে কুছ তো পিযাও।'

অথচ, যেমনি পাঁচটা বাজে, যখন দোতলা বাড়িগুলিব ও পথেব পাথবে পাথবে বৌদ্রেব উষ্ণতাটা থাকে শুধু, আলোব পবশ যখন মুছে যায পথে পথে টাঙাগুলো যখন মাতালেব মতো টলতে টলতে ঝুমঝুমি বাজিযে চলে তখন এ মহল্লাতে এবং মহল্লাব চাবদিকে হঠাৎই একটা ব্যস্ততা পড়ে যায। ফুলওযালা ডিমওযালা, কাবাবওযালা, ঈত্বওযালা সকলেই তৈবি হতে থাকে বাতেব জন্যে। বাঁযা তবলাতে ঠুক ঠুক আওযাজ ওঠে। জোড়া তানপুবা বাঁধা হয।

বিকেল থাকতে থাকতেই মুক্তাব্বব বাগানে ঢোকে ফুল তুলতে। আমাদেব মছিন্দাব বাড়িব বাগানে। মুজাব্বব আমাদেব খিদমদগাব বহমানেব ভাইপো। আমি তখন কলেজে পড়ি। গবমেব ছুটিতে মছিন্দাতে গেছি। উত্তবপ্রদেশেব মীর্জাপুব শহবেব কাছেই মছিন্দা।

মীর্জাপুর থেকে এলাহাবাদ যাওয়ার পথের উপরে। বাড়িতে ঠাকুমা আছেন শুধু। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে পূজা দেন। গঙ্গায় স্নান করেন এবং আমাকে ভালোটা-মন্দটা রেঁধে খাওয়ান।

পড়াশুনা করতে চাই। নিজেকে বার বার শাসন করি ; বকি, কিন্তু দুপুর থেকে যেই ঝুরঝুর করে গাছের পাতায় পাতায় হাওয়া দেয়, শুকনো পাতা ওড়ে, টিয়া পাখির ঝাঁক ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ করে তীক্ষ্ণ স্বর ছড়িয়ে গঙ্গার দিক থেকে উড়ে আসে অমনি মনটা উদাস উদাস লাগে। পথ বেয়ে মছিন্দার পথে ভাড়ার-টাঙা টুঙটুঙিয়ে চলে। পড়া আর হয় না। বারান্দার চেয়ারে বসে মুজাব্বরের প্রতিক্ষায় পথ চেয়ে থাকি। বইয়েব পড়ার বাইরেও যে অনেক পড়াশুনো থাকে, যে পাঠ জীবন থেকে নিতে হয়, সেই সব পড়াশুনোর জন্যে তীব্র আকুতি জাগে।

রোজ মুজাব্বর ফুল তোলে। শুধুই গোলাপ। লাল গোলাপ। কাঁটা মুড়িয়ে ডাঁটা ভাঙে। তারপর ঝুলি ভরে নিয়ে চলে যায় মীর্জাপুরে। তওয়ায়েফদের মহল্লায়। ঘরে ঘরে ফুল দেয় ও। ওকে রোজ দেখি আর ঈর্ষা হয়। ঠাকুমা ঘরের ইজিচেয়ারে বসে গুনগুনিয়ে অতুলপ্রসাদের গান করেন :

"আমার বাগানে এতো ফুল, তবু কেন চলে যায় ? তারা চেয়ে আছে তারি পানে, সে তো নাহি ফিরে চায়···"

আমি মুজাব্বরের জগতের কথা ভাবি আর কৌতূহলে কাঁদি। মুজাব্বর আমার চেয়ে বয়সে সামান্যই বড় হবে, অথচ পৃথিবীর ও কত জানে শোনে, কত বোঝে !

সকালে ও যখন আমাকে পথ দেখিয়ে পাহাড়ে তিতির মারতে নিয়ে যায় তখন ওকে আমার কাছের মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু যেই বিকেল হয়ে আসে, হাসনুহানার গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিশে বুকের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে , অমনি ও যেন আমার কাছ থেকে হঠাৎই অনেক দূরে চলে যায়। ও যেন মুহূর্তের মধ্যে অনেকই বড় হয়ে যায়। আমার গুরুজন হয়ে ওঠে। ও যে জগতে প্রবেশ করে, সে জগতের চৌকাঠ মাড়ানোর কোনও উপায়ই নেই আমার। সেই মুহূর্তে, প্রতিদিনই মুজাব্বরকে আমার বড় ঈর্ষা হয়।

একদিন ওকে কথাটা বলেই ফেললাম। কিন্তু প্রথমে ও কিছুতেই রাজী হল না। বললো, গুণ্ডা-বদমাস আছে। মীর্জাপুর বহতই খতরনাগ জায়গা ; এক মানুষ লম্বা লাঠি নিয়ে লোকে পথেঘাটে চলাফেরা করে। তুমি কি করতে যাবে ? সেখানে তওয়ায়েফ্ মহল্লায় ? বড়া-খানদানের পড়ালিখা করা ইন্সান ! তাছাড়া ঠাকুমা জানলে কেলেঙ্কারি হবে। আমার চাকরি তো যাবেই। কাকার চাকরিটাও যাবে।

কিন্তু আমি ওর প্রায় পা ধরতে বাকি রাখলাম। শেষকালে আমায় নাছোড়বান্দা দেখে ও বলল, আচ্ছা। চলো। কাল চলো।

মুজাব্বর যে সময়ে যায়, তেমনি সময়েই আগে চলে গেলো। ওর নির্দেশমতো যথাসময়ে পানের দোকানটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোকান-জোড়া আয়না। নানা লোকে পান কিনছে। মিঠি-মিঠি বলছে। লক্ষ্ণৌর লোকের মতো মীর্জাপুরের লোকদেরও বড় মিঠি জবান। আয়নায় নিজের মুখের ছায়া পড়তেই দেখলাম, চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাবার আগে যেমন লাগে, তেমন লাগছে। কান গরম। এমন সময় মুজাব্বর এল। এবং মনে হলো, ওই যেন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। ও আসতেই, ভয়টা প্রায় উবে গেল। রইলো শুধু কৌতূহল।

এগোতে এগোতে মুজাব্বর বলল, টাকা এনেছ ?

টাকা কিসেব?

টাকা না তো, তারা কি তোমার সুরত দেখে গান শোনাবে?

এটা তো সত্যিই ভাবিনি আগে।

বললাম, সঙ্গে দশ টাকার একটা নোট আছে। ঠাকুমা জন্মদিনে দিয়েছিলেন।

ও হাসলো। বললো ঠিক আছে দশ টাকায় শুধু মুখই দেখতে পাবে। গান শোনা আর হবে না।

খুবই মনক্ষুণ্ণ হলাম তখন তো আর কিছু করারও নেই তা ছাড়া বেশি টাকা আমি পাবোই বা কোথায়?

যে সব লোক ও পথে আসছিলো যাচ্ছিলো, তারা আমায় দেখে অবাক হচ্ছিলো। দু-একজন কী সব মন্তব্য টন্তব্যও করলো। হেসে উঠলো।

মুজাব্বর তাদের একটুও পাত্তা না দিয়ে আমাকে নিয়ে একটি বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলো। দোতলায় উঠে গেলো। চকমিলানো বাড়ি। ভিতরে চাতাল। তার চার পাশে দোতলা ঘোরানো বারান্দা। কোনও ঘরের দরজা বন্ধ। কোনও ঘরের দরজা খোলা কয়েকটি ঘর থেকে সারেঙ্গীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো গান শোনা যাচ্ছিলো।

মুজাব্বর বলল সব ঘরে ঢুকে কি করবে? সবাইকে দেখলে ভালো লাগবেও না যাকে দেখলে ভালো লাগবে তার ঘরেই নিয়ে যাবো তোমাকে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ও যে—যে ঘরে মেহেমান এসেছেন সে—সে ঘরে ফুল দিয়ে এলো।

তারপর আমাকে নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পাশের বাড়িতে পৌঁছে সটান দোতলায় উঠে একটি ঘরে ঢুকে পড়লো। ঘর মানে ফ্ল্যাটের মতো। একটির বেশি ঘর আছে। মধ্যে একটুখানি প্যাসেজ। সেই প্যাসেজ পেরিয়ে গিয়েই একটি বিরাট ঘরে গিয়ে পৌঁছোলাম। পৌঁছেই থমকে দাঁড়ালাম।

ধবধবে ফরাশ পাতা। মোটা গদীর উপর। দেওয়ালে হেলানো ভাবে টাঙানো আয়না। আয়নার নীচে সারি দেওয়া দুধ সাদা তাকিয়া একটার পর একটা সাজানো। মাথার উপর থেকে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে।

একটি ছিপছিপে মেয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিলো। ফুল-সাজানো বেণীটি পিঠ থেকে টান টান হয়ে ঝুলে ছিলো নীচে। জানলা দিয়ে কিছু দেখছিলো বোধ হয়। এদিকে মুখ না ফিরিয়েই শুধোলো কৌন?

- ম্যায় মুজাব্বর।

কই মেহমান নেহী আঁয়ে হে, তো ম্যায় ফুলোঁসে ক্যা করুঁ?

মুজাব্বর আবার সঙ্কোচের সঙ্গে ডাকলো, বাই।

এবার মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। আমার মনে হল ঝাড়লণ্ঠনের আলো ম্লান হয়ে গেল। তার দু চোখে এতো ঔজ্জ্বল্য, তার দু চোখ ঠিকরে এত আলো বেরুচ্ছিলো যে, তাতে আমার চোখের সামনের সব কিছুই ম্লান হয়ে গেল। অবাক হলাম। আমি যেমন বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে ওর দিকে চেয়েছিলাম ও-ও তেমনি চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে দেখে।

ওর পক্ষে অবাক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমার বাপ-ঠাকুর্দা কেউ কোনও দিন বাঈজী-বাড়ি যায়নি। তাদের সে পাপ অথবা পুণ্যের কোনও ছাপ হয়ত আমার চেহারায় ছিল। তা ছাড়া, আমি তাজমহল দেখবার চোখ নিয়ে তার কাছে গেছিলাম। মুরগীর মাংস খাবার চোখ নিয়ে যাইনি। ও হয়তো এই নিপট আনাড়ির চোখে এমন কিছু আবেদন

দেখেছিলো যার জন্যে ও অবাক হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

এসে মুজাব্বরকে শুধোলো, এ কে বে?

মুজাব্বর অপরাধীর মতো বললো আমার চাচার মনিবের ছেলে। গান ভালোবাসে খুব। তাই আপনার গান শুনতে এলো। বারণ করেছিলাম। কিছুতে শুনলো না। কিন্তু ওর টাকা নেই। মানে, মাত্র দশ টাকা আছে।

মেয়েটি টুণ্ডা-প্রপাতের মতো ঝর-ঝরিয়ে হেসে উঠলো। শ্বেতা দাঁতে আর নখে হীরের আলো চমকাল। তারপর থমকে গিয়ে আবারও চমকালো। বেণী থেকে একটি বেল ফুল খসে পড়লো হাসির দমকে।

হাসতে হাসতে সে মেয়ে বললো, আয়ী মেরী মেহমান! তারপর কৌতুকের চোখে শুধোলো, কিত্না উমর হোগা আপ্কি?

বললাম, কুড়ি বছর। ও বললো, ম্যায ভি বিশ সালকি। মগব কিতনা ফারাক্।

তারপর মেয়েটি হঠাৎ আত্মীয়তার সুরে বললো আইয়ে আইয়ে, তসরিফ্ রাখিয়ে, আপ্কি পুরী তারিফ্ তো মুঝে বাৎলাইয়ে?

বেশ কেটে কেটে আমার নাম বললাম। সত্যি নাম গোপন করলাম না। আমার বেশ রাগই হচ্ছিলো। ও ভেবেছেটা কি? দেখতে না হয় সুন্দরীই, গানও না হয় ভালোই গায়; রাজা-রাজড়া লোক না হয় ওর পায়ের কাছে মাথা কোটেই, তা বলে আমাকে অমন নস্যাৎ করার কি আছে জানি না।

আমি বললাম, গান শোনার মতো আমার টাকা নেই। শুধু দেখতে এসেছি। এবার মেয়েটি হাসতে হাসতে কাঁপতে কাঁপতে বেলজিয়ান দেওয়াল-আয়নার মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ফরাশের উপর যেন ছড়িয়ে পড়ল। তার অগণ্য টুকরো টাকরা ফরাশময় প্রতিসরিত হতে লাগলো। সে বসে কুর্নিশ করে বললো, আদাব! আদাব! বড়ী মেহেরবানি আপ্কি।

বসবার জন্যে জোর করাতে, বসলাম, সঙ্কোচের সঙ্গে, ফরাশের উপর।

মুজাব্বর দাঁড়িয়েই রইল।

মেয়েটি তেমনি অবাক চোখে আবার শুধোলো, আপ্‌কি খুদ গানা গাতে হেঁ?

বললাম, থোড়া বহত।

বড়ী খুশীকি বাত।

ম্যায় গানা শুনাউঙ্গী আপকো, জরুর শুনাউঙ্গী, মগর আপকোভি গানা শুনানা পড়েগা।

চমকে উঠলাম। বললাম, আমি বাথরুমে গাই, নইলে একা একা গাই। ম্যায়ফিলে গাইবার উপযুক্ত গান আমি জানি না।

মেয়ে তবু নাছোড়বান্দা।

সে বললো, এই ঘরও আপনার বাথরুম মানে করে নিন না কেন?

মহা মুশকিলেই পড়লাম। গান শুনতে এসে মহা ফ্যাসাদে ফাঁসলাম।

তওয়াফ চাকরকে ডেকে পান আনতে বললো এবং অন্য চাকরকে বললো দরজা বন্ধ করতে।

মুজাব্বর বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিলো, অবাক ও-ও কম হয়নি। হঠাৎ আমার কী মনে হলো, মুজাব্বরকে বললাম, তোমার থলিতে আজ কত গোলাপ আছে? ও বলল, তা না হলেও দশ টাকার তো হবেই।

বললাম, তোমার সব গোলাপ আজ আমি কিনে নিলাম। ও অবাক হয়ে গোলাপের

থলি উপুড় করে ফরাশে ঢেলে দিল। এবং বাঈজী নির্বাকে আমার দিকে চেয়ে রইলো।

বাঈজী হাততালি দিলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন মন্ত্রবলে সারেঙ্গীওয়ালা হারমোনিয়মওয়ালা এবং তবলচি এসে উদয় হলো। বাঈজী আমার আরো কাছে সরে এসে বসলো। অত কাছ থেকে এ বয়সে মা-ঠাকুমা-দিদি ছাড়া আর কোনও মেয়েকেই দেখিনি। আজও আমার চোখে সে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা হয়ে আছে। সরু কোমর, কবুতরী বুক, এবং বুদ্ধিদীপ্ত চঞ্চল চাউনির মুখ। অনেক সুন্দরী আজ অবধি দেখলাম কিন্তু অমনটি আর দেখলাম না।

সারেঙ্গীওয়ালার গজের টানে টানে কত কি অব্যক্ত বেদনা, কথা, গান সব বাজতে লাগলো। ঠুঙরির ঠাট-বাট, সুরের লচক্, গায়িকার মুখের ভাব, কাঠ-ঠোকরার মতো, আমার চোখ কান ঠোকরাতে লাগলো।

ও পিছনের আয়নায় একবার নিজের চেহারার দিকে বিমুগ্ধ নয়নে চাইলো। তারপর শরত সকালের মতো চোখ মেলে আমার চোখে চাইলো। আমার মনে হলো এ চাউনি জাদুর খেপলা-জাল-ছোঁড়া চাউনি নয়। অন্যকে বাঁধবার চাউনি এ নয়। ও যেন নিজেই বাঁধা পড়ে গেছে। হয়ত আমার অভাবনীয় সারল্যে, আমার সাবলীল স্পর্ধায় ও নিজেকে পুষ্পিত করে তুলেছে, মঞ্জরিত। সেই মুহূর্তে ওর নকল-আমিকে ছাপিয়ে ওর আসল আমি ওর উপরে আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে যে তা আমি বুঝতে পেলাম। আঁট-করে চুল-বাঁধা নাসরী-ক্লাসের ছট্‌ফটে মেয়ে তার ক্লাসের সহপাঠীর দিকে যেমন স্বর্গীয় চোখে চায়, সেই সুগন্ধি সন্ধ্যার জেওহর-বাই আমার দিকে তেমনি চোখে চেয়ে রইলো।

আমাকে প্রায় ধম্‌কে বলল, অব্ শুরু কিজীয়ে।

আমি বললাম, না। আগে নয়।

না। আপনি আগে।

আবদার করে মাথা নাড়ল ও।

বুড়ো সারেঙ্গীওয়ালা বললো, অব্ শুরু কিয়া যায়।

কী গান গাইবো ভেবে পেলাম না। হঠাৎ মনে এল মীর্জা গালিবের চারটি লাইন। তাতেই সুর বসিয়ে গেয়ে দিলাম।

"বুঢ়া না মান্ গালিব—
যো দুনিয়া বুঢ়া কহে,
এ্যায়সাভি কোঈ হ্যায় দুনিয়ামে
সবহি আচ্ছা কহে যিসে ?"

কেন জানি না, ওর চোখে চেয়ে আমার মনে হয়েছিল সমস্ত পৃথিবী ওকে খারাপ আখ্যা দিয়ে ওর এই কুড়ি বছরের মনটাকে একেবারে দুখিয়ে রেখেছে। ও যে ভালো না, ওর যে কিছুই ভালো নেই, মনে হলো সে বিষয়ে ও নিঃসন্দেহই হয়ে গেছে। তাই মনে হলো গালিবের কথায় ওকে বলি যে, এখনও সব ফুরোয়নি ; আশা আছে। এখনও ভালো লাগা আছে, এত বড় পৃথিবীতে এখনও ভালো লাগার, ভালোবাসার অনেক কিছুই আছে। শরীরের স্বর্গ পেরিয়েও আরও অনেক মহত্তী স্বর্গ আছে। কাজেই অমন কান্না-কান্না চোখে চাইবার কিছুই হয়নি।

কি হলো জানি না, কী করলাম জানি না। কেমন গান গাইলাম তাও জানি না। কিন্তু জহরের কানে সে গান কী কথা যে বয়ে নিয়ে গেলো তা সেই শুধু জানে।

গান শেষ হলে ও কোনও কথাই বললো না। কেবল মুখ নিচু করে নীরবে আমাকে বার

বার আদাব জানাল। দু চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতে লাগল ওর।

ঠিক এই রকম যে হবে, তা ভাবিনি। আমি গান শুনে ভালোলাগায় কাঁদতে এসেছিলাম, গান শুনিয়ে কাউকেই ব্যথায় কাঁদাতে চাইনি। ভারী খারাপ লাগতে লাগলো আমার।

জেওহর ওর নরম হাতে আমার হাত ধরলো। চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম সেই সব গর্ব, কৌতুক, মজাক্ কিছুই আর নেই চোখে। জল-ভরা চোখে অন্য কী যেন আছে। যার নাম আমি জানি না।

ফিস্‌ফিসে ধরা গলায় জওহর বললো, ভাইসাব আপ্‌কি তহজিব, আপ্‌কি একলাক, ঔর আপ্‌কি তমদ্দুন কী ঈজ্জৎ কিয়া যায় এ্যায়সে কুছ্‌ভি হামারি পাস হ্যায় নেহি। ম্যায় মাফি মাঙতী হুঁ।....

এইটুকু বলেই ও ঘর ছেড়ে সোজা উঠে ভিতরের ঘরে গিয়ে দুয়ার বন্ধ করলো।

আমি বোকার মতো বসে থাকলাম। বসে বসে ভাবতে লাগলাম। ও যা বললো, সে কথাগুলো আমার কানে টুঁঙি-পাখির শীষের মতো বাজছিলো। ভাই সাহেব, তোমার সংস্কৃতি, তোমার উদারতা, তোমার ব্যবহারের ঈজ্জৎ দেব এমন কিছু আমার নেই। আমায় তুমি ক্ষমা কোরো।

আর এলোই না ঘর থেকে জেওহর বাঈ। অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে এলাম মুজাব্বরকে নিয়ে।

ভালো মন্দ জানি না। জানি, জেওহর মানে বিষ। আমার বিশ বছর। জেওহর বিষ বছর। আগেকার দিনের সুন্দরী রাজকুমারীদের মতো আংটির বিষ চুষে মরে যায় না কেন জেওহর ? কি দরকার এমন করে কাঁদাব ? এক শরীরের জ্বালা কি অন্য শরীরের জ্বালা দিয়েই নিবৃত্ত করতে হয় ? এর কি কোনও অন্য পথ নেই ?

জানি না।

আর কতটুকুই বা জানি! মুজাব্বরকে রোজ জিগ্‌গেস করি। জেওহরকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। একবার ওর কাছে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মুজাব্বর বলেছে, জেওহর গুণ্ডাদের বলে রেখেছে যে, আর কোনওদিন আমাকে ও পাড়ায় নিয়ে গেলে মুজাব্বরকে জানে খতম্ করে দেবে।

জানি না কেন ? ওর কথা মনে হলেই মনটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। কেন যে জেওহর ওরকম বললো গুণ্ডাদের তা কে জানে!

বিরহী নদীতে প্রতিদিন বিকেলে জেলেরা মাছ ধরে। মাছ কিনতে গেছি। সেদিন মাছ পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পা চালিয়ে মছিন্দার দিকে ফিরছি। জায়গাটা ভালো নয়। উল্টোদিক থেকে একটি ফিটন গাড়ি আসছিলো। একটি কুচকুচে কালো একেবারে মস্ত ঘোড়ায়-টানা। মাথায় বাক্স-তোরঙ্গ বাঁধা। কোচোয়ানের পাশে একটি গুণ্ডামত লোক বসে। তার মাথায় পাগড়ি। হাতে ছ ফিট লম্বা লাঠি।

আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ঐ টাঙা থেকে হঠাৎই একটা পুরুষ কণ্ঠ বললো, বাবুজী!

থমকে দাঁড়ালাম। কোচোয়ানের পাশের লোকটিকে চেনা চেনা লাগলো। একটুক্ষণ তাকাতেই চিনতে পারলাম। এ সেই সেই রাতের সারেঙ্গীওয়ালা। বিচিত্রবীর্য লোক যা হোক!

ফিটনের দরজা খুলে গেলো। একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, মীর্জা গালিব, কাঁহা চলতেঁ হেঁ আপ ?

দেখি জেওহর। হাসছে। আজকে ও সাজেনি একটুও। সাধারণ শাড়ি। সুন্দর

টিকোলো নাকে হীরের নাকছাবি। ফিনফিনে কালো ফিঙের মতো রেশমী, উজ্জ্বল চুল। বিকেলের বিষণ্ণ হাওয়ায় অলক উড়ছে। তার চোখের সুর্মা আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতাকে দুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

শুধোলাম, কোথায় যাচ্ছো ? জেওহর ?

জেওহরের মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ও যেন এই মুহূর্তে আমাকেই ভীষণভাবে খুঁজছিলো।

হেসে বলল, কোথায় আর যাবো ? এক জাহান্নম থেকে অন্য জাহান্নমে। যাবে তুমি আমার সঙ্গে ? তা হলে বেহেস্তেও যেতে পারি। জিন্নত্এ।

ওকে দেখে এবং ওর বলার ভঙ্গী দেখে আমার ভীষণই কষ্ট হলো। হঠাৎই বলে ফেললাম, তোমাকে আমি যদি যেতে না দিই ? যদি আমাদের বাড়ি নিয়ে যাই ?

ও ভীষণ চমকে উঠে আমার ঠোঁটে ডান হাতের তর্জনীটি ছুঁইয়ে বললো, চুপ্। বিলকুল চুপ। এ্যায়সা বাঁতে কভি না কহনা, কভি না শোচনা।

কিছুক্ষণ ফিটনের দরজা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বললাম, তুমি তো চলে যাবেই। চলোই না একটু বিরহীর ধারে বসবে ? পর মুহূর্তে মনে পড়লো এ জায়গা ভালো নয়। ডাকাতদের আস্তানা এ। বললাম, না না দরকার নেই, এ জায়গা খারাপ।

ও নামতে নামতে হাসলো। বললো, আমি যেখানে থাকি তার চেয়েও ? খারাপ হলেও খুদাহ্ ঠিকই আছেন। এইসী কোঈ জাগে বাতাদো যাঁহা খুদাহ্ না হো।

আমরা দুজনে গিয়ে বিরহীর পাশের আমলকি গাছের তলায় বসলাম। গঙ্গা থেকে তোড়ে জল ঢুকছে বিরহীতে। এখন জোয়ার। একটি একলা মাছরাঙা শেষ বিকেলে মেহেন্দী-রঙা জলে ছোঁ মেরে মেরে বেড়াচ্ছে।

বললাম, তোমার গান শুনতে গেলাম, গান শোনালে না তো !

আমার গান শুনে আর কি করবে ? ও তো সকলকেই শোনাই। যে পয়সা দেয়, তাকেই শোনাই।

আর যে ফুল দেয় ? শুধু লাল ফুল ?

ও বড় এক বিষণ্ণ হাসি হাসলো, বললো, তাকে আমি আর কি দেবো ? বলো ? আমি যে ময়লা-কুচলা, বদনসীব এক জেনানা। আমি যে জেওহর !

বললাম, তোমাকে গান শোনালাম, ফুল দিলাম, তুমি আমাকে কিছুই দিলে না।

ও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে ফিরে বললো কিছুই দিইনি কি ? ঠিক জানো ?

আমি মাথা নাড়লাম।

গঙ্গার দিক থেকে এক ঝাঁক রেড-হেডেড পোচার্ড অস্তগামী সূর্যকে পিছনে ফেলে ডানা শন্‌শনিয়ে দূরের বিলের দিকে উড়ে গেলো। আমরা দুজনে চুপ করে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে রইলাম। দেখতে দেখতে বিরহীর জলের মেহেন্দীতে সন্ধ্যের জাম-রঙা বেগুনি ছায়া পড়ল।

জেওহর উঠলো, বললো, চলি।

ধীরে ধীরে গাড়ি অবধি গেলাম দুজনে। দরজা খুলে দিলাম, ফিটনে উঠে বসলো ও।

আবার কবে দেখা হবে ?

আমি বললাম।

জানি না ; কোনওদিন আর নাও হতে পাবে।

আমাকে কিছু দিয়ে যাও জেওহর, যাতে তোমাকে মনে রাখি।

কোচোয়ান জিভ আর তালু দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করে ঘোড়াকে এগোতে বলল, পা দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে। জেওহরের বিদায়ের ঘণ্টা। চাকা গড়াতে লাগল। সারেঙ্গীওয়ালা বললো, সেলাম বাবুজী।

আমি বললাম, সেলাম।

আমি ফিটনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। আবার বললাম, কিছুই দিয়ে গেলে না জেওহর ? আমাকে তুমি কিছুই দিলে না।

জেওহর এবার হাতের ইশারায় আমাকে কাছে আসতে বললো। ওর আরো কাছে সরে গেলাম, চলতে চলতে। ওর খোলা চুলে চন্দনের গন্ধ পেলাম। ও আমার কানে কানে বললো, তুমি এখনো ছোটো আছো। যা তোমাকে দিয়েছি, তার দাম, আরও বড় হলে বুঝতে পারবে।

তবু অধৈর্য হয়ে আমি বললাম, বলো না তা কি ? জেওহর, বলো না ?

জেওহর কান্নার মতো হাসলো।

তারপর দরজায়—রাখা আমার হাতের উপরে ওর হাতটি ছুঁইয়ে সন্ধ্যেবেলার আলোর মতো নরম উল্লাসে বললো : পহেলি পেয়ার।

সোহিনীর কুকুর এবং আমি

আমার আড়াই বছরের মেয়েকে আমি একটা ভুটিয়া-কুকুর কিনে দিয়েছিলাম আউটরাম ঘাটের সামনের বেদেদের কাছ থেকে পঁচিশ টাকা দিয়ে।

সোহিনী কুকুর খুব ভালবাসে ছোটবেলা থেকে। পথের কুকুর দেখলেই কুকু-বাচ্চা, কুকু-বাচ্চা বলে চেঁচিয়ে উঠত। কারও বাড়ি বেড়াতে গেলে তাদের কুকুরের গলা জড়িয়ে বসে থাকত।

কুকুরটার গায়ে বড় বড় লোম। ওকে যেদিন বুকে করে মিনিবাসের সামনের সিটে বসে বাড়ি নিয়ে এলাম সেদিন হৈ-চৈ পরে গেল বাড়িময়।

সেদিন ভীষণ গরম ছিল। কুকুরটা তার বড় বড় লোমভর্তি শরীরে দরদর করে ঘামছিল। তাকে সাবান দিয়ে চান করিয়ে গায়ে সোহিনীরই পাউডার ঢেলে যখন একটু আরামে রাখা গেল পাখার তলায়, ঠিক তক্ষুনি লোডশেডিং হয়ে গেল।

কুকুরটা গরমে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। রানু বলল, আহা, বেচারীকে কেন আনলে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়ার জন্যে? ওরা কি গরম সহ্য করতে পারে?

গরমে আঁই-ঢাঁই করা ঘামে-জব্‌জব্‌ রানুর চেহারার দিকে তাকিয়ে বললাম মানুষ যদি পারে তা হলে কুকুরও পারবে। কুকুর কি মানুষের চেয়েও বড়?

রানু বলল, অত জানি না। তবে কুকুরটার আশ্চর্য সহ্যশক্তি। এত যে কষ্ট পাচ্ছে কোনও চঞ্চলতা নেই। তবু কেমন স্থির হয়ে থাবার উপর মুখ রেখে শুয়ে আছে দ্যাখো?

আমি অনেকক্ষণ কুকুরটার দিকে চেয়ে রইলাম।

কুকুরটার চোখ দুটো ভারী শান্ত। কোনও অভিযোগ নেই অনুযোগ নেই, কোনও প্রতিবাদ নেই চোখে। ও যে মাথার উপর একটু ছাদ পেয়েছে, প্রচণ্ড ক্ষিদের সময় যে দু দানা যা হোক কিছু খেতে পারে একথা জেনেছে; তাতেই ও যেন পরম নিশ্চিন্ত হয়েছে। আর কোনও কিছু চাইবার সাহস বুঝি ওর নেই।

পরদিন কুকুরের নামকরণ নিয়ে মহা গোলমাল বেধে গেল।

রানু বলল, ওর নাম রাখো টম। বড় মেয়ে বলল. না টম ফম বড় বাজে বিদেশিনাম। তার চেয়ে ওর নাম রাখো শান্ত।

আমি বললাম, একটাও নাম পছন্দ হচ্ছে না।

আমাদের রান্নার লোক ভীম ঠাকুর বহুদিনের পুরানো লোক। সে আমাদের কথোপকথন শুনে বলল, বউদি এর নাম রাখো মানুষ।

রানু বলল, সে কি? কুকুরের নাম মানুষ হয় নাকি?

ও বলল, দেখছেন না কুকুরটার কী বুদ্ধি, কী রকম মানুষের মত হাবভাব ?

আমি কিছু বলার আগেই সোহিনী কুকুরটার কান ধরে আদর করে তাকে 'মানুষ' 'মানুষ' বলে ডাকতে শুরু করে দিল। তারপর আর অন্য নাম রাখার উপায় ছিল না। আমাদের সকলেরই মনে হল যে যার জন্যে কুকুর কেনা, তারই যখন নামটা মনে ধরেছে তখন আমাদের আপত্তির মানে নেই কোনও।

আমাদের বাড়িতে 'মানুষ' এখন পুরনো হয়ে গেছে। ওর শান্ত সভ্য ব্যবহারে সকলেই খুশি। মানুষের মত এমন নির্জীব স্বভাবের কুকুর বড় একটা দেখা যায় না।

অফিসে সারাদিনের মধ্যে, মানে সকাল নটা থেকে রাত সাতটার মধ্যে মাত্র দু-তিন ঘণ্টা কারেন্ট ছিল। সাতটার সময় যখন অফিস থেকে বেরোলাম তখন আমি আর মানুষ নেই। আজকাল বাসে-ট্রামে ভিড় দিনে-রাতের কোনও সময়ই কম-বেশি কিছু নেই। অফিস থেকে যখনি বেরুই, তখনই একই রকম ভিড়।

মনে আছে আট-দশ বছর আগেও ছটা নাগাদ বেরিয়ে ধর্মতলার মোড় থেকে দু নম্বর বাসে উঠতে কোনও বেগ পেতে হত না। বসার জায়গা না পাওয়া গেলেও স্বচ্ছন্দে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যেত। আজকাল সে সব স্বপ্ন বলে মনে হয়।

বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে আটটা হল।

বাস থেকে নেমে বাড়িতে হেঁটে আসতে আসতে ভাবছিলাম, বাড়ি গিয়ে ভাল করে চান করব। তারপর চান করে উঠে একটু কাগজ কলম নিয়ে বসব। দারুণ একটা রোমান্টিক গল্পের প্লট ঘুরছিল মাথায়। আমাদের এই সওদাগরী অফিসের রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ভারী মিষ্টি। তার কাছে প্রায়ই একটি সুন্দর চেহারার লাজুক লাজুক ছেলেকে আসতে দেখি। আমার ঘরের কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। ছেলেটি কোনও কথা বলে না। চুপচাপ ওর সামনে বসে থাকে। কপালের উপর একরাশ চুল লেপ্টে থাকে। অনেকক্ষণ বসে থাকে। এক কাপ চা খায়। তারপর চলে যায়। যতক্ষণ ও থাকে ততক্ষণ আমাদের রিসেপশনিস্টের গলাটা এমনিতে যত না মিষ্টি, তার চেয়েও বেশি মিষ্টি শোনায়।

ভেবেছিলাম, দারুণ একটা রোমান্টিক গল্প লিখব।

দূর থেকে বাড়ির আলোটা দেখা যাচ্ছিল। মনে মনে খুশি হলাম, আজ আলো নেভেনি বলে। তা হলে লেখাটা আরম্ভ করা যাবে। বাড়ির দরজায় যখন প্রায় পৌঁছে গেছি, তখনই ঝুপ করে আলোটা নিভে গেল।

ঠাকুর যখন দরজা খুলল তখনও ওরা ঘরে ঘরে মোমবাতি জ্বালায়নি।

বাড়িতে দুটো লণ্ঠন ছিল। কিন্তু কেরোসিন তেল নেই। পাওয়া যায় না। লণ্ঠন জ্বালানো যায় না।

বড় মেয়ের পরীক্ষা। মোমবাতির কাঁপতে-থাকা আলোতে পড়তে পড়তে ওর চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ছে। আগামী রবিবার ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

রানুর মেজাজ রুক্ষ হয়ে ছিল। স্বাভাবিক কারণে। বলল, তুমি অফিস যাবার আগে সেই যে কারেন্ট গেল, আর এলো আবার বিকেল চারটেয়। এসেই চলে গেল ছটার সময়। কিছু ভাল লাগে না আর। আমাকে টিকিট কেটে দাও, আমি মায়ের কাছে চলে যাব

শিলং-এ। এরকম ভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না। বাচ্চা দুটো ঘেমে ঘেমে মরে গেল। দিনের পর দিন, দিনের পর দিন ; আর কত দিন ?

তারপর বলল, জানো, সারাদিন রুমির স্কুলেও কারেন্ট থাকে না। স্কুলের উনিফর্ম পরে সারাদিন ঘামে। যখন বাড়ি ফেরে, মনে হয়, সমস্ত জীবনীশক্তি বুঝি কেউ নিংড়ে নিয়েছে। মুখটা লাল হয়ে থাকে, চোখ দুটো ফ্যাকাসে।

সারাদিন লোডশেডিং-এর মধ্যেও শত ঝামেলার পর আমার এসব কথা আর ভাল লাগছিল না।

বললাম, কি করবে বল ? কষ্ট তো সকলেই করছে। তুমি বা তোমরা তো আর একা করছ না ? কোলকাতা শহরের লোক, গ্রামের লোক, সকলেই করছে।

রানু রেগে বলল, সকলেই এমন কষ্ট করছে, কিন্তু এর কোনও প্রতিকার নেই ? আমরা কি মানুষ না জন্তু ?

আমি দার্শনিকের মত বললাম, আমরা মানুষ। অত সহজে অধৈর্য হলে চলে না। ধৈর্য ধরো। পাগলামি কোরো না। দ্যাখো তো, সোহিনীর 'মানুষ'-কে। ওর দেশ ভুটান। তবুও কী করে ও মুখ বুঁজে এই গরম সহ্য করছে। কখনও ওকে রাগতে দেখেছো ? কামড়াতে দেখেছো কাউকে ? ওকে দেখে শেখো। তুমি বড় বেশি অধৈর্য। তুমি কি ওর কাছে, একটা কুকুরের কাছেও হেরে যেতে চাও ? তোমার বাড়ি ত শিলং-এ। শিলং কি থিম্পুর চেয়েও ঠাণ্ডা ?

রানু কথা না বলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

শুধু-গায়ে একটা পাতলা ব্লাউজ পরেছে ও। চুলগুলোকে বাউলের মত ঝুঁটি করে মাথার উপর বেঁধে রেখেছে। গা দিয়ে ঘামের গা-গোলানো গন্ধ বেরুচ্ছে।

আমি একটা দারুণ রোমান্টিক গল্প লিখব। এখন আমার নষ্ট করার মত সময় নেই।

আমি জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে গেলাম।

কলের নীচে বালতিটা টং টং করছিল। বালতিতে এক ফোঁটা জল নেই। চৌবাচ্চাতেও নয়। কল খুললাম। কলে কোনো আওয়াজই নেই। এমনকি চোঁ চোঁ আওয়াজ দিয়ে জল যে অদূর ভবিষ্যতে আসতে পারে এমন সান্ত্বনাও কল দিল না।

আমি রেগে সবেগে বাথরুমের দরজা খুলে বাইরে এলাম। সত্যি সত্যি। এরা ভেবেছে কি ? সারাদিন রোজগারের ধান্ধা করে, চাকরির গ্লানি সেরে বাড়ি ফিরলাম। যাদের ভাল রাখার জন্যে যাদের সুখের জন্যে আমার এত হয়রানি, তাদের একটুও কনসিডারেশন নেই আমার প্রতি ?

রানুকে বললাম, সব জল তো না ফুরোলেও পারতে। আমার জন্যে কি এক বালতি জলও ধরে রাখতে পারোনি ?

রানু বলল, আজ সারাদিন আমি এবং মেয়েরা চান করিনি। তুমিই একমাত্র লোক যে চান করে গেছ সকালে। কাপড় কাচা হয়নি। কোনওক্রমে বাসন মাজা হয়েছে, কোনওক্রমে খাওয়ার জল শুধু ভরে রাখা হয়েছে। আমি চটে উঠে বললাম, কেন ? আমি কি মাসে মাসে বাড়িওয়ালাকে এক বাণ্ডিল টাকা দিই না ? আমরা কি করেছি ?

রানু মুখ ঘুরিয়ে বলল, বাড়িওয়ালার কি দোষ। পাম্প চললে, তবেই না ট্যাঙ্কে জল উঠবে ? সারাদিনে দু ঘণ্টা পাম্প চললে আর বাড়িওয়ালা কি করবে ?

আমি ভেবেছিলাম, দারুণ একটা রোমান্টিক গল্প লিখব।

বন্ধুরা বলে, আমার হাতে নাকি প্রেমের গল্প দারুণ খোলে।

ঘরে ঢুকে দেখি, আমার ন বছরের বড় মেয়ে রুমি খালি গায়ে টেবিলের সামনে ইজের পরে বসে আছে। এই বয়সেও শরীর একটুও বড় হয়নি। যতটুকু বিশেষত্ব ওর তা ওর উজ্জ্বল চোখ দুটিতে। মোমবাতির সামনে উপুড় হয়ে ও পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে। ঘরের কোণায় আয়নায়, মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় ওর শীর্ণ, অসম্ভব ফর্সা ; রুগ্ন পাঠরতা শরীরের ছায়া পড়েছে।

ও আমাকে দেখতে পায়নি।

আমার মেয়ে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। ওর এখনও ভোট দেওয়ার বয়স হয়নি। যখন হবে, তখন ও নিঃসংশয়ে আমারই মত বুঝতে পারবে যে, ওর ভোটের জন্যে কেউ লালায়িত নয়। মধ্যবিত্তর ভোট থাকল কি গেল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কোনও দলেরই ; এই বিরাট সমাজতান্ত্রিক গরীবী-হঠানোর গণতন্ত্রে। ও জানে না, ওর এই মোম-গলানো, চোখ-গলানো পড়াশুনার বিনিময়ে একদিন সাবালিকা হয়ে ওঠার পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ও যে ছাপটা পাবে, (কোলকাতার বাজারের মরা-পাঁঠার পিছনে করপোরেশনের ছাপেরই মত) সেই ছাপের বিনিময়ে ও হয়ত মাথা খুঁড়েও কোনও চাকরি পাবে না। ওকে মানুষ করাব জন্যে সমস্ত কষ্টস্বীকার আমার বৃথাই হবে। ওর সমস্ত কষ্টও বৃথা হবে। রুমি এখনও জানে না, ওর ভবিষ্যৎও আজকের অন্ধকার গুমোট রাতের কম্পমান মোমবাতির আলোর মতই কম্পমান ; অনিশ্চিত।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে এসব ভাবছিলাম। ঘামে আমার মাথার চুল, সারা গা ভিজে গেছিল। ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি এমন সময় পাশের ঘর থেকে সোহিনী হঠাৎ ভীষণ চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও ভৌ-ভৌ করে ডেকে উঠল। বোবা কুকুরের ভৌ-ভৌ ও সোহিনীর কান্না প্রায় একই সঙ্গে শোনা গেল।

আমি দৌড়ে ও-ঘরে যেতে যেতেই রানু বারান্দা থেকে এবং ঠাকুর রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এল।

'মানুষ' সোহিনীকে কামড়ে দিয়েছে। ওর গাল থেকে এক খাবলা মাংস কেটে নিয়েছে 'মানুষ'। সোহিনীর বাধ্য শান্ত-শিষ্ট কুকুর।

সোহিনী ভয়ে যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে। মুখ হাঁ করে কাঁদছে সোহিনী।

আমি দৌড়ে গিয়ে বসবার ঘর থেকে টেলিফোন করতে গেলাম ডাক্তারবাবুকে। ডায়ালটোন পেলাম না। রুমিও দৌড়ে এসেছিল পড়া ছেড়ে। রুমি বলল, লোডশেডিং-এর সময় টেলিফোন কাজ করে না বাবা।

আমি তাড়াতাড়ি করে জামা পরতে গেলাম। ডাক্তারের কাছে এক্ষুনি নিয়ে যেতে হবে ওকে। এখনই অ্যান্টি-র‍্যাবিস ইনজেকশান দেওয়া দরকার কি ?

জামা পরে ও ঘরে গিয়ে ফিরে আসতেই দেখি রানু হি-হি করে হাসছে। ওর মাথার চুলের ঝুঁটি ভেঙে পড়েছে, পিঠময় ; বুকময়। মেঝেতে পা-ছড়িয়ে বসে ও ভুটিয়া-কুকুরটাকে কোলে নিয়ে চুমু খাচ্ছে। হাসছে আর চুমু খাচ্ছে। সোহিনীর দিকে একবারও ফিরে তাকাচ্ছে না। ঠাকুর সোহিনীকে কোলে করে অবাক চোখে রানুর দিকে চেয়ে আছে। সোহিনীর গাল গড়িয়ে, বুক গড়িয়ে রক্ত পড়ছে।

রানু কি পাগল হয়ে গেল ? আমার মনে হল রানু পাগল হয়ে গেছে। না হলেও, মনে হল যে কোনও মুহূর্তে ও পাগল হয়ে যেতে পারে।

আমি ডাকলাম, রানু ! এই রানু !

রানু হি-হি করে হাসতে হাসতে আমার দিকে আঙুল তুলে পাগলের মত বলল, কিছু

একটা কর। প্লিজ তোমরা কিছু একটা কর।

তোমরা বলতে ও কাদের বোঝাল বুঝলাম না! আমি তো একাই ছিলাম—না কি আমার পিছনে আর কেউ ছিল?

রানু বলল:, কুকুরটার পর্যন্ত অসহ্য হয়েছে। তারও সহ্যশক্তি শেষ হয়ে গেছে।

তারপর আমার দিকে ঘৃণার চোখে, আগুনের চোখে চেয়ে বলল, তুমি কি এই 'মানুষ'টার চেয়েও অধম? কুকুরের চেয়েও অধম?

আমার আর দাঁড়াবার উপায় ছিল না।

আমি সোহিনীকে বুকে করে অন্ধকারের মধ্যে মোড়ের ডাক্তারখানার দিকে যাচ্ছিলাম। এক হাতে টর্চ ধরে হাঁটছিলাম আমি, কলকাতা মহানগরীর এই গভীর অরণ্যের অন্ধকারে। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কিছু ভাবাও যাচ্ছিল না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট বোধ লক্ষ লক্ষ ঘৃণপোকার মত আমার মস্তিষ্কের কোষগুলো কুরে কুরে খাচ্ছিল। সেই চাপ-চাপ অন্ধকারের মধ্যে থেকে অন্ধকারতর কে যেন তার ভৌতিক হাত নেড়ে আমাকে বারবার ইশারা করছিল।

সেই ভৌতিক অন্ধকারে অন্ধকারতর কেউ বার বার বলছিল, সোহিনীর জন্যে, রুমির জন্যে, ঠাকুরের জন্যে, রানুর জন্যে এমনকি আমারও জন্যে, আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই কিছু একটা করতে হবে। কিছু একটা করতে হবেই।

আমি হোঁচট খেতে খেতে, রক্তাক্ত মেয়েকে কোলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, সেটা কি?

আমাদের কর্তব্যটা কি?

..ফর টেক অফফ্

বম্বে থেকে এসেছে, তাই সূর্যর ফ্ল্যাটে গেট-টুগেদার পার্টি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কেউ কনিয়াক্ সিপ্ করছে। কেউ বা ড্রাম্বুই বা অন্য লিকুওর।

তোমরা কি উঠবে না আজ কেউ?

পরমা কিঞ্চিৎ অধৈর্য গলায় বলল।

আরে বোসোই না। শুক্রবারের রাত! সুজয়ও তো কলকাতায় নেই,তোমার অত তাড়া কিসের? নাইট ইজ ভেরী ইয়াং। ওরা সমস্বরেই বললো।

নাঃ। এগারোটা বাজে। তাড়া আমার নিজের জন্য নয়। তোমাদের না হয় অফিস ছুটি, কিন্তু কাল আমার মেয়ের স্কুল আছে ভাই।

আহা! মেয়ে যেন এক তোমারই আছে। আমরা যেন একেবারেই ঝাড়া-হাত-পা! মাঝ বয়েসী সুন্দরী সুমি, ঝংকার দিয়ে বললো।

রাবড়িটা কেমন এনেছিলাম বলো?

সূর্য শুধলো।

দারুণ!

অশেষ সার্টিফিকেট দিল।

পরমার মনে হলো এদের কারোরই বাড়ি যাবার তাড়া আদৌ নেই। সকলেরই ফ্ল্যাট বা বাড়ি একটা আছে বটে, শোওয়ার ঘর-ও আছে, স্বামী বা স্ত্রী, কিন্তু পরমার মনের গভীরে বাড়ি বলতে যে একটা গভীর সখ্যতা, প্রেম, আর উষ্ণতার নীড়ের কল্পনা ছিলো ; সেই নীড়-এর সঙ্গে তার নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব চেনাজানাদের প্রায় কারোরই বাড়ির কোনও মিল নেই।

পরমা, অশেষকে একবার ইঙ্গিতে বারান্দাতে ডাকলো। নিভৃতে।

মাল্‌টিস্টোরিড বাড়ির বারোতলার বাইরের বারান্দায় অন্ধকার ছিলো। আলো জ্বালেনি কেউ। অনেক নিচে হ্যালোজেন ভেপারের আলো-জ্বলা রঙিন কলকাতা। হলুদরঙা হেড়লাইট জ্বালিয়ে যাওয়া আসা করছে গাড়ি।

পরমা নিচের পথে চেয়ে বললো, খুব কুয়াশা হয়েছে না?

হুঁ। কাল সকালে আমার দিল্লী যেতে হবে। ফ্লাইট ডিলেড না হয়ে যায়?

পরমা একদৃষ্টে অশেষের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। একটা সময় এই মুখটিকে কত কাছ থেকে, কতক্ষণ ধরে, দেখেছে। মানুষটির কত কাছাকাছি এসেছে, কতবার? কত গভীর সুখের, অভিমানের, রাগের সব মুহূর্তগুলি। আজ সবই যেন নিচের পথের বেদানারঙা

আলো-জড়ানো, নীলাভ কুয়াশারই মত হয়ে গেছে। মনে পড়ে না কিছুই আর তেমন করে। মনে পড়বার সময়ই হয় না। তবু, কুঁড়ির টিফিন ভরতে ভরতে, বা জানালার সামনে বসে চা খেতে খেতে, মধ্যসকালের কাগজওয়ালার "কাগজ বিক্রি আছে··· ? কাগজ··· ? শিশি বো—ত্বল্" ডাকে, বুকের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ কেমন এক শূন্যতা শূন্যতা বোধ করে ও।

পুরোনো কথা ; শুধুই অশেষের কথা মনে পড়ে। পরমার নিজের জীবনটাকেও বিক্রির জন্য জড়ো করে রাখা পুরনো কাগজ বা খালি শিশি বলে মনে হয় কখনো কখনো।

কী ভাবছো ?

অশেষ জিজ্ঞেস করলো।

কিছু না এমনি···। তুমি আছো কেমন ?

ভালোই বোধহয়। আসলে, নিজের সম্বন্ধে ভাবার সময় কোথায় পাই ? সবই আছে। শুধু সময় নেই।

তা ঠিক। কারোরই ভাবার সময় নেই আজকাল।

উদ্বৃত্ত সময় যদি কারোর হাতে এত্তোটুকুও থাকেও, তাহলেও তো আমরা তাকে "কিল্" করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তাই না ? এই সময়ের আমরা, সকলে এমনই হয়ে গেছি। সময়কে সময় দেবার একটুও সময় নেই।

এটা কি ভালো বলে মনে হয় তোমার ?

জানি না। ভালো কি মন্দ সেটুকু ভাবারও যে সময় নেই।

ইস্‌স্, তোমার সঙ্গে একটুও একা থাকা হল না, কথা হল না। ভারি খারাপ তুমি। আবার কবে আসবে ? এবারই সুযোগ ছিলো। সুজয় তো ফার-ইস্টে গেছে, সাতদিনের জন্যে অফিসের কাজে ; বললামই তো একটু আগে। তুমি এলেও যদি, তা-ও খবর না—দিয়ে। আর চলে যাচ্ছো, কাল-ই সকালে ! ভাবতেও পারি না, ভাবলেও কষ্ট হচ্ছে এত্ত।

অশেষ বললো, বাবে ! সীমা এ-পার্টিতে আমাকে না ডাকলে তোমার সঙ্গে দেখাই তো হতো না। জানতেও পেতাম না। তুমিও খুব লোক কিন্তু !

তোমার কাছে আমার ঠিকানা বা ফোন নাম্বার ছিলো না ?

না।

কেন ? রাখতে ইচ্ছে করোনি ?

নাঃ ! কী লাভ ? কে আর হৃদয় খুঁড়ে হায় বেদনা জাগাতে চায়।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পরমা বললো, তুমি কি আমাকে সত্যিই ভুলে গেছ ? সত্যি সত্যি ?

অশেষ পাইপটা ধরালো দু'হাতের মধ্যে নিয়ে।

পরমা উৎসুক চোখে মনোযোগের সঙ্গে অশেষকে লক্ষ করছিলো। ওর জীবনে একটা সময়ে এই রকমই যেমন করে পাইপটিকে ধরেছে দু'হাতের পাতাতে তেমনই আদরে অশেষ দু'হাতের পাতার মধ্যে পরমার মুখটিকে নিতো কী সোহাগে ! কী সোহাগে !

পাইপ ধরিয়ে, হাসলো অশেষ।

হাসিটি ঠিক সেইরকমই আছে ! মুখ শুধু সামান্য ভারী হয়েছে। কিছুটা বয়সের কারণে, কিছুটা মদ্যপানে ; কিন্তু তার আকর্ষণ পরমার কাছে আগের মতোই প্রবল আছে।

এ-কথাটা আবিষ্কার করেও খুবই বিব্রতবোধ করলো পরমা। অথচ ওর স্বামী সুজয়, অশেষের চেয়ে অনেক বেশি হ্যান্ডসাম্। সকলেই বলে। অনেক বেশি ওয়েলপ্লেসড় ইন্

লাইফ। সবদিক দিয়েই ভালো। তবু, কেন যে এমন হয় ; কার যে কাকে ভালো লেগে যায়! চেহারাই তো মানুষের সব নয়। পয়সা-প্রতিপত্তি, এসবও নয়।

ছেলেবেলার বন্ধু প্রদীপ এসেছিলো হোটেলে আজ সকালে।

অশেষ বললো।

রামকুমারবাবুর একটি গান গাইছিলো, "ওগো কেমনে বলো না ? ভালো না বেসে থাকি গো ? পাগল করেছে মোরে ঐ দুটি আঁখি গো..."

বলেই, হাসতে হাসতে এক কলি গেয়েই উঠলো অশেষ। চাপাস্বরে।

একটু বেশিই হাসছে অশেষ। বোধহয় 'হাই' হয়ে গেছে সামান্য।

পরমা ভাবলো।

অনেক টুকরো-টুকরো পুরনো কথা দপ্-দপ্ করে মনে পড়ে যেতেই রাতের আকাশে অসংখ্য নীলাভ দ্যুতির তারা হয়ে ছড়িয়ে গেলো কথাগুলি। পরমার আকাশে।

অস্ফুটে ও বললো, ইস্স্, তুমি এখনও কী ভালো গাও ? চর্চা করো ?

করি। হোয়েন আই অ্যাম ইন মাই স্যাংচুয়ারি। ইন দ্যা বাথরুম। ওনলি, অন হলিডেজ এন্ড সানডেইজ। অন দ্যা থ্রোন।

পরমা হেসে বললো, অসভ্য। তুমি সেইরকমই অসভ্য আছো।

পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, বলো, আবার কবে আসবে কলকাতায়, এর পরের বার ?

যখন কাজ পড়বে।

কবে কাজ পড়বে ?

কী জানি ? চাকর মানে চাকরই। কুড়ি হাজার টাকাই মাইনে পাই, আর দশ টাকাই পাই। আমি, একটি ঘূর্ণি হয়ে গেছি পরমা। আমার হাতে হাত রেখে দেখেছিলে না একবার ? চৈত্রশেষের ডিগারিয়া পাহাড়ের নিচের টাঁড়ে জসিডিতে দ্বারিক মিত্তিরের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে। মনে আছে ? ঘূর্ণি ? ঠিক তেমনই জীবনটা, প্রত্যেকটা দিনই ঘূর্ণি!

দ্বারিকদা কেমন আছে ?

চমৎকার। অবস্থার সামান্য হেবফের হয়েছে বটে কিন্তু মানুষটির কোনোই হেরফের হয়নি। অমন বড় মনের বাঙালি আমি দেখিনি। এমন বাঙালিও নয়, যিনি কারোর নিন্দা করেন না।

পরমা কী যেন বলতে গেলো অশেষকে। ঠিক সেই সময়েই মৃণালিনী বারান্দাতে এলো। গোয়েন্দার মতো। মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অনেকই ভালো গোয়েন্দা হতে পারেন, যদি হন।

গলায় রসিকতার রঙ চড়িয়েই বললো বটে, কিন্তু সেটা রসিকতার মতো আদৌ শোনালো না।

এই মেয়েটির চোখ আছে সুজয়ের ওপর।

ভাবলো, পরমা।

দুজনে এখানে ? অন্ধকার বারান্দাতে ? ভেরি সাস্পিশাস্। এদিকে সকলেই যে তোমাদরই খুঁজছে। পরমাকে গাইতে বলছে।

ইম্পসিবল আমি না। গুড্ডিকে বলো ; আমি তো বাংলা গান গাই। ও ইংরিজী গান গাইবে। তোমরা সকলে তো ইংরিজীই ভালোবাসো।

মৃণালিনী আজ এমন শরীর-দেখানো একটি পোশাকে এসেছে যে, পরমা মেয়ে হয়েও

খুবই লজ্জা পাচ্ছে ওর কারণে। শরীর ছাড়া, দেখানোর মত মেয়েদের কি আর কিছুই নেই ?

মৃণালিনী বললো। তা-হলে তা-ই বলি গিয়ে সকলকে।

ও চলে যেতেই, পরমা নিচু গলায় তাড়াতাড়ি অশেষকে বললো, আমাকে পৌঁছে দেবে ? অশি ?

শ্যুওর।

তারপর বললো, তোমাকে পৌঁছে দিলে বোম্বেতে কিন্তু চিরদিনই প্রাইজ দিতে তুমি আমায়। যদিও কন্‌সোলেশান্ প্রাইজ। ফার্স্ট প্রাইজ তো সুজয়কেই দিলে। কিন্তু এখানে যে গুঁফো ড্রাইভার আছে সঙ্গে।

তবু। চলো।

পরমা বললো। আমার দেরী হয়ে গেছে খুবই। কুঁড়ির স্কুল আছে না কাল ! দেরী করে ফিরলে, আয়া মুখ ঝামটা দেবে।

সকলকে গুড নাইট, আর বাই-ই-ই...করে ওরা বিদায় নিলো।

মৃণালিনী ভুরু তুলে বললো, হুজ ড্রপিং ট্যু পরমা ? অশেষ ?

অশেষ তাড়াতাড়ি কথাটা অন্যদিকে চারিয়ে দিয়ে বললো, আমি তো আর ড্রাইভ করছি না, ড্রাইভার আছে। অসুবিধা নেই। পরমার আলিপুরের বাড়ি, নাকি আমার হোটেলের কাছেই পড়বে। আমি তাজ বেঙ্গলে উঠেছি। আই অ্যাম ইন আ হারী। মাস্ট শোভ্ অফফ্ ন্যাউ। মাই, ফ্লাইট ইজ অ্যাট সিক্স। ভোর পাঁচটাতে রিপোর্ট করতে হবে। ডিজগাস্টিং। আই রিয়েলি হেইট দিজ আরলি-মর্নিং ফ্লাইটস।

॥ ২ ॥

গাড়িতে পেছনের সিটে পাশাপাশি বসল ওরা দুজন অশেষ পরমার হাতটি তুলে তার দু'হাতের মধ্যে নিয়ে কোলের ওপর রাখলো।

পুরনো দিনের মতো পরমার হাত আগে খুব ঘামতো। এখন আর ঘামে না। আগের মতো নরম-ও নেই হাতের পাতা। বহিরঙ্গে অনেকই বদলে গেছে ও।

পরমাও ভাবছিলো, অশেষও অনেকই বদলেছে।

কাল কোনরকমে যাওয়াটা পেছোতে পার না ? তাহলে সন্ধ্যেটাতে আমরা কোথাও মিট্ করতাম, গল্প করতাম, খেতাম ; আগের মতো !

ইংরেজিতে বললো পরমা, যাতে ড্রাইভার বুঝতে না পারে।

যাওয়া ক্যানসেল্ ? হ্যাঁ, তা করতে পারি। ক্যানসেলেশান্ চার্জ লাগবে। সে, কোম্পানি বুঝবে। তুমি বললে, করব। কিন্তু মিট্ করবো আর কেনই বা ? হাত ধারে বসে থাকা, ঘাড়ে মাথা রেখে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলার দিন কি আর আছে ? নিরপরাধ, নির্জলা মিটিং ! কী লাভ ? তাছাড়া দেখাটা করবে কোথায় ? আমি তো কলকাতার কিছু চিনি না। কোথায় ?

কোনো ক্লাবে ?

অনেকেই যে চেনে তোমাকে।

কোনো হোটেলের ইটিং প্লেসে ?

সেখানেও তাই-ই।

কোনো রেস্তোঁরাতে ?

মে বি, উই উইল বাম্প্ অন দা ফেসেস্ উই হেইট্। তারচেয়ে বরং তোমার বাড়িতেই আসতে পারি আমি। কখন আসবো বলো ?

ন্ না, না। আয়া এবং কুঁড়ি দুজনেই তোমাকে চেনে। আর সুজয় ভীষণ মীন ; ন্যারো-মাইন্ডেড। জানতে পারবে ও।

অশেষ হাসলো।

তাহলে তুমি বরং আমার হোটেলের ঘরেই চলে এসো। রুম নাম্বার থ্রি ওয়ান ফাইভ্। সুজয় তো তোমাকে পুরোনো করে দিলো আমি একবার নতুন চোখে দেখে তোমাকে নতুন করে দিই,। কি, আপত্তি ? একবারের জন্যেও কি আমি পেতে পারি না ? তোমাকে ?

পরমার গলার স্বর কেঁপে গেলো। ভীরুও হয়ে উঠলো ও। বললো, জানি না। আমি সত্যিই জানি না। খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু লজ্জা করে। ভয় তো করেই !

তুমি তো রোজই সুজয়ের, অনুক্ষণ ; চব্বিশ ঘন্টা অমার কি আধ ঘন্টাও হতে পারো না ? সন্ধের পর থেকে তাহলে ঘরেই থাকবো আমি। চলে এসো। ভীরু পায়রা ; সাহসী হও।

কাল ভোরে যাওয়াটা ক্যানসেল করতে পারবে তো ? নইলে আমি মিছিমিছি—

নো প্রবলেম্। দেখানোর জন্যে সকালে অ্যাজ ইউজুয়াল এয়ারপোর্টে যাব। মনে হয়, ফ্লাইট ডিলেড্ থাকবেই ফগের জন্যে। টিকিটে 'ডিলেড' লিখিয়ে নিয়ে ফেরৎ চলে আসব। কাল তো রবিবারই। সোমবার সকালের ফ্লাইটে বোম্বে পৌঁছে সোজা অফিস যাব। ডাইনারসের কার্ড সঙ্গে আছে। নো প্রবলেম্। সোমবার আবার বোর্ড-মিটিং আছে। এসো, কালই তুমি এসো। আমি যাচ্ছি না কাল তাহলে। সোমবার ভোরে পৌঁছতেই হবে।

পরমা আদুরে গলায় বললো, যেও না ! আমার জন্যেই যদি তুমি ওভারস্টে করো, তাহলে তোমার একদিনের হোটেলের বিল আমিই দেব। ইন অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ...অর ফর ওল্ড টাইমস্ সেক্।

।অশেষ হাসল।

বললো, ফাইন ! পরকীয়া প্রেম করলে তোমার মতো বড়লোকের বউয়ের সঙ্গেই করতে হয়।

যদি কেউ দেখে ফেলে ?

দেখলে দেখবে। অত ভয় করলে চলে না। একটাই জীবন পরমা।তোমার জন্যে আমার কষ্ট হয় ; আমার স্ত্রী মানে অরা-র জন্যেও হয়। অরা-ও ওর প্রথম প্রেমিক শ্যামলদাকে ভুলতে পারেনি। পুরো ব্যাপারগুলোই ফুলিশ্। অথচ আমরা সকলেই মোর অর লেস হেল্পলেস।

একটু চুপ করে থেকে অশেষ বললো, তুমি ডিভোর্স নিতে পারো না ?

না। ও কথা বলো না। কুঁড়ি। কুঁড়ির জন্যে পারি না। ও কথা আমি ভাবতেই পারি না। আমি অত স্বার্থপর হতে পারি না।

অরাও ঠিক এরকমই বলে। সোম-এর জন্যে। আমি ওকে বলেছিলাম, খুশি মনে ডিভোর্স দিয়ে দেবো ; যদি চায়। ও শ্যামলদাকে সত্যিই ভালোবাসে। তাহলেও অনেকই কম্‌প্লিকেশান্। তার শ্যামলদাও বিবাহিত। এখন। গ্রেট ফান্। বাট, হাই স্যাড্। তাই না।

আমাদের সন্তানেরা ; কুঁরি আর সোম কি আমাদের এই স্যাক্রিফাইসের কথা মনে রাখবে ? বড় হলে ? ওরা কি কখনো রিয়ালাইজ করবে আমাদের একটাই জীবন আমরা

শুধু ওদেরই মুখ চেয়ে কীভাবে করে নষ্ট করলাম ! পুরোপুরি ?

পরমা বললো ।

তারপরই বললো এই যে দ্যাখো, ওই বাড়িটা ! আমার বাড়ি এসে গেলো ।

ইয়া । প্রিয়ার বাড়ি, অনেক দূরে ; ভেবেছিলাম ।পথ বেশি হলে, ভালোই হতে আরও কিছুক্ষণ তোমার কাছে থাকতে পারতাম ।

ভেরি ফানি ! না । তোমার বাড়ি । কানে লাগে কথাটা ।

স্বামীর বাড়ি, মানে শ্বশুর বাড়ি । এই-ই এখন আমার বাড়ি ।

নামবার সময় অশেষ পরমার হাতে চাপ দিল । তাহলে কাল । এনি টাইম । আফটার সিক্স্ ।

ভীষণ খুশি অথচ ভয়ার্ত কাঁপা গলায় পরমা বলল, আচ্ছা ।

॥ ৩ ॥

পিসু ; 'ম্যান ওয়াচিং' বইটা পড়তে দিয়েছিলো । শুয়ে শুয়ে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলো অশেষ । গভীর ঘুম হঠাৎ ভাঙিয়ে দিয়ে ফোনটা পুরর-পুরর করে শিলাবৃষ্টির মতো কানের মধ্যে বাজল ।

এখন এমন এমন সময়ে ফোন এলেই বড় ভয় করে অশেষের । বিশেষ করে যখন বোম্বের বাইরে থাকে ও । সোম-এর ইন্‌ফ্যান্‌টাইল ডায়াবেটিস আছে । মায়ের শরীর খারাপ । তারওপর বয়সও হয়েছে ।ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আন্ধেরীতে থাকেন মা । কখন কি খবর আসে ।

গভীর রাতের টেলিফোনকে ভড় ভয় ওর ।

ইয়েস্ । ভয় ভয় গলায় বললো, অশেষ

অ্যাই । সরি ! তোমার ঘুম ভাঙালাম । আমি পরমা বলছি । সাবধানী ফিসফিসে গলায়, পরমা বললো । যেন ও প্রান্তে কেউ শুনতে না পায় ।

কী হয়েছে ? প ?

উৎকণ্ঠার গলায় অশেষ শুধলো ।

শোনো । তুমি না, কাল সকালের যাওয়াটা ক্যানসেল্ কোরো না । হ্যাঁ ? আমার না খুব ভয় করছে । তাছাড়া ড্রাইভারকেই বা কী বলবো ? ট্যাক্সি করে তো কখনোই কোথাওই যাই না ।

অশেষ হাসলো । চাপা গলায় ।

পাগলি ! তুমি একটা রিয়্যাল পাগলি ! তাহলে আমিই তোমার কাছে যাব । পর্বত, মহম্মদের কাছে । নিয়মত তাই-ই ।

ইঃ । ন্ না । কেলেঙ্কারি হবে । ন্ নাঃ ।

কেলেঙ্কারির ভয় করলে কখনোই কোনো কেলেঙ্কারি করা যায় না । তুমি এখনো ইম্‌ম্যাচিওরড্ আছো ॥ কী চাও তা নিজেই জানো না । ভীরুরা কিন্তু জীবনে কিছুই পায় না, সত্যিই পারি না । আমি পারি না ।

তাহলে আমার সঙ্গে কাল চলো বোম্বে ? যাবে ? তোমাকে ওবেরয় টাওয়ার্সে রেখে দেবো । মহরানীর মতো । সাতদিন আমাদের জীবনে যত এবং যতরকম মজা, দুজনেরই অ্যাকাউন্টে জমা আছে, যা তামাদি হয়নি এখনও তার সবটুকুই দুজনে মিলে জমজমিয়ে

চেটেপুটে খরচ করে তোমাকেআবার কলকাতায় তোমার স্বামীর কাছেই পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবো। নিজ হাতে তোমাকে চান করাবো, ভাত খাওয়াবো। কি ? কোনো মানুষ সাতদিনের জন্যেও কি হারিয়ে যেতে পারে না ? জীবনের সমস্তকটি দিনই তো হিসেবে বাঁধা। হিসেবের হাজার হাজার দিনের মধ্যে জীবনভর দিনগুলোর মাত্র সাতটি দিনও কি থাকতে পারে না হিসেবের বাইরে ? আমাকে দিলেই না হয় অল্প কটা দিন ? তুমি ক্ষয়ে যাবে না পরী। তোমাকে ফুরিয়ে দিলেও, নতুন করে ভরে দেবো আবার।

পাগল তুমি ! কুঁড়ির স্কুল আছে। যা হয় না, তা হয় না। ওরকম করে বললে, বুঝি কষ্ট হয় না আমার ?

বুঝেছি।

কি বুঝেছ ?

যা বোঝার ?

তুমি আরার কবে আসছো কলকাতায় ?

অশেষ চুপ করে রইল।

এই যে, শুনছো ? শুনতে পাচ্ছো ?

জানি না ! এলে, ফোন করবো।

যখনি করো, দুপুরে কোরো কিন্তু বিটুইন্ টেন টু ফাইভ্। আর শনি-রবি ছাড়া। ও থাকলে কিন্তু ঝামেলা করবে। ও তোমার মত উদার নয়। ভেরি ভেরি, মীন, পসেসিভ্। আই হেইট্ হিম।

ঠিক আছে। ডোন্ট হেইট্ অনিওয়ান্।

কী করবো ? আমি যে পারি না। লাভ আর হেইট্-এর মধ্যে যে অন্য কিছুই দেখি না আমি।

ছাড়ছি।

আমাকে একটা চুমু দাও, ফর ওল্ড টাইমস্ সেক।

অশেষ, আদুরে গলায় বললো।

চাপা হাসি হাসলো পরমা। চুঃ ! করে একটা আলতো শব্দ হল রিসিভারে। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় ও বললো. রাখো ফোন।

তুমি আগে।

অশেষ পুরোনো দিনের মতো বললো।

পরমা রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

অশেষও রিসিভার নামিয়ে, হাত বাড়িয়ে আলো জ্বেলে বেড-সাইড্ টেবল্ থেকে চিঠিটি তুলে নিলো। কাল সকালে ওর ফ্লাইট টেক্ অফ্‌ফ্ করার পর এই চিঠিটি পরমার কাছে পৌঁছে দিতে বলবে ড্রাইভারকে ; এই-ই ঠিক করেছিলো।

একটা বড় হাই তুলতে তুলতে চিঠিটা খাম থেকে বের করে খুললো অশেষ।

নিজের লেখা চিঠি, নিজের চোখেই অচেনা বলে মনে হচ্ছিল। চিঠিটাই অচেনা, নাকি ও নিজেই নিজের কাছে অচেনা ?

প, কল্যাণীয়াসু।

আমার আজকে না গেলেই নয়। সোমবার, ফ্লাইট কোনো কারণে ডিলেড্ হলে বোর্ড-মিটিং অ্যাটেন্ড করতে পারবো না। মিটিং দশটায়। শার্প। ইন আ ম্যান্স্ লাইফ, নাথিং ইজ মোর ইম্পট্যান্ট দ্যান হিজ ওয়ার্ক।

পরেরবার এসে তোমাকে নিশ্চয়ই ফোন করবো ।রাগ কোরো না।

আমাদের 'জীবন' বলতে বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সবটাই একটা ডে-ইন্ ডে-আউট, মনোটোনাস্, ডিস্‌গাস্টিং অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। সকাল থেকে রাত, দিন থেকে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে মাস, মাস থেকে বছর, জীবন থেকে মৃত্যু, পুরোটাই একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস। শুধুই রুজিরোজগারের, প্রতিযোগিতার, কামড়াকামড়ির।

আমরা রোবোটস্ হয়ে গেছি, পরমা। আটারলি গাটাবলি রোবোটস।

আমাকে ক্ষমা কোরো। ইতি তোমার অশি।

অশেষের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো। ভাগ্যিস্ চিঠিটা রাতেই পাঠায়নি ড্রাইভারের হাতে।

পড়ার পর চিঠিটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলল। পার্সের ভিতরের খাঁজে, যেখানে ডাইনারস্ ক্লাবের কার্ডটা রাখে, সেইখানে পরমার একটি ছবি ছিল। দশ বছর আগের ছবি। ছবিটাকেও বের করলো হাই তুলতে তুলতেই। চোখের খুব কাছে এনে দেখলো একবার। জুহুবিচে দাঁড়িয়ে আছে পরমা। সাদা শিফন শাড়ি। মুক্তোর মালা ও ইয়ার টপ্। মুক্তোর মতো হাসি।

চুমু খেল একটা। অনেকক্ষণ ঠোঁটটা চেপে থাকল ; শেষ বারের মত দেখে নিলো, তারপর কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে, ছেঁড়া চিঠিটার সঙ্গেই ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিলো।

নিজের জাগতিক উন্নতির জন্যে নিতান্তই প্রয়োজনীয় কিছু জাগতিক জিনিস ছাড়া সঙ্গে এই "স্পেস্-এজ"-এ আর কিছুই রাখতে নেই। যতখানি ভারশূন্য করে রাখা যায় নিজেকে ততই ভালো। প্র্যাক্‌টিক্যাল, প্রাগ্‌মাটিক কৃতি পুরুষ অশেষ ভাবলো, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তারপর, হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো।

অ্যালার্ম কল দিতে বলেছে ঠিক তিনটে পঞ্চাশ মিনিটে। উঠে পড়ে, দাড়ি কামাবে ; চান করবে।

ততক্ষণে দিনের আলোর মত উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত এয়ারপোর্টের ডিপারচার লাউঞ্জে দীর্ঘ সারি পড়বে অশেষ-এর মতো, কর্মিৎকর্মা, দ্রুতগতি, সুপারম্যান, হাই-ফ্লাইং মানুষদের।

মাইক্রোফোনে ভেসে আসবে: প্লিজ প্রসিড ফর সিকিওরিটি চেক

আরও একটি দিন শুরু হবে।

প্রেমহীন।

অবকাশহীন।

সময়, সময়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে সময়কে ধর্ষণ করতে করতে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আবর্তিত হবে। এয়ারবাস-এর পাইলট-এর গলা ভেসে আসবে কর্কপিট থেকে দরজা-বন্ধ প্লেনের মধ্যে "ক্যাবিন ক্রুজ প্লিজ বি অ্যাট ইওর স্টেশানস্ ফর টেক অফ্‌ফ...ফর টেক অফ্‌ফ প্লীজ

অ্যান্টিকুয়ারিয়ান্

ভারতীয় নানা আদিবাসীদের এথ্নো-বায়োলজির উপরে তখন প্রফেসর দিলুগুনের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করছিলাম। সেই সুবাদে কত পণ্ডিতজনের সঙ্গে যে আলাপিত হবার সুযোগ ঘটেছিল, তা বলার নয়।

অবশ্য এ বিষয়ে যাঁরা দিকপাল তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ মৃত। ইংরেজ, বেলজিয়ান, জার্মান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান সব মিশনারী সাহেবরা এই দেশেব জঙ্গল-পাহাড়ের গভীরের গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন আদিবাসীদের অতি কাছ থেকে দেখে, তাদের ভাষা শিখে, তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত জগৎ সম্বন্ধে কতরকম আলোকপাতই যে করে গেছেন তা জানলে ও পড়লে ভারতীয় হিসেবে লজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

অবশ্য শরৎচন্দ্র রায়, এবং অধুনা ডঃ দিনেশ্বর প্রসাদ, ডঃ কে সুরেশ সিং, পি দাশ শর্মা, ডঃ রামদয়াল মুণ্ডা এবং আরো অনেকেই খুব ভালো কাজ করেছেন।

অ্যানথ্রোপলজিকাল বা এথনো-বায়োলজিকাল কাজ করার পথে আমার প্রধান অসুবিধে দাঁড়িয়েছিল পূর্বসূরীদের বই ও বিভিন্ন রচনার হদিস না-পাওয়া। কোলকাতায় থাকলে, ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে গিয়ে হয়তো কিছু সুবিধে করা যেতো। কিন্তু ভালুমারের জঙ্গলে থেকে ন্যাশানাল লাইব্রেরির স্বপ্ন দেখে লাভ ছিলো না কোনো। তবুও চিঠি মারফৎ ন্যাশনাল লাইব্রেরিব দুই লেখক বন্ধু অনেক সাহায্য করেছিলেন।

ফাদার পি. পনেট্, ফাদার হফ্ম্যানের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত করে আমাকে নানা রেফারেন্সের এক লম্বা লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই লিস্ট নিয়ে পাগলের মত ঘোরাঘুরি করছি, এমন সময় একদিন অচিন্ত্যব সঙ্গে দেখা। রাঁচীর অনন্তপুরের অচিন্ত্য গঙ্গোপাধ্যায়। অচিন্ত্য কাজ করতো অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলেব বিহারের অফিসে। কিন্তু এরকম বহুমুখী উৎসাহসম্পন্ন সাংবাদিকসুলভ ঔৎসুক্য-জরজর ছেলে কমই দেখা যায়। বিহারের বিভিন্ন আদিবাসীদের সম্বন্ধে ওর অনেক পড়াশুনো ছিলো। সবচেয়ে বড় কথা, ভালোবাসা ছিলো। পড়াশুনোর চেয়েও ভালোবাসা অনেকই দামী। ডঃ মুণ্ডার সঙ্গেও ওর নাকি আলাপ ছিলো। ডঃ মুণ্ডা সবে আমেরিকা থেকে ফিরেছিলেন। উনি এম. এ. করেছিলেন অ্যানথ্রোপলজিতে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং তারপর চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিঙ্গুইস্টিকসএও ডক্টরেট করেছিলেন।

অচিন্ত্য একদিন রাঁচীর মেইন রোডে, এক চা-ফুলুরীর দোকানে বসে চা খেতে-খেতে বলল, দিন দুয়েকের জন্যে পাটনা যেতে পারেন দাদা ?

পাটনা ? কেন ?

একজনের নাম ঠিকানা দিতে পারি। তাঁকে গিয়ে ধরতে যদি পারেন, তাহলে আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

একটু ভেবে বললাম, যাবো। কিন্তু, সমস্যার সমাধান কি করে হবে?

হবে। বলছি তো হবে। হালিম সাব হচ্ছেন একজন পুরনো বইয়ের বহিস্ দোকানদার। গজাধর মণ্ডিতে তাঁর বাড়ি। বাড়িতেই দোকান শুনেছি। আদিবাসীদের উপর এ হেন আধুনিক গবেষক নেই, যাঁকে ওঁর শরণাপন্ন হতে না হয়েছে।

২

এক শনিবার রাঁচী থেকে ট্রেন ধরে পৌঁছলাম গিয়ে পাটনা। একেবারে শীতের চূড়োয়। গঙ্গা থেকে হিম-ভরা বাতাস বইছে। বেজায় শীত। রোদ ঝকঝক আকাশ, তবু খদ্দরের জওহর কোটের উপর খাদি গ্রামোদ্যোগের কম্বলের মত আলোয়ান চাপিয়েও শীত যায় না।

পাটনা স্টেশনের পাশেই অনেক রকমের বেউড়ির দোকান। হাঁক ডাক, শোর-গোল, দেহাত থেকে আসা মানুষদের জন্যে অনেকেই প্রলোভন। স্টেশানের ওয়েটিং-রুমে চান-টান সেরে নিয়ে বাইরে এসে পুরী আর আলুর চোকা, আমলার আচার দিয়ে গরমাগরম খেয়ে তারপর আদা ও এলাচ দেওয়া এক ভাঁড় জবরদস্ত চা গলায় ঢেলে যথাসম্ভব গরম হয়ে সাইকেল-রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গজাধর মণ্ডীর উদ্দেশে।

গজাধর মণ্ডী এলাকাতে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে যখন পায়ে হেঁটে ঠিকানা এবং হালিম সাব-এর নাম সম্বল করে এদিক-ওদিক ঘোরা শুরু করলাম, তখনও জানতাম না যে, কপালে এত হয়রানি আছে। যাকেই বলি, হালিম সাব, বইয়ের দোকানদার? সেই-ই মাথা নেড়ে বলে 'পাত্তা জরুর গলদ হ্যায়।'

যে-নম্বরে তার থাকার কথা অনেক ঘুরে সেই নম্বরের একটা জরাজীর্ণ বাড়ির দেখাও পেলাম। জাহাঙ্গীর অথবা বাহাদুর শা, কার আমলের বানানো বাড়ি যে, তা বোঝা গেলো না। সে বাড়িতে যে কোনো লোক থাকে বা থাকতে পারে তাও মনে হলো না বাড়ির অবস্থা দেখে।

বাইরে একটি মরচে পড়া মান্ধাতার আমলের ডিজাইনের নোনা-ধরা লোহার গেট। সেই গেটের ভিতরে ঢুকে একটি দরজা দেখা গেলো। তা দিয়ে কোনোক্রমে একজন মানুষই ঢুকতে পারে। দরজা অবধি গিয়ে, ভিতরে উঁকি মেরে দেখলাম, অন্ধকার। ঝকঝকে রোদ-ওঠা মাঘের সকালেও অন্ধকার। এবং মৃত্যুর নিস্তব্ধতা।

ঝটপট আওয়াজ করে কতগুলো পায়রা অদৃশ্যভাবে উড়ে, চোখের আড়ালেই আবার বসে প্রমাণ করার চেষ্টা করলো যে, আমি যা ভাবছি, তা নয়, প্রাণ আছে। সে বাড়িতেও প্রাণ আছে।

কোঈ হ্যায়? হালিম সাব? হালিম সাব।

বহুবার ডেকেও কোনো সাড়া পেলাম না। ঐ দরজা দিয়ে ঢুকতেও সাহস হলো না। যদি কেউ খুনও করে রেখে দেয়, কিছুই বলার নেই। কেউ জানতেও পারবে না। গত সপ্তাহেই সবে নতুন এইচ-এম-টি হাত-ঘড়িটি কিনেছি।

কী করব, ভেবে না পেয়ে, আবার বাইরেই ফিরে এলাম। ঐ বাড়িটির লাগোয়া দু পাশের এবং উল্টোদিকের দোকানে খোঁজ করলাম। নাঃ। কেউ কখনও শোনেইনি অমন ভুতুড়ে বইয়ের দোকানের কথা।

অচিন্ত্যর তো কোনো ক্ষতি করিনি আমি ? জেনেশুনে এমন প্র্যাকটিকাল জোক করলো কেন ও আমার সঙ্গে ?

একটি অল্পবয়সী ছেলে আমার হাতের চিরকুটের ঠিকানা পড়ে নিয়ে, পিচিক্ করে পানের পিক ফেলে, হাসি হাসি মুখে জিগগ্যেস করল, আপ কাঁহাকা রহনেওয়ালা ?

রাঁচীকা !

রাঁচী মতলব ? কাঁকে রোডকা ?

বলেই, মিচ্কে হেসে বললো, হুমম্। মেরী আন্দাজ তব তো বিল্কুল্ ঠিকই নিক্‌লা।

এমন সময়, নোংরা-ধুতি ও পাঞ্জাবি-পরা একজন বৃদ্ধ, হাতে লাঠি, মুখে লেগে-থাকা আশ্চর্য বিধুর এক হাসি নিয়ে পথ চলতে চলতে, ছেলেটির কথা শুনেই দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেটিকে শ্লেষমিশ্রিত গলায় বললেন : 'তুমলোগোঁনে পটনামে রহকে স্রিফ্ শত্রুঘন সিন্‌হাকা খিদ্‌মদ্‌গারী জানতে হো ! হালিম সাব ইস্ জমানেকে তমদদ্দুনকে লায়েক নেহী না হ্যায় !'

ছেলেটি জিভের সমস্ত জোর জড়ো করে পিচিক্ করে বৃদ্ধর প্রায় মুখের উপরই পিক ফেলল আরেকবার। ফেলে বলল, 'আজ্ সুবে সুবেই দুনিয়াকা সব মানহুস্ ইনসানোসে ভেট হো গ্যয়া। ইয়ে দিন্‌কা নতীজা বহত্ই খরাব নিকলেগা হামারা লিয়ে।'

বৃদ্ধ যুবকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন, যেমন করে একমাত্র গর্বিত, বিজ্ঞ, বৃদ্ধরাই করতে পারেন। সামান্য ফিরে, একটু ঝুঁকে, লোহা-বসানো ছুঁচোলো লাঠিটি তুলে যে-দরজা দিয়ে আমি একটু আগেই বেরিয়ে এলাম, সেদিকেই নির্দেশ করে চোখ দিয়ে ইশারা করলেন আমায়।

ওঁকে বলতে যাচ্ছিলাম···

আমাকে থামিয়ে দিয়েই উনি বললেন, 'জারা আন্ধারী পার হোকে দেখিয়ে না জনাব, সাম্‌নামে বড়া উজালা হ্যায় ! আপ্ ক্যা শোচেথে যো, হালিম সাব গঙ্গাধর-মণ্ডীকা শড়ক্-পর বৈঠকে ফিল্মী গানাকা কিতাঁবো···

আমি লজ্জিত হয়ে, ওঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার সাহস করে সেই সুড়ঙ্গের মতো দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গে রোদ মরে গেলো। আবার শোনা গেলো চোখের আড়ালে পায়রার ডানার ঝটপটানি। মনে হলো, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকে অনেকদিন আগেই কে বা কারা এখানে অন্ধকারে গলা-টিপে খুন করে রেখে গেছে, অতীতের রাজত্বকে চিরদিন কায়েম করে রাখার জন্যে।

একসময় বাঘের গুহাতেও সাহস করে ঢুকেছি, তাই অপ্রয়োজনের ফেলে-দেওয়া পুরনো সাহসকে মনের ওয়েস্ট-পেপার বক্স থেকে তুলে নিয়ে আর একটু এগোলাম। এবার অন্ধকার সুড়ঙ্গ পেরুনোর পর স্পষ্ট চোখে পড়লো একটি মস্ত উঠোন। চারকোণা। একতলাতে প্রাচীন কারুকার্যময় রেলিঙ-দেওয়া চারকোণা বারান্দা। চারদিকে ঘোরানো। দোতলাতেও তাই। উঠোনের একপাশে শীতের জাফরান্-রঙা রোদ এসে নিস্তেজ পোষা-কুকুরের মত শুয়ে আছে।

কী ধুলো !

কতদিনের ধুলো চারদিকে।

ধুলোগুলো কোথাও কোথাও জড়ো করে স্তূপাকার করা আছে। মনে হচ্ছিলো, ধুলো নয় ; কালো বারুদ। দেশলাই ঠুকে দিলেই, জ্বলে উঠবে দপ্ করে। পায়রাদের ডানার

ঝটপট আর তাদেব অস্ফুট স্বগতোক্তি ছাড়া আব কোনোই শব্দ নেই। ধুলোব বাকদও নিস্তব্ধ।

আবাবও উপবে তাকিয়েই চোখে পড়লো একটি বহুমূল্য কিন্তু শতচ্ছিন্ন পাবসিযান গালিচা দোতলাব বেলিঙেব উপব মেলে দেওযা হয়েছে। বোদ এসে তাতে বসবে, সেই আশায।

গলা চড়িয়ে 'হালিম সাব' বলে ডাকতে যাবো ঠিক এমনি সময সাবেঙ্গীব মিষ্টি আওযাজ ভেসে এলো দোতলা থেকে। হবিণেব খুবেব আওযাজেব মত ছন্দোবদ্ধ তবলাব আওযাজও যেন শুনলাম মনে হলো। এক তরুণীব গলাব স্বব। স্বব শুনেই, কেন জানি না মনে হল, কণ্ঠস্ববেব মালকিন খুবই সুন্দবী। সাবেঙ্গীব সুবেব সঙ্গে স্বব মিলিযে প্রথম ভোবেব পবিযাযী পাখিব চিকন ডাকেব মতো নিষ্কলুষ নিক্কনিত সুবেলা গলায কে যেন হঠাৎ ধবলো "তুযা চবণকমলপব মন ভ্রমব ভালভান যা॰ চন্দ্র চকোব।'

আঃ! সব কিছু গোলমাল হযে গেলো আমাব সেই মুখবা শুনে। মনে পড়ে গেলো, যশোযন্ত-এব সঙ্গে একবাব গাড়োযাব জঙ্গলেব শিকাবেব ক্যাম্পে আজ থেকে তিবিশ বছব আগে এক মীর্জাপুবী বাইজী রুকনি বাঈযেব মুখে শুনেছিলাম এই বিখ্যাত গানটি।

গান শুনতে শুনতে আমি কেন যে পাটনাতে এসেছি আজ সকালে, কেন যে গজাধব মণ্ডিব এই আশ্চর্য প্রাগৈতিহাসিক আলো আঁধাবেব উঠোনে এসে দাঁড়িযেছি সবই ভুলে গেলাম। যাকে আত্মবিস্মবণ বলে পুবোপুবিই তাই হলো আমাব।

আশাভৈবিব এই পদটি ধ্রুপদেব মতই গাইতে শুনেছিলাম গাড়োযাতে সেই বাইজীকে। মন্ত্রমুগ্ধেব মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িযে থাকতেই বুঝলাম ধ্রুপদ নয গাযিকা খেযালেব ঢং-এই গাইছেন। অজানিতে নিযম ভেঙ্গে অথবা ভুল কবে কি, জান না।

গাযিকা ধীবে ধীবে নিজেকে ফুলেব মতো ফুটিযে তুলছিলেন। আব ৮° এব সামান্য এদিক ওদিক হয়ে যাওয়াতে ভৈববী এব জৌনপুবীবও ছোঁযা লাগছিল এসে। ব্যাকবণ হযত তাতে অশুদ্ধ হচ্ছিলো। কিন্তু হলোই বা!

পুবোনো বইযেব খোঁজে এসে আজ সকালে যে অসামান্য অতীতেব অন্ধকাব পর্দা ফুঁড়ে সত্যিই এক অনন্তকালেব আলোব মধ্যে অভাবনীযভাবে এসে পড়লাম সে কথা মনে কবেও আমাব গাযে কাঁটা দিচ্ছিলো।

ঐ সুব-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক অথবা প্রাগৈতিহাসিক পবিবেশে ডাকাডাকি চেঁচামেচি একেবাবেই কবা সম্ভব ছিলো না।

কতক্ষণ যে ঐভাবেই দাঁড়িযেছিলাম বলতে পাববো না। পনেবো মিনিটও হতে পাবে, তিন ঘণ্টাও হতে পাবে। নিস্তেজ কুকুবেব মত উঠোনেব কোণায কোণাকুণি শুয়ে থাকা-বোদ একসময কখন যে নিঃশব্দে উঠে চলে গেলো তা খেযাল পর্যন্ত কবিনি। দোতলাব বাবান্দা থেকে তখনও বাশি বাশি নবম যুঁই ফুলেব মতো, পাখিব তলপেটেব মসৃণ বেশমী পালকেব মতো সুব ঝবছিলো।

ঝবছে ত ঝবছেই। ভৈববী ও জৌনপুবী মিশিযে দেওযা আশাওবীব তান শুনতে শুনতে আমি যেন সেই বহু যুগ আগেব গাড়োযাব জঙ্গলেব সকালেই চলে গেছিলাম। যশোযন্ত যেন আমাকে ঠেলা মেবে বলছিলো, ক্যা লালসাব? হালত খাবাব?

হঠাৎই স্বপ্নভঙ্গ হলো। কে যেন আমাকে প্রায পেছন থেকে ধাক্কা দিযেই পাশে এসে দাঁড়ালো। অসভ্যেব মত।

বললো, কওন হ্যায আপ?

চমক ভেঙে ও সবিনয়ে আমার তারিফ পেশ করে দিয়ে বললাম যে, আমি হালিম সাব্-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। রাঁচী থেকে আসছি।

ছেলেটি অল্পবয়সী। তার পরনে ঘন লাল রঙের জিনস্। গায়ে লাল এবং কালো রঙের চেক-চেক নাইলনের গেঞ্জী। পায়ে, সোনার জলের কাজ-করা চটি। শরীরে, সস্তা পাউডারের অশালীন গন্ধ। আমার দিকে এবং দোতলার দিকে একই সঙ্গে চেয়ে সে অদ্ভুত এক উপেক্ষা ও ঘেন্না মেশা হাসি হাসলো।

তারপর বিদ্রূপাত্মক গলায় বললো, আপনি দাঁড়ান। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি বুড়োকে। সকাল সকালই আজ গান চেগেছে। ম্যায়ফিল বসে গেছে। যেমন দোকান, তেমন দোকানদার, আর...তেমনই সব খদ্দের!

বলেই, আমার দিকে একবার অপাঙ্গে চেয়েই জাফ্‌রি-লাগানো সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে গেল সে উপরে।

কিন্তু ছেলেটি উপরে যাওয়ার আগেই দোতলার বারান্দাতে এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন। চেহারা দেখে, বয়স আন্দাজ করা যায় না। পোশাকেও না। তবে মনে হলো যে, আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখনও হয়তো উনি বৃদ্ধই ছিলেন।

উনি আমার দিকে চেয়ে, নিজের ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে চুপ করে থাকতে বললেন।

গান যেমন চলছিলো; তেমনই চলছিলো। বোধহয় অমন কোমল স্বরের ছড়াছড়ির মধ্যে হঠাৎ বেসুরো ছেলেটির কর্কশ উচ্চকিত স্বরে বিরক্ত হয়েই উনি বারান্দাতে উঠে এসেছিলেন।

ছেলেটি নিশ্চয়ই ওঁকে বলে থাকবে, আমি কেন এবং কোথা থেকে এসেছি। একটু পরই হালিম সাব নেমে এসে, উঠোনের অন্য কোণে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কালো ধুলোর পাহাড়, উপত্যকা, সব সাবধানে পেরিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই ধুলোর বাঁধ-দেওয়া একটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে লম্বা পেতলের চাবি বের করে অদ্ভুত দর্শন একটা তালা খুললেন। কী কাঠের দরজা, তা বোঝা গেলো না। কিন্তু এমন কারুকার্যময় দরজা কখনও কোনো রাজারাজড়ার বাড়িতেও দেখেছি বলে মনে পড়লো না। যদিও সব কারুকাজই তখন ধুলোয় ঢাকা।

আগে নিজে ঢুকে, আমাকে বললেন, আইয়ে অন্দর। পাধারীয়ে।

চমকে উঠলাম আমি; আশ্চর্য তারুণ্য গলার স্বরে। কে বলবে যে, ইনি বৃদ্ধ!

ঘরটাতে ঢুকতে আমার ভয় করছিলো। ছোট্ট ঘর। চারদিকে বইয়ের পাহাড়। পাহাড় না বলে, উইয়ের ঢিপিই বলা ভালো। কারণ, কোটি কোটি উইপোকার বাস সেখানে এবং কয়েক টন কালো ধুলো।

একটি চেয়ারে উনি নিজে বসে, আমাকে অন্য একটি চেয়ারে বসতে দিলেন। চেয়ারের চেহারা দেখেও মনে হল কোলকাতার লেজারার্স কোম্পানির প্রথম আমলের চেয়ার।

হালিম সাহেবের পরনে মলিন চুড়িদার পাজামা। উপরে কুর্তা। তার উপরে জমকালো, কিন্তু ছেঁড়া একখানা শাল। শালটির ওজন হয়তো নতুন অবস্থায় শ'গ্রাম ছিলো। এমন কারুকার্য্যময় পাতলা শালও আমি আগে দেখিনি। হালিম সাব-এর গা দিয়ে হালকা অম্বর আতরের গন্ধ বেরুচ্ছিল। এবং মুখ দিয়ে, অচেনা কোনো মদ-এর।

একটি কারুকাজ-করা জানালা খুলে দিলেন তিনি। কোথা থেকে যে আলো আসতে লাগলো, বুঝলাম না। রোদ নয়; শুধু একটু আলো। সেই স্বল্পালোকিত ঘরে বসে বহু যুগ আগে ক্ষরিত জমাট বাঁধা রক্তের মতো লাল আর সর্ষেফুলের মতো হলুদ রঙে-মেশা শাল

গায়ে-দেওয়া চেস্ট-নাট্ রঙের বৃদ্ধর দিকে আমি অবাক চোখে চেয়েছিলাম।

আমি ওঁকে দেখছিলাম। উনিও আমাকে।

উনি যে-চেয়ারে বসে আছেন তার সামনে একটি রাইটিং-ব্যুরো। তাতে অসংখ্য পীজন্-হোলস্। তার মধ্যে হাজার হাজার চিঠি। চিঠিগুলোও ধুলোর বারুদে ঢাকা। একটি ওষুধের শিশি। হাকিমী-দাওয়াখানার রতিশক্তি-বর্ধক বটিকা। আরও নানা দাওয়াই। গ্লাসের মধ্যে লেজ গজানো একমুঠো ছোলা—জলের ভিতর। রাইটিংব্যুরোর উপরেই একটি সুইস টেবল-ক্লক। বন্ধ। তাতে বারোটা বাজতে এক মিনিট দেখাচ্ছে সময়। অনেকক্ষণ পর সময়ের কথা মনে পড়াতে নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এগারোটা বেজেছে।

রাইটিং-ব্যুরোর উপরের দেওয়ালে একটি ক্যালেণ্ডার। সেই ক্যালেণ্ডারে একজন খাইখাই চেহারার ইংরেজ মেয়ে ফরাসীয় ক্যান্-ক্যান্ ড্যান্সারের মত ফোলানো গাউন পরে, ছাতা মাথায় গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে ছবি হয়ে। ডিসেম্বর মাসের পাতা ঝুলছে। উনিশ শ উনত্রিশ সালের। সে বছরের চব্বিশে ডিসেম্বর তারিখের নীচে কালি দিয়ে কী যেন কী লেখাও আছে।

উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, পড়তে গেলাম আমি।

হালিমসাব হাসলেন। বললেন, লেখা মুছে যায় ; শুধু ব্যথা আর স্মৃতি থাকে।

ইংরেজিতে যখনই কথা বলছিলেন, তখনই একেবারে অক্সোনিয়ান এ্যাকসেন্টে। এখনকার দিশী সাহেবদের মত নয়। যাঁরা প্রথম দেড় মিনিট অক্সোনিয়ান এ্যাকসেন্টে কথা বলার পরই হয় হরিয়ানা, নয় তামিলনাড়ু, নয়তো রাজস্থানী, নয়ত নিউ মার্কেটের সিন্ধী দোকানদারদের এ্যাকসেন্টে ফিরে যান।

ইংরেজ মেয়েটির জন্যে ভারী কষ্ট হলো। নাইনটিন টুয়েন্টি নাইনের ডিসেম্বর মাস থেকে প্রেমিক আসবে বলে সে সটান দাঁড়িয়ে আছে এই ছবিতে। প্যারাসোল্ খুলে, ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে।

এবার কাজের কথায় এলেন হালিম সাব। বললেন, আপনার ইন্টারেস্ট কি ? হো, মুণ্ডা, সাঁওতাল, বীর্‌হোর, চেরো, খড়িয়া, খাঁর্‌ওয়ার, খন্দ, অসুর, কোন আদিবাসীদের সম্বন্ধে ? এবং কি নিয়ে কাজ করছেন আপনি ? অ্যান্থ্রোপলজি, এথ্নোলজি, সোসিও-ইকনমিক ডেভলাপমেন্ট, স্পিরিচ্যুয়ালিটি, রিলিজন, ফোক-লোরস, উ্যাসেজেস এণ্ড কাস্টমস্ ? সংগস এণ্ড পোয়েমস ? কি নিয়ে ?

আমি ওঁকে বললাম, যা বলার ; সংক্ষেপে।

আপনি বাঙালী ? তা, শরৎ রায়ের নাম শোনেননি ? শরৎবাবু নিজে উকীল ছিলেন, আদিবাসীদের হয়ে মামলা লড়তে লড়তে কখন যে তাদের ভালোবেসে ফেলেছিলেন, তা তিনি নিজেও হয়তো বুঝতে পারেননি। ঐ উকীল ভদ্রলোক যা করে গেছেন অনেক ডিগ্রিধারী অ্যান্থ্রোপলজিস্টও তা করেননি। শরৎ রায় আপনার রাঁচীতেই মারা গেলেন। এই তো সেদিন।

সেদিন ? কই ? কাগজে কিছু পড়িনি তো। আমি ত জানি উনি···

তিরিশে এপ্রিল। তারিখটাও মনে আছে আমার।

আর বছরটা ?

হ্যাঁ। মনে থাকবে না ? মাত্র সেদিনের তো কথা ! নাইনটিন ফর্‌টি টু !

তারপর বললেন, কি কি বই দরকার ? তার লিস্ট করে এনেছেন ?

আপনি কী কী সাজেস্ট করেন ? কি কি পাব এখানে তা না জানলে ! জানবো কী ক'রে ।

মুণ্ডাদের সম্বন্ধে জানতে চান ত ভাল করে হফ্‌ম্যানকে পড়ুন ।

হালিম সাহেব বললেন ।

কুড়ি বছরের জার্মান ছোকরা আঠারশো সাতাত্তর সনে এদেশে এসে নেমেছিলো । উনিশশো পনেরোতে ফার্স্ট ওয়ার্লড-ওয়ারের সময়ে তাকে ইংরেজরা ফেরৎ পাঠালো জার্মানীতে । ফাদার হফ্‌ম্যানকে । কিন্তু জার্মান জাতটার মতোই ইংরেজ জাতটারও অনেকই গুণ ছিলো । অনেকই গুণ !

বলেই বললেন, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ লান্‌ড়ানের জার্নালের ব্যাক কপি চাই ? নাইনটিন টুয়েণ্টি ফাইভ থেকে ? রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সব ব্যাক নাম্বারও আছে । এই ধরুন, পি ও বডিং-এর "হাউ দ্যা সাণ্টালস্ লিভ", ভল্যুম টেন, নাম্বার থ্রী । আজকালকার ছোকরা বলতে, মানে, যারা মুণ্ডাদের নিয়ে ভালো কাজ করেছে—যেমন পনেট, ফাকস্, ভ্যান আক্সাম ; জে ডিনী । এরা ছাড়াও অনেক দিশী ছোকরাও নিশ্চয়ই আছে ।

চারধারের স্তূপীকৃত উইয়ে-কাটা, ধুলোভরা বইয়ের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে বসেছিলাম আমি ।

একটা মোটা বই দেখিয়ে বললাম, ওটা কি বই ? ইস্ । উইয়ে ত একেবারে···

উনি হাসলেন । বললেন, উইয়ে তো শুধু বই-ই কাটে ! আর আমরা ? আমরা যে সবকিছুই কাটি ? সততা, স্মৃতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি যা কিছু ভালো ; সবই কাটি !

বলেই বললেন, এই নিন ! লুথার সাহেবের আঠারশো সাতাশ সনে চায়নাতে বাঘ শিকারের এ্যাডভেঞ্চার । শিকারে ইন্টারেস্টেড লোকেরা এ বইয়ের দাম দেবেন হাজার টাকা !

আমি বললাম, আমার কাছে দুশো টাকা আছে । এতে কি কি বই হবে ?

উনি হাসলেন ।

তবে, অবজ্ঞা করে নয় ।

বললেন, ঐ টাকায় তো কোনো বইই হবে না জনাব । তবে, এক কাজ করতে পারেন । বিব্‌লোগ্রাফী নিয়ে যান । পরে আমাকে লিখলে আমি ভি. পি-তে পাঠিয়ে দেব এক এক করে ।

তারপর প্রবোধ দিয়ে বললেন, এসব বইয়ের তো দাম হয় না । মানে, দামে দাম হয় না । তাছাড়া, আমার দোকানে মাসে হয়ত একজন খদ্দের আসেন । এ তো দোকান নয় । নিভৃত কবরখানা ।

বিব্‌লোগ্রাফই নিলাম একটি । চটি বই । রঙ হলুদ হয়ে গেছে । অর্ধেক উইয়ে কাটা ।

উনি বললেন, পোকার জন্যে চিন্তে নেই । কেরোসিন তেলের মধ্যে ন্যাপথোলিনের বড়ি ফেলে ডিসলভ্ করে নিয়ে ন্যাকড়াতে তা ভিজিয়ে সেই ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নেবেন বইয়ের পাতাগুলো । সব উই মরে যাবে ।

এবার উঠতে হবে । কী বলবো ভেবে না পেয়ে, হঠাৎ বললাম, ভারী ভালো গান ।

হালিম সাহেব চমকে উঠলেন । বললেন, গান ? এ গান আপনার ভালো লাগে ?

জবাব না দিয়ে বললাম, কে গাইছিলেন ?

আমার পাঁচ-নম্বরী বিবি ।

আর যে ছেলেটি আমার আসার খবর নিয়ে ঢুকলো, সে কে ?

ছেলে ? ওহো ! আমারই ছেলে। তিন নম্বর বিবির চার নম্বর ছেলে।

কি করেন উনি ? নিশ্চয়ই আপনার এই ব্যবসা দেখেন না।

উনি ? করেন অনেক কিছুই। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করেন। নেপাল থেকে স্মাগলিং করে জিনিস আনেন। প্রয়োজনে, চাকু-বোমা চালান।

গানও ভালবাসেন না মনে হল।

ওদের কি ধৈর্য আছে ? ধৈর্যই ভালবাসাকে গভীর করে। যে-কোনো ভালোবাসা। এসব গান ওদের জন্যে নয়।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, হালিম সাহেব, আপনার বয়স কত হলো ?

বলেই, বললাম ; কিছু মনে করবেন না।

আমার বয়স ?

বলে, হালিম সাহেব, যে জানালা দিয়ে আলোর আভাস আসছিল সেই দিকে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকলেন। অনেকদিন বোধহয় এমন প্রশ্ন ওঁকে কেই করেনি।

তারপর, আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আমার মনের বয়স কুড়ি। শরীরের বয়সের হিসেব রাখি না। গাছ কি ঝরাপাতার হিসেব রাখে ? তবে, নব্বুই-একশ ত হবেই।

আপনার কি কোনো মন্ত্র-গুপ্তি জানা আছে হালিম সাহেব ? এই বয়সেও আশ্চর্য তরুণ আপনি !

আছে আছে !

বলে হেসে উঠলেন হালিম সাহেব।

তারপর বললেন, জওয়ান লেড়কিয়া। যারা আপনার চেয়ে কম করে কুড়ি বছরের ছোটো এমন যুবতীদের নজর্দিকিয়া। সৎসঙ্গ। এবং সৎসুরা। এই তিন মন্ত্র আমার। আনন্দে থাকাটাই মন্ত্র। আনন্দের দ্বার খুলে রাখার আর এক নামই বেঁচে থাকা। আনন্দের দ্বার যেই রুদ্ধ করবেন, মৃত্যু তখুনি সেই বন্ধ দরজায় এসে টোকা মারবে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম, চলি এবার।

হালিম সাহেবও উঠলেন। বললেন, খুদা হাফিজ। ওরওয়াক্ত মজেমে রহিয়ে। ইস বেহেতরীন দুনিয়ামে ওরওয়াক্ত খুশী ঔর ইনায়েৎ কি খুশবু ডালতে রহিয়ে ওর উস্‌সীমে ডুবকে রহিয়ে।

হালিম সাহেব একটা কার্ড দিলেন আমাকে। বললেন, প্রয়োজনে চিঠি লিখবেন। আসতে হবে না। হয় উর্দু, নয় ইংরেজিতে। আপনাদের হিন্দী-ফিন্দী আমি জানি না। শুনেছি, হিন্দী হিন্দুস্থানের রাষ্ট্র ভাষা হয়েছে !

কার্ডটা হাতে নিয়ে দেখলাম, সেটাও ঘি-রঙা হয়ে গেছে।

নাইনটিন ফর্টি-ফাইভে শেষ ছেপে ছিলাম পাঁচশ কার্ড। এখনও তিনশ রয়ে গেছে।

পড়ে দেখলাম, লেখা আছে, জনাব মহম্মদ হালিম বাহাদুর। এণ্টিকুয়ারিয়ান বুক সেলার। গজাধর মণ্ডী। পাটনা।

কালো বারুদের মত ধুলোর প্রাচীর তুলে তার ভিতরে বসে আছেন জনাব মহম্মদ হালিম খাঁ বাহাদুর। শান্তির নিভৃত ছোট্ট দ্বীপ গড়ে ; এই অশান্ত সময়ের সমুদ্রে। নিজের নাতনীর চেয়েও বয়সে ছোট কোনো গন্ধরাজী লেবু নারীর শরীরে, সুরায় এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বুঁদ হয়ে। ইতিহাসকে কৌটো-বন্দী করে রেখে দিয়েছেন। প্রেমিকার অপেক্ষায় ক্যান্-ক্যান গাউন-পরে দাঁড়িয়ে-থাকা নাইনটিন টুয়েন্টি-নাইনের ক্যালেণ্ডারের ছবির মেমসাহেবের

মতো, বারোটা বাজতে এক মিনিটে বন্ধ করে—রাখা ঘড়ির মতো , মৃত্যুকে, জরাকে দূরে সরিয়ে তাঁর সমকালীন সমস্ত কিছু সুন্দর মোহময়তাকে কৌটো-বন্দী করেই রেখে দিয়েছেন ঐ অন্ধকারের ধুলোর বারুদ-কালো আব্রুর মধ্যে। "ওয়াক্ত কা সাঁপ কী নীগাহ্" এড়াবার জন্যে, ওয়াক্তকেই থামিয়ে রেখেছেন উনি।

বাইরে বেরিয়ে, লোক-গিস-গিস, আওয়াজ-ঘর্ঘর নব্য পাটনাব পথে পা দিয়েই, আলোতে চোখ ধেঁধে গেল। অনেক আলো। কিন্তু এ আলো অন্য রকম আলো।

পথিক বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ লাঠি তুলে পথ নির্দেশ করে আমাকে ঠিকই বলেছিলেন

'জাবা আন্ধার পার হোকে দেখিয়ে না জনাব, বড়া উজালা হ্যায।'

একলা বৈশাখ

সুমি রবিবারের নাটক শুনছিল রেডিওর। রাঘবকে আসতে দেখেই বন্ধ করে দিল।

সারা সপ্তাহটা দুজনেই ব্যস্ত। সুমি স্কুলে পড়ায়, রাঘব ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। পোদ্দার কোর্টে ওর অফিস। সুমির আজ ছ বছর থেকে যে কোনও দিনই ওব স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস হয়ে যাবার কথা হচ্ছে। রাঘবও অফিসারের পরীক্ষা পাস করে বসে আছে পাঁচ বছর। যে কোনও দিনই ও অফিসার হতে পারে। কিন্তু আজ অবধি হয়নি। দুজনেরই এই অবস্থা।

কুশলই একমাত্র সন্তান, ওদের ভবিষ্যৎ, সাধ-আহ্লাদ, ওদের দুজনের জীবনে যা কিছুই হয়নি, সেই সব শূন্যতাই পূর্ণ করতে চায় ওরা কুশলের মধ্যে। নিজেদের বঞ্চিত করেও কুশলের জন্যে কিছুমাত্র করতে ত্রুটি করে না।

কুশল রবিবার পাশের ঘরে বই-টই পড়ে, নইলে একা একা ক্যারাম খেলে। বয়স নয় হলো। ও জেনে গেছে যে, মা-বাবা রবিবার দুপুরটাতেই একটু একসঙ্গে থাকে। নানা কথাবার্তা বলে। রাতে ও মায়ের সঙ্গেই শোয়।

কুশলের যেটা জানার কথা নয় সেটা হচ্ছে এইই যে, কথাবার্তা তো বটেই, প্রতি রবিবার দুপুরেই, মাঝে মধ্যে সুমি ও রাঘব একটু আদরটাদরও করে এবং খায়।

জীবন এখন এতই ঝামেলার, ক্লান্তির এবং একঘেয়েমির হয়ে গেছে যে, কোনও কিছুই আর ভালো লাগে না ওদের। মানুষ কেন বিয়ে করে, সংসার করে, কেনই বা ছেলেমেয়ে হয়, কেনই বা এই বুড়ো বয়সের পুতুল খেলাতে নিজেরা জীবনগুলো এমন করে মাটি করে ফেলল এ সব কথা প্রায়ই ওদের দুজনেরই মনে হয়, কিন্তু এ নিয়ে ভাবার মতো সময়টুকু পর্যন্ত ওদের নেই।

অন্য লক্ষ লক্ষ দম্পতিরই মতো, ওদেরও জীবনে একদিন অনেক সুখ, সাধ, কল্পনা, ভালবাসাও ছিল। সবই যেন এখন মরে গেছে। তবু দুজনে সাত তাড়াতাড়ি তৈরি হয় প্রতি সকালে সপ্তাহে ছ দিন। নাকে-মুখে খেয়ে দুজনেই বেরিয়ে পড়ে। কুশলকে রাঘব স্কুলে পৌঁছে দিয়ে মিনি ধরে অফিসে যায়। নিয়ে আসে সুমি স্কুল ছুটির পর। বিয়ের সময় ওরা দুজনে মিলে যা রোজগার করত, এখন রোজগার তার চেয়ে বেড়েছে অনেকই। কিন্তু তবু আগের থেকে অনেকই গরিব ওরা এখন। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় এমনই অবস্থা। টাকা কাগজ হয়ে গেছে।

অ্যাই! বালিশটা দাও তো।

রাঘব পান চিবোতে চিবোতে বলল।

সুমি এক হাতে বালিশটা ছুড়ে দিয়ে বলল, বেশ লোক। একটা পান তো আমার জন্যেও আনতে পারতে ?

সিগারেট কিনতে গিয়েই পয়সা ফুরিয়ে গেল। ঠাকুরটা নেই পানের দোকানে। ওর মামা না কাকা কে জানে, সবে এসেছে ঢেনকানল থেকে, বাংলাও শেখেনি এখনও, আমাকে চেনেই না। ধারে দিল না। চেয়েছিলাম।

সুমি কিছু বলল না।

পাখাটা ঘুরছিল মাথার উপরে কিচিক্ কিচিক্ একটানা শব্দ করে। কার্বনটা বোধ হয় ক্ষয়ে গেছে। নীলচে আগুন বেরোয় সব সময়। কিন্তু আগুনটা ঠাণ্ডা মেজাজের, স্নিগ্ধ। রাগী আগুনের মতো নয়।

সুমি বেডকভারের উপর পা দুটি টানটান করে মেলে দিল। ওর এই পা-টানটানের একটা বিশেষ রকম আছে। আদর খাওয়ার ইচ্ছে হলে বেড়ালনীরা যেমন করে।

ঘরের পর্দা সব টানাই ছিল। ধূপকাঠি জ্বেলে দিয়েছিল সুমি। আয়নাও ঢেকে দিয়েছিল লেসের ঢাকনাতে। ঘরের মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, আধো অন্ধকার। রোম্যান্টিক। আদর করা এবং খাওয়ার মতোই পরিবেশ।

রাঘব বলল, হবে নাকি ? ইচ্ছে ?

সুমির মাথাটা বালিশের এক কোনায় নেমে এসেছিল। মুখটা তির্যকভাবে রাঘবের দিকে ফিরিয়ে উদাসীন নিরুত্তাপ চোখে চেয়েছিল ও। হারের লকেটটা বুকের বাইরে এসে বালিশের প্রান্তে ঝুলে ছিল। সুমি একবার চোখ দুটি বন্ধ করে আবার চোখ ফেলে দেখল রাঘবের মুখ। তারপর বলল, নাঃ।

কেন ? না কেন ? গত রবিবারেও তো....

ভালোই লাগে না।

কেন ?

অত্ত বলতে পারব না। আজকাল এসব ভালোই লাগে না।

বল, আমাকে ভালো লাগে না, অন্য কেউ হলে, পরেশ হলে....

সুমি চোখের চকিত চাবুক মেরে বলল, যা মনে কর তাই। হয়তো, সত্যিই তোমাকে আর ভালো লাগে না। অনেকদিন তো হলো। একজনকে আর কতদিন ভালো লাগে।

আমারও তো সেরকম মনে হতে পারে ? কখনও।

হতে তো পারেই। আমি কি বলেছি যে, পারে না ? হয় না যে কেন, সেইটা ভেবেই আশ্চর্য লাগে। আচ্ছা, এই বিয়ে ব্যাপারটা কোন খারাপ লোক চালু করেছিল বল তো ?

গলায় একটু অভিমানের সুর লাগল রাঘবের। বলল, বেশ তো ! বেল্, তো যায়নি। পরেশের সঙ্গেই না হয়....আমি ডিভোর্স দিয়ে দেব। চাইলেই। এক কথায়।

না। আমি জানি তুমি খুব উদার। অন্তত দেখাতে চাও যে তাই।

তবুও না। আমার দরকার নেই। জীবনের আর বাকিটা আছে কি ?

এই ভগ্নাংশ নিয়ে কাকে পূর্ণ করতে যাব ? নিজেও কি হব ?

কেন ? না কেন ?

কাউকেই ভালো লাগে না আমার। মানে, লাগে। কিছুক্ষণের জন্যে, কিছুদিনের জন্যে। বেশিক্ষণ, বেশি দিন কোনও পুরুষকেই ভালো লাগে না।

এসব হয়েছে তোমাদের আর্থিক স্বাধীনতার জন্যে। যেই-ই তোমরা রোজগার শুরু করেছ, স্বাবলম্বী হয়েছ ; অমনি তোমাদের যত খারাপ-লাগা শুরু হয়েছে। এত বছরের

পরাধীনতার পর স্বাধীনতা ! তা নিয়ে কী যে করবে, তা ভেবে উঠতে পাচ্ছো না পর্যন্ত। আমার মা অথবা তোমার মায়ের কথা একবার ভাব তো ! কত সুখী ছিলেন তাঁরা।

সুমি হাসল। শ্লেষের হাসি। বলল, তা বটে। আমার বাবা ও তোমার বাবাও বোধ হয় এই ভেবেই খুশি থাকতেন। তাঁরা ছিলেন মেল শভিনিজিম্-এর শেষ ধ্বজাধারী। নিজেদের চোখকে চোখ ঠাওরাতেন। ভণ্ড ছিলেন ওঁরা। আমার মা কি তোমার মা মানুষের জীবনযাপন করেছেন কি ? কলুর বলদরাও তো ওঁদের চেয়ে স্বাধীন ছিল। সবকালে।

কিন্তু যাই-ই বল, কখনও দুঃখী দেখিনি। ওঁদের কাউকেই। এটা কি কম কথা ?

দেখার চোখ নেই পুরুষদের ! তাই-ই দেখোনি। হাজার হাজার বছর ধরে চোখ ব্যবহার না করায় তোমাদের চোখই খারাপ হয়ে গেছে। তা ছাড়া দুঃখবোধের ব্যাপারটাও একটা মিনিমাম শিক্ষা এবং কিছুটা ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসা থেকে হয়তো জন্মায়। যাকগে। তাঁদের জীবন তাঁদেরই ছিল। আমার কি ?

এ রবিবারটাও কি ঝগড়াই করবে ? রাঘব বলল।

করতে তো চাই না। হয়ে যায়।

এবারে নববর্ষে কি হবে ? তার তো পাঁচদিন মাত্র বাকি ! কাল অফিস থেকে বেরিয়ে ভাবছি তোমার জন্যে একটা শাড়ি কিনে আনব।

একদম না।

কেন ?

তোমার কেনা শাড়ি আমার পছন্দই হয় না। কত নতুন ডিজাইনের, কত রকম শাড়ি বেরিয়েছে আজকাল। কত যেন খোঁজ রাখো !

অ ! তা হলে আনব না। ঠিক আছে। তা হলে না হয় কুশলের জন্যেই আমাদের অফিসের কাছেই একটা দোকানে রিডাকশন সেল হচ্ছে, সেখান থেকে সস্তায় ভালো জিনিস নিয়ে আসব।

সারাটা জীবনই তুমি সস্তায় ভালো জিনিস খুঁজে মরলে। এই-ই তোমার জীবনের ট্র্যাজেডি ! সস্তায়, ভালো কিছুই পাওয়ার নয় যে এ সংসারে, এই সোজা কথাটা তোমার মগজে ঢুকল না। বরং নিজের একটা পায়জামা-পাঞ্জাবি কিনে এনো। নববর্ষের দিনে চন্দনার বাড়িতে একবার যাবে তো সেজেগুজে, নাকি ? এত ভালোবাসে তোমাকে !

রাঘব বিরক্ত হলো। বলল, যেতেও পারি। না যাওয়ার কী ! তা ছাড়া ভালো যে বাসে, সেটা তো মিথ্যে নয়।

সুমি চুপ করেই রইল। তারপর রেডিওটা খুলল আর একবার। খুলেই বন্ধ করে দিল। বলল, দুস্‌স····

কার নাটক ?

কে জানে ? নাটকের দোষ নয়। দোষটা আমার। মাঝে মাঝেই এরকম হয়। কোনও কোনও দিন। কিছুই ভালো লাগে না।

টেবিলঘড়িটা টিক্ টিক্ করছিল টেবিলের উপর।

রাঘব বলল, মিলিকে কালই একটা মানিঅর্ডার করে দেব ভাবছি। দেরি হয়ে গেছে অনেক। আসানসোলে। কমপক্ষে একশ টাকা পাঠানো উচিত, কি বল ? মিলির শাড়ি আর চুম্‌কির ফ্রকের জন্যে ?

আমাকেই যদি জিজ্ঞেস কর তো বলব পাঠানোর কোনওই দরকার নেই। তোমার ভগ্নীপতি অত বড় কোম্পানির পারচেজ ম্যানেজার, অমন দারুণ ফ্ল্যাটে থাকে, বছরে দুবার

করে ফ্যামিলি নিয়ে রাজার হালে বেড়াতে যায়, সবই বলতে গেলে নিখরচায়, তুমি কে বড়লোক এসেছ তাদের প্রত্যেকবার নববর্ষে প্রেজেন্ট দেবার ? তা ছাড়া তারা কি তোমার ছেলেকে কি আমাকে কোনওবারই কিছুমাত্রও দেয় ? গত পনেরো বছরে তো অনেকই করলে। পেলে কি ?

নাই-ই বা দিল ! রাঘব স্বগতোক্তির মতো বলল, এ তো বিনিময় নয়। কাউকে দেওয়ার মতো আনন্দ আর কীই-বা আছে ? কাউকেই দিতে মানা কোরো না। যতদিন পারি, দিই। ওরা বদলে কী দেবে, তা ভেবে তো দিই না ওদের। ছোট বোন ! সংসারে টাকাটাই তো সকলে বোঝে। কিন্তু টাকার চেয়েও বড় অনেক ব্যাপার আজও আছে। এবং আছে বলেই, এই নোংরা, কালি-ঝুলি মাখা, ঘুণধরা পৃথিবী চলছে। ওঃ ভালো কথা। রুমিকে কি পাঠানো যায় ? তোমার একমাত্রা বোনকে ?

না। একদম না। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা উঠিয়ে বোনের বিয়ে দিলাম। তারাই এখন বড়লোকী দেখায় আমার কাছে। বাকি জীবনে কারও জন্যে কিছুই করব না আমি। সত্যি বলছি, কারও জন্যেই না। পৃথিবীর চেহারা আমি দেখেছি।

রাঘব হেসে ফেলল। বলল, ঈসস্, জীবনানন্দ বাংলার মুখ দেখেছিলেন, আর তুমিও দেখলে ! একটু উঁচু হও সুমি, আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখো।

রাখো তো তোমার কবিত্বর কথা। কবিতা, অবিবাহিত ছেলেমেয়েদেরই জন্যে ! না, আমি তোমাকেও করতে দেব না। দেখি, তুমি কি করে কব ! আর কিছু দিয়ে দেখই একবার ! তোমাকে যে সকলেই কত বোকা ভাবে, তোমার এই বোকা-বোকা বড়লোকী নিয়ে যে হাসিঠাট্টা করে তোমার পেছনে তা বোঝার মতো ক্ষমতা তোমার থাকলে তো হয়েই যেত। কী আমার বড়লোক এসেছেন ! বড়লোকীর রকম আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি !

রাঘবের গলায় দুঃখ লাগল।

বলল, সকলেই হাসি-ঠাট্টা করে ? আমাকে নিয়ে ? কেন ? হবে হয়তো ! আজকাল ভালবাসা ব্যাপারটাই তো একটা ঠাট্টা হয়ে গেছে। দাদার ভালবাসা, জামাইবাবুর ভালবাসা বোধ হয় আর ভালবাসার ক্যাটেগোরিতেই পড়ে না। যাই হোক, তা হলে এবার নববর্ষে কি করবে ? নতুন বছরটা যে আসবে, তা তো বোঝাই যাবে না। নতুন তাঁতের শাড়ির গন্ধ, সন্দেশের প্যাকেট হাতে, সকালে উঠে চান করে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া, এসব না থাকলে তো····। দিনকাল সব কেমন বদলে গেল, না ?

মোড়ের ফুটপাথে একটা ফুলুরীর দোকান দাও। দিলে, খেরো-খাতা নিয়ে সাতসকালে কালীবাড়ি যেতে পারবে, পুজো দিতে, হালখাতার। তা হলে মনে হবে, কিছু একটা করলে। আমদানীও ভালো হবে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ ! ঘুষ না খেলে আজকাল সরকারী চাকরিতে আছেটা কি ? তোমার মতো লোকের বাঁ হাতে পক্ষাঘাত হওয়া উচিত। আকাট মূর্খ তুমি !

রাঘব কথা ঘোরাল। বলল, কি খাওয়াবে ? এই নববর্ষে আমাদের ? মানে, আমাকে আর কুশলকে ? রুমি আর চাঁদুকেও খেতে বলে দেবে নাকি ?

না। না। না। একেবারেই না।

তা হলে, আমাদেরই।

পোলাউ, মাংস, রুই মাছের কালিয়া, রাবড়ি, গিরিশের আম-সন্দেশ আরও যা বলবে। হীরে, মুক্তো সব খাওয়াব। বাজার তো দিনে হয় দশ টাকার।

ঠাট্টা করছ ? সেদিন নববর্ষের দিন না হয় কুড়ি টাকাই দেব। একটাই দিন।

ঠাট্টা ! ঠাট্টা কেন করব ? তোমার বাড়ি। তোমার টাকা। তুমি খাবে।

আমি ঠাট্টা করার কে ? যা দেবে, তার মধ্যে যা হবে, তাই খাবে।

তা দিও না। জগুর মা বলছিল, পটলের কেজি নাকি বাহান্ন টাকা। কারা খায় বল তো ? তীর্থে না গিয়ে একবার সেই লোকগুলোকে দেখতে যাওয়া উচিত মানুষের।

ঠাট্টাই করছ। বছরে একটা দিন তাও এরকম কর ? সত্যি। অনেক অনেক বছর হয়ে গেল তেল-কই খাইনি।

মিথ্যে কথা বলো না। গতবছরই জামাই ষষ্ঠিতে খেয়েছিলে। আর খাবে কি না কখনও তা অবশ্য বলতে পারছি না। মাইই চলে গেল। বাড়িটাই অন্যরকম হয়ে গেছে। দাদারা ব্যস্ত ; বড়লোক !

হঠাৎই গলা ধরে এলো সুমিতার। বলল, ওরা কেমন মানুষ সব বল তো ?

তুমি কী না করেছ ওদের জন্যে। সবই ভুলে গেল ? লজ্জা করে বড়ই আমার।

কই-এর কথা বলছ, মানে, আমার মা যেমন করে রাঁধতেন ?

না, না তোমার মা তো পোস্ত আর শর্ষে দিয়ে রাঁধতেন। তা নয়। তেল-কই। বেশ বড়, বুঝলে এই ইয়া বড় বড় কই, স্রেফ শর্ষের তেলে কালোজিরে-কাঁচালঙ্কা দিয়ে। সঙ্গে সামান্য ধনেপাতা। আঃ।

রাঁধবে কে ? আমি ওসব রাঁধতে জানি না। অত জম্পেস করে রান্না। যেসব মেয়েদের কোনও বাইরের কাজ করতে হয় না, তাদের পক্ষেই পোষায়। আমাদের পক্ষে ওসব সম্ভব নয়। তা ছাড়া, কইমাছ অত্যন্ত খারাপ মাছ। এই সময়ে খেলে চিকেন-পক্স বা মিজলস্ হতে পারে কুশলের। ও অন্যভাবে মানুষ। ইম্যুনিটি কম। আর কাঁটা ? অমন মাছ ভদ্রলোকে খায় না। ভদ্রলোকে খাবে রুই, কাটা-পোনা, বড় মাগুর, গলদা কী বাগদা চিংড়ি। ম্যাক্সিমাম চলতে পারে, পাব্‌দা। একটাই কাঁটা তো। কুশল তো কোনও মাছ খেতেই পারে না। মাছ খেতে চায়ও না। বোন্‌লেস চিকেন শুনে শুনে বলে, মা বোন্‌লেস ফিশ দাও।

বোন্‌লেস ফিশ ! রাঘব অবাক গলায় বলল।

রাঘবের মাঝে মাঝে সবই গোলমাল হয়ে যায়। ওদের ছোটবেলায় সব কিছুই কত অন্যরকম ছিল। ফ্রী-স্কুল স্ট্রিটের বাসিন্দাদের হেদোর ছেলেরা খ্যাপাতো : "ড্যাডী। ড্যাডী। ছাপ্পর-পর্ পীজন্ বৈঠে বৈঠে। "কান্ট্, শান্ট্" করে সে ছোঁড়ারা ইংরিজি বলত। আজ তার একমাত্র ছেলে কুশলও প্রায় সেই "ছাপ্পর্-পর পীজন্ বৈঠের" সংস্কৃতিরই হয়ে গেল। বইমেলায় তিনদিন ওকে নিয়ে গেছিল রাঘব। পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও, একটিও বাংলা বই কিনল না। রাঘবের ছেলে, বাংলা বই পড়ে না, কইমাছ খেতে পারে না····। দুস্‌স শালা। এমন সাহেব ছেলের দৌলতে নিজেই বি-এন-জি-এস হয়ে গেল। কী পরিহাস ভাগ্যের। ছোটবেলায় ওরা বলত বি-এন-জি-এস। অর্থাৎ বিলেত-না-গিয়ে-সাহেব !

রাঘবের খুবই রাগ হলো হঠাৎ। কুশলের উপর। কিন্তু আসলে দোষটা তো ওদেরই ! দোষ তো বাবা মায়েরই। তাদের ছাড়া আর কার ? যে ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষায় ভালো করে কথা বলতে পারে না, মাতৃভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে যারা কোনও খোঁজই রাখে না, যারা বাংলা গান পর্যন্ত ভালবাসে না সেইসব কলকাতাবাসী বঙ্গসন্তানদের বাবা-মা হিসেবে ওদের তো লজ্জা রাখার সত্যিই জায়গা নেই। বড়জামদা, ভুবনেশ্বর, ভোপাল, মাদ্রাস, এটাওয়া. ইতারসিতে যে-সব বাঙালী বাবা-মা অত্যন্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুযোগের অভাবে

ছেলেমেয়েদের হাতে বাংলা বই তুলে দিতে পারেন না, পারেন না বাংলা খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক বা মাসিক ; তাঁদের কথা আলাদা। তাঁদের দোষ ক্ষমা করা যায়। দোষটা তাঁদের আদৌ নয়। দোষ কলকাতার বাঙালীদেরই, যাঁরা তাঁদের হাতে বাংলা পত্র-পত্রিকা, খবরের কাগজ পৌঁছে দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করেন না। কিন্তু রাঘব আর সুমির দোষ ?

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। বিশেষ কারণ না থাকলে দুপুরে দরজাতে খিল তোলে না ওরা।

সুমি বলল, কে রে ? জগুর মা ? কুশল ?

হ্যাঁ মা। কুশল বলল। মে আই কাম্ ইন ?

আয় !

আই হ্যাভ আ প্রবলেম্।

কি ?

একলা বৈশাখ মানে কি মা ? এন্ড হোয়াট ইজ বৈশাখ ? তিনরা আষাঢ় মানেই বা কি ?

সুমি একবার রাঘবেব দিকে তাকাল।

রাঘব মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করল।

সুমি বলল, এক্‌লা নয়, কুশু, কথাটা পয়লা। মানে প্রথম। লেখা হয় ঐভাবে। মাসের প্রথম তারিখকে বলে পয়লা। তিনরাও নয়। ওটা বাংলায় লেখা হয় ৩রা করে, কিন্তু উচ্চারণ হবে তেস্‌রা। অর্থাৎ তিন তারিখ। আষাঢ়ের তিন তারিখ।

ফানী !

বলল, কুশল। তারপর বলল, হোয়াট ইজ বৈশাখ, মা ?

বৈশাখ একটা মাসের নাম বাবা। আমাদের বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস হচ্ছে বৈশাখ। এবং পয়লা বৈশাখ হচ্ছে আমাদের নববর্ষ, মানে নিউ-ইয়ার।

ডোন্ট বী সিলী মা ! নববর্ষ তো ফারস্ট জানুয়ারি। তুমি আমাকে মিছিমিছি বলছ !

না কুশু। মিছিমিছি বলিনি।

আমি যাচ্ছি। অধৈর্য গলায় কুশল বলল।

তুমি কি করছিলে ?

হুইজ-বিজ্ পড়ছিলাম 'দ্যা টেলীগ্রাফের'। দারুণ লাগে আমার টেলীগ্রাফ। শুধু রবিবারে না রেখে রোজই রাখ না কেন মা ? তোমাদের আনন্দবাজারের নামটাই কেমন বাজার বাজার। বন্ধ করে দাও।

রাঘব বলল, কুশু, আনন্দবাজার, শুধু একটা খবরের কাগজই নয়, আমাদের দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন এই কাগজ অন্য আরও কিছু কাগজের সঙ্গে, আমাদের স্বাধীন করতে সাহায্য করেছে। আনন্দবাজার বাঙালীর জীবনের সঙ্গে মিশে রয়েছে। ছাপা ঝক্‌ঝকে বা কাগজ সাদা হওয়ার চেয়েও আরও অনেক বড় ব্যাপার থাকে কুশু। তুমি বড় হয়ে বুঝবে। জানি না বুঝবেই কি না। হয়তো বুঝবে।

কুশল চলে যেতে, রাঘব সুমির মুখের দিকে চাইল।

বলল, তোমাদের স্কুলের সব ছেলেমেয়েই কি এরকম ?

তা কেন হবে ? বাড়িতে আমরা যদি একটুও ওকে নিয়ে না বসি, আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের গান সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকেই ইন্টারেস্টেড না করে তুলতে পেরে থাকি, তা হলে দোষটা কার ? ওর ? না আমাদের ?

তুমি কি বসতে পারতে না ওকে নিয়ে ? নিজে টিচার হয়েও ? দুদিন পর অ্যাসিস্ট্যান্ট

হেডমিস্ট্রেস হবে তুমি।

না। আমার স্কুলের বকবকানীর পর রান্নাবান্নাতেও কিছু সাহায্য তো করতে হয়। রান্না ছাড়াও অনেকই কাজ থাকে। তুমিই একমাত্র পারতে। তা নয়, অফিস থেকে এসে তাস পিটতে যাবে। ইংরিজী, জার্মান, অ্যামেরিকান আর্টফিল্ম দেখতে যাবে। ছেলের জন্যে দেওয়ার সময় কোথায় তোমার? তুমিও তো একজন ইন্টারন্যাশনাল পার্সোনালিটি। ছেলে বাঙালী হলো না বলে তোমার দুঃখ করা মানায় না।

রাঘব উত্তর না দিয়ে উঠে বসল বিছানাতে। অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বলল, আমি যা দেখছি, এই ভাবে চলতে থাকলে, পঞ্চাশ বছর পরে বাঙালী বলে কোনও জাতই বোধ হয় আর থাকবে না। যে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী এতদিন আমাদের সংস্কৃতি সাহিত্য, সংগীত সব কিছুকেই বাঁচিয়ে রেখেছে, তারা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

যাবে। সুমি ওর হারের লকেটটা চিবোতে চিবোতে বলল। যারাই ছেলেমেয়েদের ভালো চাকর বানাতে চায়, বেশি টাকা রোজগারের মেশিন করতে চায়, ব্রিফ-কেস হাতে, টাই-পরা চাকর মেয়েদের বেশি রোজগেরে ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়, তারাই ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ছেলেমেয়েকে পড়াতে পাঠাবে। তারা বাংলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে না কখনওই। বাবা মা যথেষ্ট ইন্টারেস্ট না নিলে।

রাঘব বলল, ইংরিজির মতো রিচ ভাষা তো হয় না। আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা কি আমাদের চেয়ে কম ভালো ইংরিজি জানতেন? কিন্তু ইংরিজি মিডিয়াম স্কুলে পড়লেই যে ইংরিজিয়ানা শিখতে হবে এ কথা আমি বিশ্বাসই করি না। তোমরা যে শিক্ষা ছেলেমেয়েদের দিচ্ছ, তাতে কাঁটাচামচে নিখুঁতভাবে খেতে পারা আর শিক্ষিত হওয়া ব্যাপারটা সমার্থক হয়ে যাচ্ছে। এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার।

সাংঘাতিকই। কিন্তু তোমার এই হঠাৎ কনশাসনেস হঠাৎ জ্ঞান ভালো লাগছে না আর। বলিনি, শরীরটা ভালো নেই আমার।

হ্যাঁ।

নববর্ষের দিন কি মাছ খাবে বল। জগুর মাকে বলে রাখব।পটলাকে বলে আগের দিনই

চৈত্র সংক্রান্তির দিন সব বাড়িঘর পরিষ্কার টরিষ্কার করবে না? মনে আছে মা ও বাবা প্রতি বছর ঐ দিন বাজার করতে বেরুতেন। দাদুর ফতুয়া বাড়ির পাপোষ কুকুরের বকলেস। নতুন বছর, নববর্ষ যে আসছে বেশ বোঝা যেত। আমাদের সকলের জন্যে নতুন জামা।

নববর্ষের দিন কি মাছ খাবে বল?

ঠাণ্ডা নৈর্ব্যক্তিক গলায় সুমি আবার বলল। কইমাছ?

না। থাক। রাঘব বলল বৈশাখ সত্যিই একলা হয়ে গেছে। একলা বৈশাখে কিছুই করার দরকার নেই। যা কিছু করার সব একলা জানুয়ারিতেই কোরো।

সুমি তখনও লকেট চিবোচ্ছিল।

ননশালান্টলি বলল, যা তোমার ইচ্ছে। তাই ই হবে। রাঘবের মনে হলো সুমি যেন বেঁচে গেল একলা বৈশাখ, কাঁটাওয়ালা কই এবং তারও উপর কালো জিরে কাঁচালঙ্কা ধনেপাতা দেওয়া তেল-কইয়ের অত্যাচার থেকে। কোলেস্টেরোল, বাজে খরচা। ঝামেলা

রাঘব জানে যে "একলা বৈশাখে"র দুপুরে হট সসেজ এবং পাঁউরুটি নয় শাক এবং পোর্ক-ভিণ্ডালু, রাঁধবে জগুর মা। সুমির অর্ডার মতো। ইদানীং বীফও আনাচ্ছে মাঝে মাঝে। কারণ অকাট্য। সুমি বলছে, ফাস্ট-গ্রোয়িং ছেলে কুশলের জন্যে চীপেস্ট প্রোটিন।

দিনকাল যা পড়েছে ! উপায়ই বা কি ? একলা একলা থেকেও এই-ই অবস্থা সকলের !

বৈশাখ, পয়লা বৈশাখ হয়তো সব বছরই আসবে ঘুরে ঘুরে, কিন্তু সকালে স্নান-করা কোরা তাঁতের শাড়ির গন্ধে-মোড়া, উজ্জ্বল মরকতেনের মতো ঢলঢলে মুখের, ভেজা চুলের বাঙালী মেয়েদের আর বেশিদিন দেখা যাবে না । গুরুজনদের বাড়ি সন্দেশের প্যাকেট হাতে করে প্রণাম করতেও যাবে না কেউ।কাঁটা-ওয়ালা মাছ, এবং তেল-কই রান্না হবে না কারোর বাড়িতে ।

বোনলেস্ চিকেন, বোনলেস্ ফিশেরই মতো, বাঙালী জাতটাই একটি বোনলেস্ জাত হয়ে গেছে, যার কোনও নিজস্বতা আর অবশিষ্ট নেই ।

পরী পয়রা

ডানদিকে শাল আর চাল্লার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে ন্যাশনাল হাইয়ের দিকে। সেখানে গিয়ে উঠলে সোজা লোধাশুলি। আরও এগিয়ে গেলে শালবনী। ঝাড়গ্রাম।

মুঠিয়া জায়গাটা, বাংলা আর ওড়িশার সীমান্তবর্তী। পয়রা পদবীটা শহরের লোকের বিশেষ পরিচিত নয়। এই পয়রাদের কাজ স্যাকরাদেরই মতো। গাঁয়ে-গঞ্জেও স্যাকরা থাকে।

মদন পয়রা, পরীর বর। বয়সে বছুর বারোর ব্যবধান দুজনের। মদন বাড়ি বসে গয়না বানিয়ে নিয়ে বালেশ্বরে বড় মহাজনের দোকানে অডরী গয়না সাপ্লাই করে কখনও-সখনও নিজের পছন্দসই ডিজাইনের গয়না নিয়ে বাংরিপোসি আর ঝাড়ফুকুরিয়ার মধ্যে সপ্তাহে যে একদিনের হাট লাগে সেখানে গিয়ে বেচে আসে। তবে সে হাটে বিকোয় রূপোর গয়নাই বেশি। সরু কোমরের, করৌঞ্জ আর নিমের তেল-মাখা তম্বী মেয়েরা আসে মাঝবয়সী কালো কবুতরের মতো। বুকের আর বগলতলির ঘামের গন্ধে ছেয়ে যায় হাট, মুরগী আর মুরগীর ডিমের আঁশটে গন্ধের সঙ্গে মিশে।

শেষবেলা অবধি কেনাবেচা করে জঙ্গলের পথ ধরে অনেকখানি এসে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে মুঠিয়া গ্রামে ফেরে মদন রাতের বেলা। কখনও চাঁদ থাকে। কখনও থাকে না। গ্রামের সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁড়িয়া-খাওয়া-সুখে অতখানি পথ যেন উড়েই আসে মদন। শরীর তখন পাখিব শরীর হয়ে যায়। রাত-পাখির মতো। বসন্তর বনের হাওয়া শালের পাতায় ফুরফুর করে তার শরীরেও। যেন পালকে ভরে গেছে বলে মনে হয় শরীর।

মদনকে মুঠিয়া গ্রামের অনেকেই হিংসে করে। বিঘে পাঁচেক ডাঙা জমি। পঁচিশ বিঘা ধান-জমি। তদুপরি এই সোনা-রূপোর ব্যবসা। কিন্তু এইসবও কিছু নয়। হিংসে করে পরীর জন্যে। ডানা-কাটা পরীরই মতো রূপ ছিলো পরীব। এখন তিরিশে এসে সে রূপে বান ডেকেছে।

সোনা রূপোয় মুড়ে রাখে পরীকে মদন তবু পরীর মন পায় না। ছেলেমেয়ে নেই ওদের। তার জন্যেও দুঃখ নেই মদনের। যদি বুঝতে পারতো একটিবারেরও জন্যে, পরী কি চায় তার কাছ থেকে? কিসে তার সুখ? তবে বর্তে যেতো সে।

ও যা কিছু চায়, সবই পরী দেয় তাকে। যা খেতে ইচ্ছে হয়, রেঁধে দেয়। যখন আদর করতে ইচ্ছে করে, আদর করতে দেয়। যেমন করে চায় ও তেমন করেই দেয়। অনেক

পুরুষ বন্ধুদের কাছে মদন শোনে তাদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে নানা অনুযোগের কথা। গণেশ কোকশাস্ত্রর বই এনে দিয়েছিলো একটা কোলকাতা থেকে। কামশাস্ত্রর ছবিওয়ালা বইও। সব ছবিকেই ও তার শোবার ঘরের বিছানার ফ্রেমে বাঁধিয়েছে একবার বা একাধিকবার। পরীর কিছুতেই আপত্তি নেই।

কিন্তু সব দিয়েও পরী যেন কিছুই দেয় না মদনকে। কী যে সে তার নিজের কাছে রাখে, তা বুঝতে পারে না মদন তার সব বুদ্ধি দু-হাতে জড়ো করেও। বুঝতে পারে না বলেই জ্যৈষ্টের দুপুরের চড়াই-এর মতো ছটফট করে। পরী কথা বলে না আদর খাওয়ার সময়ে। বিলিতি পুতুলের মতো মদনের কথামতো কাজ করে যায়। তখন পরীর মুখে এক আশ্চর্য হাসি লেগে থাকে। প্রদীপের পলতে নয়সে হাসি। ভালোবাসার হাওয়া লেগে তা বাড়ে-কমে না। ইলেক্‌টিরির বাল্বের মতো স্থির সমান উজ্জ্বলতায় জ্বলতে থাকে তা। মাঝে মাঝেই মদনের মনে হয় যে, তার কোনো মানুষীর সঙ্গ বিয়ে হয়নি , বিয়ে হয়েছে কোনো সত্যি পরীরই সঙ্গে। যে-পরীরা গা-ছমছম্ জ্যোৎস্না-রাতে শালের বনে কী সুবর্ণরেখার সোনার মতো বালুভূমিতে খেলে বেড়ায়। মেয়ে মানুষটার বুক চিবুক দু-হাতের মধ্যে নিয়ে, তার নিঃশ্বাসের মিষ্টি গন্ধে নিজের বিড়ি-ফোঁকা দুর্গন্ধ মুখ সুগন্ধি করে তুলেও মেয়ে মানুষটার মনের কাছে কোনোদিনও আসতে পারেনি গত পনেরো বছরে।

পরী রাতের পর রাত তাকে বনের পরীর মতো কুহকের রাজ্যে নিয়ে যায়। সর্বস্বান্ত হয়ে মদন পয়রা হাহাকার করে। যাকে অন্য যে-কেউই সুখের চরম বলে জানতো, তা পেয়েও মদন বুঝতে পারে, সুখের বাড়ি অনেকদূরে।

পরীর কোনো দোষ নেই। শরীরে কোনো রোগ নেই। সৌন্দর্যে কোনো খুঁত নেই। তার গায়ের চামড়া জলপিপিরগায়ের মতো উজ্জ্বল। অথচ কুসুমফুলের মতো নরম লাল। পরীকে সুবর্ণরেখা নদীর বালির মতো নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখেও তার মনের সোনার এক কণাও তার নখে তুলতে পারেনি মদন।

দোষ বলতে একটাই। প্রতিবছর বসন্তর রাতে, দোলের চাঁদের পনেরো দিন আগে থেকে পরীকে যেন পরীতে পায়। চাঁদ যত বড় হতে থাকে পরীর পাগলামি ততই বাড়ে।

রাতের বেলা সে দরজা খুলে বেরিয়ে গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে সুবর্ণরেখার দিকে চলে যায়, যেখানে অসমসাহসী পুরুষও একা একা যেতে সাহস পায় না গভীর রাতে। মজা এইই যে, ঠিক সেই সব দিনেই মদনকে ঘুমে পায়। পরী শেষরাতে যখন নদী থেকে ফিরে আসে তখন ওর ঘুম ভাঙে। আর যখন যায়, তখন গভীর ঘুমে মড়ার মতো পড়ে থাকে। ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে মদন এই পনেরোদিন রাত নামলেই একাধিকবার আদর কর পরীকে। তৃপ্ত নারীর ঘুম সাপের কামড়ও টের পায় না এ-কথা কে-না জানে! তবু পরী তারপরও ঠিক বেরিয়ে যায় মদন যা কিছু চায় সব দিয়ে তারপরও পরীর অনেকই উদ্বৃত্ত থাকে। সেই উদ্বৃত্ত সে কোথায় কার জন্যে যে বয়ে নিয়ে যায়, নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে ; সে এক গভীর রহস্য।

পরী গত পনেরো বছরে দিনে গড়ে পনেরোটি কথাও বলেনি। পাঁচ প্রশ্নর উত্তর একটি 'হাঁ' অথবা একটি 'না'-তে সারে। মুখে সেই ইলেক্‌টিরি বাল্বের হাসি লেগে থাকে সবসময়ই। বাড়া-কমা নেই কোনো।

পরীর বাড়ি যে গ্রামে, সেই গ্রাম নদীর ওপারে। সেই গ্রামে এক মাতাল গেঁজেল জুয়াখেলায় সর্বস্ব-খোয়ানো-পুরুষের বাস। সে মদনেরই বয়সী হবে নাম তার খেয়ালি। খেয়ালির সব কিছুই গেছে। গ্রামের কোণের এক পড়ো-পড়ো কুঁড়েতে তার বাস। মাধুকরী

করে খায় সে। সবই দোষ। গুণের মধ্যে সে, গান গায়। সে গানও কাউকে শোনাবার জন্যে নয়। কেউ শুনতেও চায় না। বনে বনে, দিনে রাতে, সেই একা পাগল গান গেয়ে গেয়ে ফেরে।

কানাঘুষোয় শুনেছিলো মদন যে, ছেলেবেলায় পরীর সঙ্গে তার ভাব ছিল খুব, পরীর মা যতদিন বেঁচে ছিলেন। মদন এও শুনেছিলো যে, পরীর বিয়ের পর থেকেই খেয়ালি মানুষটা অমন হয়ে যায়। দাবা খেলে, যুধিষ্ঠিরের মত সব খোয়ায় একে একে। মন দিয়ে খেললে ওকে হারাতে পারে এমন লোক কমই ছিল দশটা গাঁয়ে। কিন্তু মানুষটা হারবে বলেই পণ করে যেন খেলতে বসতো। তারপর নেশা শুরু করে।

খেয়ালির সঙ্গেও পরীর বিয়ে হতে পারতো। কিন্তু জাতে তারা ছিল মুচি। মরা পশুর চামড়া শুকিয়ে তা দিয়ে জুতো বানাতো। যে-ঢোল মন্দিরে বাজে, সেই ঢোলের চামড়া আসতো তাদেরই ঘর থেকে, যে-খোলে ঠাকুর-দেবতার নাম-কীর্তন হয় সেই খোলের চামড়াও আসতো তাদের বাড়ি থেকেই ; তবু অন্যের চোখে তারা জাতে নিচু।

পরীরা ছিল স্বর্ণকাব। দেবীর গয়না বানাতো তার বাপ। তার মেয়ের সঙ্গে খেয়ালির বিয়ে হলে সমাজে ঠাঁই দিতো না কেউই তাদের। তাই পরীর বিয়ে দিয়েছিলো বাপ খগেন. পাল্টি-ঘরে মদনের সঙ্গে।

বড় অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে এই পরী। বাপকে অমান্য করেনি। কিন্তু বিয়ের পর একদিনের জন্যেও আর বাপেরবাড়ি যায়নি। পা দেয়নি বাপের গাঁয়ে। অনেক ঝুলাঝুলি সাধাসাধিতেও না। শুধুই হেসেছে। ইলেক্‌টিরি-হাসি।

মায়ের মৃত্যুতেও তাকে কেউই নিয়ে যেতে পারেনি! নিজ-গাঁয়ে মরা-মায়ের মুখ দেখতে। সুবর্ণরেখার জলের পাশে সে তর্পণ আর কাজ সেরেছে। নদীব এপাশে।

বড় অদ্ভুত চরিত্রের মেয়েছেলে বটে!

সকলেই বলে এ কথা।

মদন কিন্তু বড় ভালবাসে তার পরীকে। শুধু ছট্‌ফট্‌ করে মরে সব সময়ে যা, পরী তাকে দেয়নি ; তা পাবার জন্যে। প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল মাটির ঘরে শালকাঠের তক্তপোষের ওপর শিমূল তুলোর তোষকের ওপরে বিছানো খড়্গপুর থেকে কিনে-আনা ফুলকাটা নরম বিছানার চাদরের ওপর পরীর পাশে শুয়ে পরীকে বার বার বলে, তুমি আমার হও. পরী, তুমি আমার! তোমাকে পুরোপুরি দাও আমাকে, একটুও বাকি না-রেখে। পরী মুখে সেই ইলেক্‌টিরি হাসি হেসে খাট থেকে নেমে শায়া আর লালপেড়ে শাড়ি খুলে আলনায় রাখে। তারপরে তার হাঁটু-সমান চুলের অর্ধেক সামনে এনে জঘন ঢাকে। অন্যপাশ থাকে পেছনে। নিতম্ব ছেয়ে। পরীর হাসি বলে, এই তো আমি! নাও আমাকে। নাও! না-বলে বলে, এর চেয়েও বড় পাওয়া বলে অপর কিছুকি জানে পুরুষেরা?

নেয় মদন। খাট থেকে নেমে তাকে কোলে করে তুলে এনে শোওয়ায় খাটে। আঁতিপাঁতি করে পরীর শরীরের সব রহস্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। কিন্তু পরীর শরীরের আড়ালে যা থাকে, কিছু কি থাকে? যা মদন পেতে চায়, তা একদিনের জন্যেও পায় না।

পরী হেসে বলে, এই তো আমি!

এই তুমিই কি সবটুকু তুমি?

আর কী বাকি আছে আমার মেয়েদের শরীরই তো সবটুকু। আর কী!

আর কিছু নেই?

আর কি?

তুমি আমার নও।

তবে আমি কার? এতভাবে এতবার দিয়েও কি দেওয়া হল না?

না, না। তুমি কী যেন লুকিয়ে রাখো। কী যেন দাও না আমাকে পরী।

আর কিছু নেই। একজন মেয়ের যা-কিছু আছে, থাকতে পারে, সবই তো পেয়েছো। আর কি চাও?

তা আমি জানি না। শুধু জানি যে, তুমি তোমার মধ্যে যে আর একজন আছে তাকে লুকিয়ে রাখো সব সময়। তাকে দাও না কখনও আমকে।

একদিন পরী মদনকে বলেছিলো, তুমি অহল্যার গল্প জান তো? আমরা মেয়েরা, এ দেশের সব মেয়েরা, অহল্যারই মতো পাথর হয়ে গেছি।। তোমাদেরই চোখের অভিশাপে। শরীরের পাথরেই আমাদের বাস। তোমদের বীর্য ধারণ করি জরায়ুতে। গর্ভে তোমাদের সন্তান। আবার তা ফিরিয়ে দিই। তোমাদেরই ফিরিয়ে দিয়ে তোমাদের অসম্পূর্ণ দান সম্পূর্ণ করি আমরা। রেঁধে খাওয়াই। রোগে সেবা করি। তোমরা মরে গেলে মাথার চুল কেটে ফেলি। নিরামিষ খাই। জীবনের এক আকাশ আলোকে নিভিয়ে দিয়ে সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকি। এইই তো তোমরা চেয়েছিলে চিরদিন। এই চেয়েছিলে বলেই এর চেয়ে বেশি কিছু চেয়ে আমাদের বিব্রত করো না কষ্ট দিও না।

এতো কথা মদন কিংবা পরী পয়রা দুজনের কেউই স্পষ্ট করে বলে না। এমন ভাষাও তাদের নেই। তবে চোখ বলে। চোখ যা বলে তা কি মুখ কোনো দিনও বলতে পেরেছে?

আজ চতুর্দশী। পলাশ শিমূল কুসুমের ফুল আর পাতা সেদ্ধ করে ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা রঙ বানিয়েছে। কাল সকালে দোল খেলবে বলে। শটি আর রঙ মিশিয়ে আবীর বানানো হয়ছে ঘরে ঘরে। হরিসভায় দোলোৎসব হবে রাতে। ঘরে ঘরে মিষ্টি বানানো হয়েছে। রঙ দিতে আসা ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেবে বলে। গাঁয়ের পাড়াতুতো দেওর আর বৌদিদের চোখে ঘুম নেই কাল সকালে দোলের অছিলায় স্পর্শ সুখের শিহরিত আনন্দের স্বপ্নে। পরীর পাগলামি আজ তুঙ্গে। মদন তার বেয়াল্লিশ বছরের যৌবনের সবটুকু নিংড়ে দিয়ে প্রথম রাত থেকে বহুভাবে আদর করেছে পরীকে। আজ পরীকে সে আদরের স্যালাইন ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াবেই। পরীকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে এখন নিজেই মরা মানুষের মত ঘুমিয়ে আছে মদন। পুরুষের ভূমিকা, ফুরিয়ে যাবার, দাতার ; নারীর পূর্ণ হবার, গ্রহিতার।

রাত এখন অনেক। নদীপারে শেয়াল ডাকছে। শাল, মহুয়া আর করৌঞ্জ-এর গন্ধে মাতাল হয়ে হাওয়া ঝড় তুলেছে চাঁদের বনে বনে। ঘরের মধ্যে প্রদীপের পলতে কাঁপছে ঘরে-ঢোকা দামাল হাওয়ায়।

নগ্না পরী বিছানা ছেড়ে নামলো। তার এলোকেশী নগ্না শরীরের ছায়া প্রদীপের দেওয়ালে নড়ে উঠলো। শুধুমাত্র শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে দরজার খিল খুলে বেরিয়ে পড়ল পরী। একটা খরিশ-কেউটে হিস্-হিস্ করে চলে গেল প্রায় পায়ের ওপর দিয়েই। কামড়ালো না। ভাল হতো কামড়ালে। এই স্থির-হয়ে থাকা ইলেক্‌টিরি-হাসির জীবনে, পচা-পানায় ভরা, সমান-সুখের একঘেয়ে জীবনে, তবু কিছু হঠাৎ-জ্বালার সুখ অথবা বিষ চারিয়ে যেতো।

পরী ভাবছিলো, সুখ মানেই তো বিষ। এই সমাজে। বিষের মতই পরিত্যাজ্য সব সুখ, যা, চামচে-মাপা ; স্বামী-দত্ত নয় ; সব সুখ। এই সমাজ সংসারের কৃপণ হাতের কুন্‌কো-ঢালা সুখ। ভারী ইচ্ছে করে, একদিন সাপের কামড় খেয়ে দেখতে। এই

খরিশ-কেউটেও তো এই পয়রা গ্রামেরই সাপ । ভুল লোককে ভুল করে সাপও কামড়ায় না এখানে । হিঃ !

কুকুর ডেকে উঠল । শুঁড়িদের বাড়ির একটা মদ্দা আর একটা মাদী ওর পিছু নিলো । কিছুটা । তারপর আর সাহস পেলো না । গ্রামের কুকুরগুলোও সাপটারই মতো । নতুন জায়গায় যেতে, নতুন কিছু করতে ভয় পায় ।

পরী চললো, আঁচল লুটিয়ে ; সুবর্ণরেখার দিকে । শাল বনের গভীরে আসতেই এবার তার মনে হতে লাগলো যে, সে সত্যিই পরী । সত্যি সত্যিই পরী হয়ে যাচ্ছে পরী পয়রা ! আঁচলের জায়গায় তার ফিনফিনে কুসুমের পাতার মত পাতলা আর কুসুম-লাল ডানা গজিয়ে গেছেমস্ত দুটি । উড়ে চললো পরী । তার স্বামীর আদরে আদরে পুরনো হয়ে-যাওয়া শরীর, তার সকাল থেকে সন্ধ্যের নিয়মবদ্ধ জীবন, সব পেছনে ফেলে এসে সে যেন সদ্য ঋতুমতী কোনো পঞ্চদশী হয়ে গেল । অচুম্বিতা, অনাঘ্রাতা, প্রত্যাশাতে ভরপুর । উড়ে এলো একেবারে সুবর্ণরেখার মধ্যে । যেখানে বড় বড় কালো কালো পাথর আছে সোনালী বালির মধ্যে চতুর্দশীর চাঁদের আলোয় বালি এখন রূপোলি ।শাড়ি খুলে ফেলে সেই পাথরের স্তূপের ওপর পায়ের ওপর পা রেখে বসল পরী ।

হু-হু হাওয়া আসছে তাদের গ্রাম থেকে । খেয়ালি, কী করছে কে জানে ? এত বছর এই দোলের আগের চাঁদের রাতে পরী এখানে এসে বসে শুধু সেই মানুষটা আসবে বলে । আহা ! কী তার গলা । গানের কী ভাব ! পরীর জন্যেই এমন করে নষ্ট হয়ে গেলো মানুষটা সর্বস্বান্ত । দুবেলা দু'মুঠো ভাতও জোটে না খেয়ালির । অথচ পরীর কিছুই করবার নেই । ও পেটপুরে খায় । ভাল শাড়ি পরে কোমরের পৈঁছা থেকে গলার সীতাহার । পায়ের পায়জোর, নাকের নথ সবই পরে । যেন, সোনা দিয়েই পেট ভরে একজন মানুষীর । হয়তো ভরে ! যাদের ভরে, কারো কারো । পরী তাদের মত নয় । তার মনের মানুষটার জন্যে যদি একটু কিছুও করতে পারতো ! মানুষটা যদি একবারও এসে সামনে দাঁড়ায়, পরী পয়রা তার স্বামীর দেওয়া শাড়িটা পর্যন্ত এই বালিতে ছেড়ে রেখে তার হাত ধরে নিরাবরণ হয়ে চলে যাবে, সে যেখানে নিয়ে যাবে । সেই নরকে ।

অনেক অনেক বছর আগে এক দোলের রাতে, গোয়ালঘরের পাশে দাঁড়িয়ে, গরুর গায়ের গন্ধ, গোবরের গন্ধ, চোনার গন্ধ আর জাবনার গন্ধের সঙ্গে মিলে-যাওয়া দোল পূর্ণিমার রাতের সব্ গন্ধর মধ্যে খেয়ালি, চোদ্দ বছরের পরীকে চুমু খেয়েছিলো তাদের গ্রামে । বঞ্চিত চুমু । চুরির চুমু । ব্যথার চুমু । প্রেমের চুমু । সেই রাতেই পরী জেনেছিলো প্রথম ও শেষবারের মত যে পরীর মধ্যে এক অন্য পরী আছে ।

সে আর এলো না । কোনোদিনও আসেনি । কই আর এলো ? আসবে না, জানে । যারা পরীদের ডানা গজাতে জানে, যাদের ঠোঁটে কুসুম ফুলের মসৃণতা, যাদের গলায় পাগল-কোকিলের গান, সেইসব পুরুষ, নারীর জীবনে ক্ষণিকের জন্যেই আসে। এসেই, পরক্ষণেই হারিয়ে যায় । দূর থেকে পুলক ভরে ডাক পাঠায় বাসন্তী হাওয়ায় । চেয়ে থাকে, সন্ধেতারার চাউনি হয়ে । দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চৈত্রের দুপুরে শালের বনে । কিন্তু তারা জীবনে আসে না ।

পরী পয়রারই মত সব নারীরই জীবন. সব নারীরই শরীর, মদন পয়রাদেরই জন্যে । অভ্যেসের খোঁটায় বাঁধা গরুর মতো সুখের জাবনাতে জাব খায় তারা । খরিশ কেউটের কামড় তাদের জন্যে নয় ।

পরী জানে ।

তবু পরী পয়রা এও জানে যে, অভ্যেসের বাঁধন এখনও তাকে পুরোপুরী বাঁধতে পারেনি। পরীর ভেতরের পরীর ডানা দুটি এখনো বছরের এই কটি দিনে জল-ফড়িংয়ের ডানারই মত ফর্‌ফর্‌ করে ওঠে। বাঁধন ছেড়ে উড়ে যেতে চায় ; সব নারীর মধ্যেই যে দ্বিতীয় নারী থাকে, সে গ্রীষ্মবনের ক্ষয়েরী তিতিরের মতো ছট্‌ফট্‌ করে উঠে বলতে চায়, এ নয় গো ! এ নয় ! জীবনের মানে এ নয় ! বাঁচার মানে এ নয় !

পরী জানে যে, এ দেশের সব পরীরই মুক্তির আরও অনেক অনেকই দেরি আছে। খেয়ালিরাও তো পুরুষই ! নারীকে মুক্ত করতে পারে, পরীর মধ্যের পরীকে ডানা মেলে উড়তে দিতে পারে, একমাত্র পুরুষের মত পুরুষরাই। মদন পয়রাও নয়, খেয়ালি মুচিও নয়। প্রথমজন প্রেমের কিছু বোঝে না দ্বিতীয়জন প্রেমে যে সাহসের দরকার তা রাখে না। যে-দেশের পুরুষেরা এমন সে দেশের পরীরা সন্ধ্যেতারার দিকে চেয়ে চেয়েই চিরদিন দিন গুনবে।

ডান পা-টাকে এবার বাঁ পায়ের ওপরে করল পরী। নিজের অনাবৃত উরুর ওপর অন্য উরুর পরশে শিহর লাগল। আরও একটু বসে থাকবে। মদন পয়রার স্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এমন একা একা নিজের এক উরুকে অন্য উরুর উষ্ণতায় ধন্য করে বাঁচাও ঢের ভাল ছিলো। এ জন্মে হলো না !

কাল সকালে গ্রামের যে ছোট ছোট মেয়েরা পুলকভরে দোল খেলবে, চিকন চিৎকারে ; ওরা যেন সত্যিকারের পরীর জীবন পায় ! পরী পয়রার জীবন নয়। সত্যিকারের স্বাধীন, উড়াল পরীর জীবন। পরী ভাবে যে ও বেঁচে উঠবে ওদের মধ্যে। অন্য জন্মে, অন্য জীবনে !

পাখিরা জানে না

বুঝলাম তো ইংরিজিতে বলে সল্ট-লিক্। কিন্তু বাংলায় কি বলে ?

রুনা, কোমরে হাত দিয়ে অর্জুন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সুজনকে শুধোলো।

সুজন বললো, বলছি।

বলে, একটা সিগারেট ধরালো। তারপর গাছের নিচের একটা পাথরে বসে বললো, বাংলায় বলে নোনা-মাটি। বা, নুনী। বনের জানোয়ারদের আফিঙের মত নেশা লাগে। রোজ একবার করে এই মাটিতে নুন চাটতে না এলে হরিণ সম্বরদের ঘুমই হয় না।

আমি তো হরিণও নই সম্বরও নই। আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন ?

বলবো, বলবো। সব বলবো।

সুজন বললো।

রুনা ওর চশমা-পরা কাটা কাটা বুদ্ধিদীপ্ত মুখটি তুলে সুজনের চোখে তাকিয়ে রইলো।

এ্যাই, বল না, কেন এনেছো এখানে?

সুজন হাত ঘুরিয়ে চারিদিকে দেখালো। বললো, কেন ? জায়গাটা তোমার ভাল লাগছে না ? একপাশে পাহাড়—গাছ-গাছালি, কত পাখি ডাকছে, প্রজাপতি উড়ছে, কাঁচপোকা গুন গুন করছে, শীতের দুপুরের লজ্জাবতী রোদ তোমার গায়ে এসে পড়েছে। তোমার ভাল লাগছে না ?

আমি কি বলেছি ভাল লাগছে না ?

শোনো, বলছি। আমার কিছু কনফেস্ করার আছে। আর তোমাকেই আজ সাক্ষী করবো। আমি ক্রীশ্চান নই, কোনো গীর্জায়ও যাইনি কখনো। আমি শুধু এই নির্জন নদী, পাহাড়, বনকে চিনি, আর তোমাকে চিনি। কোনো অচেনা স্যাঁতসেঁতে গীর্জার উঁচু সিলিংওয়ালা ঠাণ্ডা ঘরে কোনো গম্ভীর পাদ্রীর সামনে নতজানু হয়ে ভয়ে ভয়ে আমার দোষ স্বীকার করার চেয়ে আদিগন্ত আকাশের নিচে এই সবুজ আস্তরণের আড়ালে নোনা-মাটির পাশে—তোমার কাছে হাঁটু-গেড়ে বসে, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার অপরাধ স্বীকার করা অনেকই সহজ বলেই তোমাকে আজ ডেকে এনেছি এখানে।

রুনা, প্রথমে কেমন অস্বস্তিভরা চোখে চারদিকে চাইলো। তারপর বললো, কী যে পাগলামি করো, জানি না। দাদা বউদি ঘুম থেকে উঠলে হয়ত খোঁজাখুঁজি করবেন। সমস্ত বাংলো তোলপাড় করবেন।

করবে না, করবে না। তুমি কি এখনো ফার্স্ট—ইয়ারের ছাত্রী আছো নাকি ? তাছাড়া, তারা নিজেরা এখন এমনই সুব্যস্ত আছে যে, তোমার খোঁজ করবার সময়ই নেই তাদের।

ভারী খারাপ তো তুমি। ফিরে চলো না। বলে দেবো।

তা দিও। আমি ভয় করি না। সত্যি কথা বলতে কী, আমি এখন আর কিছুকেই, কাউকেই ভয় করি না।

তুমি তো বীরপুরুষই। চিরদিনের।

বীরপুরুষ নই। বরঞ্চ দায়িত্বজ্ঞানহীন বলতে পারো। পরিনামজ্ঞানহীনও। এখন কী রকম যেন হয়ে গেছি!

ওরকম ছটফট করছো কেন ? চুপ করে একটুখনও কি বসে থাকতে পারো না ?

রুনা ধমকে বললো।

সুজন পাঞ্জাবী-পাজামা গুটিয়ে শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আসন-পিড়ি হয়ে বসে পড়লো পাথরটায়। বললো, এই বসলাম।

তারপর অনেকক্ষণ ওরা দুজনে চুপচাপ নোনামাটির দিকে চেয়ে বসে রইলো।

মন্থর হাওয়াটা লাল মাটিতে আর পাথরে শুকনো শালপাতাগুলোকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে মচমচানি তুলে বনে বনে আল্‌তো পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক ঝাঁক টিয়া কাছের একটা শালগাছের সমস্ত পাতা যেন ছেয়ে বসেছে। ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ করে নিজেদের মনে কতো কী বলছে।

রুনা বললো, শীতের দুপুরের রোদটা দারুণ লাগে, না ?

দারুণ! ঠিক তোমার মতো। রোদে বসে ঘরে গেলে যেমন শীত অনেক বেশী লাগে, তুমি কিছুক্ষণ কাছে কাছে থেকে তারপর চলে গেলেই আমার মনের ঘরের চিরদিনের শীতটা হঠাৎ একেবারেই অসহ্য ঠেকে। দু একদিনের জন্যে কেন যে তুমি আমার কাছে আসো তা তুমিই জানো।

রুনা কথাটা চাপা দিয়ে বলে উঠলো : এবার দেখছি তোমারও কপালের পাশে দু-একটা রুপোলি রেখা ঝিলিক মারছে। জানো, আমিও যখন সমস্ত দিন ক্লাস নেওয়ার পর বাড়ি এসে চশমা খুলে আয়নার সামনে দাঁড়াই তখন চোখের নিচের গভীর কালো রেখাগুলি আমাকে কেবলি মনে পড়িয়ে দেয় যে বেলা পড়ে আসছে, বেলা পড়ে আসছে ; বেলা পড়ে আসছে। জানো, এ কথা ভাবতে ভালো লাগে না। আমার দু একজন ছাত্রীর পর পর বিয়ে হয়ে গেলো। বুঝলে মশাই ? কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমার ছাত্রীদেরও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমাকে কি তুমি এখনও ছেলেমানুষই ভাববে ?

তোমাকে ছেলেমানুষ কোনোদিনও ভাবিনি।

তবে কি ছোটবেলা থেকেই আমি বুড়ি ছিলাম ?

রুনা দুষ্টুমিমাখা চোখে হেসে বললো।

সুজন হাসলো। বললো, জানি না। হয়ত তাই ছিলে।

একটু গম্ভীর হয়ে থেকে বললো, তোমার বয়স যখন তোমার ছাত্রীদের মত ছিলো, ইচ্ছে করলে তুমি তো তখনই স্বয়ংবরা হতে পারতে। রুনা রায়ের তো অ্যাডমায়ারারের অভাব ছিলো না কোনোদিনই।

সে কথা মিথ্যে বলোনি। হয়ত পারতাম। কিন্তু সকলের বোধ হয় সব কিছু হয় না। সময়ে হয় না। আমি হয়ত সবাই যে-সময়ে যা চায়, তা চাইনি। ঠিক করেছি কী ভুল করেছি, জানি না। এখন মাঝে মাঝে ভাবি, তোমাকেই বা এমন কষ্ট দিলাম কেন এতদিন এবং নিজেই বা অন্য একজনের জন্যে এতো বছর এতো কষ্ট পেলাম কেন ? জানো সুজন, আমার মনে হয় ; সব কিছুরই শেষ আছে। দেখিই না শেষে কি আছে ?

এই অবধি বলে, রুনা থেমে গেলো।

বললো, কই ? তুমি যা বলবে বলে এতদূর হাঁটিয়ে আনলে, তাতো এখনো বললে না ?

সুজন চমকে উঠলো। বললো, রুনা, আমি সত্যিই এমন কিছু বলবো আজ তোমাকে, যা শুনলে তুমি হয়তো আমাকে খুব ঘেন্না করবে। তুমি হয়ত ভাববে, এতদিন তুমি একজন নোংরা লোকের ভালবাসা পেয়েছো।

অধৈর্য গলায় রুনা বললো, আঃ বলোই না। কী যে গৌরচন্দ্রিকা করছো তখন থেকে !

সুজন একবার কাশলো। বললো, বলছি। আমি একবার বলা আরম্ভ করলে তুমি কিন্তু আমাকে থামিয়ে দেবে না। থামিয়ে দিলে, আমি সত্যি সত্যি একেবারেই থেমে যাব। আর কিছুতেই শুরু করতে পারব না।

কালকে, মানে কাল, রাতের কথা বলছি, রুনা। তুমি মনোযোগ দিয়ে শোনো আমি যা বলছি।

কী হলো ?

হ্যাঁ। জানো, আগে না, আগে, আমার ঘুমও খুব গাঢ় ছিলো, কিন্তু গত কয়েক মাস আমি ভালো ঘুমোতে পারি না। সারাদিন কাজে কর্মে থাকি। বিকেলের পর থেকে এতো ক্লান্তি লাগে যে, মনে হয় রাতে বিছানায় শোবো আর মড়ার মতো ঘুমাবো। কিন্তু যেই বিছানায় শুই, তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার হাসি, তোমার কথা বলা, তোমার সব কিছু মাথার মধ্যে ভীড় করে আসে। রোজ ; রোজ রাতে। আমি চোখ বুজে থাকি। পাছে চোখ খুলে অন্ধকারকে দেখতে হয় ; সেই ভয়ে। বারে বারে পাশ ফিরে শুই, ঘুমুবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। কখনো বা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। বাংলোর হাতার ঝাঁকড়া মহুয়া গাছের ডালে অন্ধকারে কোনো নাম-না-জানা নিরাবয়ব পাখি নড়ে-চড়ে বসে। গেটের কাছে, মহুয়া-মিলনের রাস্তায় জোনাকির ঝাঁক নিঃশব্দে ওড়ে। জানালা দিয়ে তারা-ভরা আকাশ দেখা যায়। দূরের নদীর পাশে হিমেল হাওয়ায় হায়না ডেকে বেড়ায়, হাঃ হাঃ করে। তখন, বুকের মধ্যে কেমন কেমন করে।

রুনা উঠে দাঁড়িয়ে কী একটা বলতে গেলো।

সুজন বাধা দিয়ে বললো, আমাকে শেষ করতে দাও ; তুমি ইন্টারাপ্ট্ কোরো না।

রুনা আবার পাথরটায় বসে পড়লো। বসে, দুটো হাত কোলের উপর রেখে মাটির দিকে চেয়ে রইলো।

সুজন বলতে লাগলো, এ সব তো গেলো রোজকার কথা ; এতে কোনো নতুনত্ব নেই। কালকের কথা বলি। মানে, কাল রাতের কথা।

বলো। আমি ইন্টারাপ্ট করবো না।

তুমি তো শুয়ে পড়লে। বিধুদা-বউদিও শুয়ে পড়লো। তারপর অনেক সময় কেটে গেলো। ঘুমোতে পারলাম না। আমি জানতাম, তুমি আমার ঘরের দিকের দরজা ভেজিয়ে শুয়েছো। বন্ধ করোনি। নতুন জায়গায়, জঙ্গলে ; তোমার ভয় করে, তুমি আমাকে বলেওছিলে।

মশারির ভিতরে ভূতের মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে নিজেকে আমি কতো বকলাম, কতো বোঝালাম ; বললাম, ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো। সুজন চ্যাটার্জি, ঘুমিয়ে পড়ো। তবু ঘুম এলো না। অন্ধকারে বার বার অনেক কিছু শুধোলাম নিজেকে। কোনো স্পষ্ট উত্তর পেলাম না। তারপর, কী যেন হয়ে গেলো রুনা। আমার শিক্ষার দম্ভ, রুচির গর্ব, সব যে আমার কোথায় ভেসে গেলো ! আস্তে আস্তে চোরের মতো তোমার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

তারপর··· । সে যেন কতো যুগ, মনে হলো ; কতো যুগ যুগান্ত পা-টিপে-টিপে হেঁটে তোমার ঘরের দৈর্ঘ্যটুকু পেরোলাম কেনোক্রমে । তারপর মশারির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম ।

বাইরের বারান্দায় হ্যাজাকটা তখন ফ্যাকাশে হলুদ মুখে জ্বলছিল । হঠাৎ হ্যাজাকটার দিকে চোখ পড়াতে আমার মনে হলো ও যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে । আমি এমন চৌর্যবৃত্তি করতে পারি ওর যেন তা বিশ্বাসই হচ্ছিলো না । সুজন যে এমন দুর্জন হবে তা এ অন্ধকার-ভাঙা-আলো যেন ভাবতেই পারছিল না ।

রুনা, তুমি আমার মুখের দিকে তাকিও না, প্লিজ, আমার মুখের দিকে তাকিও না । আমি তাহলে গুছিয়ে বলতে পারবো না ।

তারপর শোনো, আমি তোমার মশারিটা আস্তে আস্তে তুললাম সাবধানে । মনে হলো, তুমি খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছো । তুমি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিলে । তোমার বেণীটা বালিশের উপর দিয়ে বিছানার একপাশে মাথার দিকে ছড়ানো ছিলো । তোমার হারের লকেটটা একদিকে ঝুলে ছিলো । তোমার বুক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে কম্বলের নিচে কাঁপছিল । হ্যাজাকের আলো জানালা দিয়ে তোমার মুখে এসে পড়েছিল । আমি অনেকক্ষণ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম । তোমার ঠোঁটের ঢেউ, তোমার চশমা-ছাড়া ক্লান্ত চোখ, তোমার টিকোলো নাক, তোমার শান্ত কপাল, সব, সব আমি অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম । যেন, তোমায কখনো আগে দেখিনি । তুমি নড়লে না, চড়লে না ; তুমি ঘন ঘুমে অঘোরে শুয়ে রইলে । সেই শীতের রাতে তোমাকে উষ্ণতার দ্যোতক কোনো নরম পাখি বলে মনে হলো । তোমার সুন্দর তুমিকে দেখে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেলো । আমার ভীষণ জল পিপাসা পেলো ।

জানো রুনা, আমার মনে হলো, হঠাৎই আমার মনে হলো, চাঁদের পিঠ থেকে দেখা ছোট্ট গোল সুন্দর ঘূর্ণায়মান পৃথিবীটাকে যেন আমি মুঠি ভরে ধরে ফেলেছি । পৃথিবীতে আমার যা-যা চাইবার ছিলো তার সবই যেন আমি ভুলে গেছি । সেই ক্ষণটুকুর প্রাপ্তিতে শুধু বুঁদ হয়ে আমি তোমার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি । যেন দাঁড়িয়ে আছি অনন্তকাল ধরে ।

তারপরে ?

সেই মুহূর্ত অবধি খুবই ভালো লাগছিলো । দারুণ ভালো লেগেছিলো । এমন সময়, হঠাৎ একেবারেই হঠাৎ আমার জ্ঞান ফিরে এলো । আমার আবাল্য-বিবেক তার ফোলা-ফোলা গাল নিয়ে যাত্রাদলের বিবেকেরই মতো ঢিলেঢালা পোশাক পরে, মুখে সুবুদ্ধির রঙ মেখে, হাত নেড়ে নেড়ে আমাকে ম্যারালিটির গান শোনাতে লাগলো ।

তারপর, তোমার কম্বলে-ঢাকা বুকের উপর মুখ ছুঁইয়ে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম । বার বার প্রার্থনা করলাম, তুমি ঘুম ভেঙে উঠে আমাকে ওখানেই আবিষ্কার করো । আমাকে মারো, আমাকে অপমান করো, তোমার দাদা-বউদিকে ঘুম থেকে তুলে সব বলে দাও । আমাকে লাতেহারের কোতোয়ালির পুলিশে ধরিয়ে দাও । তোমার যা খুশি তুমি আমাকে তাই শাস্তি দাও । কিন্তু তোমার এমনই ঘুম যে, তুমি ঘুমিয়েই রইলে । তুমি যদি তখনো ঘুম ভেঙে উঠতে, আমাকে হাতে-নাতে ধরে শাস্তি দিতে, যদি দাঁতে-দাঁত চেপে আমাকে বলতে, জানোয়ার ! বলতে, অসভ্য ! দুশ্চরিত্র ! তবুও বোধ হয় আমার এত লজ্জা, এত অপমান হতো না রুনা । এখন এক-আকাশ আলোর নীচে বসে, দিনের বেলায়, তোমার সামনে তোমার দিকে মুখ করে আমাকে দুঃস্বপ্নের মতো গত রাতের কথা বলতে হচ্ছে । আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো না রুনা । তুমি আমাকে মারো । তুমি আমার গায়ে থুথু

দাও। কাল বাতেব পব থেকে আমি এক ভীষণ অস্বস্তিতে আছি। তোমাব কাছে ভীষণই ছোটো, ববাববেব মত ছোটো হযে গেছি।

রুনা পাথবে বসে, মাটিব দিকে চেযে, পাযেব নখ দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছিলো। শালবনেব ঘন গাঢ সবুজ পাতায ঝাঁপ দিযে পডে দিন শেষেব এক ফালি বোদ পিছলে এসে রুনাব মুখে পডেছিলো। রুনা একটা খযেবী, জংলা—কাজেব বাটিকেব শাডি পবেছিলো। গায়ে সাদা শাল।

রুনা কোনো কথা বললো না। মুখ নিচু কবে, পাযেব নখ দিযে মাটিতে দাগই কেটে চললো।

সুজন কিছুক্ষণ চুপ কবে মাটিব দিকে চেযে হঠাৎ যেন অধৈর্যে ফেটে পডলো। দু হাত দুদিকে ছুঁডে বললো, কী ? তুমি ভেবেছটা কি ? চুপ কবে থেকে আমাকে ক্ষমা দেখিযে তুমি মহৎ হবে ? প্রতিমুহূর্ত তুমি আমাকে অনেকই শাস্তি দাও। সে সব শাস্তিব কথা তুমি জানো না। তোমাব কাছ থে ক কোনো বকম দযাই চাই না আমি। প্লীজ, রুনা, তুমি আমাকে দিযে তোমাব সামনে আং নাটক কবিযো না। দোহাই তোমাব, আমাকে কঠিন কিছু বলো। কঠিন কিছু

বলতে, বলতেই সুজন রুনাব কাছ থেকে দূবে চলে যেতে লাগলো। কযেক পা গিযেই, রুনাব দিকে পিছন ফিবে একটা বুডো শাল গাছেব গুঁডিব পাশে হঠাৎ দাঁডিযে পডলো।

রুনা এতক্ষণে মুখ তুললো। মুখ তুলে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে পেছনফেবা সুজনেব দিকে তাকিযে থাকলো। তাব বেশ কিছুক্ষণ পব রুনা ডাকল ওকে। বললো, অ্যাই শোনো। আমাব কাছে এসো। তোমাব সঙ্গে কথা আছে।

সুজন এলো না। তবুও, তেমনিভাবে পেছন ফিবেই দাঁডিযে বইলো।

রুনা পাথব ছেডে উঠে ওব কাছে গিযে ওব মুখোমুখি দাঁডালো। তাবপব দু হাত দিযে সুজনেব মুখ ঢাকা দু হাত নামিযে দিযে রুনা হঠাৎ বলে উঠলো আমি তখন জেগেছিলাম সুজন। সমস্তক্ষণ।

তাবপব সুজনেব হাত ধবে টেনে পাথবগুলোব কাছে নিযে যেতে যেতে, খুব আস্তে আস্তে বললো, আমিও মহৎ নই সুজন। আমাব তোমাকে ক্ষমা কবাব কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

পাথবে বসে রুনা বললো, কাল তুমি যেই দবজা ঠেলে ঘবে ঢুকলে অমনি আমি চোখ বন্ধ কবে মডাব মত শুযে বইলাম। তাব আগে আমি জানালা দিযে বাবান্দায ঝুলানো হ্যাজাকটাব দিকে চেযেছিলাম। ওটাব চাবপাশে নানাবকম বড বড পোকা উডছিলো। তাই দেখছিলাম। আব কীবকম গাযে-কাঁটা দেওযা স্বগতোক্তি কবছিলো হ্যাজাকটা। বাতেব নিস্তব্ধতায ইন-অ্যানিমেট অবজেক্টবাও কি প্রাণ পায ? আমাব ভয কবছিলো। আমি ঘুমোতে পাবছিলাম না।

তুমি দবজা ঠেলে এলে, আমাব কাছে এলে, আমাব মুখেব কাছে মুখ নিলে। আমি চোখবুজে শুযে থেকে তোমাব মুখেব সিগাবেটেব গন্ধ পেলাম। তারপব তুমি যখন, তুমি যা বললে, তাই করলে·

সুজন, ক্ষমা করাব কোনো কথাই ওঠে না এতে। হয়ত তুমিই ক্ষমা করবে আমাকে। ক্ষমা করা উচিত। কাল তুমি যখন আমাব কাছে, আমার বুকের কাছে, আমার বুকে মুখ রেখে আমাকে জডিয়ে বইলে, আমি জানি তুমি তখন কাঁদছিলে। যে-তুমি পায়ে দাঁড়ানোর দিনগুলোতেও কোনদিন না-খেয়ে থেকেও কাঁদোনি— একবারও কাঁদোনি, সেই তুমিই

যখন কাঁদছিলে, তোমার গাল বেয়ে তোমার চোখের জল আমার গলায় গড়িয়ে পড়েছিলো ; তখন তুমি জানো না, আমার সমস্ত শরীর, আমার সমস্ত মন শুধু আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো একমাত্র অমোঘ পরিণতির দিকে। তোমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে তোমার সঙ্গে কাঁদতে। তারপর...

কেন যে পারলাম না, জানি না। হয়ত আমি জেগে গেলে তুমি লজ্জা পাবে, এই ভয় আমার মনে ছিলো। অথবা জানি না, আমি হয়ত ভয় পেয়েছিলাম আমার মধ্যের শরীরি মানুষটাকেই, যার বত্রিশ বছরের জীবনে এমন উত্তেজিত সে আর কখনোই হয়নি। হয়তো ভয় পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ; শরীরের ছাই-চাপা আগুনে ফুঁ দিলে হয়ত আমার নিজের ইচ্ছায় তা আর নিভবে না। জ্বলে-পুড়ে মরবো আমি !

এই অবধি বলেই, রুনা থেমে গেলো।

পরক্ষণেই হঠাৎ বলে উঠলো, তুমি কেন আমাকে নিয়ে তোমার যা খুশী তাই করলে না সুজন ? পরে যা হোতো হোতো। আমি কি বুঝি না যে, তুমি আমাকে চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছো ?

তুমি জানো তা ?

জানি। কিন্তু তুমি এও জানো, ভালো করেই জানো যে, আমিও অন্য একজনকে চেয়ে চেয়ে তোমার মতোই ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমরা দুজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত। আমাদের পথ এক ; কিন্তু গন্তব্য অন্য। তুমি যদি তোমার যা খুশী তাই করতে, আমরা না হয় এই দীর্ঘ শীতল পথের মাঝামাঝি এসে উষ্ণ আশ্রয়ে কিছুক্ষণ দুজনকে দুজনে বুকে জড়িয়ে জিরিয়ে নিতাম।

এই ক্লান্তি আমারও অসহ্য লাগে। তোমার মতো, যা মনে হয় তা গুছিয়ে চিঠিতে লিখতে পারি না আমি। কিন্তু আমার মনেও তো কথা জমে ! আর ক্লান্তিও তো ক্লান্তিই। আমার যন্ত্রণাও তো যন্ত্রণা ! তুমি কেন আমাকে বোঝ না সুজন ? তুমি কেনো কোনোদিন আমাকে একটুও বুঝলে না ?

তারপর ওরা কেউই কোনো কথা বললো না। ওরা দুজনে দুদিকে মুখ করে বসে রইলো। দুপুরের হাওয়ায় শুকনো শালপাতা, খড়-কুটো পাতা উড়তে লাগলো।

রুনার মনে হলো, ওরা দুজনে দাঁড় বেয়ে একটি নদীতে অনেকদূর চলে এসেছিলো। মাঝ-নদীতে এসে, দুজনের হাত থেকেই কোনো দৈবদুর্বিপাকে দাঁড় দুটি জলে পড়ে গেছে। ওরা দুজনে দাঁড়-বিহীন নৌকোয় বসে চারদিকের ঢেউয়ের দিকে চেয়ে আছে। নৌকোটা ঘুরছে, টলমল করছে। ঠিক ভয় নয়, কী এক অনামা শীতল অনুভূতিতে রুনার মন ভরে আছে।

অনেকক্ষণ পর রুনা বললো, আমরা দুজনেই দুজনকে ক্ষমা করে দিই। বুঝলে সুজন ! তুমি আমাকে, আর আমি তোমাকে। দুজনে দুজনকে যা দিতে চেয়েছিলাম, তা দিতে পারিনি বলে ; ক্ষমা করে দিই।

সুজন যেন ঘুম ভেঙে উঠে বললো, কাল হয়তো আমরা দুজনেই ভুল করেছিলাম ? আজ সে ভুল কি শোধরানো যায় না ? রুনা ?

রুনা যেন ভয় পেলো। ভয়-পাওয়া গলায় বললো, না, না। আর তা হয় না।

এমনভাবে দুজনের কাছে দুজনে ধরা পড়ার পরে আজ রাতের প্রাঞ্জল অন্ধকারে সে আর হয় না। কাল হলে, অন্য কিছু হতো। সিণ্ডারেলার স্বপ্নের মতো, ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মতো, আমি রাজকন্যা হয়ে পদ্মফুলের পালঙ্কে ঘুমোতাম, আর তুমি ভিনদেশী

রাজকুমার হয়ে আমাকে চুরি করতে আসতে। আফটার-অল্, সে ব্যাপারটা অনেক রোম্যান্টিক হতো। স্বপ্নময়। ভেবে দ্যাখো সুজন, জীবনে তুমি, আমি, আমরা সকলে যা কিছুই অনুক্ষণ করি বা করাই তার সবটাই তো স্থূল, Utterly gross, তাই জীবনের দু-একটি প্রধান প্রধান ঘটনাও যদি রোম্যাণ্টিক না হয়, তার চেয়ে সুজন, সে দুর্ঘটনা না ঘটাই বোধহয় ভালো।

এইটুকু বলেই, রুনা থেমে গেলো। রুনা হাঁপাতে লাগলো। রুনার মনে হলো ও যেন এক্ষুনি নিজেকে ; খুব কঠিন কিছু বুঝিয়ে উঠলো। আজকাল ও বোঝে যে, ছাত্রীদের কিছু বোঝানো অনেকই সহজ, নিজেকে কিছু বোঝানোর চেয়ে।

দুজনের কেউই এর পরে আর কোনো কথা বললো না। রুনা বুকের কাছে দু-হাঁটু জড়ো করে হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে নোনামাটির দিকে চেয়ে রইলো।

সুজন অনেকগুলো কাঠি নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত একটা সিগারেট ধরালো।

রোদ পড়ে এসেছে। নোনামাটির উপরে শালগাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়েছে। একটি শৈত্যময় সোঁদাভাব মাটি থেকে আস্তে-আস্তে উঠতে আরম্ভ করেছে। ওরা দুজনেই নোনামাটির ওপরে শালগাছেদের প্রলম্বিত ছায়ার দিকে চেয়ে ক্রমশঃ অপসৃয়মান উষ্ণতার কথা ভাবতে লাগলো।

এমন বিকেলে সকলের মনেই একধরনের শীতার্ত একাকিত্ব এসে বাসা বাঁধে। যে—একাকিত্ব প্রত্যেকেরই একান্ত নিজস্ব। যে একাকিত্ব সম্বন্ধে বাইরের কারো, কিছুই করণীয় থাকে না।

এক ঝাঁক ময়ূর নিঃশব্দে—পায়ে ওড়িশী নাচের ভঙ্গীতে এক পা এক পা করে হেঁটে নোনামাটির পাশ অবধি এলো। তারপর হঠাৎই ওদের দেখতে পেয়ে, বড় বড় ডানা ও লেজ ঝাপটাতে ঝাপটাতে কেঁয়া কেঁয়া রব তুলে পশ্চিমের দিকের জঙ্গলে উড়ে গেলো।

অনেকক্ষণ পর সুজন বললো, চলো, উঠি এবারে। বেলা পড়লেই জানোয়ারেরা আসতে শুরু করবে এখন নোনামাটিতে। এখানে আর না থাকাই ভালো।

রুনা নিস্পৃহ গলায় বললো, চলো।

ওরা দুজনে বিকেলের জঙ্গলের লালমাটির পথে হাঁটতে লাগলো, পাশাপাশি।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর, সুজন রুনার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে যেন নিঃশব্দে কোনো প্রশ্ন করলো।

রুনা নিঃশব্দ উত্তরে সুজনের হাতে ওর হাত দিয়ে চাপ দিলো।

ওরা কথা না বলে হাঁটতে লাগলো।

সুজনের হাতের আঙুলগুলির সঙ্গে ওর আঙুলগুলি ছুঁইয়েই রাখলো রুনা।

সুজন বললো, আচ্ছা রুনা, ওকে তুমি ভালো করে শিক্ষা দিতে পারো না ? শিক্ষা দেওয়া যাকে বলে।

রুনা চমকে উঠে বললো, কাকে ?

কাকে আবার ? যে তোমাকে এতদিন ধরে এমনভাবে কষ্ট দিচ্ছে তাকে। ঐ স্বার্থপর অন্ধ পুরুষটিকে ?

রুনা এক ঝলক রোদের মত হেসে উঠলো, বললো : বেচারীর কি দোষ ! সব দোষ তো আমারই। প্রথম দিন থেকেই তো ও আমাকে মানা করে এসেছে। বরাবর মানা করেছে। বলেছে, আমাকে কত করে বুঝিয়েছে যে, বিবাহিত লোককে ভালবাসলে কপালে অনেকই দুঃখ। ও তো সব সময়ই বলে, অন্যকে দুঃখ না দিয়ে নিজে কখনওই সুখী হওয়া যায় না।

ও যখন সে রকমভাগে সুখী হতে চায় না, তো ওকে দোষ দিয়ে কি লাভ বলো ? তাছাড়া, শিক্ষা দেবার কথাই যদি বলো, তো তুমিই বা আমাকে শিক্ষা দাও না কেন ? আমি জানি, আমিও তো তোমাকে কম কষ্ট দিইনি। অবশ্য কোনো কষ্টই আমি ইচ্ছা করে দিইনি। কিন্তু তুমি পেয়েছো। আমার জন্যেই পেয়েছো ; পাচ্ছো। ভালবাসার কষ্ট ! তুমি আমাকে শিক্ষা দাও না কেন ? আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারো না কেন ? একবার রাগ করে চিঠি লিখলে দশবার ক্ষমা চেয়ে চিঠি লেখো কেন ? এই কেনর জবাব দাও !

জবাব নেই কোনো। এই সব কেনর জবাব হয় না !

সুজন বললো।

আমি তোমাকে দুঃখ দেবার কথা ভাবতেও পারি না।

আমিও হয়তো তাকে দুঃখ দেবার কথা ভাবতে পারি না। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক। আমার কপালের পাশের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছে। বড় কষ্ট পাচ্ছি সাইনাসাইটিসে।

ডাক্তার দেখাও, অনেক কষ্ট তো এমনিতেই পাচ্ছো। আবার অসুখ-বিসুখের কষ্ট কেন ? নিস্পৃহ গলায় বললো সুজন।

রুনা সে কথা গায়ে না মেখে বললো, জানো, তোমার জন্যে একটি ফুল-স্লিভস পুলোভার বুনছি। তোমাকে দারুণ মানাবে।

বুনো না।

কেনো ?

আমার অনেক সোয়েটার, পুলোভার আছে। যা চাই মুঠি উপুড় করে তা যখন কোনোদিন দিতে পারলে না তখন এসব থাক না কেন।

তুমি ওরকম কোরো না। সত্যি বলছি, আমার খারাপ লাগে। তুমি ভালো করেই জানো যে, আমার খারাপ লাগে।

তাহলেও পুলোভার চাই না আমার। তারচেয়ে কোনো বই বা রেকর্ড কিনে রেখো। পরের বার কোলকাতা গেলে নিয়ে আসবো। কিছুদিন আগে লারাজ থীম পাঠিয়েছিলে। মনে আছে ? কি যেন নাম রেকর্ডটার ?

"সামহোয়্যার মাই লাভ।" রুনা বলল।

ঐ রেকর্ডটা শুনলে বুকের মধ্যেটা কেমন যেন করে। তোমার কথা মনে হয়। মনে হয় তুমিই যেন লারা।

রুনা হেসে উঠলো, বললো, আমি লারা হলেই তুমি যদি ডক্টর জিভাগোর মতো, মনে, বরিস পাস্তারনাক্-এর মতো কেউ হতে পারো তাহলে আমি লারা হতে রাজী।

সুজন অন্যদিকে চেয়ে বললো, সুযোগ দিলে কোথায় ? আমি কি হতে পারতাম আর কি হতে পারতাম না, তা নিয়ে তুমি কখনো ভেবেছো ? তোমার ভাবার সময় কই ? অথচ আমি...

ডক্টর জিভাগের কবিতা পড়েছো তুমি ?

সুজন বললো।

পড়েছি। আমার ভালো লাগে না।

আমার তো মনে হয় উনি যতো বড় গদ্যলেখক তার চেয়েও অনেক বড় কবি।

জানি না।

"The years will pass and you will marry.
You will forget the hardships you endured.

To be a woman is a great adventure;
To drive men mad is a heroic thing.

For my part, all my life long
I have stood like a devoted slave
In reverence and awe before the miracle
Of womans hands, her back, her shoulders, and her
Sculptured throat.

And yet no matter how the night
May chain me within its ring of longing,
The pull of separation is still stronger
And I have a beckoning passion for the clean break.

রুনা বললো, বাঃ। কবিতাটি ভালো কিন্তু তার চেয়েও ভালো তোমার আবৃত্তি।

হয়তো। সুজন বললো। যা কিছু এক হৃদয়ের যত গভীর থেকে ওঠে তাই তো অন্য হৃদয়ের তত গভীরে গিয়ে পৌঁছয়।

রুনা সুজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, আমার সুন্দর সুজন, তুমি জানো না ; তুমি কিছু বোঝো না। যখনি উল কাঁটা নিয়ে বসি—তখনি তোমার কথা ভাবি। তোমাকে চোখের সামনে দেখতে পাই। দেখি, তুমি আমার সোয়েটার গায়ে দিয়ে জীপ চালিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছো। কাজ দেখে বেড়াচ্ছো। তুমি আদিবাসী কাঠুরেদের সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছো। তুমি আকাশে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছুঁড়ছো। সব, সব। এসব কি একেবারে কিছুই নয় ? এ সবের কোনোই দাম নেই ?

জানি না। আমি জানি না। সুজন বললো।

তোমার হয়তো মনে নেই, গতবার তুমি যখন কোলকাতায় গেছিলে, আমার ঘরে, আমার সাধের সর্ষেরঙা বেড-কভারটার ওপরে কফি ঢেলে ফেলেছিলে। মনে আছে ? তোমাকে কত করে বললাম, ঘরের কোণের ইজিচেয়ারটায় বসো, তুমি শুনলে না। ভীষণ হাসতে হাসতে তুমি কাপসুদ্ধ কফি ঢেলে ফেললে। চাদরটায় দাগ হয়ে গেলো। কী হাসিই হাসছিলে ! বাবাঃ। আচ্ছা, তোমার মনে আছে, কী নিয়ে তুমি অত হাসছিলে ?

না। আমার মনে নেই। এত ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো কথা আমার মনে থাকে না।

আমার থাকে। আমরা 'মাই ফেয়ার লেডি' দেখতে গেছিলাম। তুমি সিনেমা থেকে ফিরে রেক্স হ্যারিসনকে নকল করে আমায় ফোনেটিকস্ শেখাচ্ছিলে—ব্যাস্ হাসতে হাসতে···।

এত অবান্তর কথা মনে করে রাখার কি দরকার ?

গম্ভীর গলায় সুজন বলল।

তোমার আজ কি হয়েছে সুজন ?

কিছু তো হয়নি।

রুনা বললো, তোমার কাছে যা অবান্তর আমার কাছে তা হয়ত নয়। তাছাড়া সবার কথা মনে থাকে না। শুধু তোমার কথাই মনে থাকে। এবং আরেকজনের কথা। তুমি জানো না সুজন, সেই বেড-কভারটার কফির দাগ ধোপাবাড়ি দিয়েও ওঠেনি বলে আমি ভীষণ খুশী ! যেদিনই ঐ চাদরটা পাতি, সেদিনই তোমার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে যায়, সেদিন তোমার জন্মদিন ছিলো। আমার কিনে-দেওয়া মেরুণ-রঙা একটি র'-সিল্কের হাওয়াইন শার্ট

পরে আধশোয়া ভঙ্গীতে তুমি খাটে বসেছিলে। পাশের ফ্ল্যাটের হাসিদির রেডিওতে কণিকা ব্যানার্জীর গান হচ্ছিলো। সব যেন চোখের সামনেই দেখতে পাই ; শুনতে পাই।

তোমার কথা মনে পড়ে। তোমার জন্যে মনটা ভীষণ খারাপ লাগে। যখনই বেডকভারটা পাতি।

রুনা আবার বলতে লাগলো, জানো সুজন, এই তো তোমার কথা ভাবি, তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছো, হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছো তুমি সিগারেট খাচ্ছো। এই যে সাতদিন তোমার চিঠি না এলে ডাক-পিওনের ওপর রেগে যাই, যখনি একটু অবকাশ পাই—অফপিরিয়ডে, বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে, চান ঘরের কলের ঝরঝরানি গান শুনতে শুনতে, চান করতে করতে, তখনি তোমার কথা এই যে ভাবি, আমার মনে হয়, এর নামই ভালোবাসা। আমার ভালোবাসা এই রকমই। তোমাকে যা সবসময় দিই, দিতে পারি, তা 'কিছুই নয়' ; 'কিছুই নয়' বলে দুহাতে তুমি ঠেলে সরিয়ে দাও। আর যা তোমাকে দিতে পারি না, তার জন্য সব সময়ই তুমি আমাকে অপমান করো।

অপমান করার কথা বললে অন্যায় করবে রুনা। আমি তোমাকে কোনোদিনও অপমান করিনি। করতে চাইনি। তুমি একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলার স্বামী এবং দশ বছরের একটি ছেলের বাবাকে ভালোবেসে, সেই ইনকন্‌সিডারেট লোকটিকে ভালোবেসে ; তোমার জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টুকু নষ্ট করলে এবং তার সঙ্গে আমার জীবনটাও নষ্ট করে দিলে। বলো তুমি ? এ কথা সত্যি কিনা ? তুমি তো প্রতিমুহূর্তে আমার সমস্ত অস্তিত্বকেই অপমান করো ; করছো ; আমিও যে একটা মানুষ এ কথাই তুমি কোনোদিন ভেবে দেখোনি। এটা কি অপমান করা নয় ? এর চেয়ে বেশী অপমানের কথা আমি তো ভাবতেও পারি না।

সত্যিই তুমি আমার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করেছো।

কেউই কারো জীবন নষ্ট করতে পারে বলে আমার তো মনে হয় না সুজন। তুমি বিনা কারণে আমাকে দোষ নিও না।

দোষ দেবো না কেনো ? তুমি যে তাই করেছো।

রুনা, সুজনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, চশমাটা খুলে, শাড়ির আঁচল দিয়ে একটু মুছে নিলো। তারপর আস্তে আস্তে, যেন কথাগুলো বলতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে ; এমন ভাবে বললো, জানো সুজন, কারো জীবন নষ্ট করার কথা জানি না ; তবু বলবো, তাকে ভালোবেসে শুধু কষ্টই পেয়েছি আর তোমাকে ভালোবেসে শুধুই আনন্দ। তোমার আমার যে-সম্পর্ক সেটা তার-আমার সম্পর্কের চেয়েও অনেকই বড় সম্পর্ক। একটা অন্যরকম সম্পর্ক। কাল রাতে চোরের মত তোমাকে আমার ঘরে ঢুকতে হয়েছিলো অথচ তোমাকে যা দিয়েছি আমি, সব সময় দিই ; তার তুলনায় তুমি যা-চুরি করতে গেছিলে তা হয়ত একেবারে কিছুই নয়। অথচ দ্যাখো, আমার বিশ্বাস ; তুমি না হয়ে যদি সে কাল আমার পাশের ঘরে শুয়ে থাকতো, জানি না, হয়ত আমিই তোমার মতো চুরি করে তার কাছে যেতাম। ওই সব নিয়ে আমি অনেকদিনই ভেবেছি। আমার আজকাল কেমন যেন একটি দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছে যে, জীবনে ভালোবাসা পাওয়াটাই সব নয়। শুধু ভালোবাসা পেয়েই মন ভরে না। নিজে আবেগে, আশ্লেষে, আনন্দে তীব্রভাবে কাউকে ভালোবাসতে পারাটাও অনেকখানি। তুমি যার কথা বলছো, সে আমাকে যেমন চুম্বকের মত আকর্ষণ করে, অত্যন্ত নির্লজ্জের মতোই বলছি ; তার ভালোবাসা আমার সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়ে আমার সমস্ত সত্তা রাঙিয়ে আমাকে যেমন পুলকভরে ভরে ডাক দেয় তেমন করে কেউ কোনোদিনও আমাকে

ডাকেনি। ঠিক তাকে যেমন করে ভালোবাসি, তেমন করে অন্য কাউকেই ভালোবাসতে পারলাম না। পারবো না। সজ্ঞানে, সে ছাড়া আমি কারো বুকে শুয়ে থাকার কথা ভাবতেও পারি না সুজন। তার ভালোবাসা, আমার সমস্ত জীবনময় রংমশালের মতো জ্বলে, আমাকে জ্বালায়, দাহ দেয়, অথচ তোমার ভালোবাসা এই শীত-সন্ধ্যার জঙ্গলের শান্ত ছবির মতো আমার মনকে এক সুন্দর শান্তিতে ভরে দেয়। অথচ দ্যাখো, আমি তোমাদের দুজনকেই চাই। অথচ, আশ্চর্য ! কত অন্য অন্য রকমভাবে চাই।

সুজন অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না।

রুনা বললো কি ? কিছু বলছ না যে !

সুজন হাঁটতে হাঁটতে বেশ ঝাঁঝালো গলায় বললো, তুমি হয়ত বক্তৃতা দেবার সময় ভাবো তোমার ছাত্রীদের সামনেই বক্তৃতা করছো। কিন্তু তোমার ছাত্রীরা সব কিছু যত সহজে বোঝে, আমি বুঝি না। আমি শুধু এটুকু বুঝি যে, তুমি স্বার্থপর। বেশ স্বার্থপর। নিজের কথা ছাড়া অন্য কারো কথা তুমি কখনো ভাবোনি।

রুনা সেই আসন্ন সন্ধ্যার মতো এক চিলতে বিষণ্ণ হাসি হাসলো। শুকনো গলায় বললো, তা তো তুমি বলবেই !

বলবো না ? একশ' বার বলবো ! তুমি অত্যন্ত খারাপ, বাজে ; অত্যন্ত স্বার্থপর এক মেয়ে।

রুনা চমকে উঠে বললো, কি বললে ?

সুজন আবার কেটে কেটে বললো, তুমি একটি সস্তা, বাজে মেয়ে। তোমাকে ভালোবেসে আমার সমস্ত জীবন নষ্ট হয়ে গেছে।

রুনা যেন কেঁপে উঠলো। যেন, ডাঙায়-তোলা মাছের মত হাঁ করে নিঃশ্বাস নিলো। মুখে কিছু বললো না।

সুজন এবার বেশ ঘৃণার সঙ্গে বললো, আমি সত্যিই জানি না, তুমি আমার কাছে আসো কেন ? এতো বছর আমাকে এমন ভাবে প্রতিমুহূর্ত ফেরানোর পর তবুও তুমি এদেশে আছো কেন ? তুমি দূরে কোথাও চলে যেতে পারো না ? কোনো চাকরি নিয়ে ? দূরে, এতদূরে যে ; কখনো আর তোমাকে আমার দেখতে পাওয়ার কোনো উপায়ই থাকে না ! প্রতিমুহূর্তে তুমি আমারই চোখের সামনে দিয়ে তোমার প্রেমিকের কাছে যাবে, আমারই সামনে সব সময় তার কথা বলবে, এ আর আমার সহ্য হয় না রুনা। কোনোদিন অন্য কারো প্রেমিকাকে ভালোবাসতে চাইনি। তাই তোমাকে একটুও সহ্য করতে পারি না আজকাল। এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারি না।

রুনা অনেকটা পথ কোনো কথা বললো না। তারপর হঠাৎ যেন অন্ধকারে কিছু খুঁজে পেয়েছে, এমনি ভাবে ওর কাঁধে ঝোলানো অফফ্-হোয়াইট-রঙা ব্যাগটা হাতড়ে হাতড়ে কি একটা কাগজ বের করে সুজনের হাতে দিলো। বললো, মনীষার চিঠি।

সুজন বিরক্ত গলায় বললো, কি ? লিখেছে কি ? কোত্থেকে ?

রুনা আস্তে আস্তে বললো, কানাডা থেকে। আমার বাইরে যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেছে সুজন। এবার আমি এখানে এসেছিলাম কেবল এই কথাটাই তোমাকে জানাতে। আমার ভয় ছিলো, তুমি দুঃখ পাবে, তুমি হয়তো বাধা দেবে। তোমাকে কথাটা বলি বলি করেও এ পর্যন্ত বলতে পারিনি শুধু এই কারণেই। ঠিক করেছিলাম, এভাবে জানালে হয়ত তুমি শুনবে না, মানবে না। তোমার দিক থেকে যে কোনো আপত্তি নেই একথাটা তুমি নিজে থেকে বলে আমাকে যে কী ভাবে বাঁচালে তুমি জানো না সুজন। সত্যি বলছি, আমারও

ভালো লাগে না। আমিও দূরে যেতে চাই। যেখানে কোনো চেনা লোক নেই।

এই অবধি এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে রুনা বললো, বাংলো তো আর বেশী দূর নেই। আমি একটু বসলাম। বুঝলে। আমার মাথার যন্ত্রণাটা ভীষণ বেড়েছে।

একটি ক্ষীণা পাহাড়ী নদী পথের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। তার ওপরের কালভার্টের ওপর রুনা বসে পড়লো। কালভার্টের নিচ দিয়ে কুলকুল করে জল বইছে। গাছের ছায়া দুপাশে ঝুঁকে পড়েছে নদীতে। সামনেই পথটা একটা বাঁক নিয়েছে। তার সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। বাজরা আর সর্ষে লেগেছে সেখানে। হলুদ আর সবুজে সমস্ত পাহাড়তলিটিকে গালচে-ছাওয়া মনে হচ্ছে। দূরে শিরিনবুড়ুর পাহাড় দেখা যাচ্ছে। নদীর জলে গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে দু-একফালি রোদ এসে পড়েছে। সেই পড়ন্ত রোদের দিকে চেয়ে রুনা চুপ করে বসে রইল। বসতেই, দু কাঁধে যেন শীত তার দুহাত রাখলো। চলার উপরে ছিলো বলে এতোক্ষণ বুঝতে পারেনি।

সুজন রুনার দেওয়া বিদেশের টিকিটমারা চিঠিটি খুলতে খুলতে বললো, তুমি বাইরে যাবে তাতে আমি দুঃখ পাবো কেন? তুমি কি করবে না করবে, তাতে আমার কি?

বলেই, চিঠিটি খুলে দুহাতে ধরে পড়তে লাগলো।

সমস্ত জঙ্গল আর পাহাড়তলি পাখিদের কলকাকলিতে ভরে উঠেছে। রুনা পাহাড়তলির দিকে আর একবার তাকালো। তারপর চশমাটাকে খুলে তার কাঁচ দুটোকে আঁচল দিয়ে মুছলো। ওর চোখে কী যেন হয়েছে। কিছু কি পড়লো চোখে? চশমাটায় কেবলি ঝাপসা দেখে।

এমন সময় সুজন রুনার কাছে এসে কালভার্টে ওর পাশে বসে পড়লো। চিঠিটা মেলে ধরে অবিশ্বাস্য গলায় শুধালো, তুমি সত্যিই চলে যাবে? টরন্টোতে?

রুনা আস্তে আস্তে বললো, হ্যাঁ। বললামই তো তোমাকে। তারপর মুখ না তুলেই বললো, জানুয়ারীর উনিশে যাব। সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার যা কোয়ালিফিকেশন তাতে এমন সুযোগ আর হবে না। ভাল চাকরী। অ্যাপার্টমেন্ট ওরা দেবে। দু বছর পর পর হোম লিভ। মনীষা যা লেখে, ওখানকার ক্লাইমেটও নাকি ভালো। শীত একটু বেশি এই যা। তারপর একটু থেমে বললো, যদি সময় পাও এবং ইচ্ছে করে তাহলে আমার কাছে একবার বেড়াতে যেও। তোমার এখানে তো কতবার আমি বেড়িয়ে গেলাম। যদি···

রুনা!

সুজন চিৎকার করে উঠলো।

রুনা, তুমি জানো যে, তুমি যাবে না।

রুনা অবাক হয়ে মুখ তুললো। বললো, বাঃ! কী যে বলো! সব ঠিকঠাক হয়ে গেলো, কত কষ্ট করে টাকা পয়সা সব যোগাড় করলাম, এখন যাবো না কেন? তাছাড়া এখানে আমার আছেটা কি? কে আছে আমার? আমার তো কোনোই পিছুটান নেই। আমি যাবো।

—তুমি যাবে না, তুমি যাবে না, বলতে বলতেই চিঠিটাকে হঠাৎ হাতে মুঠোয় পাকিয়ে মুঠো করে দিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সুজন। দোমড়ানো চিঠিটা জলের ওপর একবার নেচে উঠেই এক পাক খেয়ে পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেসে গেল।

রুনা দাঁড়িয়ে উঠে বললো, ইস্ কি করলে বলোতো? ওর মধ্যে যে অনেক কিছু দরকারী ইনফরমেশান ছিলো। কী করলে তুমি!

আমি জানি, তুমি যাবে না। তুমি যেতে পারবে না।

রুনা বসে পড়ে বেশ শক্ত গলায় বললো, আমি জানি যে, আমি যাবো। আমি যাবোই তুমি আমাকে মানা করবার কে ? আর মানা করলেই বা তা আমি শুনবো কেন ? অনেকদিন হলো। এবার আমি আমার নিজের দিকে তাকাবো। আমার নিজের দিকে তাকাবার সময় হয়েছে এবারে।

রুনা, তুমি যাবে না।

আমি যাব, যাব ; যাব।

সুজন হঠাৎ বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে উঠলো। কেঁদে, হাঁটু গেড়ে বসে ; রুনার কোলে মাথা রেখে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

বলতে লাগলো, তুমি যাবে না রুনা, তুমি যাবে না রুনা, তুমি যাবে না। বলতে বলতে, মাথাটা ওর কোলে এপাশ ওপাশ করতে লাগলো।

রুনা কথা না বলে স্থির হয়ে বসে রইলো। পাহাড়তলির দিকে মুখ করে। নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করলো।

সুজন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগল, তোমার কাছ থেকে আমি আর কিছু চাই না রুনা, আর কোনোদিন কিছু চাইবো না, তোমার যাকে খুশী তুমি তাকে ভালোবেসো। আমাকে শুধু মাঝে মাঝে তোমায় একটু দেখতে দিও। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসো। তুমি অত দূরে যেও না রুনা। তোমাকে মাঝে মাঝে না দেখতে পেলে...তোমার পায়ে পড়ি...তুমি যেও না, তুমি ওখানে যেও না।

রুনা এতক্ষণ শক্ত ও স্থির হয়ে বসেছিলো। এখন কি করবে বুঝতে না পেরে হঠাৎ দু'হাত দিয়ে সুজনের মাথার চুলে হাত বোলাতে লাগলো, দু'হাতে ওর মাথাটা ধরে রইল অনেকক্ষণ। বললো, সুজন ওঠো, সুজন, কী ছেলেমানুষী করছো ? আমরা কি এখনো ছেলেমানুষ আছি ?

রুনার খুব নার্ভাস লাগতে লাগলো।

ওর কোল থেকে মুখ তুলে সুজন তবু বললো, রুনা তুমি কথা দাও যে, আমাকে তুমি কথা দাও যাবে না। কথা দাও।

রুনা কোনো উত্তর দিলো না। চুপ করে বসে উদাস চোখে চেয়ে রইলো।

কতকগুলো লম্বা-গলাওয়ালা পাখি, পাহাড় আর উপত্যকাটার মধ্যে গ্লাইডিং করে ভেসে যাচ্ছিলো। ওরা ডানা নাড়াচ্ছে না একটুও। ওই শান্ত পাহাড়ি পটভূমিতে ওর মনের এক বিষণ্নতম মুহূর্তে ওদের ভেসে বেড়ানো দেখতে দেখতে রুনার চোখের কোল জলে ভরে উঠলো। মনে হলো, ঐ নাম-না-জানা পাখিগুলোর মত ও-ও বুঝি ভেসে বেড়াচ্ছে, শাড়ি পরার পর থেকে, বড় হবার পর থেকে, ও নিজের ইচ্ছার ডানা-নাড়া একেবারেই ভুলে গেছে। কোথায় ওর বাসা ছিল ভুলে গেছে। কোথায় যে বাসা বাঁধবে, তাও সঠিক জানা নেই। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে ; উষ্ণতা মরে যাচ্ছে ; শীতের রাতের নিশ্চিত কালো হাত ওর দিকে ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। তবুও এখনো ঐ পাখিদেরই মতো ও ভেসেই বেড়াচ্ছে।

স্বাহা

শরীরটা কদিন হল বড়ই খারাপ যাচ্ছে। আজ সকালে টেনিস খেলতে গিয়েই মাথা ঘুরে গেল। বাড়ি ফিরে ডাক্তার গুহকে ডাকতেই তিনি বললেন, প্রেসার ভীষণ নেমে গেছে। অফিস যাওয়া চলবে না দিনকতক। ভাল করে খাওয়া দাওয়া করুন। কোনো চিন্তা ভাবনা নয়। একেবারে চুপচাপ ঘুমোন। রিল্যাক্স করুন। লেখা-টেখাও কদিন একদম বন্ধ। মনে করবেন আপনি একটি নিটোল ভ্যাগাবন্ড।

'নিটোল ভ্যাগাবন্ড' কথাটা ডাক্তার বড় ভালো বলেছেন।

কিন্তু ডাক্তার বোধহয় জানেন না যে, যাঁদের মস্তিষ্ক আছে এবং মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ধূসর পদার্থও আছে তারা শরীরের বিশ্রাম নিলেও নিতে পারে, কিন্তু মনের বিশ্রাম নেওয়া তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

শিশুকাল থেকে মস্তিষ্ক চালু হবার পর তার মধ্যে নিরন্তর কতো না কতো ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাঙচুর। শরীর নিষ্কর্মা থাকলেও মনকে শরীরের সঙ্গে শবাসনে যুক্ত করা আমার মত সাধারণ লোকের কর্ম নয়। বরং শরীর যখন কাজবিহীন মস্তিষ্ক তখনই সবচেয়ে বেশী সক্রিয়। মস্তিষ্কের বিশ্রাম একমাত্র সেদিনই ঘটবে যেদিন চিতার আগুনে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দুঃখ-আনন্দের সমস্ত ভার সমেত মাথার খুলি একটা তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত আওয়াজ করে ফেটে যাবে।

তবু খাওয়া-দাওয়ার পর, ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী শুলাম একটু। শীতের দুপুর। নিস্তেজ রোদ বাঁকা হয়ে পড়েছে শিউলি আর চেরীগাছের চুল বেয়ে। এক জোড়া ঘুঘু ডাকছে লনে। কেরালার নারকোল গাছের ডালে বসে দাঁড়কাক কা-কা করে ক খ চিরছে। ফিরিওলা হেঁকে যাচ্ছে দূরের রাস্তায়। একটা দুটো গাড়ি যাচ্ছে যান্ত্রিক ঝর ঝর শব্দ করে।

ঘুম এসে গেছিলো। এমন সময় ফোনটা বাজলো।

টেলিফোনের আওয়াজকে বড় ঘেন্না করতে শুরু করেছি আমি আজকাল। বাথরুমে চান করতে গিয়ে, ঘুমের মধ্যে ; গাড়ি চালাতে চালাতে, আমি আজকাল মাথার মধ্যে ফোন বাজছে শুনি সবসময়। এমন ধাতব, নক্কারজনক, ঘৃণিত শব্দ আর দুটি নেই। শুধু কাজ ; শুধু কর্তব্য ; শুধু দাবীর কথা শোনায় টেলিফোন।

একদিন ছিলো, যেদিন টেলিফোনের আওয়াজ পথ দেখিয়ে আনতো কত মিষ্টি সুখপ্রদ সব ঘটনা। কারো কারো গলার স্বরের রিনিরিনি শুনতে পেতাম ঐ যান্ত্রিক শব্দেরই মধ্যে। এমনও সময় গেছে যখন ফোন ধরে দু-তিন ঘণ্টার আগে ফোন ছাড়িনি।

তখন আমি ছোট ছিলাম, ভাবুক ছিলাম ; প্রেমিক ছিলাম। তাবৎ জগৎ তখন আমার

কাছে এক অনাবিল রহস্যভরা সুগন্ধময় অনুভূতির ছিল। পৃথিবীর হালচাল, দুঃখ-কষ্ট, ছল-চাতুরী কোনো কিছু সম্বন্ধেই অবহিত ছিলাম না তখন।

প্রত্যেক মনুষই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। কাল যে-জানাকে অমোঘ বলে জানে আজ সেই জানাকে মিথ্যা অলীক বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। আবার আজ যে-জানাকে জানলো সে, যে-বিশ্বাসে ভর করে জীবনের পথে পা বাড়ালো আগামী কালই নির্দ্বিধায় সেই জানা ও বিশ্বাসকে পদদলিত করে অন্য কোনো নতুন জানা ও বিশ্বাসকে আঁকড়ে এই অবিশ্বাসী, খল দুনিয়ার উথাল-পাথাল ঢেউয়ে কোনোক্রমে জীবনের হাল ধরে বেঁচে থাকতে চায়।

সব মানুষেরই মতো একজন লেখকও বদলান। তিনি বদলে যান, তাঁর লেখা বদলে যান ; প্রতিদিন নিজেকে নিজে অতিক্রম করে, নয়ত নিজের ফেলে-আসা পথ মাড়িয়ে পিছিয়ে যান। মাথা হেঁট করে। পিছন ফিরে তাঁর পুরোনো খোলসটার দিকে চেয়ে এক মিশ্র অনুভূতিভরা অনুকম্পায় ভরে ওঠেন। প্রত্যেক মানুষই বোধহয় সাপের মতো। কখনও না কখনও, কোনো অস্থির অনির্দিষ্ট সময়ে, সে তার খোলস ছাড়েই। নতুন খোলস পরে। সাপের মত বুকে হেঁটে জীবনের পথে এগোয়। ব্যাঙ খায়, ইঁদুর খায়, নেউলের সঙ্গে লড়াই করে, সুন্দরী ময়ূরের প্রেমে পড়ে, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার তীক্ষ্ণ নখের ও চঞ্চুর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়। কখনও বা মৃত।

এই প্রাপ্তবয়স্ক মানুষীবোধ প্রেমে কি অপ্রেমে, বন্ধুত্ব বা শত্রুতায় বড়ই বক্র, ও জটিল। গভীর ছায়াচ্ছন্ন দুঃখশীতল মৃত্যুহিম পথে আমার মত প্রাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্তমনস্ক মানুষ চুপি চুপি পা ফেলে চলাফেরা করে। মাঝে মাঝে সে নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে ওঠে।

টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। থামছে না।

বড় রাগ হলো। তবুও হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নিলাম।

ওপাশ থেকে, যেন কতদূর, বহু যুগের ওপার থেকে এক কিশোরী বা সদ্যযুবতী দেবদূতীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। বড় ক্ষীণ সে কণ্ঠ। কিন্তু এত মিষ্টি, কোমল ও নরম যে মন বলছিলো, সে কেন আরো জোরে কথা বলছে না ?

আমি আমার নাম্বার বললাম যন্ত্রের মত।

ঘুমভাঙানীয়া বলল, বুদ্ধদেব গুহ ?

আমি বললাম, কে ?

আমি সাহা

সাহা কে ?

সাহা আমি। তুমি বুদ্ধদেব গুহ ?

আমি বললাম, বলছি।

অচেনা, অজানা মানুষ কে আমাকে "তুমি" বলে সম্বোধন করছে বুঝলাম না।

বললাম, কি চাই আপনার ?

চাই না কিছু। তোমার বই পড়ে ভালো লেগেছে বলে ফোন করলাম।

একটা সময় ছিলো, যখন এসব কথা ভালো লাগতো শুনতে। আজকাল কি আমি দাম্ভিক হয়ে গেছি ? না, না দম্ভ নয়, ক্লান্তি ; একঘেয়েমি।

ভালোলাগার ; ভালবাসার ; স্তুতির ; প্রশংসার সব কিছুরই একটা ক্লান্তি আছে। কোনো কিছুই বাড়বাড়ি হলে, বেশী হলে, তা মনের কোণ উপচে পড়ে যায়। তখন সেই প্রশস্তির যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়ে ওঠে না। ধন্যবাদ দিতেও ক্লান্তি লাগে।

অথবা আমি কি ধরেই নিয়েছি যে অনেক স্তুতি, অনেক প্রশংসা আমার স্বাভাবিক পাওনা ? ছিঃ ছিঃ কখনও কি এত দম্ভের বা মূর্খামির শিকার হবো ?

গলার স্বরে বয়স অনুমান করে বললাম আমি, আমার কি বই পড়েছো তুমি ?

বললাম, কারণ অনেকে ভালোলাগা জানান, বই না পড়েই। কেন, তা তাঁরাই জানেন। অনেকের বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলাটা একটা রোগ। যাঁরা কিছুমাত্র না পড়েই শূন্যকুম্ভ ভালোলাগা জানান তাঁদের উপর স্বভাবতই রাগ হয় লেখকমাত্ররই।

সেই স্বর বললো, আমি বাংলা ভালো জানি না। মাত্র তিনটে বই পড়েছি।

আমি তবুও কঠিন গলায় বললাম, কী কী বই ?

যেন পাঠিকাকে তার আন্তরিকতার পরীক্ষায় বসাচ্ছি আমি।

ও তিনটে বইয়ের নাম করলো। দুটি বই পনেরো বছর আগে প্রকাশিত। একটি সাম্প্রতিক।

প্রথম পরীক্ষায় যখন সে পাশ করলো তখন বললাম, আমার এই টেলিফোন নাম্বার ত ডাইরেকটরীতে নেই। এ তো আনলিস্টেড। তুমি আমার নম্বর পেলে কোথায় ?

আমাকে আমার এক বন্ধু দিয়েছে। বন্ধু নয়, দিদি বলি ; কিন্তু বন্ধুই।

নাম কি তার ?

শিখা। শিখা রায়।

কি করে সে ?

যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

শিখা বলে কাউকে আমি চিনি না। আমার এক বন্ধু-পত্নীর নাম শিখা। সে আর্কিটেক্ট। যাদবপুরে কখনোই পড়েনি।

আমি বুঝলাম না এই শিখা কে ?

বললাম, তুমি কি পড়ো ?

আমি ? আমি কলেজে পড়ি। বোম্বেতে। এখানে এসেছি আমার দীদার বাড়িতে।

তোমার দীদার বাড়ি কোথায় ?

বালিগঞ্জে।

বালিগঞ্জে কোথায় ?

কী জানি ? আমাকে নিয়ে এসেছে। ছাত থেকে মিলিটারী ক্যাম্প দেখা যায়। আমি এখানে থাকবো না, চলে যাব ; আমার ভালো লাগে না।

কোথায় চলে যাবে ?

যেখানে হয়। আমি ওদের বাড়ির লিফট্‌ম্যানকে বলে রেখেছি যে, একদিন আমি একা-একা নেমে এসে হারিয়ে যাব।

কোথায় হারিয়ে যাবে ?

যেখানে হয়। তুমি দেখো, ঠিক হারিয়ে যাব।

আমার মনে হলো মেয়েটির মাথায় গোলমাল আছে। কিন্তু ওর গলার স্বর এমন পবিত্র, আন্তরিক, এত নির্ভরতার প্রত্যাশায় ভরা যে, ও যে পাগল একথা বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করছিলো না।

বললাম, তোমার মা-বাবা কোথায় থাকেন ?

বাবা এখন স্টেটস্-এ গেছেন। আমার মা পোলিশ। বাবা বাঙালি।

তারপর আমাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বললো, জানো, আমি আর আমার

মা যখন জুহুবীচের সামনে রোজ বিকেলে হাঁটি, যখন ফেনায় ভরে যায় সমুদ্র : তখন আমার মা বলেন আমি ঐ ফেনা থেকে এসেছি।

জানো ?

আমি অবাক হলাম। কলেজে পড়া মেয়ে, সারসের গল্প, ফেনার গল্প এখনও বিশ্বাস করে বলে . নাকি, কেউ বোকা লেখককে নিয়ে রসিকতা করছে ?

ও আবার বললো, জানো, আমাদের বোম্বের বাড়ির বসার ঘরে ইন্‌গ্রেসের একটা ছবি আছে, কী সুন্দর ! নিউড্। মা বলেন, ঐ যে ভগবান।

একটু চুপ করে থেকে বলল, ভগবান খুব সুন্দর, না ?

আবার বলল, মা তো পোলিশ। মা আমাকে ডাকেন তানিয়া বলে। তানিয়া একটা পোলিশ ফুলের নাম। ভালো না ?

আমি বললাম, ভালো।

ওর বাংলাটা একটু আড়ষ্ট। বাংলা যে খুব ভালো জানে না, বুঝতে পারছিলাম কেন জানি না, এই আশ্চর্য অপরিণত অথচ অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠের মেয়েটির প্রতি, ওর কথা বলার ধরন ও বক্তব্যেতে ধীরে ধীরে আগ্রহী হয়ে উঠছিলাম। ওর গলার স্বরটি কোনো ফুলে ফুলে ভরা সবুজ উপত্যকার ছোট্ট চিকণ পাখির মত। শুধু গলার স্বর শুনেই মনে হচ্ছিল ও কোনো সাধারণ মেয়ে নয় ; ও কোনো বিশেষ মেয়ে।

ও বলল জানো, আমি ফুল খুব ভালোবাসি। আমি আর আমার মা দুজনে মিলে গার্ডেনিং করি। মা বলেন, "আমো রোজাম।" ল্যাটিন মানে জানো ?

আমি বললাম, না।

মানে, আমি ফুল ভালোবাসি। তুমি ফুল ভালোবাসো ? তোমাকে ফুল পাঠাবো রোজ রোজ বোম্বে থেকে। আমি মায়ের সঙ্গে পোল্যান্ড চলে যাব। জানো, আমার মা আর বাবার ঝগড়া। তাই মা বলে, বাবাকে ছেড়ে আমাকে নিয়ে পোল্যান্ডে চলে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে তারপর বললো ও, পোল্যান্ড থেকে তোমার জন্যে প্রেজেন্ট নিয়ে আসবো।

তারপরই বললো, তুমি কত বড় ?

আমি বললাম, আমি বুড়ো।

কক্ষনো না। তুমি বুড়ো হতেই পারো না। আমি বলছি, তুমি কক্ষনো বুড়ো হবে না। মা বলেন কেউ কোনোদিনও বুড়ো হয় না যদি যদি···

যদি কি ?

যদি তুমি যখন খুব রেগে যাও তখন যদি খুব হেসে ওঠো, খুব হাসো ; তাহলে তুমি কক্ষনো বুড়ো হবে না। তুমি তাই করবে তো ? কক্ষনো রাগবে না। আর যদি রাগোও তাহলে খুব হাসবে। তুমি মোটেই বুড়ো নয়। বুড়ো হলে বুঝি আমি···

তুমি কি ?

না থাক।

বলো না।

আমি কি তাহলে তোমাকে ফোন করি ? তুমি আমার প্রিন্স চার্মিং !

লাইনটা হঠাৎ ক্রশ কানেকশান্ হয়ে কেটে গেল। কেটে যাওয়ার আগে আমি ওকে শুধোলাম তোমার নাম বললে সাহা, সাহা ত সারনেম তোমার ইনিশিয়ালস কি ?

ও বলল, আমার নাম স্বাহা।

তারপর আস্তে আস্তে, কেটে কেটে : ইংরিজিতে বানান করে বলল, SWAHA সংস্কৃত। মা আমাকে সংস্কৃত শিখতে বলেন।

লাইনটা কেটে গেল।

তন্দ্রাবিষ্ট যুবক—আমি যৌবনের ক্ষয়িষ্ণুতার কথা ভাবছিলাম অবচেতনে। সব যুবাই একদিন প্রৌঢ় হয়, সব প্রৌঢ়ই একদিন বৃদ্ধ। এই নিয়মে দুঃখজনকভাবে অভ্যস্ত হতে হবেই একদিন তাইই ভেবেছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে কোন যৌবনের দেবদূতী এসে আমাকে জাগিয়ে গেল ? কোন্ স্বরে, কানে আমার কোন্ মন্ত্র দিয়ে গেল সে ?

বলল, রাগ হলে খুব হাসতে হবে। বলল, আম্মো রোহাম্। বলল. ফুল পাঠাবে, ভালোবাসার ফুল। লাল গোলাপ। ইনগ্রেসের নিউড্ ছবির কথা বলল।

আমি খুব খারাপ হয়ে গেলাম মুহূর্তের জন্যে। আমি ভগবান নই ; মানুষ। বিবস্না ইনগ্রেসের ছবির উপর অদেখা স্বাহার কল্পিত চেহারাটা বসিয়ে ফেললাম মনে মনে।

যার গলার স্বর এত ভালো সে না জানি কত বিধুর সুন্দরী। কে জানে কেমন তার চোখ, তার ভুঁরু, তার চোখের পাতা, তার ঠোঁটের গড়ন ? সে কী বেণী বাঁধে ? না কোমর সমান চুল তার ? চুলে কোন তেল মাখে সে ? কেমন তার বাস ? নাকি তার চুল বব করা ? কেমন তার চুলের রঙ ? হাসলে কি তার গালে টোল পড়ে ? তার দাঁতের সারি কি সমান ? উজ্জ্বল সাদা ? কেমন সাদা ?

আমার প্রেসার বেড়ে গেল। কিংবা জানি না. হয়তো নেমে গেল। আমি উঠে পড়ে জানলার পাশের ইজিচেয়ারে বসে পাইপ ধরালাম।

বাইরে শীতের দিন ছুটি নিচ্ছিল। বড় বিষণ্ণতা চারদিকে। কেমন এক ম্লান ; ক্লিষ্ট সৌন্দর্য। একটা মৌটুসী পাখি এসে আঙুরের লতায় বসল ? তারপর আঙুর ঠুকরে, টক দেখে উড়ে গেলো। উড়ে যাবার আগে একবার সংক্ষিপ্তস্বরে রেশমী চাবুকের মত হঠাৎ ডেকে গেল। স্বাহার গলার স্বরের মত। উদাস করে গেল আমাকে। আমি ভাবছিলাম, কে এই স্বাহা ? ও কি স্বপ্ন ? না সত্যি ?

ওর গলার স্বরে কী জানি কেমন এক অপার্থিবতা ছিল, এত ক্ষীণ গলায় ও কথা বলছিল কেন ? যেন কত দূর থেকে—এমন কোথাও থেকে, যেখানে পৃথিবীর কোনো কলুষ পৌঁছয়নি। ছল, চাতুরী, ভণ্ডামি, ভড়ং, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, ডিজেলের ধুঁয়ো কিছুই যেখানে নেই এমন কোনো জায়গা থেকে। কী আন্তরিক, পবিত্র, গা-শিউরানো ওর গলার স্বর।

ভাবছিলাম, আমি কি পাগল হলাম ? অমি কি এই শেষ যৌবনে এসে অদেখা, অচেনা, অজানা এক দেবদূতীর কণ্ঠস্বর শুনেই তার প্রেমে পড়লাম। ছিঃ ছিঃ।

কিন্তু ও যে বলে গেলো আমি কোনোদিনও বুড়ো হবো না। হমন করে কেউই বলেনি। ও যে বলে গেলো শুধু হাসতে। রাগলেই, হেসে উঠতে।

সেই আশ্চর্য, কোমল সজীব মধুর কণ্ঠের পরী আমাকে বলে গেলো একটু আগেই যে যৌবন বা বার্দ্ধক্য কোনো বিশেষ শারীরিক অবস্থা নয়। "আম্মো রোজাম্" বলতে পারার মতো কোনো মানসিক অবস্থাকেই যৌবন বলে।

কাল রাত থেকে জ্বর হয়েছে আমার । দুপুর বেলা একা ঘরে জ্বরের ঘোরে কোথায় যেন ভেসে চলেছি আমি । কারা যেন কথা কইছে কানের কাছে ফিসফিস করে । তাদের কথার মানে বুঝি না, কিন্তু তাদের ফিসফিসানি কত কী অস্পষ্ট স্মৃতি এবং কল্পনা বয়ে আনে মনে ।

কিন্তু একা থাকলে, অসুস্থ থাকলে তো বটেই ; জানলা দিয়ে যমদূত হাতছানি দেয় । আজকাল প্রায়ই আসে সে । সে খুব সুন্দর । সে মোটেই খারাপ দেখতে নয় । কী উজ্জ্বল তার চেহারা ! কী শান্ত তার মুখের ও চোখের ভাব । সেইই শাশ্বত । সেই আদি এবং অনন্ত । জীবনের ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্রতাকে সেইই ত অসীমতা দান করে, মুক্ত করে পাখিকে, উদার আকাশে । সে যে মুক্তির দূত । তার সঙ্গে আমার কথা হয় । কত কথা ।

আমি বলি, তাড়াতাড়ি করো । যে-পারে আমার আসল আবাস নয়, সে-পারে বেশীদিন থেকে সময় নষ্ট করে লাভ কি ? আমার ঐ পারেই ভরসা বেশী । এই পারেতেই ভয় ।

ও হাসে, আর বলে, জয় ! অজানার জয় !

আমি নিরুচ্চারে গান গাই : 'দু দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে, তাইতে যদি এতই ধরে ! চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময় ?'

ও হাসে, আর বলে, জয় ! অজানার জয় !

ফোনটা আবার বাজল ।

স্বাহা ।

স্বাহা বলল. কী করছো তুমি ?

বললাম, শুয়ে আছি, জ্বর ।

খুব জ্বর ?

দেখিনি কত জ্বর ?

ও বলল, অসুখ মানে কি ? তুমি জানো ?

আমি বললাম, অসুখ ।

তুমি বোকা । সুখের অভাবকেই অসুখ বলে ।

বললাম, ঠিক বলেছো । কী খেয়েছ ? তুমি ?

খাইনি কিছু । কিছু একটা খাবো ।

ওমাঃ, এখনও খাওনি ? দুটো বাজে । তুমি কেমন মানুষ গো ? তোমাকে দেখার কেউ নেই ?

কাউকে দেখারই কি কেউ থাকে ? নিজেকেই নিজের দেখতে হয় । আমরা সকলেই ত একা । একা আসা ; একা যাওয়া । মিছিমিছি আমার অনেকে আছে বলে ভুল ভাবা কি ভালো ? কারোই কেউ থাকে না । এক ভগবান ছাড়া । আমরা সকলেই একা । বড় একা ।

ও বলল. বেচারী ! আমি যাই তোমার কাছে ? ফুল নিয়ে যাই ? আমি ফ্রায়েড এগস্ বানাতে পারি । জানো । তোমাকে খিচুড়ি আর ফ্রায়েড এগস্ বানিয়ে দেব । সামনে বসে খাওয়াব তোমাকে । কত যত্ন করে খাওয়াব । দেখো তুমি ।

আমি বললাম, অন্য কথা বলো ? তুমি কেমন আছো ?

ও হঠাৎ বলল, লিউকোমীয়া কি গো ?

আমার বুকটা ধ্বক্ করে উঠলো । বললাম, জানি না ।

ও বলল, আই হ্যাভ ওভারহার্ড মাই পেরেন্টস্ । বাবা আমার রক্ত নিয়ে স্টেটস-এ

গেছে। ওটা কি অসুখ গো ?

বললাম, যে অসুখই হোক, তোমার তা হয়নি।

আমার বুকের মধ্যে সেই অদেখা মেয়ের জন্যে কী যেন করে উঠলো। আমি মনে মনে বার বার বলতে লাগলাম যে, তুমি তোমার সব অসুখ আমাকে দিয়ে দাও স্বাহা। আমি তোমার সব অসুখ শুষে নেবো তোমার মুখ থেকে, রক্ত থেকে। তুমি এসব খারাপ অসুখের নাম মুখেও এনো না।

ও বললো, তুমি জানো কী করে ? যে হয়নি ?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই জানি।

তুমি বলছ ?

আমি বলছি।

তুমি কী ভালো গো। তুমি যেমন করে কথা বলো, তেমন করে সকলে বলে না কেন বলো তো ? তোমার মত যদি সকলে হতো !

তারপরই বললো, আমি ভালো ?

খু-উ-উব।

আমি বললাম।

তারপর বললাম, তুমি Sweety Pie!

তুমি পরী।

পরী কি গো ?

পরী মানে Fairy!

তাইই।

তারপর একটু চুপ করে বললো থ্যাঙ্ক উ্য !

স্বাহা বললো, তুমি গান গাইতে পারো ?

পারি। একটু একটু।

শোনাবে ?

তুমি আগে বলো, তুমি নিজে গাইতে পারো কিনা।

পারি। কিন্তু বাংলা গান আমি জানি না। সব ইংরিজী গান।

তাইই শোনাও।

আমি খুব আস্তে গাইবো কিন্তু ! আমার কথা বলতে কষ্ট হয়। হাঁফিয়ে যাই।

বললাম, ঠিক আছে। আস্তেই গাও।

তারপরই ও গাইতে আরম্ভ করল।

এমন গান কখনও শুনিনি। কী সুন্দর সুরে-বসা গলা। কী দরদ ! আবেগ ! কী আশ্চর্য অস্পষ্ট স্পষ্টতা।

মনে হল, স্বর্গ থেকে কোনো পরীই গাইছে বুঝি।

"Why are the stars so bright
Why is my heart so light
Why is the sky so blue.
Since the hour I met you!
Flowers are smilling bright
Smiling for all delight

Smiling so tenderly
For the world, you and me!"

বললাম, কার গাওয়া গান এটা ?

ও বললো, তুমি কে গো ? আমার !

না, না, কার গান ?

ও বললো, পেটুলা ক্লার্ক !

আরেকবার গাও তো, লক্ষ্মীটি ! আমি টেপ করব।

টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে এলাম। রিসিভারের সঙ্গে মাউথপীসটাকে লাগিয়ে দিলাম। বললাম, গাও।

ও গাইতে লাগল। রিসিভারের কাছে কান নিয়ে ওর গান শুনতে লাগলাম আমি।

গান টেপ হয়ে গেলে ও রিনবিনে ফিস্‌ফিসে গলায় কত কথা বলতে লাগল। মোহাবিষ্টের মতো আমি ওর কথা শুনতে লাগলাম। কত সব শিশুসুলভ এলোমেলো অথচ কী আন্তরিক সব কথা।

একবার বললো, তুমি খাবে না ?

আমি বললাম, তোমার কথা শুনে এতো ভাল লাগছে যে, খিদে নেই আর। জ্বরও বোধহয় নেই।

ও বললো, জানো, এখানে কী ঝাল রান্না ! আমি খেতে পারি না। আমার দীদা আমাকে খুব ভালোবাসে। দীদা আমাকে ডাকে ফুলটুসী বলে। ফুলটুসী মানে কি ?

একটা পাখির নাম।

এরকম নাম কেন ?

ফুলে টুশ্‌কি দিয়ে মধু খায় বলে।

ওঃ কী ভালো ! বাঃ, আমিও ত ফুল ভালোবাসি।

তারপর বললো, আমি হাত দিয়ে খেতে পাবি না তাই সকলে আমাকে বকে। আমি হাত দিয়ে খেলে ডান হাত বাঁ হাত দু হাত লাগাই তাতেও সকলে বকে। আজকে না, আমি আমার বাঁ হাতটা পিছনে রেখে শুধু ডান হাত দিয়ে খেয়েছি।

তারপর বললো, আমার গলায় বোনস্ ফুটে গেছিল। জানো ?

আমি বললাম, ইস্‌স্ ! কাঁটা ? এখন বেরিয়ে গেছে তো ?

হ্যাঁ। কিরকম বাঁকা বাঁকা বোন্‌স।

বোন্‌স নয়। বলে কাঁটা।

ও বললো, তাই বুঝি ? কাওয়াই মাছে এত কাঁটা ?

কাওয়াই নয় ; কই।

ও বললো, থ্যাঙ্ক উ্য। তুমি কত কী শেখালে আমাকে। তুমি ভীষণ ভালো।

হঠাৎ বললো, লিউকোমীয়া কী অসুখ গো ?

আবার আমার বুকের মধ্যেটা ধ্বক্ করে উঠল।

বললাম, হবে কোনো অসুখ। অসুখের কথা এখন থাক। তার চেয়ে সুখের কথা বলো।

ও বললো, তোমার হলুদবসন্ত বইয়ের প্রথমে তুমি এই কবিতাটি লিখেছো ?

কোন্ কবিতা ?

"সুখ নেইকো মনে,
নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে

হলুদ বনে বনে।"

বললাম, আমার কবিতা না। ওটা কোটেশান।

যাই-ই হোক। কী ভাল কবিতাটা! আমার খুব ভাল লাগে।

তারপর বললো, তুমি গান শোনালে না?

আমি আমার প্রিয় গায়ক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটা গানের দু লাইন ওকে শোনালাম।

"তুমি অবসর যদি পাও
আমার দুয়ারে ক্ষণিকের তরে
বারেক এসে দাঁড়াও।"

ও বলল, লাভ্‌লী। কী ভালো গাও তুমি!

তুমি তো আমার সবই ভালো দেখছো!

দেখছিই তো!

তারপর বললো, জানো! আমি এখান থেকে পালিয়ে তোমার কাছে চলে যাবো।

বললাম, বেশ তো!

তোমার তাহলে কী মজা হবে বলো? ফুলও তোমার, মালীও তোমার। আমি গার্ডেনিং করবো, তোমাকে ফ্রায়েড এগস্ রেঁধে খাওয়াবো।

তারপর একটু চুপ করে থেকে যেন অন্য জগৎ থেকে বললো, হঠাৎই; আমাকে ভালোবাসবে তো তুমি?

বললাম, খুব বাসব। খু-উ-ব।

সেদিন তুমি বলেছিলে, ভগবান চাঁদে আছে, পাখিতে আছে, ফুলে আছে, কথাটা খুউব ভাল লেগেছিল? আচ্ছা, ফুলটুসী যদি পাখি হয় তাহলে আমি তানিয়া, ফুল আর পাখিও? ফুল আর পাখি দুইই আমি! কী মজা?

আমি বললাম, তুমি তাইই তো!

ও কিছুতেই ওর টেলিফোন নাম্বার ওর দাদু-দীদার নাম, বাড়ির ঠিকানা আমাকে দিলো না। প্রথম দিনও দেয়নি। লিউকোমীয়ার কথা শুনেই আমার বুকে ওর জন্যে বড় আশঙ্কা আর ভয় জমে উঠেছিলো। ও যে ইচ্ছে করে দিলো না তা মনে হলো না। মনে হলো, ও জানে না, অথবা ওর দেওয়ার উপায় নেই। মনে হচ্ছিলো ও যেন কোনো বন্দিনী পরী। মর্ত্যে এসে ওর ডানা গেছে কাটা। কোনো উঁচু বাড়ির কোনো বন্ধ ঘরে ওর পবিত্র মন শরীর সমেত বন্দী দশায় ও যেন বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

ও বললো, কথা বললে আমার বড় কষ্ট হয় গো! হাঁফিয়ে যাই আমি। দীদা আর কাকীমা যদি জানে আমি তোমাকে ফোন করেছি, এত কথা বলেছি; তাহলে খুব বকবে আমাকে। কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলতে কী ভালো লাগে আমার। যা কিছু ভালো লাগে, তা এতো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় কেন বলো ত?

আমি একটু চুপ করে থাকলাম।

ভারী খারাপ লাগছিলো আমার।

ও বললো, চুপ করে আছো কেন? কথা বলো না?

তারপরই আবার বললো, যা কিছু ভালো লাগে তাইই এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় কেন গো?

না-ফুরোলে আবার ভালো লাগায় ভরবে কি করে?

ঠিক বলেছো। তুমি কী ভালো। বলেছি না, তুমি আমার প্রিন্স চার্মিং! তোমার বুদ্ধিই আলাদা!

ছাড়ছি। পরে ফোন করলে আমার সঙ্গে কথা বলবে ত? প্রমিস্? প্রমিস করতে হবে কিন্তু!

আমি বললাম, প্রমিস্।

স্বাহা ফোন ছেড়ে দেওয়ার পরই টেপ রেকডর্টারটাকে রি-ওয়াইন্ড করে আমি বাজালাম ওর সেই গানটা শুনব বলে। আশ্চর্য! ওর গান রেকর্ডই হয়নি? কী সব বিশ্রী আওয়াজ! কোনো কর্কশ পাখির ডাক। কত সব অজাগতিক শব্দ। পৃথিবীর অনেক পাখির ডাকই আমি চিনি কিন্তু এ কোনো পৃথিবীর পাখির ডাক নয়। পৃথিবীর কোনো পরিচিত আওয়াজের সঙ্গেই ওর গানের বদলে যা রেকর্ডেড় হয়েছে তার সঙ্গে মেলানো যায় না একটুও; একটি কথাও ওঠেনি ওর গানের!

আমি কম্বল ফেলে দিয়ে বিছানাতে উঠে বসলাম। টেপ্‌টাতে চাইকোভ্‌স্কির একটা বিখ্যাত কম্পোজিশন্ ছিলো। আগে পরে তা-ই আছে। শুধু যেখান থেকে স্বাহার গান টেপ করেছিলাম, সেইখান থেকে কিছুটা জায়গায় ঐসব শব্দ।

স্বাহা কি এ পৃথিবীর নয়? ওর গলার আশ্চর্য অপার্থিব মধুর স্বর, ওর ইনোসেন্ট, পিওর ব্যক্তিত্ব আমাকে মোহারিষ্ট, আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ও কি অশরীরী?

॥ ৩ ॥

আর কোনোদিনও স্বাহা ফোন করেনি। উদগ্রীব হয়ে ছিলাম, থাকতাম; প্রতিদিন। নাঃ আর একদিনও ফোন এলো না।

ওর শেষ ফোন আসার মাসখানেক বাদে অফিস থেকে ফিরছি একদিন, রাত সাড়ে সাতটা বাজে। পার্ক স্ট্রীট আর ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি থেমেছে, হঠাৎ আমার গাড়ির পাশের একটা সাদারঙা ভোক্সওয়াগান গাড়ির পিছনের সীটে চোখ পড়লো। উজ্জ্বল চোখসম্পন্ন একটি অল্প বয়সী মেয়ে কাঁধ এলিয়ে পিছনের সীটে বসে আছে। তার বব্ করা চুল, তার চোখের দৃষ্টির সমস্ত ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও সে যেন কত দূরে পৃথিবীর সব দিগন্তরেখার ওপারে চেয়ে আছে।

আমি ভাবলাম, এই কি স্বাহা?

কে যেন আমার মাথার মধ্যে বলে উঠলো, এই স্বাহা।

উর্দিপরা ড্রাইভার সেই গাড়ি চালাচ্ছিল।

আলো সবুজ হতেই গাড়িটার পিছন পিছন যেতে লাগলাম গাড়ি চালিয়ে। আমাকে যেন নিশিতে ডেকেছিল গাড়িটা গুরুসদয় রোডের একটা মাল্টিস্টোরিড বাড়িতে ঢুকলো। আমিও গাড়িকে ঢোকালাম। আমার গাড়ি ঐ গাড়ির পাশে দাঁড় করালাম।

মেয়েটি নামলো. নেমে, ড্রাউভারকে হিন্দীতে কি যেন বললো।

আমি বুঝলাম এ স্বাহা নয়: হতেই পারে না। এ নিজেকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধেও সচেতন। ও সচেতন নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে। ও এই পৃথিবীরই অন্য কোনো আবিল সাধারণ; র্সতর্ক মেয়ে। ও আমার স্বাহা কখনোই নয়।

বড় মনমরা হয়ে আমি ফিরে এলাম।

আরও মাসখানেক পরে রাসবিহারী অ্যাভিন্যু ধরে ছুটির দিন সকালে হেঁটে যাচ্ছি।

একটা দোতলা বাড়ির চওড়া বারান্দায় শীতের রোদ পোয়াচ্ছিলো শাড়ি পরা একটি অল্প বয়সী মেয়ে, ইজিচেয়ারে বসে, তার কোলের উপরে রাখা ছিল কোনো বই।

আমার বই কি ?

মেয়েটির মুখ রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছিলো না। কিন্তু তার বসার ভঙ্গির মধ্যে বড় একটা অসহায় আতুর ভাব ছিল। মনে হচ্ছিলো এই পৃথিবীর ডিজেলের গন্ধ-ভরা নিঃশ্বাস নিতে ওর কষ্ট হচ্ছে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

মেয়েটি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে কাকে যেন কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল, ঠাকুর, বাজার থেকে ফেরার সময় আমার জন্যে গুপ্ত ব্রাদার্স থেকে দহি-কচুরি এনো।

আমি বুঝলাম যে, এও স্বাহা নয়। এ স্বাহা হতেই পারে না।

যদি স্বাহার সত্যিই লিউকোমীয়া হয়ে থাকে ? আমার কি কিছুই করণীয় নেই ?

স্বাহা যদি পৃথিবীর মেয়ে হয় তাহলে আমি কি রোজ অফিস-ফেরত ওর জন্যে লাল গোলাপ নিয়ে গিয়ে বসতে পারতাম না ওর পায়ের কাছে ? ওকে বলতে পারতাম না যে, মৃত্যু তোমার জন্যে নয়, আমি থাকতে মৃত্যু তোমাকে নিতে পারবে না। ওর সব অসুখ শুষে নিয়ে আমি কি ওকে বাঁচাতে পারতাম না ?

ওইই তো বলেছিলো, অসুখ মানে জানো ? সুখের অভাব।

ওর মা-বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের অসহায়তার ভার কি একটুও লাঘব করতে পারতাম না আমি ? এই অসহায় লেখক ?

কত কী যে বলার ছিল স্বাহাকে আমার। আমার ঘুমভাঙানীয়া, সুখজাগানীয়া; দুখজাগানীয়াকে কত যে গুন গুন গান শোনাবার ছিল। কিছুই ত হলো না।

কাল মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে উঠে জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। অন্ধকার আকাশে কত গ্রহনক্ষত্র। কত বিচিত্র তাদের অয়নপথ। কত বিচিত্র লীলাখেলা চলেছে সৃষ্টির আদি থেকে এই রহস্যময় পুরোনো কিন্তু চিরনতুন অসীম ব্রহ্মাণ্ডে। কত কোটি যোজন দূরে মিটমিট করছে কত নাম-জানা ও নাম-না-জানা তারারা।

স্বাহা কি কোনো তারা ? তারার নামেই তার নাম ?

আমার বুকের মধ্যে বড় কষ্ট। আমি বললাম, স্বাহা !

ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন বললো, ফিসফিস করে, তোমাকে আমৃত্যু খুঁজেই বেড়াতে হবে তাকে। তুমি শান্তি পাবে না, বিশ্রাম পাবে না, ঘুম কেড়ে নেবো আমি তোমার চোখ থেকে।

পরীর অভিশাপ লেগেছে তোমার।

আমি নিরুচ্চারে বললাম, তা লাগুক। শুধু আমি যদি জানতে পেতাম যে, স্বাহা ভালো আছে। তার লিউকোমীয়া হয়নি। এবং যদি কেউ একজনও আমাকে বলতে পারতো যে, অনেক দূরের সুন্দর অধরা স্বর্গের পরী নয় সে কোনো। স্বাহা এই ধূলিধূসরিত ব্যবহারমলিন আমার পুরোনো পরিচিত পৃথিবীরই দোষে-গুণে—মেশা একজন রক্ত মাংসর মেয়ে। বড় ভালো মেয়ে !

আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, যতদিন বাঁচব, ততদিন ও আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। আমি এও জানি যে, আমার নিজের রক্তেও এক সাংঘাতিক দুরারোগ্য অসুখ এসে বাসা বেঁধেছে।

আমার শ্বেত ও লোহিত রক্ত কণিকাগুলোর প্রত্যেকটির রঙ ডালিয়া ফুল আর ফুলটুসী

পাখির রহস্যময় মিশ্র রঙে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে সেই পরী।

আমার এই মৃত্যুবাহী অসুখের নামও স্বাহা।

লেখকের নিবেদন :

[যদি কোনো পাঠক-পাঠিকা স্বাহার খোঁজ বা খবর জানাতে পারেন তো অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো। এই ঘটনাটি পুরোপুরীই সত্যি !]

এজমালি

জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগেই। দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে একবার দেখলো সূর্য। নাঃ। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে একেবারে।

দশ ট্রাক জ্বালানি-কাঠ ঢেনকানল থেকে এনে আজই গোলার হাতারমধ্যে আনলোড করেছে হরজিত সিং ট্রাকওয়ালা। সেগুলো শেড্-এর নীচে নেওয়া গোলো না কুলিরা সব পরবের জন্যে ছুটি নিয়ে চলে গেলো বলে। কাঠগুলো সব ভিজে একসা হয়ে গেলো। দু-তিন দিনের কড়া রোদ পেলে তবেই শুকোবে না-শুকোলে শেড্-এর নীচে তোলাও যাবে না। ফরেস্ট করপোরেশানের কাঠগুলোও এসে যাবে মনে হয় কালকের মধ্যেই। এদিকে বৃষ্টিরও ছাড় নেই। কতদিন পরে যে আকাশ আজ পরিষ্কার হলো! আবার কখন নামবে কে জানে!

চালান করে মালগুলো পারিজাবাবুর আর শশধরবাবুর করাত-কলে পাঠাতে হবে পড়শু-তড়শুর মধ্যেই। কতরকম যে কাজ থাকে তা বলার নয়। দিনের শেষে নিজেকে মনে হয় ঝড়ের মধ্যে-পড়া ডানা-ভাঙা কোনো পাখি।

মেজভাই চাঁদ চলে গেছে পাঁচটার সময়ে। পুজোর নাটকের মহড়া শুরু হয়ে গেছে ওদের ক্লাবের। বাখ্‌রাবাদ ক্লাব এবারে ভদ্রক থেকে খুব ভালো যাত্রা আনছে। চাঁদরা "ছত্রপতি শিবাজী" করবে। এখন থেকে রোজই বিকেল পাঁচটাতেই চলে যাবে চাঁদ। পুজোর মাত্র দেড়মাস বাকি। সবচেয়ে ছোট ভাই তারা তো রোজ আসেই না। খুশি হলে আসে, নইলে নয়। যেদিন আসে সেদিন দুজনেই খেতে যায় বাড়িতে বারোটা নাগাদ। ঘুমিয়ে-টুমিয়ে ফেরে তিনটে নাগাদ।

দোকানের দরজা বন্ধ করে তালাগুলো সব লাগালো সূর্য। তারপর তালাগুলোর উপরে পাকানো-কাগজে আগুন জ্বেলে আরতির মতো করলো। বাবা ব্রহ্ম সেন হাতে ধরে তাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছিলেন। এই রিচুয়াল্। বিশ্বাস করে কি না জানে না নিজেই, তবু করে আসছে তিরিশ বছরের চেয়ে বেশি। কৃপাসিন্ধু আর বাইধর তালাগুলো টেনেটুনে দেখে নিলো ঠিকমতো আটকেছে কি না! চাবির তোড়াটা থলেতে পুরে সাইকেলের ক্যারিয়ারের স্প্রিং-লাগানো ঢাকনার নীচে রাখলো। তারপর বললো, কাল সকাল আটটার সময়ে আসবোরে বাইধর।

কৃপাসিন্ধু বললো, আমিও চলে আসবো আটটারই মধ্যে। কেন্দ্রাপাড়া আর নুয়াগড় থেকে মালও যে আসবে কাল সকাল আটটা নাগাদ।

ক' ট্রাক? আগেতো বলোনি কৃপাসিন্ধু!

সূর্য শুধোলো।

বলবো কি বড়বাবু ! আপনার কি নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিলো ?

কেন্দ্রাপাড়া থেকে দু ট্রাক আর নুয়াগড় থেকে তিন ট্রাক।

কি কাঠ রে ?

ভালো কাঠ আর কোথায় কাছে বাবু দেশে ? সরু সরু শাল আর কিছু রস্‌সি আসবে কেন্দ্রাপাড়া থেকে। মিটকুনিয়া, সাহাজ আর বুনো আম আসতে পারে নুয়াগড় থেকে।

হুঁ।

সূর্য স্বগতোক্তি করলো। মাঝেমাঝে ওর মনে হয় প্রকৃতির দেবতা বোধহয় কোনোদিন তাদের পুরো পরিবারকেই সাংঘাতিক শাস্তি দেবেন নিবিড় অরণ্যকে দুই পুরুষ ধরে এমনভাবে নষ্ট করার জন্যে ! নষ্ট এমনিতেই হতো। ওরা নিমিত্ত মাত্র। মানুষের লোভ আর মানুষের সংখ্যাই সুন্দর সবকিছুকেই একেবারেই নষ্ট করে দেবে যে, সে বিষয়ে সূর্যর কোনোই সন্দেহ নেই।

সাইকেলে উঠলো সূর্য। ওরাও যার যার সাইকেলে উঠলো। কাঠগোলা প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ মহল্লা ছাড়িয়ে এসে অন্য মহল্লাতে পড়লো। সেখানেরও প্রায় সব দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। পথে বেশি লোকজনও নেই। কাঠজুরি নদীর পারের রাস্তায় কিছু লোক আর ফেরিওয়ালা আছে। বেশিই কলেজের ছেলে মেয়ে। নদীপারের চওড়া রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ওদের পাড়ার কাঁচারাস্তাতে ঢুকতেই নদীর জলের আর নদীর পারের রাস্তার মিশ্র কলরোল আর কোলাহল থেমে গেলো।

নায়েকবাবুর বড় মেয়ে সরস্বতী রোজকার মতো আজও রিয়াজ করছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো কাফী ঠাঁটের কোনো রাগ। এখন আর তেমন ধরতে পারে না সূর্য। সুনন্দা পট্টনায়েকের কাছে নাড়া বেঁধেছে সরস্বতী।

রোজই দোকান বন্ধ করে ফেরার সময় যখন নায়েকবাবুর বাড়ির সামনে আসে তখনই ওর মনটা খারাপ হয়ে যায়। ও নিজেও ক্লাসিকাল গান শিখতো একসময়। র‍্যাভেনশও কলেজে পড়াশোনাও করতো। পড়াশুনোতে কিছু খারাপও ছিলো না। বাবার একবার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হলো। তখনই কলেজ ছাড়িয়ে ওকে ব্যবসাতে ঢোকালেন উনি। বাবা, ব্রহ্মা সেন বলতেন, ব্যবসারদের ছেলেরা বেশি পড়াশুনো করলে তাদের গুমোর হয়ে যায়। আর গুমোর হলেই ব্যবসা মাটি। বেশি বিদ্বান ছেলেরা কি আর দোকানে বসতে চায় ?

ফলে, ইন্টারমীডিয়েট পরীক্ষাটা পর্যন্ত দেওয়া হলো না সূর্যর। গান-বাজনা করা তো দূরের কথা। বাবা বলতেন, ব্যাটাছেলে আবার গান গাইবে কি ? গান তো গায় বাঈজীরা ! সেই ব্রহ্মা সেনেরই অনেক পরিবর্তন এসেছিলো পরবর্তী জীবনে।

মেজ ভাই চাঁদ ঐ কলেজ থেকেই বি· এ· করেছিলো। কটকের নামকরা কলেজ। আর ছোট ভাই তারাও ঐ কলেজ থেকেই বি এ করে য়ুনিভার্সিটি থেকে পোলিটিক্যাল সায়ান্স-এ এম এ করেছিলো।

চাঁদ ও তারা যে বড় ভাই সূর্যর থেকে বেশি পড়াশুনো করেছে এ কারণে মাঝে মাঝে সূর্যকে অপ্রস্তুত হতে হয়। ভাইয়েরা কিছু বলে না কিন্তু ভায়েদের স্ত্রীদের কথাবার্তায় মাঝে মধ্যে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। সূর্যর স্ত্রী সাবিত্রী স্কুল-ফাইন্যাল পাশ। উত্তর কলকাতার এক ভালো বংশের পড়ে-যাওয়া-অবস্থার বাড়ির মেয়ে সে। মেজোভাই চাঁদের বউ ঝুমরীদের বাড়ি ভুবনেশ্বরে। ঝুমরীর বাবা ভুবনেশ্বরের একজন বড় ঠিকাদার। বেশ পয়সাওয়ালা

পরিবার। ঝুমরী নিজেও বি এ পাশ। ঝুমরীর বাবা অনেককিছু দিয়ে থুয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন বলে ঝুমরীর দেমাকও খুব। একটি ফিয়াট গাড়িও দিয়েছিলেন। সেটি বিক্রি করে দিয়েছে চাঁদ ক'দিন হলো। মারুতি বুক করেছিলো, অ্যালটমেন্টের চিঠি পেয়ে গেছে।

ছোট ভাই তারার স্ত্রী চুমকি দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে। সেখানকার কলেজেই পড়া। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুলের ডিপ্লোমাও আছে। তার পয়সার দেমাক নেই কিন্তু সংস্কৃতি এবং আধুনিকতার দেমাক আছে। ওড়িশাপ্রবাসী এই কাঠ-ব্যবসায়ী পরিবারে চুমকি যেন দয়া করেই এসেছে বউ হয়ে এমনই একটা ভাব।

সূর্য, নারায়ণের কাছ থেকে দুটি পান নিয়ে প্রায় জোর করেই গগনবাবুকে খাওয়ালো। গুণ্ডির পিক ফেলে বললো আরে, ওরা আজকালকার ছেলে, ওরকমই! যাইহোক, আমিই ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি। মার্জনা করে দেবেন। আমি তো আপনাকে কখনও অপমান করিনি।

আরে, আপনার কথা কে বলছে? আমি তো আমার ছোট ভায়েদের বলি সবসময়ই!

কী বলেন?

বলি, আমাদের এই কারবারে মানুষ ঐ একটাই আছে। সততা আর বিনয় আর কথার দামের আরেক নামই তো ব্যবসা। না কি? সেই যে সেবার পারাদীপের অত বড় সাপ্লাইয়ে কয়েক লাখ টাকা লোকসান দিলেন সে তো কথার দামেরই জন্যে, না কি? সবসময়ই বলি!

সূর্য হেসে বললো, কিসের লোকসান গগনবাবু? যে-সাপ্লাইয়ে লাভের কথা থাকে তাতে হয়ে যায় লোকসান আর যাতে লোকসানের কথা, তাতে লাভ। ডানহাতের তর্জনী তুলে উপরে দেখিয়ে সূর্য বললো, দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ঐ উপরে একজন যে বসে থাকেন, খতিয়ান মেলে; উনিই হরেদরে রেওয়া ঠিকই মিল করে দেন। ওঁর উপরে ভরসা রাখুন গগনবাবু, চিন্তাভাবনা ওঁর উপরে ছেড়ে দিন। নিজের বোঝা হালকা লাগবে। আমাদের নিজেদের হাতে কতটুকু আছে?

পান খেতে খেতে গগনবাবু আবার বললেন ছোটভাই তারাও কি আলাদা ফার্ম করলো নাকি? তারাও শুনি প্রায়ই জাজপুরে যায়। জাজপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি তো! ও-ও ওখানে একটা ধান্দা করছে মনে হয়। আপনি কি জানেন এ সব? একটু খোঁজ খবর রাখবেন সূর্যবাবু। দশটা গাধা মরে একটা বড় ছেলে হয়। আমাকে দেখে শিখুন। কী করলাম সংসারের জন্যে আর কী পেলাম।

সূর্য অনেকখানি গুণ্ডির পিক একবারেই গিলে ফেললো। বললো, আরে, গগনবাবু আমিই তো ওদের পাঠাই। এক ঝুড়িতে সবকটি ডিম রাখা কি ভালো? তাছাড়া, ওরা তো আমার মতো পুরোনো আমলের লোক নয়। ওদের ভাবনা চিন্তাই আলাদা; মডার্ন। তারাটাতো বলেছিলো, কম্প্যুটারের এজেন্সী নেবে। বিজনেস্ অফ দ্যা ফিউচার। আমি না হয় তেমন লেখাপড়া শিখিনি, ইংরিজি বলতে পারি না ফটাফট করে, খালপাড়ের এই কাঠগোলায় পড়ে থাকা ছাড়া আমার না হয় আর কোনোই উপায় নেই, তাবলে ওরা অন্য কিছু, নতুন কিছু করবে না কেন। ওদের বুদ্ধিসুদ্ধিই আলাদা।

গগনবাবু সূর্যর কথাতে একটু মনমরা হয়ে গেলেন। ভেবেছিলেন, ভায়েদের এই স্বার্থপরতাতে সূর্য আহত হবে। দু চার কথা বলেও দেবে ভায়েদের নামে।

বললেন, ও। আপনি তাহলে জানেনই সব। তাহলে তো ভালোই। খুবই ভালো! খুবই ভালো। ডাইভার্সিফাই করা তো ভালোই।

গগনবাবুর জীপ চলে গেলে সূর্য সাইকেলে উঠলো। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো। এসব কোনো কিছুই সূর্য জানতো না। ভাইয়েরা পারিবারিক ব্যবসায়ে তাকে সাহায্য না করে, ব্যবসায়ে ঢুকতে না ঢুকতেই নিজেদের আলাদা রোজগারের ধান্দা করতে শুরু করেছে অথচ ব্রহ্মা সেনের কারবারে তিনজনেরই সমান অংশ। কী করবে ! বাবা বেঁচে থাকলে অভিমান করে বাবাকে কিছু বলতে পারতো। কিন্তু বলেও লাভ বোধহয় হতো না। স্নেহ চিরদিনই নিম্নগামী। বাবা থাকাকালীনই সে কথা সূর্য বুঝতে পেতো ।ছোট ভায়েদের ব্রহ্মা সেন আলাদা চোখে দেখতেন। মাঝে মাঝেই সূর্যর মনে হতো ও বোধহয় বাবার সৎ ছেলে।

মা ও বাবার মৃত্যুর পর তাঁদের সিন্দুকে কী ছিলো না ছিলো তা ভায়েরা সূর্যকে কেউই কিছু বলেনি। সূর্যর জানবার কোনো ঔৎসুক্যও হয়নি কখনও। বাবার মৃত্যুর পরে বলেছিলো, মায়ের বাপের বাড়ি সম্বলপুর থেকে বাবাকে লেখা মায়ের কিছু চিঠি ছাড়া বাবার আলমারীতে আর কিছুই ছিলো না। মায়ের অসংখ্য দামী গয়না ছিলো, মা সাবিত্রীকে দেখিয়ে রেখেছিলেন, এই যে সাবু এইটে আর এইগুলো তোমার, আর এইগুলো হলো আমার বড় ছেলের মেয়ের, আমার ছায়া নাতনীর ! কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর চাঁদ ও তারা বলেছিলো, মায়ের কোনো গয়নাই ছিলো না। যতটুকু ছিলো তাতো একমাত্র বোন দরিয়ার বিয়ের সময়েই সব দিয়ে-থুয়েই গেছেন। ইনকানট্যাক্সের উকিল পানিগ্রাহিবাবুকে দিয়ে সাফাই গাইয়েছিলো।

"মিসেস সেন এর ওয়েল্থ-ট্যাক্স এর রিটার্ন-এ তো কোনো জুয়েলারী দেখানো ছিলো না কোনোদিনও। গয়না থাকলে তো দেখানোই হতো।"

সূর্য একটিও কথা বলেনি। মনে মনে হেসেছিলো। কিন্তু যারা চোখের পাতা একটুও না-কাঁপিয়ে ডাহা মিথ্যে বলতে পারে তাদের কাছে সত্য নিয়ে তর্ক করার মত নোংরামির মধ্যে সূর্য যায়নি।

সাবিত্রী বিস্ময়ের চোখে চেয়েছিলো সূর্যর দিকে, মায়ের কাজের সময়ে। সূর্য চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো।

সম্পত্তি, জমি-জমা, দলিল-পত্র ইত্যাদি কোনো বিষয়েই ব্রহ্মা সেন কোনোদিনও বড়ছেলের সঙ্গে পরামর্শ বা আলোচনা করেননি। সবই ছোটদের সঙ্গে। শুধু ব্যবসাটার পুরো ভারটা তার কাঁধে চাপিয়ে তাঁকে প্রথম যৌবন থেকেই ন্যুব্জ করে রেখেছিলেন। সেই বোঝার ভার আজও লাভব হয়নি।

গগনবাবুরই মতন বহু পরিচিত মানুষই বলেছেন সূর্যকে, জমি-বাড়ির দলিল চোখে দেখেননি ! আশ্চর্য ! অথচ আপনি বড় ছেলে ! আপনি আলাদা হয়ে নিজের কারবার করছেন না কেন ? আপনিই তো সব !

সূর্য হেসে বলতো, আমিই কেন সব হতে যাবো ? এজমালি ব্যবসা। আমি বড় ভাই, তাই ঝক্কিটা আমার বেশি। অনেক পরিবারে এই ঝক্কি মেজোভাই বা ছোটভাইকেও পোহাতে হয়। তাছাড়া সত্যি বলতে কী, আমার মোটা বুদ্ধিতে এই ব্যবসাটুকুই আমি বুঝি। বাবার মতো বুদ্ধিমান মানুষ কমই দেখেছি। বাবা ভালো মনে করেছিলেন বলেই ছোট ভায়েদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। মায়ের পেটের ভাইয়েরা কি আমাকে ঠকাবে ? তাছাড়া ওদের বিষয়-বুদ্ধি আমার চেয়ে অনেকই বেশি। কাজেরও ওরা অনেক। ছোট বোন দরিয়ার বিয়ের সময় বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপা থেকে, প্যাণ্ডেল বাঁধা থেকে, রসুই ভিয়েন সব কিছু তো ওরাই সামলেছে। সূর্য তো শুধু, করেছে আসুন-বসুন। ওরাই তো সব কিছু

করে, সবসময়ই। তারপরই উপরে আঙুল দেখিয়ে তাদের প্রত্যেককেই বলেছে, উপরওয়ালা আছেন। কারো কপাল তো কেউ নিতে পারে না মশাই! নিতেও পারে না, দিতেও পারে না। ওখানে যেটুকু পাওয়ার কথা লেখা আছে শুধু ওটুকুই আমার বরাদ্দ।

কিন্তু আজকে গগনবাবুর কথা শুনে মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছিলো সূর্যর। সেই আগের সূর্যতো আর নেই! অস্তমিত হবার সময় ক্রমশ এগিয়ে আসছে। রক্তের তেমন তেজও আর নেই। নিজের কোনো ছেলেও নেই। একটি মাত্র মেয়ে, ছায়া, তাও বিয়ের বহুদিন পরে হয়েছে। তার বয়স এখন বারো। মাঝে মাঝে এখন মনে হয় যে তার,সাবিত্রীর এবং ছায়ার ভবিষ্যতের কথা একটু ভাবা হয়তো উচিত এখন।

এই সব ভাবতে ভাবতেই বাড়ি পৌঁছলো সূর্য। গেট দিয়ে ঢুকেই সাইকেলের ঘণ্টা বাজালো কিরিং-কিরিং-করে। চাঁদ-এর ছেলে জ্যোৎস্না আর তারার মেয়ে দ্যুতি দৌড়ে এলো 'জেটু'! 'জেতু'! করতে করতে। সাইকেলটা রেখে সূর্য তাদের দু কাঁধে তুলে নিয়ে চকোলেট বার করে দিলো।

চাঁদের ছেলে জ্যোৎস্না বললো, জেটু! বাবার মারুতি গাড়ি আসবে সোমবারে।

বাঃ। তাই না কী? কী রঙ এর রে?

সাদা। মা পছন্দ করেছে।

বাঃ।

ছোট ভাই তারার মেয়ে দ্যুতি বললো, আমাল বাবা মোটলথাইকেল কিনেতে দেতু। দেকবে? দ্যাকো, দ্যাকো! তলো আমাল্ থঙ্গে তলো। বলেই সূর্যর শার্ট-এর কোণা ধরে টেনে নিয়ে গেলো ভাইঝি।

সূর্য দেখলো, বাবার আমলে যেখানে বাবার বেবি-অস্টিন গাড়িটা থাকতো সেই চালাঘরের নীচে ঝকঝকে জোড়া সাইলেন্সার লাগানো নীল-রঙা হন্ডা মোটর-বাইক দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোৎস্না বললো, কটকচণ্ডী দেবীর কাছে পুজো দিয়ে নিয়ে এসেছে কাকু। ঐ দ্যাখো না, জবাফুলের মালা!

আবাল্ হেলমেট্ আতে বাবাল!

দ্যুতি বললো।

তাই? বাঃ কী মজা! আমাদের একটা সাইকেল, একটা মোটর সাইকেল আর একটা মারুতি গাড়ি হলো।

দ্যুতি বললো, তোমাল্ ভাঙা থাইকেলটা ফেলে দাও জেতু।

সূর্য হাসতে হাসতে বললো, দেবোরে দেবো। নিজেকেও ফেলে দেবো এবারে। সাইকেলটার মতো আমিও তে বুড়ো হয়েছি, ভেঙে গেছি।

সূর্যর মেয়ে ছায়া বসবার ঘরে বসে স্কুলের পড়া করছিলো। সে একবার ওদের দিকে মুখ তুলে চাইলো। মেয়েটার মুখটা বড় করুণ দেখালো সূর্যর চোখে।

সাবিত্রীর উপরেই রান্নাঘরের সব ভার। যদিও রাঁধুনী ও চাকর আছে। মা কোনোদিনই পছন্দ করতেন না যে ছেলেরা রাঁধুনী ও চাকরের রান্না খাক। ডাল-ভাত হয়তো তারা নামিয়ে দিতো কিন্তু ভালো পদ এবং ছুটির দিনে সৌখিন পদ মা নিজে রাঁধতেন। বড় বৌ হিসেবে সাবিত্রীকেও অনেক রান্না শিখিয়েছিলেন। সাবিত্রীও শিখে নিয়েছে। আর তো কোনো গুণ নেই বড়বৌ-এর!

ঝুমরী গিটার বাজায়, গাড়ি চালাতে জানে, ইংরিজি গান গায়। চুমকী রবিঠাকুর, হিন্দী

ছবি ও বাংলা সাহিত্য গুলে খেয়েছে। কলকাতার অনেক লেখকের সঙ্গেই তার আলাপ আছে। কলকাতায় গেলেই সে তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে। শুনেও তাজ্জব হয়ে যায় সূর্য। কলকাতার বাঘা বাঘা সাহিত্যিক এবং চিড়িয়াখানার গণ্ডার তার কাছে সমান বিস্ময়ের। এ পর্যন্ত দুয়ের একটিও দেখা হয়নি তার। দেখার সাহস এবং সুযোগও নেই। "রবিঠাকুর"ও গুলে খেয়েছে ও। ওদের "ক্লাস"ই আলাদা। সূর্য আর সাবিত্রীরা সম্পূর্ণ অন্য "ক্লাসের"।

ঘরে এসে শার্টটা হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রেখে, ধুতিটা কুঁচিয়ে তুলে রাখতে যাবে এমন সময় সাবিত্রী এসে ঘরে ঢুকলো। সূর্য বাড়ি ফেরার আগেই সাবিত্রী গা ধুয়ে নেয়, বাড়িতে-কাচা ইস্ত্রীবিহীন টাটকা শাড়ি পরে। চুল বাঁধে। সিঁদুরের টিপ পরে, বড় করে। সূর্য ছাড়া, সাবিত্রীর যে অন্য কোনো গুণ নেই, অবলম্বন নেই, প্রত্যাশা নেই, সেই কথাটাই তার মস্তবড় সিঁদুরের টিপ-এর মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে প্রতিভাত হয়, নীরব বিদ্রোহের মতো।

এই নাও তোমার পান।

সূর্য বললো।

খাবো না।

কেন? কী হলো!

তুমি কি গো?

কিসের কি?

সেই সাতসকালে আধসেদ্ধ দুটি মুখে দিয়ে দোকানে দৌড়োও সাইকেল ঠেঙ্গিয়ে আর এই আটটা সাড়ে-আটটাতে ফিরে আসো, আর তোমার ছোটভায়েরা···

সূর্য বললো, আরে ওরা তো ছোট। ছোট বলেই না···

কাজের বেলায় তুমি, আর···

আরে, কাউকে তো কাজ করতে হবে। বাবার দোকান নইলে যে উঠে যাবে।

উঠলে তোমার কি ক্ষতি? থেকেই বা তোমার কি লাভ? পাশের বাড়ির ময়নাদি বলেন, তোমার যে ঐ বন্ধুরা, ঐ হরেনবাবু আর জগদীশবাবু তাঁরাও তো বাবার বড় ছেলে। ব্যবসাতে তো ছোট ভাইদের একটি চেয়ারও দেয়নি বসতে। তেমন করলেই বোধহয় ভালো করতে তুমিও।

সূর্য একটু বিরক্তি-মাখা গলায় বললো, আমার ভালো নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। হরেন আর জগদীশ আমার বাল্যবন্ধু হতে পারে কিন্তু ওরা ওদের ছোট ভাইদের প্রতি যে ব্যবহার করেছে তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে তাদের শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ঈশ্বরের সঙ্গে কি তোমার কথা হয় নাকি?

শুধু আমার সঙ্গেই কেন, যাদেরই বিশ্বাস গভীর তাদের সকলের সঙ্গেই হয়। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া জীবনের কোনো প্রাপ্তিই প্রাপ্তি থাকে না সাবিত্রী। এটা ঘোর কলি। ধূর্ত-ধাউড়ে-কুচক্রীতে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। কিন্তু তারা কতদূর যায় তুমি এই জীবনেই দেখে নিও। ঈশ্বর-বিশ্বাসের চেয়ে বড় সম্পত্তি আর কিছুই হতে পারে না।

তুমি যে কী, তা তুমিই জানো! কটকচণ্ডীর মন্দিরে প্রতি সপ্তাহে আমি যাই না?

নিশ্চয়ই যাও। কিন্তু তোমার দৌড় মন্দির অবধিই। কটকচণ্ডীর কাছে পৌঁছনো তোমার হবে কি না জানা নেই। কথাটা বললাম বলে রাগ কোরো না। চানে যাবো এবারে।

লুঙ্গি-ফতুয়া-গামছা দিয়েছো তো ?

দেওয়া আছে ।

চান সেরে এসে বারান্দার ইজিচেয়ারে বসলো সূর্য । রোজই বসে । খুব খিদে পেলেও, অফিস থেকে ফিরে চান করে একটু কিছু খেয়ে নেয় ও । তারপর ভায়েদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাবে বলে অপেক্ষা করে ।

কিন্তু আজকাল বেশিরভাগ দিনই ছোটভাই তারা আর চুমকি, হয় নিজেদের ঘরে খায়, নয় বাইরে কোথাও না কোথাও তাদের নেমন্তন্ন থাকে । ওরা আজকাল ঘরে বসে, খাওয়ার আগে একটু ড্রিঙ্ক করে । চুমকিও খায় । দ্যুতি একদিন বলে দিয়েছিলো সূর্যকে । শিশুরা সব ঈশ্বর-ঈশ্বরী । কোনো কোনো দিন হাওয়াটা এইদিকে মোচড় দিলে বারান্দায় বসে গন্ধও পাওয়া যায় ।

ওরা খেলে খাক । ওরা মডার্ন, উচ্চশিক্ষিত, ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়া । চুয়ান্ন বছরের বুড়ো, অশিক্ষিত সূর্য কি বলবে ওদের ?

চাঁদ আর ঝুমরীও আজকাল হয় আগে আগেই খেয়ে নেয়, নয়তো সূর্যর খাওয়া হয়ে গেলে তারপর খায় । যতক্ষণ না সকলে খাচ্ছে ততক্ষণ সাবিত্রীর ডিউটি শেষ হয় না । কোনো কোনো দিন সব কাজ সেরে ঘরে আসতে রাত এগারোটা বেজে যায় তার ।

সূর্য তাই কিছুদিন হলই ভাবছে যে ওদের সঙ্গে খাবে বলে খিদে-পেটে বসে না-থেকে, ও-ও দোকান থেকে ফিরেই চান করে খেয়ে নেবে । দুপুরের খাবার তো থাকেই । রাতের রান্না না হলেও তাতেই চলে যাবে ।

কিন্তু ভাবছেই । পারে না । ওরা আসুক খাওয়ার ঘরে আর নাই বসুক, এ বাড়ির একতলার এই রান্নাঘরের লাগোয়া এই খাওয়ার ঘরের বড় বড় পিঁড়িতে, ব্রহ্মা সেনের আমলে যেমন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রাত সাড়ে নটার সময় বাড়ির সব পুরুষেরা, বাবা ব্রহ্মা সেন, সূর্য, চাঁদ, তারা, গোমস্তা গিরিমশায়, বড় বড় কাঁটালকাঠের পিঁড়িতে একসঙ্গে খেতে বসতেন, আজও সূর্য তেমনি কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটার সময়েই এসে বসে । ফাঁকা, খাওয়ার ঘরে । বাচ্চারা নটার সময়েই খেয়ে নেয় । সূর্য সেন একা বসে খায় । সাবিত্রী, সাবিত্রীরই মতো সামনে বসে থাকে । বামুনদি খাবার এনে দেয় । সাদা বিড়ালটা খাওয়ার ঘরের দরজায় বাঘের মতো বুক ফুলিয়ে বসে পাহাড়া দেয় । ব্রহ্মা সেনের আমলেও এর পূর্বপুরুষেরা, কালো-ধলো-কী-বাদামী, এমনি করেই বসে থাকতো । পুরোনো কথা মনে পড়ে যায় সূর্যর খেতে খেতে । বাবার আমলে খাবার সময়ে খাওয়ার ঘর, রান্নাঘর গমগম করতো । বাবা, তিন ছেলে, গিরিবাবু খেতেন আর মা, সাবিত্রী, ঠাকুর, চাকরেরা তত্ত্বাধান করতো ! এখন বাইরের উঠোনে পেঁপে গাছে তক্ষক ডাকে । বলে ঠিক । ঠিক । ঠিক । নিঃশব্দ খাওয়ার ঘরে তক্ষকের ডাকটা ঠিকরে আসে । সূর্য যখন খায়, তখন কোনোদিন চাঁদের ঘর থেকে ক্যাসেট প্লেয়ারে ইংরিজি গান ভেসে আসে । কোনো কোনোদিন ভি সি আর-এ ছবি দেখে ওরা । কোনো কোনো দিন দরজা জানালা বন্ধ করে জ্যোৎস্নাকে সাবিত্রীর জিম্মায় পাঠিয়ে দিয়ে দেখে । কী ছবি, কে জানে !

চুমকি আর তারার ঘর থেকে বিখ্যাত কবিদের স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি ভেসে আসে । ক্যাসেটের মাধ্যমে । কোনো কোনো দিন বাণী ঠাকুর বা গীতা ঘটকের রবীন্দ্রসঙ্গীত ।

সাবিত্রী বললো, কিছু একটা করা উচিত তোমার । পেছোতে পেছোতে, দাম বইতে বইতে তুমি তো একেবারে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছো । তোমাদের দোকানের লাভের অংশ তো সকলেরই সমান কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি অন্যদের চাকর । এটা

আমার কথা নয় পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই এই কথা বলে।

সব পরিবারেই কাউকে চাকর হতে হয় সাবিত্রী, প্রত্যেক যৌথ-পরিবারেই। নইলে কারবার থাকে না। নিজেকে চাকর ভাবলেই চাকর, আর মালিক, ভাবলেই মালিক ! এতো ভাবাভাবিরই ব্যাপার।

আচ্ছা, আমি না হয় বাঁদী, আমার জায়েদের ঝি ! কিন্তু তুমিও কি কেউ নও ? তোমার কি মানুষের মতো বাঁচতে ইচ্ছে করে না একদিনের জন্যে ? ধুতি-জামা, তাও দুদিন পরা চাই। বাহন, সেই মান্ধাতার আমলের ভাঙা সাইকেল। পায়ে তালি-মারা কাবলি-জুতো। বয়স যার দশ।

সূর্য হেসে বললো, বাবা কি বলতেন জানো ? বলতেন "আ রুপী সেভড্ ইজ আ রুপী আর্নড।" বুঝেছো। যতক্ষণ জুতো পা থেকে খুলে না পড়ে যায় ততক্ষণ বদলাতে যাবো কোন দুঃখে ? তাছাড়া "আমার আমার" করো কেন ? সব তো আমাদেরই। মোটর সাইকেল, গাড়ি সবই তো আছে আমাদের বাড়িতে। এটা ব্রহ্মা সেনের বাড়ি। তার ব্যবসা, তার জমি-জমা থেকেই সব কিছু হয়েছে এটা ভুলে যেও না।

ঠিক আছে। আমাদেরই যদি সব তবে সে গাড়িতে একদিনও কি আমি-তুমি চড়েছি ? আমার দরকারও নেই। তোমার মতো নই আমি। অমার আত্মসম্মান আছে।

আমার কথা ছাড়ো, তোমার মেয়ের কি হবে ? এরা যেরকম স্বার্থপর দেখছি, মেয়েটার যে বিয়ে পর্যন্ত দিতে পারবো ন। তুমি যদি হঠাৎ চলে যাও, আমার যে কী হবে !

সূর্য হাসলো। বললো, হঠাৎ ? শুধু আমি কেন ? সকলকেই তো হঠাৎই চলে যেতে হবে। বলে কয়ে আর কজন যেতে পারে বলো ? তবে তোমার মেয়ের কথা ? এই শুনে নাও সাবিত্রী। তোমার মেয়েকে বাড়ি বয়ে এসে খুবই ভালো পরিবারের ছেলে উপযাচক হয়ে নিয়ে যাবে। দেনা-পাওনার কথা তুলবে পর্যন্ত না। কোনো চিন্তা কোরো না। তোমার কিসের অভাব ? তোমার কী নেই যে, আমার ছোট ভায়েদের তুমি ঈর্ষা করো ?

ঈর্ষা করি ? ছিঃ। আমার কি আছে ? আমাব জায়েদের তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত গয়নার মোড়া। এতো গয়না তারা পেলো কোথায় ? পায় কোথায়। আর আমি, তোমার স্ত্রী !

গয়না ? গয়না একটা ঈর্ষা করার জিনিস হলো সাবিত্রী ? গয়না নিয়ে গর্ব করে শুধু নির্গুণ আর অশিক্ষিতরা : ছিঃ!

বেশি শিক্ষা দেখিও না ! নিজে তো ইন্টারমীডিয়েটও পাশ না করে কলেজ ছেড়েছিলে। আমি স্কুল-ফাইন্যাল ! আমার চেয়ে তুমি বেশি কি ?

সাবিত্রী খুবই রেখে গিয়ে বললো।

অবশ্য নিচু গলায়।

কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে থেকে সূর্য বললো, শিক্ষার অনেকেই রকম হয়। একধরনের শিক্ষা মানুষ প্রতিষ্ঠান থেকে : মানে, ভালো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পায় আর অন্য এক ধরনের শিক্ষা নিজের ভিতরে ভিতরে গড়ে নেয়। পাঁচটা পাস দিয়েও মানুষ অশিক্ষিত থাকতে পারে আবার একটাও পাস না দিয়েও উচ্চশিক্ষিত হতে পারে। শিক্ষা আর ডিগ্রীর পাকানো কাগজ এক কথা নয়। বিশেষ করে, এই দেশে।

তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না।

তোমার মন আজ ভালো নেই, কোনো কারণে। এসো সাবু, আমার পাশে এসে বসো, মোড়াটা নিয়ে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে, দ্যাখো, আকাশটা। মনে হচ্ছে, পুজো বুঝি এসেই

গেছে। কী নীল আকাশ! চাঁদ ছমছম করছে পেঁজা-তুলোর মতো সাদা মেঘে মেঘে। ও ভালো কথা। পুজোর লিস্টিটা বানিয়ে ফেলো। আর তো দেড়মাসও বাকি নেই। চাকর-বাকর, দোকানের কর্মচারীরা, আত্মীয়স্বজন, কেউই যেন বাদ না যায়। এ বছর তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা বেশি দেবো।

সাবিত্রী বললো, তোমাকে বলবো বলবো করে বলা হয়নি, ঝুমরী আর চুমকি বলেছে যে ওদের পুজোর টাকা আলাদা করে দিতে। মানে স্বামীদের অংশ। ওদের বাপের বাড়ির লোকজন, বন্ধুবান্ধব, চাকরবাকর সব ওরা নিজেরাই নিজেদের হিসেব মতো দেবে। বলেছে, তাছাড়া রুচিরও একটা ব্যাপার আছে। আমি যা কিনি তা প্রায় কারোরই পছন্দ হয় না।

সূর্য চেয়ারে উঠে বসলো বললো, তাই! তা হবে। মানে. হতেই পারে। রুচি ব্যাপারটাতো নিশ্চয়ই নিজস্ব। আমাদেরই উচিত ছিলো এই ব্যাপারটার কথা ভাবা অনেক আগে। তাছাড়া ওরাও তো বড় হয়েছে। সত্যিই তো! এবারে তাই দিও। ওদের টাকাটা আলাদা করই ধরে দিও। ভালোই হলো, তোমার ঝক্কি কমে গেলো।

তোমার বোন দরিয়াও রাগ করে চিঠি দিয়েছে যে দাদা কাজে এতোই কি ব্যস্ত থাকে যে মাঝে-মাঝে চিঠি লিখে খোঁজ নিতেও পারে না। টাকাই সব নয় সংসারে। পয়লা বৈশাখে, আর পুজোয় আর ভাইফোঁটায় টাকা পাঠালেই ভালোবাসা দেখানো হয় না। টাকা পাঠাতে তোমাকে মানা করেছে দরিয়া।

সূর্যর গলা এবারে গম্ভীর শোনালো। বললো, তাই বলেছে? দরিয়া? চিঠি লেখার অভ্যেসই যে নেই আমার। কাউকেই তো লিখি না। যাক্। টাকা ওকে আর কারা পাঠায়? টাকা বুঝি কষ্ট করে রোজগার করতে হয় না? কাউকে কিছু দেয়া মানেই নিজেকে কিছু থেকে বঞ্চিত করা। নিজেকে; নিজের পরিবারকে।

তারপর স্বগতোক্তিরই মতো বললো সূর্য, সংসারে অনেকেরই অনেক থাকে হয়তো কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেরই অন্যাকে স্বার্থহীন ভাবে দেওয়ার মন থাকে না। এ তো জানাই ছিলো। আজকে জানলাম, এ সংসারে নেওয়ার মন নিয়েও কম লোকই আসে। হৃদয়ের অতটুকু ঔদার্যও যে কেন বিধাতা তাঁদের দ্যান না। ভারী মজার জায়গা কিন্তু এই পৃথিবী!

সাবিত্রী বললো, তোমার ভায়েরা বলেছে যে, দোকানের কর্মচারীদের আলাদা করে কিছু দেওয়ার রেওয়াজটাও আদিখ্যাতা। ওরা তো বোনাস পায়ই!

হাঃ। সে আর কটা টাকা! এই বাজারে! কিন্তু ওরা বলেছে এ কথা? কবে?

পরশু।

ঠিক আছে। ওদের টাকা আলাদা করে দিয়ে দেবো। আমি আমার একার অংশ থেকেই দোকানের কর্মচারীদের দেবো পূজোতে। এতোদিন দিয়ে এসেছি, আর···

বাবার আমলেও নাকি এইসব কোনোদিনও দেওয়া হয়নি? তুমিই বা কেন···

সূর্য অবাক হলো। বললো, এ কথাও বলেছে ওরা তোমাকে? এ কথাটা ভুল বলেনি। বাবার আমলে দেওয়া হয়নি যে তা ঠিকই। কিন্তু এটা যে আমারই আমল সাবিত্রী!

আর হাসিও না। তোমার আমল! যেন কোনো সাম্রাজ্যের মহারাজ তুমি! তুমি তো বান্দা! তুমি অন্ধ। তুমি কী···তুমি কি মানুষ? না ভগবান? না, তুমি ভূত?

সূর্য হো হো করে হেসে উঠলো জোরে!

তারপর পাশে-বসা অবাক-হওয়া স্ত্রীর হাতের উপর নিজের হাতটি রেখে বললো, সাবিত্রী, আমি দাদা! আমি দাদা যে!

ন্যাঙ্গিমনি

এখন বর্ষা। এদিকে রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। বন-পাহাড়, লাল মাটির উদলা রাস্তা, ভেজা, বিষণ্ণ। বৃষ্টির পর রোদ উঠলেই টিয়ার দল তীরের ঝাঁকের মত ওড়াওড়ি করছে এদিক থেকে ওদিকে। পেয়ারার বনে ঝাঁপাঝাঁপি করে, কিছু পেয়ারা খেয়ে কিছু কামড়ে ফেলে, ভীষণ ব্যস্ত-সমস্ততাতে আবার উড়ে যাচ্ছে অন্য গন্তব্যের দিকে। তিতিরগুলো করুন গলায় কাঁদে এই সব বিধুর বিকেলে। টুপ-টাপ্ করে জল পড়ে গাছগাছালির পাতা থেকে। দূরাগত এক্সপ্রেস ট্রেনের মত শব্দ করে পুরুষালী গন্ধ বয়ে নিয়ে বৃষ্টি আসে, পাহাড় পেরিয়ে, কোনো নরম সবুজ নারীর জঘনের মতো ঘন বনে রোমাঞ্চের কাঁটা তুলে। চোখের সামনে তরতরিয়ে বেড়ে ওঠে তরতাজা নতুন লাগানো গাছ, বিমুগ্ধ মায়ের চোখের সামনের প্রথম সন্তানের মতো।

এই সময় কোথাওই যেতে ইচ্ছে করে না আমার। এই আলস্য এই অবকাশের আদিগন্ত কর্মহীনতার নিরবচ্ছিন্নতার আনন্দ ছেড়ে। কিন্তু ডেরার হাতার গা-দিয়ে বয়ে-যাওয়া পাহাড়ী নদীতে এখন ঢল নেমেছে। একদল সবে স্কুল-ছুটি হওয়া ছেলেমেয়ের মত কলকল করতে করতে বয়ে চলেছে জলরাশি, পাথরে লাফিয়ে উঠে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। চালোয়া মাছ আর পাহাড়ী পুঁটি ধরবার জন্যে অর্ধ-উলঙ্গ ছেলে মেয়েরা নানারকম গবেষণা ও প্রক্রিয়া চালাচ্ছে এখন নদীতে। এই জঙ্গলে-ঘেরা পরিবেশে গরুর গলার কাঠের ঘণ্টা-বাজা নরম নিভৃত উত্তেজনাহীন একঘেয়েমিতে ছেদ টেনেছে ওরা।

ধানের বীজ কিনতে রওনা হয়েছি আমি ছাতা হাতে, সঙ্গে বাড়ির মালী। চলেছি, স্টেশানের দিকে। আজ বড় হাট আছে, চাঁদোয়া-টোরীতে। সেই হাটে গেলেই ভাল ধানের বীজ পাওয়া যাবে। সেই ধান এনে ছড়াবো নিচু জমিতে। ঝর্ণার ধারে ধারে। ধান হবে প্রথম শীতে। নিজেদের ক্ষেতের ধান, হাতের ধান, বড় মিষ্টি লাগে খেতে। এই ধানের চালে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ছোঁয়াচ লেগে তা বাজার-কেনা অন্য চালের সঙ্গে একেবারেই আলাদা হয়ে পড়ে। অর্থ সংস্থান আদৌ কতখানি হয়, অথবা লোকসানের বোঝাই বা কতখানি, তা নিয়ে আমার মত কম বয়সী ও অনভিজ্ঞ শহুরে-চাষী কখনও ভাবে না। নিজের ক্ষেতের মোটা লাল মিষ্টি ধানের চাল চামনমণি চালের চেয়েও বেশী দামের।

টোরী স্টেশনের আগে একটাই স্টেশন পড়ে। তার নাম মহুয়া-মিলন। পৃথিবীর সমস্ত সময় করতলগত করে খয়েরী অজগরের মত ট্রেনটা চলেছে পাহাড়-জঙ্গলের নগ্নতার নির্মোক ছিঁড়ে। ফিস ফিস করে বৃষ্টি পড়ছে এখানের ট্রেনগুলো দেখলে বোঝা যায় যে, ভারত সত্যিই এক স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কেউই প্রায় টিকিট কেনে না। ফার্স্ট-ক্লাসের

টিকিট যারা কেনে তারাও অন্য মানুষ এবং ছাগল-শুয়োর-হাঁস-মুরগীর সঙ্গে একীভূত হয়ে একই কামরায় সহাস্যে সহাবস্থান করে বিনা প্রতিবাদ এবং অনুযোগে। এত লোক নামলো যে, টোরী স্টেশানে ট্রেনটা প্রায় খালিই হয়ে গেল। দূর দূর বহু জায়গা থেকে লোক এসেছে হাটে। খিলাড়ির সিমেন্ট-ফ্যাক্টরী আর কয়লা খাদ থেকেও। অন্যদিক থেকেও আসে লাতেহারের লোক অবধি।

স্টেশানে পা দিয়েই আমার দুটি চোখ আটকে গেল। চারদিকের আফ্রিকার আগ্নেয়গিরির লাভামিশ্রিত কালো মাটির রঙের মধ্যে হঠাৎ একটা গাঢ় কমলা রঙা পুটোলেকা ফুল অবাক করল আমাকে। তার গায়ের রঙ টাটকা—তোলা পাকা কমলালেবুর মত, গায়ে একটি কমলা রঙা শাড়ি, সাদা হাত-কাটা ব্লাউজ। খালি পা। তার ঠোঁটে শ্রীরামপুরের ইঁটের মত ফিকে লালচে পানের দাগ। দুটি পা বুকের কাছে গুটিয়ে সে প্ল্যাটফর্মে বসে আছে, সামনে একটি ঝুড়ি নিয়ে। তার পাশে একটি অল্পবয়সী ওঁরাও ছোকরা। কালো ফুলপ্যান্ট আর সাদা গেঞ্জী পরা।

যথাসম্ভব কম ঔৎসুক্য দেখিয়ে মালীকে জিগেস করলাম, মেয়েটি কে?

মালী বললো, ন্যান্সীমনি!

নাম শুনে অবাক হলাম ন্যান্সীরা সাধারণত ডিয়ার বা ডার্লিং হয় মনি হয় না।

ওর জাত কি?

মালী হাঁটতে হাঁটতে হাটের দিকে যেতে যেতে বললো, কেরেস্টান। ও মেম সাহেব হচ্ছে।

বুঝলাম, ন্যান্সীমনি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। এই অঞ্চলে অ্যাংলোইন্ডিয়ানরাই প্রথমে এসে বসতি করে। আজও কিছু কিছু নিরুপায় মানুষ রয়ে গেছে, যারা অস্ট্রেলিয়া বা কানাডায় যেতে পারেনি, অথবা যায়নি এই আশ্চর্য রূপসী বনাঞ্চলের প্রেমে পড়ে গিয়ে। এই সম্প্রদায়ের কিছু দরিদ্রতম মানুষ তাঁদের এককালীন সমস্ত দম্ভ ও জাঁককে কবর দিয়ে বড় করুন জীবনযাত্রা যাপন করেন এখানে।

মালী আবার বললো, সাহেব হলে কি হয়? সাহেবরা ত এখন খেতেই পায় না। তেমনই সাহেব। ন্যান্সীমনি ঐ ছেলেটার সঙ্গে থাকে। ও মুসলমান। নাম তস্‌লিম। জাত বদলে, মুসলমান হয়ে বিয়ে করেছে। জাত না-বদলালে মুসলমানরা কাউকে বিয়ে করে না।

ও। আমি বললাম।

ত, ও থাকে কোথায়? তোমার ন্যান্সীমনি?

কেন? গঞ্জেই থাকে। কঙ্কার ওদিকে। শুনেছি সারাদিন ঘুঁটে দেয়। গরু আছে দুটো। তস্‌লিম খিলাড়ির কয়লা-খাদে কাজ করে। শুনেছি, ওদের ডেরা একেবারে সুন্‌-সান্‌ সান্নাটা জায়গায়। কারোই যাতায়াত নেই ওদিকে। আমিও যাইনি কখনও।

—ছেলে পেলে নেই ওদের?

নাঃ। ও বাঁজা। ভারী ছেনাল মেয়েছেলে···যার তার সঙ্গে···

আলোচনার বিষয় আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আমি চুপ করে গেলাম।

মালীটা ভেবেছে কি নিজেকে? ও যেন নিজেও ন্যান্সীমনির লেভেলের মানুষ, এমন ভাবেই কথা বলছে। পয়সা নেই বলে বেচারী ন্যান্সীমনিকে নিয়ে সকলেই আলোচনা করবে?

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করেই আমার বুক ভেঙে যেতে লাগলো। ভয়ও করতে লাগলো। তাকে, প্রথমবার দেখেই এমন দরদ উথলালো কেন?

মালীকে ধমকে বললাম, যে জিনিস তুই নিজের চোখে না দেখেছিস তা কখনও বলবি না। বললেই, মার খাবি আমার কাছে। আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিলো।

মালী হেসে বললো, বাবু, এই দুনিয়াতে কিছু কিছু ঘটনা থাকে, যা নিজের চোখে না-দেখেই বিশ্বাস করতে হয়। কারণ, সেসব ঘটনা কখনই কারো চোখেরসামনে ঘটে না। বলেই, ধূর্তামির হাসি হাসলো।

কথা বাড়ালে বিপদ দেখে বললাম, কোথায় ধান? চল সেই দিকেই যাই।

মস্ত হাট। গরু ছাগল হাঁস মুরগী, আনাজ পাতি, গরুর মাংস পাঁঠার মাংস শুয়োরের মাংস এসব বিক্রী হচ্ছে মাছ বিশেষ নেই। পাহাড়ী নদীতে ধরা সামান্য চালোয়া ও অন্যান্য মাছ ছাড়া। কিন্তু যে কারণে আলস্যের নির্মোক ছিঁড়ে এতদূরে এলাম সেই বস্তুটিই নেই ধান ওঠেনি আজও। কেন ওঠেনি তা কেউই বলতে পারলো না। একজন শুধু বললো, কুরু বস্তী থেকে একটি লোকই আসে ধানের বীজ নিয়ে প্রতি হাটে কিন্তু তার বৌকে কাল রাতে সাপে কেটেছে, তাই ই সে আসেনি। উরুতে কেটেছে সাপে। কালো গহুমন সাপ।

তার বৌকে কেটেছে কালো সাপ উরুতে, আমাকে কেটেছে কমলা বড়া সাপ -বাঁ দিকের বুকে। কুরুর বস্তীর বউ যদি বা বাঁচে বাঁচতেও পারে কিন্তু আমি মরেছি। আমি জানি যে, আমি মরেছি নিঃসন্দেহে।

স্টেশানে ফিরে যখন এলাম, তখন বেলা পড়ে গেছে। ট্রেন লেট। এখানে লেট হওয়ার কোনো মা-বাপ নেই। এখানের বাসিন্দাদেরও সত্যিকারের কোনো মা-বাপ নেই। কিন্তু এদের মিথ্যে মা-বাবাদের মাঝে মাঝে দেখা যায়। পাঁচ বছর বাদ বাদ নির্বাচনের আগে, জীপগাড়ি আর মোটর গাড়ির ভীড়ে রাজহাঁসের গায়ের মত সাদা খদ্দরের পোশাক আর খুনীর মত মুখের কতগুলো পাজী লোকের গমগমে বক্তৃতাতে বোঝা যায় যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সব প্রতিশ্রুতিই টিয়া ঢোকবানো পেয়ারার মতো ভোটাভুটির পরই হতাশায় মাটিতে ঝরে যায় এবং তা এদেশায় রাজনীতিকদের মতো খল ও চতুর শিয়ালেই খেয়ে যায় রাতের বেলা। গত তেত্রিশ বছরের সমস্ত প্রতিশ্রুতির একশ ভাগও রাখা হলে এই অঞ্চল এবং হয়ত এই দেশ এমন থাকত না। তবু, এদের উত্তেজনা বলতে ঐটুকুই। ঐ তামাশা। প্রতি পাঁচ বছর বাদে বাদে ভোট দেওয়ার বদলে পাঁচটা দশটা টাকা পাওয়া, পেট ভরে মাটিতে বসে খিচুড়ি খাওয়া এক-দুদিন---এইই এইই সব।

উত্তেজনা ওদের যেমন নেই, আমারও ছিলো না। কিন্তু নাগীমনিকে দেখার পর থেকেই আমার উত্তেজনার কোনো সীমা নেই। মাঝে মাঝে এমনই হয়। কাউকে কাউকে হঠাৎ দেখে মনে হয়, যেন কৈশোরের পর থেকে বহুবার শেষ রাতের অস্পষ্ট, আবক্ত, কাউকেই-বলা-যায় না এমন সব স্বপ্নে এই সুন্দর মুখটিকেই দেখেছিলাম। যেন এরই সঙ্গে দেখা হবে বলে এত বছর চান করেছিলাম, দাড়ি কামিয়েছিলাম, প্রেমের গান শুনেছিলাম এবং গল্প পড়েছিলাম।

আমি, শিক্ষিত, শহুরে, মার্জিত-রুচি, সভ্য একজন মানুষ। আমি এক আকাশ মেঘের নিচের ভেজা ঊ্যকালিপটার গায়ের ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধের মধ্যে খোলা হওয়ায় দাঁড়িয়ে এমন একজন ঘুঁটে-কুড়ানিকে কেন যে এমনভাবে দেখতে গেলাম আর আমার সর্বনাশ ডেকে আনলাম তা অপদেবতারাই জানেন। আমার খিদে গেল, ঘুম গেল, জীবনের আর সমস্ত ভালো কিছু সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও স্পৃহা হঠাৎই বুকের মধ্যে মরে গেল। আমি জানি যে,

যে-কটা প্রিয় বই নিয়ে এসেছিলাম এবারে কলকাতা থেকে, তার একটাও পড়া হবে না। ফিক্‌শান ত ঘটনার আর কল্পনারই নামান্তর। আমি এখন জীবনের এক উত্তাল কেন্দ্রবিন্দুতে এসে স্থির দাঁড়িয়েছি। তস্‌লিম এব সঙ্গে কল্পনায় নানাবকম যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। ওকে কোন্ ভাবে, কোথায় ওয়েলেইড্ করে বন্দুক দিয়ে মারা যায় তাও ভাবছি। বন্দুক ছুঁড়লে আওয়াজ হবে, তার চেয়ে কোথাও কোনো নির্জন জায়গায় টাঙ্গীব একটা ক্লীন-কোপ্ অথবা টীপিক্যাল সভাবাবুদের মতো মসৃণ মাফিয়া কায়দায় ওর মালিকেব মাধ্যমে ওর চাকরীটা কোয়াইট্‌লী খেয়ে দেওয়া। তারপর ? ন্যান্সীমনি ত আমারই। আমারই একার।

ন্যান্সীমনিকে বিয়ে করতেও আমাব এতটুকুআপত্তি নেই। ওকে রানীর মতো করে রাখবো আমি। দাস-দাসী, বেয়ারা-ববুর্চি। ছোট্ট লাল রঙা ফিয়াট্ কিনে দেব একটা। মাথায় হলুদ সিল্কের স্কার্ফ জড়িয়ে, ডান-হাতের প্লাটিনামের বালা আর বাঁ-হাতে রূপোলী ব্যান্ড-লাগানো ছোট্ট রূপোলী ঘড়ি পরে ও জঙ্গলের পথে গাড়ি চালাবে। পাশে বসে থাকব আমি। ভেজা জঙ্গলের ফুল পাতার গন্ধ-ভবা হাওয়া হু হু করে লাগবে এসে নাকে। ন্যান্সীমনিকে আমি আমার সম্পূর্ণ মালিকানায় পেতে চাই। একবারের জন্যে নয়; একদিনের জন্যে নয়; চিরদিনেরই জন্যে।

ঘোরের মধ্যে ট্রেনে চড়লাম. ঘোরের মধ্যেই অন্ধকারে বৃষ্টিব মধ্যে ভিজতে ভিজতে কাদাময় বনপথে সাপ-বিছের ভয় বেমালুম ভুলে ঘোরের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছলাম।

মালিকে বললাম, তাড়াতাড়ি খিচুড়ি চাপাও। আমাব ঘুম পেয়েছে খুব।

॥ ২ ॥

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে—চা-টা খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম স্টেশানে। এমন ঘুমন্ত ছোট্ট জায়গায় স্টেশানই হচ্ছে পাবলিক-রিলেশানস অফিস, খবরের কাগজ, পরনিন্দা-পরচর্চা এবং পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এবং স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের হেডকোয়াটার্স। স্টেশান মাস্টারের ঘরেরমধ্যে অথবা বারান্দার বেঞ্চে চোখকান খুলে বসে থাকলে স্যাটেলাইটের পক্ষেও যে খবর পাওয়া দুরূহ সেই খববও আপনিই কর্ণগোচর হয়। সেই ভরসাতেই গেলাম। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, ন্যান্সীমনি কোথায় থাকে, তার বাড়ির ঠিক লোকেশানটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা নিজেকে। মালিকে আর কিছু জিগ্যেস করাতে বিপদ ছিলো।

বেলা এগারোটা নাগাদ একটা ভবঘুরে বিশ্বনিন্দুক ছোঁড়া এল। ও স্টেশানে মৌসুমী ফল বেচে। মিসেস কার্ডির দোকানের পাশে বসে। তাকেই কতগুলো ট্যানজেন্ট ও হাইলী ইমপার্সোনাল প্রশ্ন করে জানা গেল ঠিক কোথায় ন্যান্সীমনির বাড়ি। এও জানা গেল, ন্যান্সীমনি তার স্বামীর উপর মোটেই সন্তুষ্ট নয়। খিলাডির কয়লা খাদে কাজ করে বলেই বিয়ে করেছিল, বিয়ের পর জানা গেছে যে, ও আসলে ওয়াগন—ব্রেকার। কয়লার ওয়াগন ভেঙে কয়লা এনে বিক্রী করে সকলের বাড়ি বাড়ি। সবরকম নেশা-ভাঙ করে। ন্যান্সীমনিকে মারধোরও করে। ন্যান্সীমনি শিগগীরি ওকে ছেড়ে দিয়ে নাকি অন্য মরদ ধরবে।

স্টেশান থেকে ডেরাতে ফিরে আসতে আসতে খুব খুশী খুশী লাগতে লাগলো। তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশের জন্যে এ যে একেবারে আইডিয়াল সিচুয়েশান। মানে, এট দিস্ জাঙ্কচার অফ দেয়ার লাইভস্—সম্পর্কটাকে ডিভাস্টেটিংলী পাংক্‌চার করে দিয়ে পৃথ্বীরাজের মত

ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে সামনে আমার আগুনা-পারা বউকে বসিয়ে টগবগিয়ে ফিরে আসা। ন্যান্সীমনির জন্যে সমাজ-সংস্কার, অতীত-বর্তমান এমন কি ভবিষ্যতের সবটাই আমি ভুলে যেতে রাজী।

চান করে খেতে বসে ভাবছিলাম কী অজুহাতে দুপুর বেলায় ঐ নির্জন বনের মধ্যে একলা-থাকা আমার স্বপ্নের সুন্দরীর কাছে যাওয়া যায় ? এক মুহূর্ত ভাবতেই প্রবলেম সলভ্‌ড হয়ে গেল।

খেয়ে দেয়ে, সামান্য জিরিয়ে নিয়ে, শিকারে বেরুবার জামা কাপড় পরে ফেললাম। পায়ে গাম-বুট। পথে বড় কাদা। কাদা, প্রেমকে ক্লেদাক্ত করে।তবে পাদুকা এবং পোষাক আদৌ অভিসারে যাওয়ার মতো হলো না।

বাড়ি থেকে বেরোবাব সময়ে মালীকে বললাম, তিতির মারতে যাচ্ছি। মশলা বেটে রাখতে। তিতিরের কাবাব আর রোস্ট্ হবে। সালিমের দোকান থেকে বাখরখানি রোটি নিয়ে এসে রাখবি। ব্যস্।

মালী সখেদে বললো, তিতির পিটাকে কেয়া হোগা হুজৌর, একঠো বড়কা শুয়োরোয়া ধড়কা দিজিয়ে খানেমে, মজা আয়েগা।

অভিসারে যাওয়ার সময় শুয়োরের নাম করায় আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম, যা বলছি, তাই-ই কর। বেশী কথা বলিস না।

জায়গাটা দারুণ। একেবারে পঞ্চবটীরই মতো। দূর থেকে পর্ণকুটিরটাকেও মনে হয় যেন ছবি একটি। দুটি সাদা দুধেল গরু হাম্বা-হাম্বা করে ডেকে উঠল। পাহাড় থেকে নেমে যখন নিচের ঢালে পা দিলাম তখন বৃষ্টিভেজা বনের গন্ধে, ছোট ছোট মৌ-টুস্‌কি পাখিদের ফিস্‌ফিসে—কিস্‌কিসে ডাকে মনটা বড কান্না-কান্না লাগতে লাগলো।

আর একটু এগিয়ে যা দেখলাম, তা আমি আমার বাইশ বছর বয়সে আগে দেখিনি কখনও। মনে হলো, আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবে খাঁচা থেকে। শুধুমাত্র কোনো কিছু দেখেই যে কারো এত কষ্ট-ভরা আনন্দ হতে পারে, এমন উত্তেজনা ; তা আমার অজানা ছিল। দেখি, ঝির্‌ঝির্ করে বয়ে-যাওয়া ওদের বাড়ির পিছনের পাহাড়ী নদীতে ন্যান্সীমনি চান করছে। শাড়ি-জামা খুলে রেখেছে পাথরে, আর অন্য পাথরে কেচে-রাখা ছাড়া শাড়ি জামা।

আমি কি করবো ভাবছি। ন্যান্সিমনি আমার দিকে পাশ ফিরে বসে, জলে কোমর অবধি ডুবিয়ে চান করছে। লাল-ঠোঁট দুধলি হাঁসের মতো দুটি বুক দুলে উঠছে ওর নড়াচড়া করার সঙ্গে সঙ্গে। তাড়াতাড়ি আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে যেতেই ঝোপের গায়ে সড়সড় করে শব্দ হল। ন্যান্সিমণি চোখ তুলে চেয়েই হাসল।

বললো, সো আর্লি ? উ্যা মাস্ট বী ক্রেইজী। গো টু মাই রুম। এ্যাম্ কামিং।

ব্যাপারটা কি হল বুঝতে না পেরে আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম ওখান থেকে। দরজা-ভেজানো ছিল চাপ দিতেই খুলে গেল। ভিতরে বড় অন্ধকার—জানালা বন্ধ। আমি বাইরেই এসে, গাছের ছায়ায় একটা কাটা-গাছের গুঁড়িতে বসলাম। হাঁপাচ্ছিলাম আমি। ক্লান্তিতে নয় ; উত্তেজনায়।

কিছুক্ষণ পর ন্যান্সীমনি এলো। শুধু গায়ে, একটা কালো শাড়ি জড়িয়ে। তাকে কেমন যে দেখাচ্ছিলো, তা বোঝাবার মতো ভাষা আমার নেই।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

ও বললো, খাওয়ার সময়টুকু দেবে তো ? না, তাড়া আছে খাঁ সাহেবের ?

খাঁ সাহেব ? আমি অবাক হলাম।

কিন্তু কিছুই বললাম না।

বললাম, না তাড়া নেই।

ন্যান্সীমনি দুটো শুকনো রুটি আর একটু ঝিঙের তরকারী আর গুড় নিয়ে এসে বসলো বারান্দার মোড়াতে। খেতে খেতে বললো, চা খাবে ?

আমার হাত-পা অসাড় লাগছিলো।

বললাম, খেতে পারি।

ন্যান্সীমনি খাওয়াটাও কী আশ্চর্য সুন্দর ! দারুণ পেলব আঙুল দিয়ে ছোট ছোট করে রুটির টুকরো ছিঁড়ে কেমন আলতো করে মুখে দিচ্ছিল। এমন কোনো মেয়ে, কোনো খাবার, তার সুরেলা আঙুলে ছিঁড়ে, সুচারু দাঁতে কাটবে বলেই বোধহয় পুরুষেরা সারাদিন কাজ করে। অন্ততঃ, তাদের করা উচিত।

খাওয়া শেষ করে ও ভিতরে গেল। গিয়ে দু কাপ চা নিয়ে এল কলাই-করা গ্লাসে।

চা খেতে-খেতে বললো, বন্দুক নিয়ে কেন ? আমার এখানে কোনো ভয় নেই। লোকে ভালোবাসতেই আসে এখানে। মারামারি করতে নয়।

তারপর চায়ে শেষ চুমুক দিয়েই বললো, এসো।

আমি ঘরে ঢুকতেই ঘরের হুড়কো আটকে দিল ও ভিতর থেকে।

বলল, খাঁ সাহেব বাজার বড় খারাপ। কী দাম সব জিনিসের ! আমি আজকাল কুড়ি করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমার কাছ থেকে কিছু নেবো না। তুমি সিমেন্ট কোম্পানীর সাহেবদের বলে তস্‌লিম্‌কে একটা চাকরি করে দাও। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো যে, আমি কেমন মেয়ে ছিলাম। যা এখন করছি তা করবার কথা ভাবলেও হয়তো আত্মহত্যা করতাম এক সময়ে। কিন্তু খিদে আর সম্ভ্রম বড় আজীব জিনিস। নিজের পেটের খিদে মেটাবার জন্যে অন্যের পেটের অন্য খিদে মিটোচ্ছি। নিজের সম্ভ্রম বিকিয়ে, স্বামী-ছেলের ঘব করার সম্ভ্রমের পথ তৈরী করছি। বড়ই অসহায় আমি। তস্‌লিমকে যে আমি বড় ভালোবাসি খাঁ সাহেব। আমার এই কাজটা তোমার করে দিতেই হবে। আদর কী করে করতে হয়, আর খেতে হয় তা তোমাকে আমি দেখাবো খাঁ সাহেব। আমি লোক ঠকাই না।

একটানা এই সব কথা বলতে বলতেই, ন্যান্সীমনি একটানে তার কাপড় খসিয়ে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে গেল। বাইরের বর্ষার অন্ধকারের ভারে অন্ধকারতর ঘরে হঠাৎ কমলা-রঙা আগুন জ্বলে উঠলো। আমি নিরুচ্চারে এক তীব্র অনভ্যস্ত দৃশ্যর ভালোলাগায় এবং ঘেন্নাতেও আর্তনাদ করে উঠলাম।

একটি দারুণ রোম্যান্টিক ; নারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; অবিবাহিত যুবকের বুকের মধ্যে সেই মুহূর্তে পৃথিবীর তাবৎ ঘুঘুর ডাক, বৃষ্টির শব্দ, চাঁদের মখমল-নরম রূপোঝুরি আলো সমস্তই রাতারাতি মরে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে আমি ঘরের বাইরে এলাম। সঙ্গে আমার টাকাও ছিলো না যে, টাকা দিয়ে আসব কিছু ওকে। আমার পিছন পিছন আত্মবিস্মৃত ন্যান্সিমনি উলঙ্গ হয়ে দৌড়ে এল কিছুটা।—হয়তো অপমানিত হয়ে, হয়তো আমি মানুষটা সত্যি কে তা জানবার জন্যে ; হয়তো প্রতিশোধ নেবারও জন্যে আমার উপর।

কিন্তু আমি একবারও পিছনে না-চেয়ে থামলাম একেবারে ডেরাতে এসে। গাম-বুট পায়ে কি দৌড়নো যায় ? গণ্ডারের মতো থপ্‌থপ্‌ করে দৌড়ে এলাম।

যা চাইলেও পাওয়া যায় না, তার জন্যেই আমার চিরদিনের কাঙালপনা। যা না-চাইতেই

পাওয়া যায়, তা বড় খোলো, মূল্যহীন ; অসার। ঘৃণারও হয়তো বা।

মালী বললো, তিত্বর কাঁহা !

আমি হাঁপাচ্ছিলাম। উত্তর দিলাম না।

মালী বললো, শুয়োরোয়া পিটা গৈল বাবু ?

আমি বললাম, চুপ কর।

তিতিরও নয়, শুয়োরও নয়, একটা বড় সুন্দর কিন্তু নিরেট বোকা পাখি একটু আগে অসহায় ভাবে মারা গেছে। মরে গেছে সে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে আমারই বুকের মধ্যে চিরদিনের মতো। সেই প্রেমের পাখি আমার বুকের দাঁড়ে আর কখনও বসবে না এসে। তার ডাকে উতলা, উন্মত্ত, উদ্বেল করবে না আর কখনও আমাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ আমার যা-কিছু কল্পনা, লজ্জা, দুর্বলতা, ঔৎসুক্য এবং মধুর অজ্ঞানতা সবই ন্যাশীমনি তার নগ্ন শরীরের কমলা রঙা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

কম্পাস

কুকুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেদিন আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়িতে। কুকু এসেছিলো, পরিচালক এবং প্রযোজকের সঙ্গে একটি উপন্যাস নিয়ে ছবি করার বিষয়ে আলোচনা করতে।

কুকুকে শেষ দেখেছিলাম আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। তখন আমি সবে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলেজে ঢুকেছি। আর কুকু তখন বোধ হয় সিক্স-সেভেনে পড়ে। খুব ফর্সা, একটু মেয়েলী। এবং খুবই সুন্দর দেখতে। অবস্থাপন্ন বাবা-মায়ের চোখের মণি। আদরে, যত্নে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ; চোখ-কাড়া। একমাত্র সন্তান।

কুকুরা পুজোর ছুটিতে এসেছিল উত্তরপ্রদেশের বিন্ধ্যাচলের কাছে শিউপুরা নামে একটি ছোট্ট গ্রামে। আমি গেছিলাম আমার বাবা-মা ভাই-বোনেদের সঙ্গে। সকলে একত্রিত হয়ে মাছিন্দার পথে চড়ুভাতি, গঙ্গার ঘাটে "ড্যাম-চিপ্" নানা রকম মাছ কেনা এবং পরিশেষে বিজয়া-সম্মিলনীও।

পথের এবং প্রবাসের আলাপ সাধারণত পথে প্রবাসেই হারিয়ে যায়। যাঁরা ব্যস্ত মানুষ, তাঁদের কারো পক্ষেই কলকাতার কর্মব্যস্ততার ঘূর্ণীর মধ্যে ফিরে এসে আর সেই অবসরের সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

কুকুর বাবা-মা কাকা-কাকী আমার মা-বাবাকে বলতেন, কলকাতা ফিরে যেন এই সম্পর্ক বজায় থাকে। বাবা বলতেন, দেখা যাবে। কলকাতায় ফিরেই প্রমাণ হবে হৃদয়ের টান খাঁটি না ঠুনকো।

কুকুর বাবা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যস্ত উকীল ; কাকা সলিসিটর। ওঁদের নিবাস ছিল উত্তর কলকাতায়। শ্যামবাজারে।

আশ্চর্য ! সেবার ছুটির পর কলকাতায় ফিরে প্রবাসের সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়ে উঠেছিলো মুখ্যতঃ কুকুদের পরিবারের আন্তরিকতাতেই। এমন একটি শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন পরিবার আমি খুব কমই দেখেছি। বাড়ির প্রত্যেক মহিলাই সুন্দরী। বিভিন্নরঙা তাঁতের ডুরেশাড়ি পরা তাঁদের সুন্দর চেহারা এখনও আমার চোখে ভাসে। রান্না-বান্না, সেলাই-ফোঁড়াই ; গান-বাজনা সব কিছুতেই সমান উৎসাহ ছিল দত্ত পরিবারের। সেই পুজোর পরও অনেক বছর কুকুদের ও আমাদের পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ আশ্চর্যভাবে বজায় ছিল।

কুকু বড় হবে, এই নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা করতেন তখন থেকেই ওর অভিভাবকেরা। কারো ইচ্ছা ছিলো কুকু ডাক্তার হোক। কেউ চাইতেন কুকু বড় হয়ে তার

বাবার ওকালতীর পসারকে আরো বাড়িয়ে তুলুক। মেসোমশাই-এর চেম্বার খুবই ভাল জায়গায়। অনেক মক্কেল। ওঁদের কারোরই সন্দেহ ছিল না যে, পড়াশোনাতে ভাল ছাত্র কুকু তার সুন্দর সপ্রতিভ ব্যবহারে এবং চোখ-কাড়া চেহারাতে একদিন তার বাবার চেয়েও বেশী সুনাম করবে হাইকোর্টে। স্বচ্ছল পরিবারের স্বাচ্ছল্য আরো বাড়াবে। বনেদী, কোনো পড়তি—অবস্থার পরিবার থেকে কুকুর জন্যে সুন্দরী শান্তস্বভাবা বিনয়ী পাত্রী পছন্দ করে আনবেন তাঁরা, যাতে তাঁদের পারিবারিক সুখ এবং ঐতিহ্য স্বাচ্ছল্যের হাতে হাত রেখে আরও উজ্জ্বল হয়।

আমার ইচ্ছে ছিলো সাহিত্যিক হবার। কিন্তু আমার প্র্যাকটিক্যাল, কৃতি বাবা বলতেন, বাঙালী সাহিত্যিকেরা না-খেয়েই থাকেন। যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে প্রকাশনের ব্যবসাতেও জড়িয়েছেন সফলভাবে নিজেদের, সেই মুষ্টিমেয় দু-একজন ছাড়া, স্বচ্ছলতার মুখ কেউই দেখেননি। বাবার আদেশ ছিলো যে, তাঁরই মতো ডাক্তার হতে হবে।

সাহিত্য নিয়ে পড়া পর্যন্ত হলো না বলেই আমার যে বাল্যবন্ধু আজ যশস্বী সাহিত্যিক, তাকে মনে মনে খুবই ঈর্ষা করতাম। সেই কারণেই আমার বন্ধুর মধ্যে আমি যা হতে চেয়েছিলাম, সেই না-হওয়া সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশকে প্রত্যক্ষ করে প্রতি ছুটির দিনে চেম্বার এবং এমন কি কল্‌-এ যাওয়াও যথাসাধ্য স্থগিত রেখে তার বাড়িতেই সাহিত্য আলোচনা করে কাটাতাম। তার মাধ্যমেই নামী-দামী সব সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপও হতো। যাদের সম্বন্ধে অগণিত পাঠকমহলে অতীব কৌতূহল, তাঁদের খুব কাছ থেকে দেখতাম।

বাঙালী মানসিকতায় যাদের "সফলতম" বলে, আমি এখন সেই শ্রেণীর লোক। বাবা ছিলেন শুধুই এম-বি ডাক্তার। আমি এম-বি-এস করার পর এম-এস-ও করেছিলাম। সপ্তাহে বারো থেকে কুড়িটি পর্যন্ত অপারেশান করতাম বড় বড় নার্সিং হোমে। টাকার অভাব ছিলো না আমার। নিউ আলিপুরে বাড়ি করেছি। শোফার-ড্রিভন গাড়ি আছে। কলকাতার একাধিক নামী ক্লাবের মেম্বার হয়েছি। এক কথায় অন্য মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত যে-কোনো বাঙালী যেসব সুখ-স্বাচ্ছন্দর স্বপ্ন দেখেন ছোটবেলা থেকে, বাবার বাধ্য ও যোগ্য সন্তান হয়ে সেই সমস্ত প্রাপ্তিই ঘটেছে আমার।

কিন্তু তারই সঙ্গে বাঙালী জাতির সবচেয়ে বড় যে পাস্ট-টাইম, সেই ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার নিত্য শিকার আজ আমি। কোন্ বাঙালী কত বড়, তা প্রমাণিত হয় তাঁর প্রতি ঈর্ষাকাতর বাঙালীদের সংখ্যা কতো, তার উপর। এই পরীক্ষাতে আমি প্রথম শ্রেণীতে, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। ছেলে-মেয়ে, নিউ আলিপুরের বাড়ি, স্ত্রী, সল্ট লেকের শ্বশুরবাড়ি, আমার মধ্যমগ্রামের ছোট্ট সুন্দর বাগানবাড়ি ও আমার পেশার খ্যাতি নিয়ে আমি একজন আদর্শ বাঙালী। আত্মীয়স্বজনরা বলে থাকেন মানুষের মতন মানুষে হয়েছি আমি। এমন মানুষ নাকি আমাদের তিনকূলে কেউ কখনও হয়নি। আমাকে এক নামে সকলে চেনে। পেটের অপারেশান? ডাঃ মুৎসুদ্দীর কাছে যাও। ধন্বন্তরি! অপারেশান থিয়েটারে আমি গাউন পরে গ্লাভস্ হাতে নিলে নতুন অল্পবয়সী নার্সরা রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ে। পরম বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধাতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কুকু সম্বন্ধে ওর অনেক আত্মীয় স্বজনের কাছেই শুনতাম যে, ছেলেটা মানুষ হলো না। বয়েই গেলো একেবারে। কিছুই হলো না। ফিল্ম লাইনে ভীড়ে গেছে। নেশা ভাঙ করে। ড্রাগ খায়। রোজগার-পাতি নেই। বিয়ে করলো না। করবেই বা কি করে? বৌকে খাওয়াবে কি? মা-বাবাকেও দেখে না। দেখবে কি করে? মানি-শূন্য মানি-ব্যাগ পকেটে নিয়ে বাবা-মায়ের পায়ে হাত বুলোলেই কি ছেলের কর্তব্য করা হয়? টাকাই হচ্ছে সার

কথা। কিছুই করলো না জীবনে।

এতদিন পরে দেখে, কুকুকে আমি চিনতেই পারিনি। সাহেবের মত ফর্সা রঙে একেবারে কালি ঢেলে দিয়েছে। কুচকুচে কালো হয়ে গেছে ও। কোঁকড়া নরম কালো চুলের জায়গায় মাথা ভর্তি টাক। মুখে একগাল দাড়ি। আধময়লা একটা ট্রাউজার এবং হাওয়াই শার্ট পরণে।

ও-ই আমাকে বললো, নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারছো না টুটুদাদা?

অবাক হয়ে বলেছিলাম, না তো!

আমি কুকু।

কুকু!

হ্যাঁ, মনে পড়ে না? শিউপুরার কুকু। বিন্ধ্যাচল, মাছিন্দা?

কুকু! বিস্ময়ে, হতাশায় আমি বলেছিলাম। মাই গুডনেস্!

ওদের কাজ শেষ হতে হতে বেলা হলো অনেক। ফিল্ম লাইনের লোকেরা বড় বেশী কথা বলেন। যে-কাজ পাঁচ মিনিটে হয়, সে কাজ ওঁরা তিন ঘণ্টায় করতে ভালবাসেন। এক কাপ চা-খাওয়া শুট্ করতে যাঁদের দেড়ঘণ্টা লেগে যায় তাঁদের অভ্যাসটাই বোধ হয় খারাপ হয়ে যায়।

কুকু বলল, উঠবে নাকি টুটুদাদা? বাড়ি যাবে না?

বাড়িতে না গেলেও হতো। কারণ, আমার সম্বন্ধীদের সঙ্গে আমার স্ত্রী ও পুত্র বাগানবাড়িতে গেছে। এ রবিবার সকালে একজন ধনী ব্যবসাদারের স্ত্রীর অপারেশন ছিল। প্রথমে 'না' করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এমন একটা টাকার অঙ্ক বলে বসলো যে, লোভ আর সামলাতে পারলাম না। ভগবানেরও একটা দাম ধার্য করেছে ওরা। টাকা দিয়েও কেনা যায় না এমন মানুষ সংসারে বোধ হয় আর বেশী নেই।

ভাবলাম, যে-ছোকরার কিছুই হলো না জীবনে, তাকে নিয়ে একটু ক্লাবে যাই। ওকে বোঝাই যে, এ ওর পরম দুর্ভাগ্য যে চোখের সামনে ওর চেয়ে সামান্যই কয়েক বছরের বড় আমি মানুষটা জলজ্যান্ত থাকা সত্ত্বেও ও সে দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হতে পারলো না। নিঃশেষে নষ্ট করলো এমন করে নিজেকে। নিজের সব সম্ভাবনা।

বললাম, চলো, ক্লাবে যাই। বীয়ার-টিয়ার খাও তো!

কুকু বলল, সবই খাই।

তাহলে চলো।

বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো। সাদা সীট-কভার লাগানো এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড কালো ঝকঝকে গাড়ি। টুপি-পরা ড্রাইভার।

আশ্চর্য! কুকু ইম্প্রেসড্ হল না। একটুও।

বোধ হয় বম্বে-টম্বে যায় প্রায়ই। ফিল্ম আর্টিস্টদের দেখেছে নিশ্চয়ই। ও পিছনের সীটে আমার পাশে এসে বসল।

রবিবারের দিন। ক্লাবে লোক গিস্‌গিস্ করছে। সামনেই ইলেক্‌শান। কে কে কমিটিতে ইলেকটেড হবেন আর কে কে হবেন না তাই নিয়ে জোর ফিসফিসানি চলছে। আমাকে ক্লাবের অনেকেই চেনে। চেনে বলেই তো কুকুকে নিয়ে আসা! ও দেখুক, জানুক আমি কী হয়েছি আর ও কি··· কলকাতার সব গণ্যমান্য মানুষই এই ক্লাবের মেম্বার।

বীয়ারের অর্ডার দিলাম। ছুটির দিনে আমি এক বোতল করে বীয়ার খাই। জাস্ট এক বোতলই। কুকুকে সে কথা বললামও।

কুকু বললো, মেজার গ্লাসে করে ঢাকার সাধনা ঔষধালয়ের সারিবাদি-সালসা খেলেই পারো। শরীর এবং চরিত্র দুইই ভাল থাকবে। মদ এবং জীবন যারা মেপে মেপে খায় এবং খরচ করে তারা মানুষ ভালো কখনওই হয় না।

আমি কিছু বললাম না।

ও বললো, মদ ; মানুষের ইন্‌হিবিশান কাটিয়ে দেয়। কিছু মানুষ আছে, যাদের ইন্‌হিবিশান্ কেটে গেলে সবই কাটাকুটি হয়ে যায়। বাকি থাকে না কিছুই। সেই মানুষগুলোই মদ খেয়ে মাতাল হতে ভয় পায়।

মাতাল হলে, এই ক্লাব থেকে বের করে দেবে।

বিরক্তস্বরে আমি অন্য দিকে মুখ করে বললাম।

মাতাল হওয়া আর মত্ত হওয়াটা এক নয়। মত্ত হওয়ার কথা বলিনি আমি। যাক্‌গে। বললেও, হয়তো তুমি বুঝবে না। তারচেয়ে বলো টুটুদাদা! লেখা-টেখা কি ছেড়েই দিলে একেবারে ? কী সুন্দর লিখতে তুমি—

আমি চাপা গর্বের সঙ্গে বললাম, সময় পেলাম কোথায় ? প্রফেশানেই তো···

কুকু বললো, খুবই ব্যস্ত থাকো বুঝি ? তারপরই চারিদিকে তাকিয়ে বললো, এই সব মানুষেরা কারা ?

ক্লাবের মেম্বার, মেম্বারদের গেস্টস্ আর কারা।

কি করেন এঁরা ?

কেউ অ্যাকাউন্টেন্ট, কেউ ডাক্তার, কেউ এঞ্জিনীয়ার। কত্ত প্রফেশান। ইন্টিরীয়র ডেকরেটর, ম্যানেজমেন্ট কন্সালট্যান্ট, আর্কিটেক্ট, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস একজিকিউটিভস। আজে-বাজে লোক তো এ ক্লাবের মেম্বার হতে পারে না।

কুকু বীয়ারে চুমুক দিয়ে চশমার আড়ালের গভীরে কালো চোখে প্রচ্ছন্ন হাসির ঝিলিক তুলে বললো, স্বাভাবিক। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা সকলেই তোমারই মত কৃতী পুরুষ জীবনে। তবে টুটুদা ব্যাপারটা কি জানো ? এঁদের বেশীর ভাগেরই কোন গন্তব্য নেই মনে হয়। শ্যালো, মেগালোম্যানিয়াক্ মানুষ এঁরা। আমি একেবারেই স্ট্যাণ্ড করতে পারি না।

কুকুর ধৃষ্টতা আমাকে মর্মাহত করলো। আমার সঙ্গে না এলে এখানে কোনোদিন ও ঢুকতেই হয়তো পারতো না। আন্‌গ্রেটফুল সিলি চ্যাপ্। এমনিতেই, ঐ পোশাকের অদ্ভুত জীবটির দিকে সকলেই তাকাচ্ছে। আমারই পয়সায় বীয়ার খেতে খেতে আমাকেই ঘুরিয়ে যা-তা বলছে। একেবারেই অমানুষ হয়ে গেছে ছোকরা।

গন্তব্য নেই মানে কি ? সকলকেই কি হরিদ্বারে গিয়ে সাধু হতে হবে নাকি ?

আমি শ্লেষের সঙ্গে বললাম।

কুকু হাসলো। বললো, তা নয়! আমি জিগ্যেস করছিলাম, এঁদের সাক্‌সেস এবং টাকাকে বিযুক্ত করে ফেললে মানুষগুলির জীবনে বাঁচার মতো কিছু কি বাকি থাকবে ? লোকে কি কেবল বাড়ি, গাড়ি, টাকা, নামী-ক্লাবের মেম্বার হওয়ার জন্যেই বেঁচে থাকে ? ওঁরা নিজেরা যা করেন, তা কি এনজয় করেন ? ওঁরা কি বেঁচে আছেন ? ওঁদের মধ্যে কজন সত্যিই বেঁচে আছেন ?

এতো সব কথার উত্তর আমার কাছে নেই।

কুকু এবার হাসলো। বললো, আছে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তুমি জবাব দিতে চাও না। নিজেকেও কখনও এ সব প্রশ্ন ভুলেও করতে চাও না। কারণ তুমি ভালো করেই জানো যে, আমি কী বলছি। যা-করে, মানুষ আনন্দ পায় না, তা মানুষ করবে কেন ? তোমার জীবনের

উদ্দেশ্যটা কি ? কখনও ভেবেছো এ নিয়ে টুটুদা ?

শ্লেষের সঙ্গে আমি বললাম, তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটাই বা কি ?

আমার উদ্দেশ্য, আমি যা-করে আনন্দ পাই, তাই-ই করা । শুনলেই তো ! ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখি । ছবি ডাইরেক্ট করারও ইচ্ছা আছে ।

পড়াশুনাই তো শেষ করলে না । য়্যুনিভার্সিটির ডিগ্রী থাকলে কত্তো সুবিধা হত বল তো ?

কুকু আবার হাসল । বলল, বিদ্যার সঙ্গে ডিগ্রীর সম্পর্ক কি ? 'দা পারপাস অফ এ্যান য়্যুনিভার্সিটি ইজ টু টেক দি হর্স নিয়ার দা ওয়াটার অ্যাণ্ড টু মেক ইট থার্সটি ।' জিগীষার উন্মেষ ঘটানোই য়্যুনিভার্সিটির কাজ । ডিগ্রী তো একটা পাকানো কাগজ । এক কাপ চায়ের জলও করা যায় না তা পুড়িয়ে ।

অনেক বড় বড় কথা শিখেছো যা হোক কুকু । নাও, বীয়ার খাও । সঙ্গে কিছু খাবে ?

নাঃ ।

কোন্ কোন ছবির স্ক্রিপ্ট করেছো তুমি ? কোনো নাম করা ছবির ?

একটা খুব নাম-করা উপন্যাসের স্ক্রিপ্ট করেছিলাম । কিন্তু প্রডিউসার তাঁর স্ত্রীর নামেই চালিয়ে দিলেন । যাক, আনন্দটা আমারই আছে । আমার একার । নামটা অনার । আর একটা ছবির স্ক্রিপ্ট এখন করছি । মানে, গত পনেরো বছর ধরেই করছি । কবে শেষ হবে জানি না । আদৌ শেষ হবে কি না তাও জানি না । কখনও ভালো প্রডিউসার পেলে কিন্তু দেখিয়ে দেবো । একটাই ছবি করবো জীবনে । ছবির মতো ছবি !

সত্যজিৎ রায় হয়ে যাবে বলছো ? রাতারাতি !

আমি বললাম । ঠাট্টার গলায় ।

তা, কে বলতে পারে ? মাণিকদা যখন কফি-হাউসে বসে লাঞ্চের সময় কাপের পর কাপ কফি নিয়ে দূরে তাকিয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেতেন তখন অত লোকের মধ্যে থেকেও তিনি নিশ্চিন্দিপুরেই থাকতেন । 'পথের পাঁচালী' তো একদিনে হয়নি । আমি স্ক্রিপ্ট-এর কথাই বলছি । কোন বড় কিছুই একদিনে হয় না টুটুদা । জীবনে দামী কিছু পেতে হলে যোগ্য দাম দিয়েই তা পেতে হয় ।

বললাম, সে কথা আমাকে না বললেও চলবে । কারণ, আমিও যা পেয়েছি, তা যোগ্য দাম দিয়েই পেয়েছি । কিন্তু তুমি যদি নাম না করতে পারো, তাহলে কি তুমি স্বীকার করবে যে, জীবনটাকে নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেললে !

কুকু এবার খুব জোরে হাসলো ।

বললো, জীবনের মত, ছিনিমিনি খেলার দারুণ জিনিস তো আর একটিও দেখলাম না ! একমাত্র তোমার নিজের জীবনটাই তোমার হাতে । তুমি জীবনে যা দামী বলে মনে করেছো, হয়তো তার পিছনেই ছুটছো । আমি ছুটছি আমি যা দামী বলে মনে করি, তারই পিছনে । নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার নিশ্চয়ই সকলেরই আছে । একটা কথা আমার মনে হয় প্রায়ই । জানো টুটুদা । জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমরা খুব ভয় পাই বলেই আমাদের কিসস্ হলো না । ছিনিমিনি খেলার মধ্যেই ক্রিয়েটিভিটি নিহিত থাকে ।

আমি বললাম, প্রতিভা থাকলেই হয় না । প্রতিভারও গৃহিণীপনার প্রয়োজন আছে । রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলছি ।

তুমি হাসালে । রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথই ! তুম কি বলতে চাও প্রতিভার গৃহিণীপনা না থাকলে 'রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্রনাথ হতেন না ? আর প্রতিভার গৃহিণীপনা থাকলেই তোমার

বন্ধুর মত আজকালকার ঢক্কা-নিনাদিত পোষা-পাখি সাহিত্যিকরা সব রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতেন ?

তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

হ্যাঁ। লাভ নেই। কারণ, তোমার যুক্তি নেই টুটুদা। তুমি যখন কলেজ জীবনে লিখতে, তখন একটা ভালো গল্প লিখে তুমি যে আনন্দ পেতে, আজ তুমি জীবনে যা কিছুই পেয়েছো, তার যোগফল কি সেই আনন্দের সমান ? একটি ভাল গল্প লেখার আনন্দই কি এই সাফল্যর চেয়ে দামী মনে হয় না তোমার কাছে ? সত্যি করে বলো তো ?

ভাবিনি কখনও। তবে, কমই বা কি পেয়েছি ? এত লোকের জীবন বাঁচাই। এতে আনন্দ নেই ? এত স্তুতি, এত যশ, এত টাকা, খাতির, প্রতিপত্তি ! কম কি ?

আনন্দ আছে কি ? আসলে, তেমন করে ভাবোনি তুমি। তাছাড়া তুলনাও চলে না অসম জিনিসে। আনন্দ হয়তো থাকতো, যদি স্বার্থহীনভাবে অন্যর জীবনটা বাঁচাবার জন্যেই তা করতে। তুমি ম্যাড্র্যাসের ডাঃ বদ্রীনাথের নাম শুনেছ ? ভেলোরে গেছ কখনও ? ওঁরাও ডাক্তার। কিন্তু ওঁরা জানেন, আনন্দ কি জিনিস। তোমার অধীত-বিদ্যা সব তো নিজের কারণে, নিজের হিতেই প্রয়োগ করলে সারাজীবন। তোমার মত পেশাদার লোকমাত্রই তো পয়সাওয়ালা লোকেদের চাকর। সবাই চাকর। ওরা তোমাদের "স্যারই" বলুক আর যা-ই বলুক। তুমিও যেমন চাকর, তোমার সাহিত্যিক বন্ধুও চাকর। পশ্চিমবঙ্গে আজ যে কারণে ডাক্তারের মত ডাক্তার বিরল, ঠিক সে কারণেই সাহিত্যিকের মত সাহিত্যিকও বিরল। আমার মনে হয়, পেশার মধ্যে ; একমাত্র বেশ্যাবৃত্তিই বোধ হয় সবচেয়ে স্বাধীন পেশা এখন। এবং সৎ।

আমি চুপ করে রইলাম। একজন পরিচিত মেম্বার কানের কাছে এসে বললেন, মুৎসুদ্দি, আমাদের টাই-আপের কথাটা মনে আছে তো ? ওরা কিন্তু ওদিকে সব কিছুই করছে। ঢালাও ড্রিঙ্কস্—গার্ডেন পার্টি··· বুঝেছ ! ইলেকশন, কিন্তু এসে গেছে !

কুকু চারদিকে চেয়ে বললো, তোমাদের ক্লাবে আজ এত উত্তেজনা কিসের ?

উত্তেজনা ? ইলেকশানের জন্যে। ক্লাবের অফিস-বেয়ারারদের ইলেকশান আছে সামনে।

এই ইলেকশানে কেউ জিতলে কি হবে ? তাঁর নতুন হাত-পা গজাবে ?

কি আবার হবে ? ম্যান অফ ইম্পর্ট্যান্স হবে। আল্টিমেট্লি প্রেসিডেন্ট হতে পারলে ক্লাবের কমিটি রুমের দেওয়ালে ছবিও ঝুলবে।

কুকু আবারও হাসলো। এবারে শ্লেষের হাসি।

বললো সত্যি টুটুদা ! তুমি আমাকে ঝুলিয়ে দিলে ! আরও বীয়ার আনাও। তোমাদের এই ক্লাবে না এলে অনেক কিছুই অজানা থাকত তোমাদের জগৎ সম্বন্ধে। এই-ই তোমাদের এ্যামবিশান্ ? ব্যস্-স্-স্ ? এইটুকুই ? ক্লাবের দেওয়ালে ছবি ঝোলানোই গন্তব্য তোমাদের জীবনের ? এত সামান্য এ্যাম্বিশান সমাজের শিরোমণিদের ? তোমাদের এমন এলিটিস্ট ইলেক্টোরেটের যদি এই স্ট্যাণ্ডার্ড, তবে দেশের গরীব, অশিক্ষিত, অনাহারী ভোটারদের দোষ দিয়ে লাভ কি ?

আমি বললাম, আস্তে, আস্তে। কেউ শুনতে পাবে।

কুকু হাসলো।

বললো, তুমি কেন এক বোতলের বেশি বীয়ার খাও না এবারে বুঝলাম। পাছে, সত্যি কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পাছে, তুমি এই সমাজে, এই ভীড়ে, অপাংক্তেয় হয়ে পড়ো।

তাই না ?

বললাম, অন্য কথা বলো কুকু। অন্য কথা বলো।

আহা টুটুদা। তুমি তো অনেকই টাকা রোজগার করলে। বাকি জীবনটা বিনা পয়সায় অপারেশন করো না ? গন্তব্য মানে, শুধু হরিদ্বারে গিয়ে সাধু হওয়াই নয়। আমি এই গন্তব্যর কথাই বলছিলাম ! নয়তো সব ছেড়ে দিয়ে এবার লেখো। যা কিছু লিখতে চেয়েছিলে, নিজেকে উজাড় করে লেখো। বেটার লেট, দ্যান নেভার।

স্বগতোক্তির মত বললাম আমি, তুমি তো বলেই খালাস কুকু ! ছেলেটার পায়ে দাঁড়াতে এখনও অনেক দেরী।

হাঃ ! জোক্ অফ দ্যা ইয়ার। পুওর ফাদার ! আমার বাবার কথাই মনে পড়ে গেল ! আমার বাবাও ঠিক এই কথাই বলতেন। আর দেখছো তো আমাকে ! এখনও ল্যাংচাচ্ছি। পায়ে আর দাঁড়ানো হলো না। টুটুদা ! তোমার ছেলেটাকে মুক্তি দাও না। ও যা হতে চায় ভালবেসে, যা করে ও আনন্দ পায় ; তাই-ই করুক না হয়। একটাই তো জীবন। বাপের কথামত নাই-ই বা বাঁচল। ওকে নিজের মতই বাঁচতে দাও। জীবন মানে কি শুধুই ভাল-থাকা, ভাল-খাওয়া ? জীবনের মানেটাই তো একেকজনের কাছে এক এক-রকম। তাই না ?

দেড়টা তো বাজে। এখানেই লাঞ্চ খেয়ে যাও কুকু। ওহো ভুলেই গেছিলাম। তোমাকে তো ডাইনীং রুমে ঢুকতেই দেবে না।

আমি বললাম।

কেন ? কুকু মুখ লাল করে বলল, দেবে না কেন ?

তুমি যে স্যুট পরে নেই।

স্যুট পরে নেই মানে ? আমার তো স্যুট একটিও নেইও। কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

না। ব্যাপার কিছু নয়। শীতকালে স্যুট ছাড়া এই ক্লাবের ডাইনীং হলে ঢোকা বারণ।

কুকু, হোঃ হোঃ হোঃ করে ফুলে ফুলে হাসতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বললো, আমাদের বাবারা সব অসহযোগ করে, খদ্দর পরে আর চরকা কেটে ইংরেজ তাড়ালো পঁয়ত্রিশ বছর আগে দেশ থেকে ! আর আজকেও স্যুট ছাড়া দিশি লোকদেরও তোমরা খাওয়ার ঘরে ঢুকতে দাও না ? জয়। ভারতের জয় ! তোমাদের জয়। এই ভারতবর্ষ স্বাধীন করার জন্যেই আমার ন'কাকা পুলিশের গুলি খেয়ে মরেছিলো। সত্যই সেলুকাস ! বিচিত্র এই দেশ।

অনেকেই আমাদের টেবলের দিকে দেখছিলো ; পরে জিজ্ঞেস করবে নিশ্চয়ই, কাকে নিয়ে এসেছিলাম আমি ? ইজ্জৎ একেবারে গলিয়ে দিল কুকুটা। আসলে, দোষ আমারই। এ সব লোককে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের বারে-টারেই যাওয়া উচিৎ ছিল !

কুকু বটমস্-আপ করে বলল, এবার উঠবো।আমার দম-বন্ধ দম-বন্ধ লাগছে এখানে। থ্যাঙ্ক য়্যু ভেরী মাচ্। নট সো মাচ ফর দ্যা বীয়ার। বাট, আমাকে এক নতুন জগতের সঙ্গে আলাপিত করালে বলে। এখানে আজ না এলে, আমি হয়তো বোকার মত পুরনো বিশ্বাসই পোষণ করতাম যে, পৃথিবীতে ডাইনোসররা আর বেঁচে নেই।

বাইরে বেরিয়ে কুকু আর গাড়িতে উঠল না।

বললো, আমি বাসেই চলে যাব। তুমি তো যাবে উল্টোদিকে। কেন ঘুরবে মিছিমিছি আমার জন্যে ?

খাবে না ? চল, অন্য কোথাও গিয়ে খাই।

খেয়ে নেব কোথাও। খাওয়াটা তো এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিছু জুটলেই হল খিদের সময়। চলি, টুটুদা।

কুকু আমার সঙ্গে এলেই ভাল হতো। বাড়িতেই খিচুড়ি বা ভাতে-ভাত খেতাম। একবার ভাবলাম, কুকুকে জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে যাই। গিয়ে, অনেকগুলো বীয়ার খাই, খেয়ে ; যে-সব কথা আজকে অনেক বছর আমার বুকের মধ্যে পাথরের মত চেপে বসে আছে, যে-সব কথা আমার স্ত্রী, আমার পরিচিত মানুষেরা, আমার সমাজে যাদের যাতায়াত তারা কেউই কখনও শুনতে চায়নি এবং বলতেও দেয়নি আমাকে, যে সব কথা শুনলেও কানে আঙুল দিয়ে আমাকে বলেছে, "সাইকোলজিকাল কেস", "কনফিউজড্", বলেছে, "ইডিয়ট", সেই সব কথা কুকুর হাতে হাত রেখে, চোখের জলে বলতাম...

কিন্তু কুকু ততক্ষণে মোড়ের ভিড়ে মিলিয়ে গেছে বড় বড় পা ফেলে।

কী সুন্দর ওর হাঁটার ভঙ্গী। ঈস্‌স্‌ ! কত্তো দিন আমি ভীড়ের মধ্যে, আমার এই ফাল্‌তু, মেকী সত্তাকে হারিয়ে দিয়ে, দশজনের একজন হয়ে হাঁটি না। কত্তো দিন ছোটবেলার মত ফুচ্‌কা খাই না। আলুকাবলী। রাধুর দোকানের চিকেন-রোস্ট, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বসন্ত কেবিনের মোগলাই পরোটা !

ড্রাইভার বললো, কাঁহা চলেগা সাব ?

আমি দরজা খুলে নেমে পড়ে বললাম, তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি চলে আসব।

ও একটুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো আমার মুখের দিকে।

তারপর কিছু না বলে চলে গেলো।

ভীড়ের মধ্যে শীতের মিষ্টি রোদে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল আমার। হাঁটতে হাঁটতে, নিজের কাছ থেকে নিজে দূরে এসে আমার কাঁচের ঘরের জীবনটাকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। যে-সমাজে আমার মেলা-মেশা, চলা-ফেরা, সেখানে ড্রাইভারেরা রোবোট। নিজে থেকে কথা বলা বারণ তাদের। তারা মানুষ নয়।

হয়তো সেখানে প্রত্যেকটা মানুষই রোবোট। সেখানে নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে কেউই ভাবে না। নিজের চোখ দিয়ে দেখে না। নিজের ইচ্ছেতে কেউই চলে না। সারাজীবন, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষ, অন্য কোন মানুষের ভূমিকাতে রংমেখে, স্যুট-পরে, উদ্দেশ্যহীন, উৎকট অভিনয় করে চলে। প্রতিদিন। আমৃত্যু !

কুকু গড্ডালিকায় গা-ভাসানো, পথ-হারানো আমাকে এইমাত্র সঠিক পথের হদিশ দিয়ে গেল।

দেওয়ার সময়

বৌদি রীতিমত হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলো।

বললো, তুই যে কী হয়েছিস, তা বলার নয়! নিজেদের জামা, নিজেরা পছন্দ করলেই পারিস। একটা আনলাম, তা রঙ পছন্দ হল না। আরেকটা আনলাম, বললি, গায়ে ছোট হচ্ছে। যেমন চেহারা করেছিস। কোনো কোম্পানীর স্ট্যাণ্ডার্ড জামাই তোর গায়ে হবে না। কলার সাইজ দেখে কিনলেও জামা গায়ে ঠিক হয় না। এমন কোথাওই শুনিওনি; দেখিওনি।

বিজু বললো। আহাঃ অত চটছো কেন? একটা কোকা-কোলা খাবে? এনে দেবো? দেওরের দোষ কি বলো? বৌদির মতই তো দেওর হবে।

মিনু হঠাৎ চটে উঠে বললো, দ্যাখ্ বিজু, আমার সঙ্গে লাগিস না। মোটা হয়েছি তো বেশ। তোর দাদা মোটা বৌ-ই পছন্দ করে। তোর বৌ রোগা দেখে আনিস, তাহলেই হবে। যার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিস সে তো ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে। তাই বুঝি আমার সঙ্গে সবসময় খুনশুটি। মোটা বলে খোঁটা দেওয়া?

বিজু এবার বললো, বসো বসো। রাগ কোরো না। আসলে কী জানো, এই পুজোর বাজারের ভীড়ে একগাদা মেয়েদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে কাউণ্টারের সামনে গরমে ঘেমে জামা কেনা আমার কোনো দিনও পোষাবে না।

আহা! মেয়েদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করতে যেন কী খারাপই লাগে।

বিশ্বাস করো, মেজাজ গরম হয়ে যায়। তোমরা, রিয়্যালি বৌদি; নাছোড়বান্দা জাত। দাদার সঙ্গে তো পান থেকে চুনটি খসলে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে তোমার, অথচ দোকানে গিয়ে শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউজের কাপড় কিনতে তো ধৈর্যচ্যুতি হয় না! সত্যি বৌদি! তোমাদের বুঝতে পারি না।

থাক্ আর বুঝে কাজ নেই। পরীক্ষাটা পাশ করো। তারপর কে কাকে বোঝায় আমি দেখবো। রাস্তায় রাস্তায় দু'জনে দু'জনকে বাংলা-পড়ানো আমি বন্ধ করবোই।

বিজু হেসে ফেললো। বললো, করেছো কি? "বাংলা-পড়ানো"ও শিখে ফেলেছো?

যা দিন-কাল পড়েছে, শুধু বাংলা-পডানো কেন, হিব্রু, লাতিন অনেক কিছু পড়ানোই শিখতে হবে।

এমন সময় দাদার সাত বছরের মেয়ে রুমি লাফাতে লাফাতে ঘরে এলো। বললো, কাকুমনি, দাদু তোমাকে ডাকছে। তোমার জন্যে প্যাণ্টের কাপড় কিনে এনেছে। দেখবে এসো।

বিজু ইতস্তত করে উঠলো। রুমি ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। মিনু আড়চোখে হাসলো। তারপর বললো, যাও, বুড়ো খোকার জন্যে বাবা লাল জামা এনেছেন, দেখে এসো। পরের বছর হিন্দুস্থান পার্কের শ্বশুর-পার্টি স্যুট দেবে। যাও।

বিজু বললো, যাঃ! বৌদি, তুমি একেবারেই বকে গেছো। "শ্বশুরপার্টি", বলছ? দাঁড়াও। দাদা আসুক, বলে দেবো।

মিনু হাসলো। বললো, ভাল লোককেই বলবি। শিখলাম কার কাছে? কথায় কথায় আমাকে বলে কি জানিস? বলে, আমার বাবার মত "কঞ্জুস-পার্টি" নাকি আর দেখেনি।

বিজু হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

॥ ২ ॥

আজ রবিবার। পূজোর আগের রবিবার। মহালয়া চলে গেছে। পাড়ার কারোরই পূজোর কেনা-কাটা এখনো শেষ হয়নি। কেউ কেউ সবে বোনাস পেয়েছে। কেউ কেউ পাবে, এই আশায় অফিসের সামনে লাল ফেস্টুন-ঝুলিয়ে ত্রিপলের তলায় বসে আছে দিবারাত্রি। কেউ বা সরকারী চাকরী করে। তাদের বোনাস নেই। তারা নানা উপায়ে পূজোর আগে তড়িৎ-ঘড়িৎ দু'চার পয়সা কামাবার ফিকিরে আছে।

রোদটায় পূজো-পূজো গন্ধ লেগেছে। আকাশের দিকে তাকালে ভালো লাগে। যদিও পড়ার চাপে আকাশের দকিে তাকাবার অবকাশ নেই। পূজো পেরুলেই পরীক্ষা।

রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। এখন পাড়াটা শান্ত। কোনো কোনো বাড়িতে রেডিও বাজছে। গলির মোড়ের নিমগাছে বসে একটা কাক ঘাড় বেঁকিয়ে পাশের বাড়ির দিকে কী যেন দেখছে। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে দু-একটা গাড়ি যাচ্ছে। বিজুদের বাড়ির সামনে রাস্তায় একটি পট্-হোল হয়েছে। তার উপর গাড়ির চাকা পড়ছে আর গুবুক্-গাং করে এক একটা আওয়াজ হচ্ছে। রাস্তায় না তাকিয়েও আওয়াজ শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে, একটা গাড়ি গেলো।

বিজু একটা সিগারেট ধরালো। সিগারেটটা শেষ হলে ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা শোবে। তারপর চোখে-মুখে জল দিয়ে আবার অ্যাকাউণ্ট্যান্সী করতে বসবে।

সিগারেটটা হাতে নিযে এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাস্তার দিকে চাইতেই বিজুর চোখ পড়লো মেয়েটির দিকে। একটা আট-দশ বছরের মেয়ে। সামনের বাড়ির রকে বসে আছে। মেয়েটির মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রঙ ভীষণ কালো। গা-মাথা ধুলো ভর্তি। গায়ে একটা নীল মোটা কাপড়ের ছেঁড়া জামা। মেয়েটি মাথা নিচু করে রকে বসেছিলো। মেয়েটি গড়িয়াহাটার শাড়ির দোকানের ছাপ-মারা সাদা কার্ডবোর্ডের একটা নতুন বাক্স হাতে ধরে বসেছিলো। মাঝে মাঝে মেয়েটির বাক্সের ডালাটা একটু খুলছিলো, আবার তাড়াতাড়ি বন্ধ করছিলো। মেয়েটির টানা-টানা চোখ মুখে কোথায় কি যেন এক সমর্পণ-তন্ময়তা, এমন এক নির্লিপ্তি ছিলো যে মেয়েটির মুখ নিচু করে বসে থাকা, বড় বড় কালো চোখ মেলে মাটির দিকে চেয়ে থাকা দেখে, মেয়েটিকে আর দশটা ভিখিরির মেয়ের মত মনে হচ্ছিলো না। তাছাড়া, মেয়েটি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ওখানে বসে আছে। কিন্তু ভিক্ষা চাওয়া বা চেঁচানো কিছুই সে করছিলো না। তার সেই শান্ত তন্ময়তার মধ্যে আশ্চর্য এক করুণ ভাব ছিলো, যা, যে দেখে, তাকে ব্যাথাতুর করে তোলে।

বিজু ভাবলো, ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, ও খাবে কিনা কিছু। তারপরই ভাবলো,

বাড়িশুদ্ধ সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। ঠাকুরও বোধ হয় ভাত বেড়ে নিয়েছে। এহেন সময়ে তার হঠাৎ-বদান্যতায় অনভ্যস্ত বাড়ির সকলেই হয়ত বিরক্ত হবে। তাই মনের ইচ্ছা মনেই রইলো।

একটু পরে মেয়েটি আবারও সেই শাড়ির বাক্সের ডালাটা খুললো। অমনি ঐ মেয়েটির মতই কালো দুটি ছোট ছিপছিপে টিকটিকি লাফিয়ে বাক্স থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়লো। তারপর তরতর করে দেওয়ালে উঠে রেইন ওয়াটার পাইপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মেয়েটি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। তারপর সেই পূজোর গন্ধভরা সুন্দর দুপুরে খালি বাক্সটা সাবধানে হাতে নিয়ে রক্ থেকে নেমে, ধীরে ধীরে হেঁটে বড় রাস্তার দিকে চলে গেলো। বিজু অনেকক্ষণ, যতক্ষণ মেয়েটিকে দেখা যায়; ততক্ষণ ঐ দিকেই চেয়ে রইলো। কেন জানে না, ওর মনে হল; এই পূজোর পরিবেশ, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ি বাড়ি যে পূজো পূজো আবহাওয়া হয়েছে তার ছোঁয়া মেয়েটির শরীরে কী মনে, কোথাও যেন লাগেনি।

॥ ৩ ॥

তারপর থেকে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বারবার মেয়েটির কথা মনে পড়েছে বিজুর। সেদিনের পর মাত্র আর একবার দেখতে পেয়েছিলো মেয়েটিকে।

সেবার, রকের উপর বসা অবস্থায় নয়। দরজায় হেলান দিয়ে দিয়ে পথে বসে। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায়। ওকে তখন দেখে বিজুর হঠাৎ মনে হয়েছিলো যে, মেয়েটির চোখে সমস্ত বুড়ো-বুড়ির ঘুম জড়িয়ে গেছে। ও যেন ইচ্ছে করেও তা আর ছাড়াতে পারছে না।

কিন্তু তবু মেয়েটিকে দেখেই ওর জন্যে যে বিজুর কিছু করণীয় আছে তা বিজুর একবারও মনে হয়নি।

যারা চিৎকার করে না, অথবা যারা হাত তুলে "চাই! চাই!" "দিতে হবে!" "কেড়ে নেব"। ইত্যাদি বলে না; তাদের দাবী নিরুচ্চারই থাকে। তাদেরও যে কিছু চাইবার আছে তা আমরা দেখেও দেখি না। তাদের নীরব চোখের ভাষা আমাদের চোখে পড়ে; কিন্তু চোখ কাড়ে না। মনে পড়ে; কিন্তু মনে থাকে না। দেওয়া উচিত যদিও বা বুঝি, যতদিন মুখ ফুটে না চায় ততদিন নিজে থেকে হাত-উপুড় করি না। এই হলো এদেশের মানুষদের ধর্ম। বড়লোক, গরীব সকলেই একই রকম। নিজের চেয়ে যার অবস্থা খারাপ তাকে প্রত্যেকেই না-দিয়ে পার পেলে কিছুই দেয় না। তাই বিজুরও মনে হয়নি, একবারও যে; সেই ছোট মেয়েটির জন্যে তার কিছুমাত্র করণীয় আছে।

হঠাৎ করে মনে পড়লো ষষ্ঠীর দিনে। যখন রাধা, বিজুকে ফোন করছিলো। রাধা বললো, আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

কেন?

বলবো না এখন। তোমার জন্যে একটা জিনিস কিনেছি। আমার পূজোর প্রেজেন্ট।

কেন কিনেছো? তুমি কি রোজগার করো?

রোজগার করার অপেক্ষায় বসে থাকলে তোমাকে কিছু দেবার মন, তোমাকে কিছু দেবার সময়, সবই হয়ত ফুরিয়ে যেতো। তাই তর সইলো না। তাছাড়া, আমার পকেট-মানি থেকে বাঁচানো টাকা কি আমারই নয়?

রাধা যখন এ কথা বলছিলো, ঠিক সেই সময়ই ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেলো বিজুর। বিজুও রোজগার করে না। এখনো ছাত্র ও। তবু অফিস থেকে কিছু অ্যালাওয়েন্স পায় আর্টিকেল্ড-ক্লার্ক হিসাবে। একটু চুপ করে থেকে, বিজু বলল, রাধা, আজ বিকেলে তো

যেতে পারবো না।

হতাশ গলায় রাধা বললো, পারবে না ? কেন ?

বিকেলে আমি আধ ঘণ্টার জন্যে বেরুবো একটু হাঁটতে। পরীক্ষা তো এসে গেছে। কিন্তু আজ ঐ আধ ঘণ্টায় অন্য একটা কাজও করার আছে।

রাধা অভিমানভরা গলায় বললো, কি কাজ ? পিয়ালির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বুঝি ?

বিজু হাসলো। বলল, পিয়ালির সঙ্গে নয় ; অন্য একজনের সঙ্গে।

নাম বলবে না ?

রাধা ঠাট্টা করলো।

নাম জানি না। সত্যি। এখনো তার নাম জানি না।

এমন সময় সিঁড়িতে বৌদির গলা পেয়েই বিজু বললো, এই ছাড়ছি। তুমি এক কাজ করো। সপ্তমীর দিন সকালে চাঁদে এসো।

রাধা বলল, চাঁদে ? কোন্ দিকে থাকব ? Sea of Tranquility-র দিকে ?

বিজু বলল, হ্যাঁ। দশটা নাগাদ এসো। তারপর রণেনদের পাড়ার মণ্ডপে একসঙ্গে অঞ্জলি দেব।

ফোন ছাড়তে না ছাড়তেই, বৌদি পর্দা ঠেলে বসবার ঘরে ঢুকলো।

ঢুকেই বললো কি রে ? ফোনে ফোনে কি পড়া হচ্ছিলো ? অডিটিং ?

বিজু সিরিয়াস মুখে বললো, আচ্ছা বৌদি, দশ বছরের মেয়ের জামা কিনতে গেলে দোকানে কি বলব ? "দশ বছরের মেয়ের জামা দিন" বললেই হবে ? না, কোনো সাইজ-টাইজ আছে। ছেলেদের সাইজের মত ?

বৌদি বলল, না। গিয়ে বললেই হবে। কার জন্যে জামা কিনবি ? রুমির জন্যে কিনিস না কিন্তু ? মেয়েটাকে সকলে মিলে তোরা নষ্ট করছিস। ওর প্রয়োজনের চেয়ে অনেকই বেশী আছে।

বিজু বলল, না। রুমির জন্য নয়।

সত্যি বলছি, আর কিছু কিনিস না।

বিকেলের দিকে বিজু লক্ষ্মণকে ঘরে ডেকে শুধোলো, ঐ যে কালো মেয়েটি চুপ করে সামনের বাড়ির রকে মাঝে মাঝে বসে থাকে, মেয়েটা কে রে ?

লক্ষ্মণ বললো, ওর মা বাবা নেই। ওর মাথা খারাপ। ওর এক কাকা সামনের বাড়ির একতলার মাদ্রাজীর বাড়ি কাজ করে। ও তাই এসে চুপ করে বসে থাকে।

আজ বিকেলে আসবে ?

জানি না। আসতে পারে।

কোন্‌দিক দিয়ে আসে রে ?

লেকের দিকের রাস্তা দিয়ে আসে।

চারটে বাজতেই বিজু জামা কাপড় পরে, মানি-ব্যাগটা হিপপকেটে ফেলে, রাস্তা ধরে লেকের দিকে এগিয়ে গিয়ে মোড়ে দাঁড়ালো। মেয়েটির আসবার সময় হয়েছে।

বাড়ির সামনে থেকে ওকে ডেকে নিয়ে গেলে ফিরে এসে দশজোড়া কৌতূহলী চোখের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে হবে। মেয়েটি এলে, ওকে নিয়ে গিয়ে একটা জামা কিনে দেবে বিজু। ওকে পছন্দ করতে দেবে। যেটা ওর ভাল লাগে। মা-বাবাহীন বোবা মেয়েটার জীবনে এত বড় প্রাপ্তির দিন বোধহয় আর আসেনি। ওর জামা কিনে দেওয়ার পরও যদি

যথেষ্ট সময় থাকে হাতে, তাহলে রাধাকে একটা ফোন করবে দোকান থেকেই। চলে আসতে বলবে Sea of Tranquility-তে। তারপর একটা পুণ্য কর্মের আনন্দে আনন্দিত হয়ে সেদিন বিজু অনেকক্ষণ রাধার সঙ্গে হেঁটে বেড়াবে। রাধার হাতের সঙ্গে হাত ছুঁইয়ে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরই মেয়েটিকে আসতে দেখা গেলো। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে চওড়া ফুটপাথের গাছের ছায়ায় ছায়ায় মুখ নিচু করে দশ বছরের মেয়েটি হেঁটে আসছিলো। সেই নীল রঙা জামা গায়ে। জামাটা ছেঁড়া যে শুধু তাই নয়, এতই নোংরা যে, নীল রঙটাকে কালো বলে মনে হয়। মেয়েটি নরম কাঁচা সোনা রোদ্দুরে একটি শীর্ণ-গ্রীবা রোগা-কাকের মত মুখ নিচু করে কী যেন ভাবতে ভাবতে আসছে; বাঁ হাতে কোমরের কাছে সেই শাড়ির বাক্সটা ঠিক ধরা আছে।

মেয়েটি কাছে এসে গেছে। এবার বিজু ওকে ডাকলো, বললো, অ্যাই শোনো। শুনছ?

মেয়েটা ভয় পেয়ে মুখ তুলে তাকালো চারদিকে। তারপর বিজুকে দেখতে পেয়ে খুব অবাক হলো। ওর মুখ দেখে মনে হলো বহু দিন ওকে এমন আমন্ত্রণী স্বরে কেউ ডাকেনি। এ ডাক যেন ও ভুলে গেছিলো। কোন্ পর্দায় যে আমন্ত্রণের সুর বাজে, ওব কান তা ভুলে গেছিলো।

মেয়েটি রাস্তা পার হয়ে গাছের নীচে দাঁড়ানো বিজুর দিকে আসতে লাগলো। বিজুর ভীষণ আনন্দ হতে লাগলো। নিজেকে বেশ মহৎ বলেও মনে হতে লাগলো। ওর মনে হলো, এ বছর ষষ্ঠীর দিনে ও এমন একটা দারুণ কাজ করতে যাচ্ছে যার জন্যে সারা পূজোই তার আনন্দে কাটবে। শ্লাঘাতেও।এমন সময় হঠাৎ,একেবারে হঠাৎই; যেমন হঠাৎ এসব দুর্ঘটনা ঘটে, একটি গাড়ি খুব স্পীডে মোড ঘুরেই আর সামলাতে পারল না। একজন রোগা ড্রাইভার ছ-জন মোটা যাত্রীণী সমেত অতবড় গাড়িটাকে বোধহয় সামাল দিতে পারল না। ব্রেক-চাপার প্রচণ্ড শব্দ সত্ত্বেও গাড়িটা মেয়েটিকে গিয়ে ধাক্কা মারলো; মেয়েটি ছিটকে হাত-পা ছড়িয়ে প্রায় বিজুর কাছাকাছি এসে পড়লো ফুটপাথে। হাত থেকে শূন্য সাদা প্যাকেটটা ছিট্‌কে গেলো। মেয়েটি বিজুর দিকে তাকিয়ে একবার ওঠবার চেষ্টা করলো। তারপর আবারও শুয়ে পড়লো। মনে হলো, ও অনেকদিন ভাল করে ঘুমোয়নি বলে এবার আরামে ঘুমোবে।

তারপর কী যে হলো বিজুর তা মনে নেই। অনেক লোক দৌড়ে এলো, গাড়িটা ঘিরে ফেললো, ড্রাইভারকে চড়-থাপ্পড় লাগলো। তারপর চোখের নিমেষে মেয়েটিকে সেই নতুন-শাড়ির গন্ধভরা গাড়িতে করেই হাসপাতালে নিয়ে গেলো। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

একটু পরে ভীড় পাতলা হয়ে এলো। কিছু স্ত্রী-পুরুষ যেখানে কালো মেয়েটার মাথার চাপ চাপ লাল রক্ত পথে ও ফুটপাথে পড়ে ছিলো, সেদিকে তাকিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত গলায় নানা রকম মন্তব্য করতে লাগলেন।

বিজু তখনো চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিলো।

বিজুর মনে হলো, কাউকে কিছু দেবার থাকলে কখনও দেরী করতে নেই। সমারোহ করে ডেকে নিয়ে, আত্মশ্লাঘায় বেঁকে গিয়ে;গর্বভরে কাউকে কিছু দান করার কথা ভাবতে পর্যন্ত নেই। কারো জীবনেই কাউকে কিছু দেওয়ার সময় বেশি আসে না। কচিৎ, কখনো, তা যদি আসেই, তখন এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে তার হাতে, যা দেবার; তা নিজের হাতেই পৌঁছে দিতে হয়। সে নিজে তা নিতে আসবে কবে, সে অপেক্ষায় কখনোই দাঁড়িয়ে থাকতে নেই।

বাণপ্রস্থ

লাইমুক্‌রা থেকে বাসে চেপে এসে বসন্তবাবু পুলিশ বাজার আর জি এস রোডের মোড়ে নামলেন। জি এস রোডের বড় দোকান থেকে উল কিনে নিয়ে যাবেন। শ্রীমতী উলের লাছি দিয়ে দিয়েছেন। রঙে রঙে মিলিয়ে আনতে হবে। জামাইয়ের জন্য সোয়েটার বুনবেন। মেয়ের বিয়ের পর প্রথম সোয়েটার বুনে দেবেন তিনি গুণমণি মডার্ন জামাইকে।

বাস থেকে নামতেই বাঁ হাঁটুটা কট্‌কট্‌ করে উঠল।

বাসটা চলে যেতেই শিলং ক্লাবের পেছনে ওয়ার্ড লেকের আশেপাশের পাইন গাছগুলোর মধ্যে একটা বেহিসেবী উদাত্ত হলুদ চাঁদকে উদ্ভাসিত দেখতে পেলেন।

বসন্তবাবু বললেন, মনে মনে : আদিখ্যাতা।

পূর্ণিমা-অমাবস্যার 'জো'য়ে বাতের ব্যথাটা বড় বাড়ে। পূর্ণিমার চাঁদকে চাবকাতে পারলে খুশি হতেন বসন্তবাবু।

সিনেমা হলটার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বসন্তবাবু মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন শ্রীমতী তাঁকে কখনও কোনও সোয়েটার বুনে দিয়েছিলেন কিনা। তেইশ বছর বিয়ে হয়েছে। তেইশ বছরের স্মৃতিকে দুহাত দিয়ে হাতড়ালেন, থাবড়ালেন, তারপর মনে পড়ল, দিয়েছিলেন একবার। প্রথম এবং শেষ। কালো উলের। শ্রীমতীর বাপের বাড়ির লোকেদের মাপ প্রমাণ ছিল বলে কয়েকঘর বেশিই নিয়ে বুনেছিলেন সোয়েটারটা শ্রীমতী। ফলে, দুর্বলা-পাতলা বসন্তবাবুর সেটা ভোগে বিশেষ লাগেনি। একবার খুব শীতে আগরতলায় বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়ে গায়ে দিয়েছিলেন। এক চা-বাগানের লালমুখো সাহেব তাঁর ঐ কিম্ভূতকিমাকার সোয়েটারে তাঁকে কালো ভাল্লুক ভুল করে একটু হলে গুলিই করে দিয়েছিলেন কিন্তু বসন্তবাবু ভাল ভাবেই জানেন যে, জামাইয়ের বেলা তা হবে না। বিশেষ যত্ন নিয়ে জামাইয়ের বক্ষ ও মধ্যপ্রদেশের মাপ নিয়েই বানাবেন শ্রীমতী। আজকাল অল্পবয়সী মেয়েদের বয়ফ্রেন্ড আর বর্ষীয়সী মহিলাদের জামাইদের সমান স্ট্যাটাস।

ইডিপাস কমপ্লেক্স এবং ইলেকট্রা কমপ্লেক্স ইত্যাদির কথা তাঁর জানা আছে কিন্তু বসন্তবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস যে, শাশুড়ী আর জামাইয়ের মধ্যেও এরকম কোনও গূঢ় গোপন হাশ্‌-হাশ্‌ ব্যাপার থাকে ; ফলে জামাই সম্বন্ধে এই রসাধিক্য, ঔৎসুক্য এবং স্নেহ ভালোবাসার যাবতীয় আধিক্য বসন্তবাবুর ভাল লাগে না। শ্রীমতীর বয়স যেন দিন দিন কমছে।

পুলিশবাজার আর জি এস রোডের মোড়ে তাঁর সুপুত্তুরের মত বহু ভ্যাগাবণ্ড, বাপের হোটেলে খাওয়া ছেলে-ছোকরারা ভিড় করে থাকে সন্ধ্যের সময়ে। মেয়ে দেখে, সিগারেট

ফোঁকে লম্বা লম্বা টানে, মাইয়াগুলানও ত্যামনি। লাজ নাই, লজ্জা নাই, সহবৎ নাই, ক্যামন কইরা হাঁটে, ক্যামন কইরা কথা কয়, ঠারে ঠারে চায়। চাহন যায় না।

আসলে বসন্তবাবুর মেজাজ আজ দুপুর থেকেই খারাপ। আজ ছুটি নিয়েছিলেন লক্ষ্মীপুজোর। মেঘালয় গভর্নমেন্ট এসব ছুটি মঞ্জুর করেন না। ছেলে মুকু, দর্জি দোকান থেকে ফিরে এসেই প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল। শীতের মুখে মুখেই বসন্তবাবুর "ওয়ান অফ দা বেস্ট উলেন কোট" ছেলেকে দিয়ে বলেছিলেন "অলটার" করে নিতে। ছেলে দর্জি দোকান থেকে ফিরে এসে বলল, তোমার এই কোট অলটার করে পরার চেয়ে স্টাফ টোম্যাটো হওয়া অনেক সুখের কথা। থ্যাঙ্ক উ। আমার গরম জামা লাগবে না। যা আছে তাই দিয়েই চালাবো। এই কোট পরলে লাবান আর রিলবঙের কুকুরগুলো আমাকে ধাওয়া করে আমার পেছন খুবলে নেবে। যার নেই, যার বাবা এ্যাফোর্ড করতে পারে না, সে পরবে না। সো-হোয়াট?

হঠাৎ পাশের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন বসন্তবাবু। গুয়া পান খাবেন একটা। শ্রীমতী, তাঁর মাইয়া মালতী আর পোলা মলয় ওরফে মুকু সব য্যান এক্কেরে, সাহেব হইয়া গ্যাছে গিয়া। বাসায় আর পান খাওন চলে না। ভদ্দর লোকে নাকি অ্যাহনে পান খায় না। যারা খায়, তারা হকলেই ছোটলোক; যারা খাইতো, তারাও রাতারাতি ছাইড়্যা দিয়া ভদ্দরলোকোগো দলে নাম লিখাইছে। পোলাডার কী অডাসিটি! "ফাদার" বইলা কোনও রেসপেকটই নাই। আরে তগো লইগ্যা কী-ই না করলাম! আব তগোই নাই কোনও কন্‌সিডারেশন? হঃ!

গুয়ায় একটা করে কামড় দেন, আর পানে একটু করে চুন লাগান খাসীয়াদের মত। গা-টা আস্তে আস্তে গরম হয়ে ওঠে। কানের লতিটা গরম হয়ে ওঠে। পান খেতে খেতে উলের দোকানের দিকে চলেন বসন্তবাবু।

হঠাৎ রাজেন সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

কোথায় চলেছেন?

এই-ই তো! এটটু উলের দোকানে।

চলুন উল কিনে নিয়ে তারপর আমার সঙ্গে আমার বাড়ি।

না না, এহন থাউক।

বসন্তবাবুর হঠাৎ শ্রীমতীর রাগে দেদীপ্যমান মুখখানি মনে পড়ে যায়। তাঁর ফতোয়া সন্ধ্যা আটটার মধ্যে ডিনার খেতে হবে—সাহেবরা তাই-ই খায়—পাঞ্জাবীরা খায়—সিন্ধীরা-মাড়োয়ারীরা—যারাই জীবনে উন্নতি করেছে তারাই সকাল সকাল ডিনার খায়।

অতএব উন্নতি না করলেও জীবনের লাস্ট ইনিংসে এসে তাঁকেও খেতে হবে।

ওয়াক্ থুঃ থুঃ।

বলেন, না না, আইজ থাউক। আরেকদিন হইব খনে। আছেন ত কিছুদিন।

হ্যাঁ, তা আছি সাতদিনের মত। তা হলে চলে আসবেন যে-কোনও দিন সন্ধ্যের পর।

আসুম অনে—স্যরি, আসব।

রাজেন সেন এখন কলকাতায় বড় চাকরি করে। ওঁদের বাড়ি ছিল গোয়ালপাড়ায়। অরিজিন্যালি সিলেটে। এই রাজেনবাবুর মত লক্ষ লক্ষ লোক যে কেন নিজেদের ভাষায় কথা বলেন না তা ভেবে অবাক হন বসন্তবাবু। কাউকে 'আইসেন' বা 'আসেন' বলে বললে আপ্যায়নটা যতটা আন্তরিক হয়, হতে পারে, তা কখনও আসুন আসুন বললে হতে পারে?

অথচ তবু লঙি-ধুতির মত, গুয়া পানের মত, বিনা প্রতিবাদে মুখের ভাষাটাও এঁরা সকলে ত্যাগ করেছেন। "দ্যাশী" ভাষায় কথা বললে লোকে "বাঙাল" ভাববে। যেন বাঙাল ভাষায় যারা কথা কয় তারা মনুষ্যেতর জীব।

আসলে মানুষগুলানের অরিজিন্যালিটিই নষ্ট হইয়া গ্যাছে গিয়া।

গুয়া খেয়ে গা গরম হয়ে ওঠে। উৎসাহ উদ্দীপনা বোধ করেন তিনি। তাঁদের দেশেও সুপুরি, মাটির নীচে, মাটির কলসীতে পোঁতা রেখে মজানো হতো। যখন সেই কলসী উঠতো—উস্‌স্‌ রে! কী বদ্‌ গন্ধ! সেই সবই এখন তামাদি হয়ে গেছে—সেই সব শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, সেইসব রূপ—রূপ-গুণের সংজ্ঞা—সব কিছুই পালটে গেছে।

উলের দোকানটায় ঢুকলেন। এই দোকানটা সিন্ধুপ্রদেশের একজনের। পার্টিশনের আগে পূর্ব ভারতে সিন্ধীদের কেউ চিনতো না, পাঞ্জাবীদেরও নয়। কিন্তু এখন মেঘালয়, অরুণাচল, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং আসামে পশ্চিম ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ভাল ব্যবসা করছে। শ্রীমতী, মুকু ও মালতী তো এই দোকানের জামা-কাপড় ছাড়া পরেনই না, বা পরে না। বলে, বাঙালী দোকানগুলোয় সব বেঢপ জামা-কাপড় রাখে। বাঙালীরা ব্যবসা জানে না।

অনেক-রঙা উলের লাছি নাড়তে চাড়তে অত আলোর মধ্যে বসন্তবাবুর মাথাটা কেমন রঙের প্রাচুর্যে ঘুরে গেল।

নাকে নদীর জলের গন্ধ পেলেন বসন্তবাবু—বহু যুগের ওপার হতে বন্দরের আওয়াজ এলো কানে—হীরালাল সা-র দোকানে যেন দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—কত রকমের উল—তাঁর মা তাঁকে উল কিনতে পাঠিয়েছেন—একপাশে উল, অন্য পাশে আর সব। বাজার থেকে পাটালি গুড় আর তামাকের গন্ধ আসছে। ইলিশ মাছের নৌকো ভিড় করছে ঘাটে। বড় বড় ইলিশ। নাকে গন্ধ এখনও আছে। টাকায় আটটা।

আট টাকা!

বড্ড দাম!

জিনিসটাভি দেখুন দাদা। জিনিসটাভি ফার্স্ট ক্লাস আছে।

তা আছে।

তবে?

বড্ড দাম।

এক দাম—আমরা দর-দাম করি না।

স্বাধীনদের বাড়ি ছিল হরিসভার পুকুর পাড়ে। কদম গাছ দুটো? আহা! বর্ষাকালে কেমন কদম ফুল ঝরে পড়ত। স্বাধীনদের বাড়ির সিঁড়ির দুদিকে হাতীর শুঁড় তোলা ছিল। শুঁড়ের মধ্যে পাথরের বল। একটা লটকা গাছ—বাড়িতে ঢুকতেই।

মালতীর ছেলে মেয়ে যদি হয়—এখন হওয়ার চান্স নেই—জামাই মেয়ে এখন নাকি পাঁচ বছর হানিমুনিং করবে—মালতী তার মাকে বলেছে—কিন্তু যদি হয়, তখন অবাক চোখে শুধোবে বসন্তবাবুকে, লট্‌কা গাছ কী গাছ দাদু।

বসন্তবাবু যে ওদের দেখাবেন, চেনাবেন যে এইটেই লটকা গাছ তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। এ দেশে লটকা গাছ নেই। য্যাগো দ্যাশে ছিল তাগো দ্যাশ এ্যাহনে বাংলা দ্যাশ। বাংলা-ভাষী বাংলা।

হরিসভার পুকুরে ভাসানের দিন। গাঁটিয়া ফোটাতো পুজো কমিটির লোকেরা মাঠের পাশের ম্যুনিসিপালিটির রাস্তায়। পরদিন মাঠময় বারুদের গন্ধ—উচ্ছ্বাসী হাউইয়ের স্তব্ধপক্ষ মুখ থুবড়ানো স্বপ্ন—কালো, পোড়া ঘাস, তারই উপর একরাশ নরম কমলা সাদা

রাতে-ঝরা শিশিরভেজা শিউলি ফুল

ভুল, ভুল, সব ভুল।

সবুজ মাঠের মধ্যে থেকে ফুলমণি গাই ডাকতো হাম্বা—আ-আ-আ করে। অত মিষ্টি করে পৃথিবীর আর কোনও গরু কখনও ডাকেনি, ডাকবে না। অমন ফড়িং উড়বে না, বৃষ্টির পর বৃষ্টিকে ধাওয়া করে। বাঁশবনে অমন করে জোনাকি জ্বলে না, জ্বলবে না কখনও কোনও দেশে—যে দেশ বসন্তবাবুর মস্তিষ্কে সুরেলা কিন্তু বড় করুণ জলতরঙ্গেই কেবলমাত্র বেঁচে আছে—থাকবে আরও কিছুদিন। তারপর খুলি ফাটবে ফট্। বসন্তবাবুর চিতা জ্বলবে। স্মৃতিগুলি ফুটে যাবে ঘিলুর সঙ্গে—দাউ দাউ করবে আগুন।

আগুনই থাকে শেষ পর্যন্ত। মানুষই একদিন আবিষ্কার করেছিল আগুনকে। আগুনের মধ্যেই মানুষের সমাপ্তি। পাবক। মানুষ দাহ্য। বসন্তবাবু দাহ্য। স্মৃতি, বোধ, সবই দাহ্য।

উঃ এত দাম! আগুন! আগুনই থাকে। জামাইও ত একদিন চিতায় জ্বলবে। কিছুদিন পরে। বসন্তবাবু শীগগিরী। তিনি পথিকৃৎ। ঘাটের মড়া। টাইম আপ্। ফসিল্। কিন্তু জামাইও জ্বলবে।

আজ-ইয়া-কাল। হিন্দি সিনেমা। তবে আর মিছে আগুন দামের উল কেন?

আরে ওঃ শাম্মা! আমজাদ খান। শোলে। প্রতিবেশীর রেকর্ড ওরে ওঃ শাম্মা। বড়ী নট্খট্। ই দুশমনী বড়ী মাঙ্গা পড়েগা ঠাকুর!

শোলে মানে কি? স্ফুলিঙ্গ? মুকু বলেছিল। আগুন।

আপনার দেশ কোথায়?

বসন্তবাবু শুধোলেন দোকানদারকে।

হিঁয়া।

না না, ওরিজিন্যাল দেশ?

ওঃ আমরা রিফিউজি। সিন্ধের লোক।

উদ্বাস্তু। জিন্না আমাদের ছিলেন।

নেতাজি আমাদের। বসন্তবাবু পানের ঢোক গিলে বললেন।

নেতাজি কে? গান্ধী আর জিন্না আর নেহরু। পার্টিশান। পার্টিশান, জিন্না আর নেহরু।

গোবর খড়ের গন্ধ; গোয়ালঘরে সাপ আর ফুলমণি গরু।

বসন্তবাবু বললেন, ও তা হলে আপনারাও উদ্বাস্তু। দ্যান দ্যান উল দ্যান। উলগুনান ভালোই? কি কন?

দোকানী হাসলেন। একগাল। বললেন, ভালোই।

উল কিনে বসন্তবাবু ভাবলেন একটু কিছু খাবেন কোনও রেস্তোরাঁতে। ডায়াবেটিস বলে খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট। শ্রীমতী কিছুমাত্র খেতে দেন না। লাভ কি? বসন্তবাবু জীবদ্দশাতেই যা দিয়েছেন, গত হলেও তাই-ই দেবেন। পলিসিগুলোর প্রিমিয়াম ঠিক ঠিক দিয়ে এসেছেন গত পঁচিশ বছর।

প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির টাকাও শ্রীমতীর ইচ্ছানুযায়ীই খরচ হবে। না বেশি; না কম। তবে এত খাতির কেন? বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কেন? আগুন ছাড়া আর কোনও প্রকৃত বন্ধু তাঁর নেই।

উল কেনা হল। কিনতে হল। শ্রীমতীর আদেশ।

এবার একটু কিছু খেলে হয়। রসমালাই? হোক। এই পাহাড়ী গরুগুলোর দুধে গাধার দুধের গন্ধ। দ্যাশের গরুর বাঁটের রঙ ছিল শিউলি ফুলের বোঁটার মত। পাথরের বাটিতে

জমানো লাল সরের পায়েস। রসমালাই এখানের? হউক। আর কি করণের আছে?

সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন রেস্তোরাঁতে। বললেন, এক প্লেট রসমালাই নিয়া আস্‌সো, আর বেশি চিনি দিয়া চা।

এখানে চাইনিজও পাওয়া যায়। কী যে খায় ছ্যামড়াগুলান্। খাওয়া-দাওয়া সব পাল্টে গেল। জামা-কাপড়, নৈতিকতা, শুভ-অশুভ বোধের মত।

পাটশাক আর কাঁটালের বিচির তরকারি? আহা! লোত্ লোত্। জিভ দিয়া জল আসে। থানকুনি পাতা, পেঁপে কাঁচকলার শুক্তানি। ভেটকি মাছের কাঁটাচচ্চড়ি। মৌরলা মাছ ভাজা—কুটুর—পুটুর। ভাপা ইলিশ। কাঁচা লঙ্কা, কালো জিরা দিয়ে তেল-কই। আহা! চিতল মাছের পেটি—ধনেপাতা আর কাঁচালঙ্কা দিয়া আর গাদার মুঠা—মুঠ্ মুঠ্, য্যান মাংস! কচি পাঁঠার ঝোল। সরপুঁটি, সরষে বাটা দিয়া।

নাঃ, মুখটা জলে ভরে এলো বসন্তবাবুর। আজকাল বাড়িতে চাওমিয়েন, চপ্‌সুই, পর্ক-চপ, হ্যাম, ব্যাকন হেইসবেরই চলন। ব্যাঙ শুয়ার না-খাইলে আইজকাল আর মডার্ন হওন যায় না। আর নিজে যখন প্রথম প্রথম কাউঠ্যার মাংস আনতেন হাতে কইর‍্যা—কী চিৎকার আর চেঁচামেচি। শ্রীমতী বলতেন, ঐতিহাসিক প্রস্তর যুগের লোক তিনি। আহা কাউঠ্যার চর্বি! কত্তদিন খান না। আর নিজেরা জামাই-পোলা লইয়া পা-ছড়াইয়া ব্যাঙের ঠ্যাঙ, শুয়ার খাইতাছ, তার বেলা? না, ব্যাঙ চালান যায়—সায়েবরা খায়। খাউক/খাও/নিপাত যাও/

সারাটা দ্যাশ আজ বড়ই সায়েব-ভক্ত হইয়া গ্যাছে। সায়েবদের গু-ও ভাল। তাইলে আর চরকা কাইট্যা জেলে গিয়া সত্যাগ্রহ কইর‍্যা পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়া তাগো তাড়াইলা ক্যান্। সত্যই সেলুকস! কী বিচিত্র এই দ্যাশ!

খেয়ে দেয়ে মুখ মুছে ভুরুক-সুরুক্ করে চায়ে চুমুক লাগালেন বসন্তবাবু। বাড়িতে জিভ পুড়াইয়া নিঃশব্দে চিনি ছাড়া স্যাকারিন গোলা চা গিল্যা খাইতে হয়। শব্দ করণ অসভ্যতা। সায়েবরা শব্দ কইর‍্যা খায় না। বোঝলানি!

বাইরে এসে ভাবলেন, একটুখানি হেঁটে যান। এক পক্কর চা খাইয়া এক চক্কর হণ্টন মারেন। লেকের চাইর-পাশের রাস্তা ধইর‍্যা—গবর্নরের বাসার আস-পাশ। রাস্তাটা নির্জন।

সন্ধ্যের পর ফুটবল খেলে যখন বাঁশবনের রাস্তা দিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরতেন তখনকার কথা মনে পড়ে।

এদিকটায় বড় বড় গাছ। ভারী-ভারী ছায়াগুলান হুমড়ি খাইয়া পড়ছে। আলো। তাগো সরাইতে পারে না। বড় ভালো লাগে।

শংকামাবীর শ্মশানের রাস্তায় হরিধ্বনি তুইল্যা শব লইয়া যাইতো কারা য্যান্। বল হরি, হরি বোল। মুসলমান ছাওয়ালগুলান্ রংপুর শহরে দুধ বিক্রি কইর‍্যা শূন্য মাটির কলস বাজাইয়া কী মিষ্টি সুরের গান গাইতে গাইতে খোঁয়াড়ের পথ ধইর‍্যা তাগো বাসার পথে ফিরতো।

আঃ! কী নির্জন পথ। ঠাণ্ডা। বড় আরাম। সংসার নাই, অফিস নাই, ছাওয়াল-মাইয়া-জামাই কেউই নাই।

বসন্তবাবুর বড্ড ঘুম পেয়ে যায়। চিরদিনের মত ঘুমোতে ইচ্ছে করে এই শান্তির মধ্যে।

সেই ঘুমের মধ্যে যদি সহস্র স্বার্থপর মুখ ঝুঁকে পড়ে তার ঘুমন্ত চোখকে জাগাতে বলে—যদি কেউ জিগ্‌গায়: 'কি করেন?'

বসন্তবাবু উত্তরে শুধু অস্ফুটে বলবেন, কিছুই করি না।

কিছু করি না, কিছু করতেও চাই না : একটু ঘুমোতে চাই। ফুলমণির ডাকের মধ্যে, বসন্তবৌরির চমকে-ওঠা ঘুমপাড়ানী সুরের মধ্যে, বাঁশবনে হাওয়ার শব্দের মধ্যে, হাওয়ায় ওড়া সজনেফুলের মধ্যে, চোত্‌রা পাতার কটুগন্ধে ভারী মন্থর পরিবেশের পরিচ্ছন্নতায় একটু ঘুমোতে চান বসন্তবাবু।

হঠাৎ চোখ মেলে দেখেন পাইনের জঙ্গল ঘন হয়ে এসেছে।

জঙ্গল গভীর, গভীরতর ; ছায়াচ্ছন্ন। উপরে হারামজাদী হলুদ চাঁদ। পায়ে বাত। বসন্তবাবু জঙ্গলের দিকে দৌড়ে যেতে চান—পালিয়ে যেতে চান, হারিয়ে যেতে চান সংসার থেকে জরাজীর্ণ ভবিষ্যৎহীন গার্হস্থ্যের এই ন্যক্কারজনক নোংরামি ও হল্লা-গুল্লা থেকে।

বসন্তবাবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে জঙ্গলের দিকে এগোন।

খেলনা

শেষের বাসটি চলে গেল। ইম্ফলের দিকে। চৈতি বারান্দায় দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে দেখল।

দেওয়ালে ঝোলানো আয়নায় মুখটি একবার দেখল, আলতো করে মুখে একটু পাউডারের প্রলেপ বুলোলো। তারপর কনে-দেখা-আলোয় বড় করে দগদগে একটি সিঁদুরের টিপ পরলো।

রুদ্র ওদের বাড়ির লাগোয়া ব্যাচেলার্স মেসে তাস খেলতে গেছে। সেখানে তক্তপোষের উপর ঝুঁকে পড়ে বসে ওরা নিশ্চয়ই তাস খেলছে, কাপের পর কাপ চা খাচ্ছে, সিগারেটের পর সিগারেট খাচ্ছে। ঘরটিকে এতক্ষণে আস্তাকুঁড় করে তুলেছে। ছেলে মাত্রই নোংরা। তার উপর অতজন কমবয়সি ছেলে যদি একসঙ্গে থাকে।

আজ শনিবার। মনে পড়ল চৈতির। মনে যে এখনো পড়ে এটাই আশ্চর্য। এই বার্মা—সীমান্তের অজ্ঞাত শেষ গ্রাম 'মোরে'তে ক্যালেন্ডারের কীই বা দাম! পুরাকায়স্থ কোম্পানির চাকরি করে রুদ্র, পাশের মেসের সকলেই তাই করে। জঙ্গলে থেকে কাঠ কাটায়, হাতী দিয়ে বইয়ে আনে, 'মোরে'র চেরাই কলে কাঠ চেরাই হয়। তারপব লরী বোঝাই হয়ে চালান যায়—প্যালেল হয়ে ইম্ফল।

চৈতি এখন সকাল-সন্ধ্যেয় রান্না করে, তারপর সন্ধ্যের পর পরই খেয়ে দেয়ে ঘুম দেয়।

বিয়ের পর পর বেশ লাগত। এমন নিরালা নির্জন জায়গা। সমাজ নেই, লৌকিকতা নেই, শুধু পাখির ডাক, বাঘের ডাক, আর অবিচ্ছিন্ন অবকাশ। নিজের স্বাধীনতার সংসার নানা রকম মজাও ছিল তখন। ভারত-বার্মা বর্ডারের চেক-পোস্টের সকলের সঙ্গে ভাব সকলের। দিব্যি, সেই নো-ম্যানস ল্যান্ডের নদীটির উপরের সাঁকো পেরিয়ে বার্মার গ্রাম "তামু"তে চলে যেতো। স্বচ্ছ, রঙীন নাইলনের জামা-পরা বর্মী মেয়েদের সঙ্গে ইশারায় কথা বলত। ওরা ফানুসের মতো হাসিতে ফুলে ফুলে উঠত—ফুলের মতো মুখে ওরা মুখরা হয়ে উঠত। কাঠের প্যাগোডাতে গিয়েও মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসতো। তারপর ভারতের এলাকায় ফেরার পথে পাঞ্জাবী ব্যবসাদারের দোকান থেকে সস্তায় টুকিটাকি কিনে ফিরত। না পাসপোর্ট, না ভিসা তখন এত কড়াকড়ি ছিল না। কয়েক বছর আগের দিনগুলোই ভালো ছিল।

এখন আর কোনও মজাও নেই। চৈতির জীবনের সব মজাই যেন শেষ হয়ে গেছে। রুদ্র যে মাইনে পায় তাতে কোনও মজার খেলনা তৈরি করতেও রুদ্র মোটে সাহস পায় না। ওরা খালি ঘুমোয়, ঘুম ভেঙে ওঠে, খায়: রোজ কার কাজ করে, আবার ঘুমোয়। চৈতি

অনেকবার হাবে-ভাবে বুঝিয়েছে, কিন্তু রুদ্র খেলনা পছন্দ করে না। খেলাও না। মাঝে মাঝেই বড় ক্লান্তি লাগে চৈতির।

প্রথম যেদিন রমাপিসীর সঙ্গে এখানে বেড়াতে আসে, ওরা পাহাড়ের উপরের "মোরে" ডাকবাংলোতে ছিল। সে রাতে পিসেমশাই-এর গাড়ির পেট্রল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছিল। পিসেমশায়ের সহপাঠী পুরকায়স্থ সাহেবের কর্মচারী রুদ্র চ্যাটার্জির ডাক পড়েছিল তখন সে বাংলোয়। সেদিনও এমনি কনে-দেখা-আলো ছিল আকাশে। খাকি শর্টস্ পরনে এবং খাকি হাফশার্ট গায়ে, চটপটে সপ্রতিভ স্বাস্থ্যবান রুদ্র বাংলোর বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। পাহাড়ের পটভূমিতে সেই শেষ বেলায় কি যে দেখেছিল জানে না চৈতি, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারেনি। শুধু ওর হৃদয়টি একটি ঝিনুক—ঝিঝির মতো ঝুমুর ঝুমুর করে বেজেছিল।

তারপর যা হয়ে থাকে তাই হয়েছিল। ইম্ফলে বেড়াতে আসা কলকাতার মেয়ে এই "মোরে"র বাংলোয় মরতে চেয়েছিল। মরে গেছিল। তাকে কেউ বাঁচাতে পারেনি।

এখন সূর্য ডুবে গেছে। সেপ্টেম্বর মাস। সারাদিন নীল আকাশে সোনালী রোদ সাঁতার কেটে কেটে বিকেলে হাঁফিয়ে বেড়ায়। ঝুরঝুর করে সজনে পাতায় দোল দিয়ে হাওয়া বয়। গেটের কাছের আমলকি গাছটা সারাদিন মুচুর-মুচুর করে পাতা ঝরায়। শেষ বিকেলে দাঁড়কাকটা চ্যাগারের উপর বসে বসে শুদ্ধ "গা"-তে কা-কা-কা-কা করে গান গায়। মণিপুরি মেয়েরা খোলের তালে তালে বাড়ির উঠোনে উঠোনে পুং-চোলোম্ কিংবা থৈবী-খাম্বার নাচ নাচে। ওদের গানের সুর দেখতে দেখতে কার্তিক মাসের কুয়াশার মতো সন্ধ্যের পর সমস্ত মোরের আকাশ বাতাস ভরে তোলে। সুরের সুরেলা চাঁদোয়ার মতো মোরের আকাশে ওদের গান আর খোলের শব্দ ভেসে বেড়ায়। দুলতে থাকে।

বেশ লাগে। ময়দা মাখতে মাখতে কি প্রেসার কুকারে মাংস চড়িয়ে বসে বসে চৈতি ওর কলকাতার জীবনের কথা ভুলে যায়। ভুলে যায় যে, ইচ্ছে করলে ও-ও আজকে বালিগঞ্জ পাড়ার কোনও এক্সিকিউটিভের স্ত্রী হতে পারত, এই সময় আলো ঝলমল রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে ছোকরা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে স্লিভ-লেস্ ব্লাউজ পরে শপিং-এ বেরোতে পারত।

এখন ওর মনে হয়, ও যেন বরাবর এই মোরেতেই ছিল, মোরেতেই ও বড় হয়েছে ; মোরেতেই ওর মরণ হবে।

এমন সময় ঝড়ের বেগে রুদ্র ঘরে ঢুকেই বলল, আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিলে ? খাবারদাবার কিছু আছে ?

চৈতি হেসে বলে, দাঁড়াও, একটু বসো ইজিচেয়ারে ; আনছি।

ও সব বসা-টসার সময় নেই আমার। আমায় এক্ষুনি যেতে হবে।

কোথায় যাবে ?

তা দিয়ে তোমার দরকার কি ?

দরকার নেই ?

না দরকার নেই। যাচ্ছি আমাদের ব্যাডমিন্টন ক্লাবে, মিটিং আছে।

চৈতি মুখ নামিয়ে বলল, বেশ।

অল্পক্ষণের মধ্যে জামা-কাপড় বদলে রুদ্র বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল—আমার জন্যে আবার বসে থেকো না খাবার নিয়ে, প্রেম দেখাবার জন্যে।

বলেই, বেরিয়ে গেল।

চৈতি নিজের মনে বিড়-বিড় করে বলল, প্রেম আমার আর নেই।

চৈতি জানে, রুদ্র কোথায় গেল এখন।

প্যালেলের রাস্তায় কিছুদুর গিয়ে ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে একটি শুঁড়িখানা আছে। ওর মণিপুরী ঠিকে ঝিয়ের কাছে সব শুনেছে চৈতি। বাঁশের বেড়া-দেওয়া ঘর। মোষের শিং-এর মতো বিনুনী বাঁধা মোটাসোটা খাসীয়া মেয়ে আছে ওখানে দুটি—তাদের দেখতেও নাকি মোষের মতো। তাছাড়া বর্মী মেয়েও আছে একটি। রুদ্ররা সেখানে যায়—সস্তায় দেশী মদ খায়—মেয়েগুলোর সঙ্গে কি করে না করে জানে না চৈতি। ভাবতেও পারে না। ভাবলেও ওর গা বমি-বমি করে।

এই জঙ্গলে এসে বোধ হয় হেরে গেছে চৈতি। যে জঙ্গল পাহাড়কে ভালোবেসে ও এখানে একদিন এসেছিলো সেই জঙ্গল পাহাড়ই ওকে হারিয়ে দিয়েছে। ওর ঘরের মানুষকে ও বেঁধে রাখতে পারেনি। রুদ্রকে নতুন কিছু দেবার মতো কিছু আর বাকি নেই চৈতির। চৈতি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। ওরা যদি দুজনে মিলে একটি হাসি-খুশি গাবলু-গুবলু ঝুমঝুমি বানাতো, তবে হয়তো এমন হত না। তবে হয়ত এমনি সব সন্ধ্যেবেলায় ওরা বসে বসে সেই ঝুমঝুমি বাজাতো—তাকে নাড়তো চাড়তো—তার কথা-বলা, তার চোখ চাওয়া নিয়ে আলোচনা করত। কিন্তু একা একা তো চৈতি কিছুই করতে পারে না। একলা একলা তো কেউ খেলনা গড়তে পারে না। মাঝে মাঝে ও মনস্থির করে ফেলে। ভাবে পরদিনই ভোরের বাসে ফিরে চলে যাবে ইম্ফল—সেখান থেকে কলকাতা। যাবে না তো কি! এখনো কি সেই শরৎচন্দ্রের যুগে আছে? না কি ও কাঁদতে বসবে? কান্নাকাটি নয়। ঝগড়া-ঝাঁটিও নয়। সোজা বেরিয়ে যাওয়া। এক বস্ত্রে। বাড়ি থেকে।

কিন্তু পারল কই? ভাবলো তো কতদিন। যখনই ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছে, দেখেছে অসহায়ের মতো রুদ্র পাশে শুয়ে আছে। তার কোমরের উপর দিয়ে ডান হাতটি মেলে দিয়েছে। রুদ্রের লজ্জা নেই, ভয় নেই, গ্লানি নেই। তবু, রুদ্রর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চৈতি উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়াতেই ভোরের মিষ্টি হাওয়া গায়ে লেগেছে। সকালের শুকতারাটি স্নিগ্ধ নীলাভ দ্যুতিতে ওকে রোজকার মতো সান্ত্বনা দিয়েছে—বাগানের বুলবুলিরা রঙ্গনের ডালে চুলবুল করে উঠেছে। ও সব ভুলে গেছে। শুধু মনে হয়েছে, রুদ্র এখুনি বেরিয়ে যাবে কাজে, বেচারা কত মাইল পথ পায়ে হেঁটে, হাতীর পিঠে যাবে কে জানে? সব রাগ ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসাতে গেছে চৈতি।

কিন্তু আর নয়। আজ ও সত্যি সত্যিই প্রতিজ্ঞা করে ফেলল। আর নয়। লজ্জাহীনেরও লজ্জা আছে। সেই লজ্জার সীমাও তার পেরুনো হয়ে গেছে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবে সে। হেস্তনেস্ত মানে, চেঁচামেচি নয়। কাল ভোরের প্রথম বাসেই চলে যাওয়া। কোনও বন্ধন নেই চৈতির—রুদ্রর সঙ্গে। একদিন মা-বাবার সঙ্গে যেমন ঝগড়া করে রুদ্রর হাত ধরে চলে এসেছিল এই পাহাড়-জঙ্গলে, আজ আবার রুদ্রর সঙ্গে ঝগড়া করে মা-বাবার কাছেই ফিরে যাবে। মা-বাবার কাছে আবার লজ্জা কি? কিন্তু, সত্যিই কি লজ্জা নেই? মাকে সে কি করে বলবে যে, যাকে ভালোবেসে সে মা-বাবাকে দুঃখ দিয়ে এই বার্মা সীমান্তে এসে, অতি দীন জীবনযাপন করছে—সেই রুদ্রই তাদের সুগন্ধি চৈতিকে সাঁঝবেলাতে একা ঘরে রেখে—মোষের মতো চেহারার দুটি পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে যায়। এ কথা কি করে কোন মুখে সে বলবে? না না তার চেয়ে ইম্ফলে গিয়ে লক্‌টাক্ লেকে ডুবে মরবে। নইলে, "মোরে" ডাকবাংলো থেকে নিচের পিচের রাস্তায় ঝাঁপ দেবে। যাই করুক, কাল সকালে ও কিছু একটা করবেই।

রাত কত হয়ে গেছে জানে না চৈতি। বাইরের ফিকে জ্যোৎস্নাও ওর মতো খেলনাহীন

একাকীত্বে বেদনাতুর, স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকছে। আর নিঝুম নদীর পাশে পাশে, মাঝে মাঝে একটি হায়না হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে ওর ব্যথার বুক কাঁপিয়েছে। ছেলেদের মেসের কমোন্-পেট ভালুকের বাচ্চাটি মাঝে মাঝে কুঁক্ কুঁক্ কুঁক্ করে উঠেছে। ওর বোধ হয় ভয় করছে কিংবা জ্বর আসছে চৈতির মতো।

চেয়ারে বসে বসেই চৈতি ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঝিঁঝিগুলো ঝিঁঝির ঝিঁঝির করে বাইরে বসে ওকে পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় দরজায় হঠাৎ ধাক্কা শুনে চৈতির ঘুম ভেঙে গেলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাশের খোলা জানলা দিয়ে টর্চের তীব্র এক ঝলক আলো ওর মুখে এসে পড়ল।

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চৈতি ভীষণ ভয় পেল। অত ভয় ও এখানে এসে এর আগে কোনওদিন পায়নি। চৈতি কথা বলতে পারল না।

এমন সময় রুদ্র জড়ানো জড়ানো গলায় বলল, 'দরজা খোলো'।

ও দরজা খুলেই রুদ্রর বুকে আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। প্রথমে ও যে ডাকাতের হাতে পড়েনি এই ভেবে চৈতির আনন্দ হয়েছিল। পরক্ষণেই ও যে ডাকাতের হাতেই পড়েছে, এইটে জেনেই ওর কান্না পেয়ে গেল। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রুদ্রর বুকে মুখ রেখে। রুদ্র ওকে সবল হাতে ধরে, ওর সামনে দাঁড় করাল তারপর টর্চের আলোটা আবার চৈতির মুখের সামনে ধরল। রুদ্র দেখল চৈতির দু চোখে জল, এবং গাল বেয়ে ধারা নেমেছে। টর্চটা খাটে ছুড়ে ফেলে রুদ্র চৈতিকে এমন জোরে জড়িয়ে ধরল যে চৈতির মনে হল ওকে আজ রুদ্র গুঁড়িয়ে ফেলবে। ফুরিয়ে যাওয়া একটি দেশলাইয়ের বাক্সর মতো ওকে আজকে ভেঙে ফেলবে। চৈতির সবকটি আগুন জ্বালানো কাঠিই বুঝি শেষ হয়ে গেছে। ও ফাঁকা। ফাঁকা দেশলাই।

কি করছো ? লাগছে যে ! তার চেয়ে আমাকে একেবারে মেরে ফেল।

রুদ্র তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল, খেতে দাও। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

আশ্চর্য ! তবু সে কাঁপা কাঁপা হাতে রুদ্রর জন্যে খাবার বাড়ল। এবং খেতে বসার জায়গা করে দিল। রুদ্র হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসে বলল, তোমার ?

আমি খাব না।

তোমার ঘাড় খাবে।

ভদ্রভাবে কথা বল।

কথা যে ভাবেই বলি না কেন, তোমায় খেতে হবে।

অর্ডার ?

হ্যাঁ অর্ডার।

বলে রুদ্র জোর করে চৈতিকে পাশে টেনে বসালো। নিজে হাতে এক গ্রাস ভাত মাংসের ঝোল দিয়ে মেখে, চৈতির মুখে তুলে দিয়ে বলল, খাও।

কথা না বলে ও লক্ষ্মীমেয়ের মতো নিঃশব্দে খেতে লাগল। তখনো ওর চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। রুদ্রর মনে কি হল যে সেই জানে, রুদ্র জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, তুমি আমার উপর রাগ করেছ ?

আমি কি তোমার উপর রাগ করতে পারি ? আমি তো তোমার খেলনা ছাড়া আর কিছু নই। আমাকে কি তুমি মানুষ বলে মনে করো ?

রুদ্র খাওয়া থামিয়ে চৈতির মুখের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর চোখ বড় বড় করে বলল, এ্যাই শোনো।

চৈতি ভাতমুখেই বলল, কি ?

রুদ্র বলল, বলছি, আগে মুখের ভাত খেয়ে নাও।

চৈতি তাড়াতাড়ি ভাত গিলে ফেলে বলল, কি ?

রুদ্র এঁটোমুখে ওর জল-ভেজা গালে একটি সশব্দ অভদ্র চুমু খেয়ে বলল, আমরা না, আজকে খেলনা গড়ব।

চৈতির ভেজা চোখে আগুন জ্বলে উঠল। ও বলল, মিথ্যুক !

রুদ্র বলল, সত্যি। মিথ্যা কথা না। সত্যি।

কাঁদতে কাঁদতে চৈতি ফিক্ করে হেসে উঠল বলল ; আমি বিশ্বাস করি না।

প্রত্যয়-ভরা গলায় রুদ্র বলল, বিশ্বাস করো না ? আচ্ছা তাড়াতাড়ি খাও।

কিন্তু আর খেতে পারল না চৈতি। থরথর করে ওর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। ও ভাবতে পারছিল না যে, ওরা দুজনে সত্যিই খেলনা গড়বে। ওদের দুজনের খেলনা।

ও বলল, তুমি আমার ভাগেরটাও খাও।

বলেই, মাংসের বাটিটা উপুড় করে রুদ্রর পাতে ঢেলে দিল।

রুদ্র বলল, এখনো খেলনার শখ গেল না খুকী। তুমি এখনো কচি খুকী।

রুদ্রর রুক্ষ চোখে ওর পেলব চোখ মেলে চৈতি বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য।

বলেই, খাবার জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে, হাত ধুয়ে, আনন্দে অস্থিরতায় বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দু হাত দিয়ে একটি কোল বালিশকে আশ্লেষে আঁকড়ে শুয়ে পড়ল।

রুদ্র খাওয়া শেষ করে উঠে লণ্ঠনের শিখাটি কমিয়ে দিয়ে পাশে বসে একটি সিগারেট ধরাল। ফসস্ করে দেশলাইটি জ্বালল। লালে মেশা আগুনের অসংখ্য আঙুলগুলি দেওয়ালে দেওয়ালে কথাকলি নেচে গেল।

চৈতি মুখ ফিরিয়ে সেই আগুনের দিকে চাইলো—ওর চাতক মনের চোখের সামনে সারে সারে শত শত নীল দেশলাই-এর দেওয়ালী দারুণ দম্ভে দপদপিয়ে উঠল।

চৈতির মাথার মধ্যে ছোটবেলার মিষ্টি ভাবনাগুলি ঝিনুক-ঝুনঝুনির মতো কোনও অদৃশ্য সেতারীর ঝালায় ঝরতে লাগল। ললিপপ্, লাল নীল দেশলাই, খেলনা, শিউলিফুলের গন্ধ, মায়ের চোখের চাউনি , সব একে একে সারে সারে, ওর মাথায় ভিড় করে এল। চৈতির মনে হল, এই শারদ রাতে শুয়ে শুয়ে ও কোনও স্নিগ্ধ সুগন্ধি স্বপ্ন দেখছে।

রুদ্র হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দিল।

একদল নরম তুলতুলে সাদা বেড়ালের মতো শরতের জ্যোৎস্না আমলকি গাছের ডাল বেয়ে জানলা গলে ঝুপঝুপিয়ে খাটে এসে নামলো। টিনের চালে চৈতি শিশির পড়ার শব্দ শুনতে পেল—টুপ্ টুপ্।

পাশে শুয়ে রুদ্র কি যেন বলতে যাচ্ছিল।

ওর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে চৈতি ফিসফিস করে বলল, চুপ ; চুপ।

বাখরাবাদের ভুবন

বৌদিরা সকলেই ভুবনকে ভালোবাসতেন। ওর মাথার একটু গোলমাল ছিল বলে এবং ওর স্বভাবটা বড় শান্ত ছিল বলে আমাদের বাড়িতে ওর একটা বিশেষ স্থান ছিল।

বাখরাবাদ জায়গাটা কটকের অনেকদিনের পুরনো মহল্লা। মহানদীর পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সোজা, সেই রাস্তার পাশেই আমাদের বাড়ি ছিল। আমাদের বাড়ির পাশে একফালি জমি। আতা এবং অনেক অমৃতভাণ্ডর গাছ। সেই জমিটুকুর মধ্যে একটি ছোট ঘরে ভুবন থাকতো। থাকতো মানে, দুপুরে বিশ্রাম করতো ও রাতে গিয়ে শুতো। নইলে সারা দিন ও আমাদের বাড়ির বাইরের গেটের ঝাঁকড়া কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে টুল পেতে বসে থাকতো।

শীতের দিনে রোদ এসে ভরে দিত জায়গাটুকু। ভুবন রোদের মধ্যে টুলটাকে টেনে এনে রোদে পিঠ দিয়ে বসতো। পরনে সব সময় গেরুয়া ধুতি আর একটা হলুদ রঙে ছোপানো শার্ট। শীতের দিনে একটা কটকী মোটা গামছা গায়ে জড়িয়ে থাকত ও সবসময়।

আমার দোতলার জানলার সামনের টেবিলে বসে কলেজের পড়া করতে করতে মুখ তুললেই ভুবনকে দেখতে পেতাম। ভুবনের মনে এক অদ্ভুত শান্ত নির্লিপ্তি ছিল। এই পৃথিবীতে ওর আপনজন বলতে কেউই ছিল না। না ছিল আপনার কোনও জন; না ছিল নিজস্ব কোনও সম্পত্তি। তবুও ওর মুখে কোনও অভিযোগ, অনুযোগ বা বিরক্তি ছিল না; কারোর বিরুদ্ধেই। সব সময় হাসি হাসি মুখে সকলের আজ্ঞা পালনের জন্যে ও তৈরি হয়ে বসে থাকত।

মাঝে মাঝে ভুবনকে আমার সিগারেট আনতে পাঠাতাম। ফেরত-আসা খুচরো পয়সা ওকে কখনও দিতে চাইলে ও নিত না। ও বলত, পয়সা দিয়ে আমি কী করব দাদাবাবু? আমি নিজে ছাড়া আর আমার তো কেউই নেই যার জন্য আমার কিছু করার আছে। আমার ভার তো তোমরাই নিয়েছো।

প্রতি বছর গরমের সময় ভুবনের মাথার গোলমালটা বাড়তো। আমাদের বাড়ির আশ্রয়ে ও শান্তিতে থাকতো কিন্তু আমাদের বাড়ী পেরুলেই জায়গাটা ওর জন্যে নিরাপদ ছিল না। পাড়ার ছেলেরা ওর দিকে কুকুর লেলিয়ে দিতো, কখনও বা খালি দইয়ের হাঁড়ি মাথায় পরিয়ে দিতো। কোনও কোনও দিন বা গাধার পিঠে উল্টোমুখ করে চড়িয়ে দিয়ে মুখে চোখে রসগোল্লার রস মাখিয়ে পাড়াময় ঘুরতো। আমরা ওকে বাঁচাবার জন্যে কিছুই করতে পারতাম না। ওকে মানা করতাম বাড়ির বাইরে যেতে—কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ও বেরিয়ে যেতো। যখন বেরোনো ওর পক্ষে বিপজ্জনক ছিল, ও ঠিক তখনই বেরিয়ে

যেতো।

বড় বৌদির বাপের বাড়ির ঝি পেঁচি থাকতো আমাদের বাড়ির হাতার মধ্যেই প্রায় বাড়ির লাগোয়া আউট-হাউসের দোতলায়, একতলায় অন্য চাকরবাকরেরা থাকত। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি ছিলো। সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠেই পেঁচির ঘর।

পেঁচির চেহারা যে আহামরি ছিল তা নয় কিন্তু পেঁচির চোখ দুটো ভারী সুন্দর ছিলো। ভুবন সেই চোখের মধ্যে কিছু বোধহয় দেখেছিলো, যা তার নিখিল ভুবনের আর কোথাওই দেখেনি। যার পৃথিবীতে থাকার মধ্যে কিছুই নেই, কাউকে দেওয়ার মতো কণামাত্র জাগতিক ধন নেই, সে যখন কাউকে সর্বস্ব দিয়ে মনে মনে ভালোবাসে, সে ভালোবাসা বড় কষ্টের হয়। হয়তো দারুণ আনন্দেরও হয় ; কারণ তার ভালোবাসার জনকে বিশেষ দেয় কিছু থাকে না বলেই অদেয়ও বোধ হয় কিছুই থাকে না।

বয়সে ভুবন প্রায় আমারই সমবয়সী ছিল। সে কারণে, অন্য কোনও ব্যাপারে আমাদের মিল না থাকলেও মানসিকতার এক বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও অজ্ঞাত কারণে আমাদের খুব মিল ছিল। যে ক্ষেত্রে সে সময় আমার কোনওমাত্র প্রাপ্তিযোগ ঘটেনি—অথচ ভুবন তার সমস্ত সম্বলহীনতার মধ্যেও আমাকে সেখানে অতিক্রম করে গেছিল, তাই মনে মনে ভুবনের কাছে আমি হেরে ছিলাম।

রানী অথবা বাঁদীই হোক দুপুরের শেষটাতে ঘরে-থাকা সব মেয়েদেরই যে একফালি রোদ্দুর-মাখা অবসর থাকে সেই অবসরের পরিসরটুকুতে পেঁচি ভুবনের সঙ্গে রোদে বসে প্রায়ই গল্প করে কাটাতো। ভুবন নিজে বিশেষ কথা বলতো না। পেঁচিই অনর্গল কথা বলে যেতো। কানে আসতো নানারকম কথা। তাদের গ্রামে কবে তালগাছের মাথায় বাজ পড়েছিল, কবে পুকুরে দেড়মনি কাতলা মাছ ধরা পড়েছিল ; ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা। একে প্রেমালাপ বলা চলতো না কোনও মতেই। কিন্তু পেঁচির সামনে বসে পেঁচির মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে-থাকা ভুবনের চোখ দেখলে তখন মনে হতো, ভুবনের মতো সুখী লোক আর নেই।

মেয়েদেব চোখে কিছুই এড়ায় না। তাই বৌদিরা ভুবন ও পেঁচির মধ্যে যে একটা মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা বিলক্ষণ বুঝতে পারতেন। কিন্তু পেঁচি এতই সাবধানী ও চালাক চতুর ছিল যে, তার সম্বন্ধে তাঁদের সহজাত সাধারণ বুদ্ধিতে তাঁরা মোটেই চিন্তিত ছিলেন না। ভুবন সম্বন্ধেও ছিলেন না। কারণ ভুবনের মধ্যে এবং একটি বোকা, সরল, ক্ষমতাহীন জল-ঢোঁড়া নির্বিষ সাপের মধ্যে তাঁরা কোনও তফাত দেখতে পেতেন না। বাড়ির দুধেল গাই, মেনিবেড়াল এবং ভুবন-পাগলও যে সমগোত্রীয় কোনও মনুষ্যেতর হৃদয়রহিত জীব এ সম্বন্ধে তাঁদের কারও মনেই কখনও কোনও সন্দেহের উদ্রেক হয়নি।

একবার পাড়ার বকা ছেলেরা কলেজ-ফিরতি একদল মেয়ের গায়ে ভুবনকে ঠেলে ফেলে দেয়। সেই সব ছেলেদের কিছু না বলে, মেয়েরা ভুবনকে ধরেই পুলিশে দেয়। ভুবনকে আমি যখন থানা থেকে দু ঘণ্টা পরে ছাড়িয়ে আনতে যাই, তার আগেই ন্যায়-বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্যে তাকে বেদম প্রহার করা হয়। ভুবনের তখন প্রায় হুঁশ ছিল না। ও কেবলই বলছিলো, দিদিমণিদের কোনও দোষ নেই, সব দোষ আমার কপালের। ভুবনের সেই অবস্থাতেও কারও উপর কোনও রাগ বা অভিমান দেখিনি। সেই সময় ওকে দেখে আমার ওকে আবার মারতে ইচ্ছে করেছিল :

কত পাগল রেগে গিয়ে কত কি করে। ইঁট ছোড়ে, গালাগালি করে, থুথু ছিটোয়, অথচ ভুবন অন্যায়ভাবে এত মার খাওয়ার পরও একটু রাগ করে না কেন ? এত নির্লিপ্ত ও কি

করে যে থাকে সবসময়, সবকিছুতে ; এ কথা ভাবতেই আমার অবাক লাগতো। খারাপও লাগতো।

ভুবনের ঘরে গেছিলাম ভুবনের জ্বর দেখতে। বেশ কদিন হল ও জ্বরে পড়েছিল। দুবেলা ভুবনকে গিয়ে দেখে আসতাম আমি। পেঁচি পথ্য নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসতো। প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে তখন ও। ভাত খাবে।

ছোট ঘর। মাটির দেওয়াল টিনের চাল। বাঁশের মাচার উপর এক কোণায় রাখা কালোর মধ্যে লাল ফুল তোলা টিনের একটি ছোট্ট তোরঙ্গ। অন্য একটি বাঁশের মাচার উপরে ভুবনের বিছানা।

ওর ঘরে সেদিন গিয়ে পৌঁছতেই আমাকে দেখে ভুবন তাড়াতাড়ি কী যেন একটা লুকিয়ে ফেলল। বললাম, কি লুকোলি রে ভুবন ?

ভুবন লজ্জা পেয়ে গেল। মনে হল, ভয়ও পেয়েছে। কিন্তু আমাকে ও মিথ্যা কথা বলতে পারলো না। মিথ্যা কথা বলতে পারতও না ও। অস্ফুটে বললো, ফোটো।

বললাম, কার ফোটো ?

ভুবন কথা না বোলে তোরঙ্গ থেকে একটা ফোটো বার করলো। দেখলাম, মেজদার মেয়ে রাণুর ছবি। পেঁচির কোলে রাণু। মেজবৌদি নিজে বক্স-ক্যামেরা দিয়ে হাত পাকিয়েছিলেন ওদেরই উপর।

ভুবন মুখ নিচু করে ছিলো।

কথাটা বলবো কি বলবো না ভাবলাম একটুখন, তারপর বলেই ফেললাম। পেঁচিকে তোর খুব ভাল লাগে ? না রে ? পেঁচিকে তুই ভালোবাসিস ?

ভুবনের সমস্ত মুখ সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললো, হ্যাঁ দাদাবাবু।

ও এমন গলায় কথাটা আমার কাছে কবুল করলো যে, মনে হলো ও খুনের অপরাধ স্বীকার করছে।

আমার সত্যিই অবাক লাগছিলো। ভুবন, আমাদের ভুবনও ভালোবাসে। কিন্তু কেন ?

আমি বোকার মতো ছেলেমানুষী সরলতায় ভুবনকে শুধিয়েছিলাম, ভালোবেসে কি পাস রে ভুবন ?

সে প্রশ্নর উত্তরে ভুবন যে কথা বলেছিলো তা শোনার জন্যে আমি মনে মনে মোটেই তৈরি ছিলাম না। ভুবন বলেছিলো, কাউকে ভালোবেসে, যাকে ভালোবাসা যায় ; তার কাছ থেকে কিছুই পাওয়ার নেই।

আমি বলেছিলাম, মানে ?

—আমি অত জানি না দাদাবাবু। লেখাপড়া করিনি তো তোমাদের মতো। পেঁচিকে ভালোবেসে আমি আমার নিজের থেকে অনেকই বড় হয়ে গেছি।

তারপরই ভুবন বলেছিলো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কাউকে বলবে না যেন। এই ছবিটা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই দামি। এই সবচেয়ে দামি।

আমি চুপ করে ছিলাম। ভুবন জানে না যে, বাড়ির সকলেই জানে পেঁচির কথা। আমি শুধিয়েছিলাম, পেঁচি কি তোকে ভালোবাসে ভুবন ?

ভুবনের চোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, কারও ভালোবাসা পাওয়া যে কী আনন্দের, যতদিন না তোমাকে কেউ সত্যি সত্যি ভালোবাসছে, ততদিন তুমি বুঝবেই না।

তারপর আর এক দিনের ঘটনা মনে আছে। এখনও স্পষ্ট মনে আছে। মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা পড়েছে কটকে। একদিন সন্ধ্যের পর দোতলার খোলা বারান্দায় বসে আছি ইজিচেয়ারে

চাদর মুড়ি দিয়ে। চমৎকার নীল আকাশে তারারা ঝিকমিক করছে। সেজদার তখন সবে বিয়ে হয়েছে। সেজবৌদি ঘরে বসে সেতার বাজাচ্ছে। কানে, দূর থেকে ভেসে আসা সুরগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছে। সেজবৌদি একটা আনকমন রাগ বাজাচ্ছিলো। রাগটা কি, তাই ধরবার চেষ্টা করছি কান পেতে ; এমন সময়ে কাছেই কোনও দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শোনা গেলো। মুখ তুলে দেখলাম, আমাদের ভুবন, পেঁচির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দরজা ধাক্কাচ্ছে। ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজটা ধীরে ধীরে জোর হতে লাগলো। বেশ অনেকক্ষণ পর পেঁচির ঘরের দরজা খুলে গেলো। ভিতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছিলো তার আলোতে দেখা গেলো পেঁচিকে। ওর মুখে পাশ থেকে আলো পড়ায় মনে হোলো ও বিছানায় শুয়ে ছিলো, এখুনি উঠে এলো। এলোমেলো শাড়ি, উস্কোখুস্কো চুল।

আগেই বলেছিলাম, আউট-হাউসটা বাড়ির একেবারে লাগোয়া ছিলো। আমি বারান্দার অন্ধকারে ইজিচেয়ারে বসে থাকায় আমার ওখান থেকে দেখা যাচ্ছিল না। অথচ পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে ভুবন ও পেঁচিকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। কথা তো শুনতে পাচ্ছিলামই।

পেঁচি ঘর থেকে বেরিয়ে বিরক্তির গলায় শুধোলো, কী ব্যাপার ?

ভুবন একটুখন চুপ করে থেকে বললো, তোর ঘরে কে রে ? তুই কি করছিলি ?

পেঁচি বললো, কেউ না তো !

ভুবনের গলায় এমন একটা আঁচ লাগলো যে, এমন গলায় ওকে কখনও ভুবনকে কারও সঙ্গে কথা বলতে শুনিনি। ভুবন বললো, আমি তোর ঘর দেখবো। বলেই, দরজার পাল্লাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে যেতেই পেঁচি ওকে ঠেলে বাইরে বের করে নিজেও ঘরের বাইরে চলে এলো।

পেঁচি বললো, আছে একজন, আমার জাজপুরের মামা। আমাকে দেখতে এসেছে।

ভুবন ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে কি দেখছিল, ভুবনই জানে। কিন্তু আমি সেই অন্ধকারেও অনুমান করতে পারলাম যে, ভুবন যেন কী রকম হয়ে গেলো।

হঠাৎ ভুবন চাপা গলায় বললো, সত্যি কথা বল পেঁচি। আমাকে মিথ্যে বলিস না। তুইও আমাকে মিথ্যে বললে আমি কিন্তু মরে যাবো।

পেঁচি খিলখিল করে হেসে উঠলো। ভাড়া-করা সস্তা মেয়েদের মতো ভুবনের গায়ে ঢলে পড়লো।

পেঁচি ভুবনকে বললো, পাগল হলি তুই ভুবন ? তোকে আমি মিথ্যে বলতে পারি ? এই বলে ভুবনের হাত ধরে পেঁচি ভুবনকে নিয়ে তরতরিয়ে নীচে নেমে এলো।

বললো, কাল এই সময়ে আসিস কিন্তু। এই সময়টাই আমার একটু সুবিধে। মামা আমার আজই চলে যাবে। জাজপুর থেকে এসেছে, জাজপুরে চলে যাবে।

ভুবন নীচে দাঁড়িয়ে পেঁচিকে করুণ গলায় আবার বললো, আমাকে মিথ্যে বলিস না পেঁচি। আমি কিন্তু মরে যাবো। তুই ছাড়া আমার আর কেউই নেই রে। সত্যিই কেউ নেই।

এইটুকু বলেই, মাথা নীচু করে ওর ঘরের দিকে চলে যেতে লাগলো।

পিছনে আর ফিরে তাকালো না একবারও।

আমি ভাবলাম, ভুবন না খেয়েই আজ চলে গেল কেন ? মনে হল, ডাকি ভুবনকে। তারপর ভাবলাম, এ ব্যাপারের আমি যে কিছু জানি, এ কথা বাড়ির কেউ জানলে আমারই সমূহ বিপদ।

ভুবন হন হন করে চলে যাবার পরই পেঁচি আবার দৌড়ে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওর ঘরে

পৌঁছেছিলো। তারপর ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

আমি আবার সেজবৌদিব সেতারে মনোনিবেশ করলাম। কি রাগ উনি বাজাচ্ছিলেন, এখনও ধরতে পারিনি, এমন সময় পেঁচির ঘরের দরজাটা খুলে গেল। ঘরের আলোয় দেখলাম বড়দার নতুন গাড়ির নতুন ড্রাইভার ছোকরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, পায়জামা আর নীলরঙা টেরিলিনের ফুল শার্ট পরে।

ছোকরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে, চোরের মতো গ্যারেজের দিকে চ'লে গেলো।

আমার গলা ছেড়ে ভুবনকে ডাকতে ইচ্ছে করলো। ইচ্ছে করলো, ভুবনকে গিয়ে বলি, ভুবন শুনে যা, দেখে যা ; তোর কাঙাল ভুবনের একমাত্র ভুবনেশ্বরী তোকে কি মর্মান্তিক ভাবে ঠকিয়েছে রে !

সেই রাতেই আমরা ভুবনকে শেষ দেখি ; ভুবন সম্বন্ধে শেষ শুনি।

পরদিন থেকে ভুবনকে আর পাওয়া গেল না। পুলিশে খবর দেওয়া হোলো। কিছুই হোলো না। এক মাস দাদারা সবরকম চেষ্টা করলেন। বৌদিবা অনেকদিন ভুবনের জন্যে খাবার রেখে দিতেন আলাদা করে। বলতেন, বেচারার মাথা খারাপ। কবে আবার নিজেই কোথা থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজিব হবে দেখিস।

কিন্তু কটকের বাখরাবাদের সে বাড়িতে আমরা আরও তিন বছর ছিলাম। র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে আমি বি· এ· পাশ করা পর্যন্ত—সেই তিন বছরের মধ্যে আমরা ভুবনের কোনওই খোঁজ পাইনি।

পাড়ার ছেলেরা যারা ভুবনকে কুকুর বেড়ালের মতো দেখেছে, তারাও নিজেদের অজান্তে ভুবনকে ভালোবেসে ফেলেছিল হয়ত। তারাও কম চেষ্টা করেনি খুঁজে বের কবার। অবশেষে কেউ কেউ বলল, কটক স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে যে লোকটার বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া গেছে লাইনের ওপর, সেই ভুবন। যে লোকটা ট্রেনে কাটা পড়েছে ; সেই ভুবন। কেউ বলল, ভুবন মহানদীতে ডুবে মরেছে।

পুলিশের লোকেরা ভুবন নিখোঁজ হওয়ার দিন ভুবনের ঘর যখন তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল, কোনও তথ্যের খোঁজে তখন আমি সামনে ছিলাম। ভুবনের ঘরে যেমনটি যেখানে থাকার সবই তেমনটি ছিল। একমাত্র যা খোয়া গেছিল, তা একটি ফোটো।

ভুবন যেখানেই যাক না কেন যাওয়ার সময় তার জীবনের সবচেয়ে দামী বস্তুটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলেনি।

পেঁচির সঙ্গে সেই ছোকরা ড্রাইভারের বিয়ে হয়েছিল। পেঁচির একটি ছেলেও হয়েছিল আমরা বাখরাবাদে থাকতে থাকতেই। বড় বৌদি ওদের প্রাইভেসীর জন্যে বিয়ের পরই ভুবন যেখানে থাকত সেই ঘর, আমবাগানের ছায়া, আতা গাছের শান্তি সবই পেঁচীর জন্যে নির্দিষ্ট করেছিলেন।

মাঝে মাঝে পেঁচির চোখের দিকে আমি তাকাতাম। ওর চোখে চেয়ে ওর কোনওরকম দুঃখ বা অনুতাপ আছে বলে আমার কখনও মনে হয়নি। দুঃখবোধ বোধ হয় সকলের থাকে না। পেঁচী ভালো খেত, ডুরে শাড়ি পরত, দুপুরে পান মুখে দিয়ে রোদে চুল ছড়িয়ে বসত। দিব্যি ছিল।

গত সপ্তাহে বহু বহু বছর বাদে অফিসের কাজে কটকে গেছিলাম। কাজ সেরেই প্রথমেই বাখরাবাদে দৌড়েছিলাম গাড়ি নিয়ে। আমার শৈশব—যৌবনের প্রথম ভাগ যে বাড়িতে কেটেছে সে বাড়ি দেখতে।

কিন্তু সে বাড়ি এতদিন বাদে আর সে বাড়ি নেই। সামনের মাঠে চারতলা নতুন বাড়ি

উঠেছে। পুরনো বাড়ির একেবারে জরাজীর্ণ দশা। সেই সব পরিচিত, প্রিয় গাছগুলোও প্রায় কোনওটাই আর নেই এখন। কিছুই আর চেনা যায় না। দেখে শুনে মনে হচ্ছিল বারবার যে, এখানে এতদিন পর না এলেই পারতাম।

স্মৃতির কোটরে যা ছিল, সবই বদলে গেছে, ক্ষয়ে নুয়ে ভেঙে গেছে ; রোদে জলে ধুয়ে গেছে, মুছে মুছে। শুধু আজও যা একটুও মোছেনি মন থেকে তা বাখরাবাদের ভুবনের স্মৃতি।

বয়সে এখন অনেক বড় হয়ে গেছি, নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে জীবনে, তবুও যখনই নানা কাজের ফাঁকে একটু সময় পাই স্মৃতিচারণার, তখনই কেবলি মনে হয়—সেই রাতে পেঁচির ঘরে ভুবন কেন জোর করে ঢুকল না, কেন পেঁচির স্বরূপ বুঝতে পেরেও পেঁচির সামনে, সকলের সামনে ; তার নিজের সামনে, পেঁচির স্বরূপ উদ্ঘাটিত করল না ? করল না কেন ?

সেই কেনর উত্তর আমার কাছে নেই। কিন্তু ওর কাছে তা নিশ্চয়ই ছিলো। যে-কথা ভুবন তার আমগাছের ছায়া-ঘেরা ঘরে বসে একদিন আমাকে বলেছিলো।

বলেছিল, পেঁচিকে ভালোবেসে আমি আমার নিজের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছি দাদাবাবু।

ভুবনটা বড় বোকা ছিল। পেঁচিকে, পৃথিবীকে ও বড় বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছিল। ও বোধ হয় কখনও বোঝেনি যে, পেঁচিরা চিরদিনই পেঁচিই থাকবে ; আর ভুবনেরা হারিয়ে যাবে, ভুবনের মতো।

চিরদিনই তাই হয়েছে।

প্রান্তিক

মিস্টার হোড় বললেন, ব্রিলিয়ান্ট, সত্যিই ব্রিলিয়ান্ট।

আসলে একা মিস্টার হোড়ই নন, ইনকাম ট্যাক্সেও এমন লোক নেই যিনি সুকল্যাণ সেনকে প্রশংসা না করেন। পণ্ডিত অনেকে হতে পারেন ; আছেনও হয়ত বা, কিন্তু ভালো অ্যাডভোকেট সকলে হতে পারেন না। ইচ্ছে করলেই ভালো অ্যাডভোকেট হওয়া যায় বলে অশোক জানে না। মানে তো নাই-ই।

নইলে, এত বড়ো একটা কুড়ি লাখ টাকার ক্যাশক্রেডিটের কেস কেমন সুন্দরভাবে গুছিয়ে আর্গুমেণ্ট করছেন। অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের বাঘা-বাঘা মেম্বাররা পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন। যেমন সুন্দর চেহারা, মিষ্টি করে কথা বলা, তেমন ক্ষুরধার বুদ্ধি। একেবারে রাজযোটক মিল হয়েছে একটি লোকের মধ্যে। সকলে "ব্রিলিয়ান্ট" এমনি এমনি বলে না।

দ্বিতীয় দিনের শুনানী যখন শেষ হলো, তখন মিস্টার হোড় বললেন : ব্রিলিয়ান্ট। অশোক বললো, মুখে ব্রিলিয়ান্ট বললে হবে না, কেসে যদি সত্যিই জেতেন, তা হলে দশ হাজার টাকা ফী দিতে হবে সেন সাহেবকে।

দশ হাজার ? চমকে উঠলো হোড়।

অশোক কেটে কেটে বললো, হ্যাঁ। দশ হাজার। উনি তাই চেয়েছেন। কেন ? কেস জিতলে আপনার মালিকের কত ট্যাক্স রিলিফ হবে ? কত লাখ টাকা ? তা তো জানেন।

মিস্টার হোড় হেসে বললেন, আজ্ঞে না, সে কথা আর বলতে।

তবে ?

অশোক শুধোল।

না। তবে কিছু না, মানে, দশ হাজার একটু বেশী মনে হচ্ছে, এই আর কী।

তৃতীয় দিনের শুনানী আরম্ভ হল। অশোক জুনিয়র কাউন্সেল। টেবিলের উপর উপুড় করে বই সাজিয়ে রেখে একটি একটি করে অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফটের গোলার মতো সিনিয়ার সুকল্যাণ সেনকে জোগান দিচ্ছে। আর দেখতে দেখতে ডিপার্টমেণ্টাল রিপ্রেজেনটেটিভের যুক্তির জঙ্গী বিমানগুলি ভূতলশায়ী হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। মিস্টার হোড়ের উত্তেজনা বাড়ছে ! মাঝে মাঝেই কোর্ট রুম থেকে বাইরে গিয়ে সিগারেট খেয়ে আসছেন।

বহুমূল্য আংটি-পরা দু-হাতের তেলোয় সাঁতরাগাছির ওলের মতো মুখখানি রেখে, শ্মশানে রাজা হরিশচন্দ্র যেমন বিবাগীর মতো মুখ করে বসেছিলেন ; মুখে তেমনি একটি কৈবল্য ভাব ফুটিয়ে বসে আছেন। আর মাঝে মাঝে মুলতানি গরুর মতো জোরে জোরে

নিঃশ্বাস ফেলছেন।

লোকটাকে দেখে প্রথম দিন থেকেই মনে হয়েছে, লোকটা একটা ঘুঘু। অ্যাপেলেণ্টের কর্মচারীই নয় হয়ত ! হয়ত কনট্রাক্ট করেছে কেস জিতিয়ে দেবার জন্যে ; তারপর পাকা রেসুড়ে যেমন ঘোড়া বুঝে জান-লড়ায়, তেমনি সুকল্যাণ সেনকে খুঁজে বের করে সেই ঘোড়ায় বাজি লাগিয়েছে। জিতলে বাজি-মাৎ। হারলেই বা কি ? ওর থোড়াই গ্যাঁট থেকে কিছু খরচ হচ্ছে। লোকটার অতি-বিনয় দেখেই মনে হয়, হয় লোকটা দালাল ; নয় খুনে।

এদিকে আর্গুমেণ্ট প্রায় শেষ হয়ে এল। সেন সাহেব সামিং-আপ্ করছেন ! মেম্বারেরা হাইলি ইম্প্রেসড্। অ্যাপারেণ্টলি। যেমন চমৎকার পেপারবুক করা হয়েছিল তেমনি খেটেছিলেন সেন সাহেব কেসটিতে। অশোকও কম খাটেনি। এতদিনের শ্রম এক্ষুনি পুরস্কৃত হবে। একটি বড় কেস তৈরী করা কি সোজা কাজ ? কতবার এ্যাডজোর্নমেণ্ট নেওয়া হল—কত কাগজ যোগাড় করতে হল, শয়ে শয়ে পাতা ডিকটেশান, শয়ে শয়ে পাতা টাইপ—তারপর তৈরী হল পেপার-বুক। একটি বড় কেসের শুনানী শেষ হতে হয়ত দু'দিন তিনদিন লাগে কিন্তু সে কেস তৈরী করতে লাগে দু'-তিন মাসের অক্লান্ত পরিশ্রম। সেই সব রাতগুলোর কথা ভাবে অশোক। টেবিলে রাশীকৃত বই ছড়িয়ে বসে আছে। দেওয়াল ঘড়িটা একলা টিক্‌টিক্ করছে। অফিসের সবাই যথাসময়ে চলে গেছে—। ও একা বসে বসে পাতা হাতরাচ্ছে, নোট নিচ্ছে ; ভাবছে।

ও অনেকদিন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেছে, মানুষ কি কখনো টাকার জন্য এত পরিশ্রম করতে পারে ? ওর দৃঢ় ধারণা, টাকার জন্যে বা নিজের জন্যে কোন মানুষই কিছুই করতে পারে না। অশোক যা কিছু করে সবই জেদের জন্যে, মজার জন্যে। একটি ভাল ইনস্যুয়িং বল ফেলে কোনো দুঁদে ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট করার মধ্যে যেআত্মতৃপ্তি পেয়েছে ও, একটি কেস ভালভাবে জিতে ও ঠিক তেমনি আনন্দই পেয়েছে। ওর ঠাসবুনুনী যুক্তি, সুন্দর ডেলিভারি এবং গুড-হিউমারের বিপক্ষে ওর প্রতিপক্ষ যখন উল্টে-দেওয়া তেলাপোকার মতো আইনের যুক্তির পিচ্ছিল মেঝেতে হাত-পা ছুঁড়েছে তখন ওর খুব ভাল লেগেছে কিংবা কোনো অভদ্র, কুজাত প্রতিপক্ষ ওর সওয়ালের মুখে যখন গুড়ের হাঁড়িতে-পড়া নেংটি ইঁদুরের মতো যন্ত্রণায় জব্‌জব্ করেছে তখনো ওর খুব ভালো লেগেছে। শুধু টাকার জন্যে ও অন্তত কিছু করতে পারতো না জীবনে। না, এ পর্যন্ত পারেনি। অথচ মুস্কিল হচ্ছে টাকারও প্রয়োজন। সে প্রয়োজনটা আবার বেশী করে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে, যখনি চোখের সামনে দেখতে পায় ওর চেয়ে সর্ববিচারে নিকৃষ্ট অনেক লোক যেন-তেন-প্রকারেণ পকেট ভর্তি টাকা রোজগার করে হাজারীবাগী টেঁটন ষাঁড়ের মতো শিং-উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সব দুর্বিনীত, ঘেয়ো গুণহীন কুকুরগুলিকে দেখলে ওরও বড়লোক হতে ইচ্ছে করে। টাকা রোজগারের ইচ্ছাকে ও সব সময়েই অবদমিত করে রাখে। অথচ ও বুঝতে পায় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো টাকা দিয়েই কেবলমাত্র ঐ শ্রেণীর টাকাওয়ালা লোককে শায়েস্তা করা যায়। ও অনেক কিছু বোঝে, সেই বোঝা যে ভুল তাও বোঝে, তারপর সব কিছু ভুলে যেতে পেরে তৃপ্ত পায়।

অবশ্য টাকা ছাড়াও অনেক কিছু দুশ্চিন্তার আছে। এসব চিন্তা ছাড়াও তার মনকে পীড়িত করার মতো অনেক চিন্তা মাথার মধ্যে দপ্‌দপ্ করে।

নীরেন, অশোকের স্ত্রী জুলির সেই কলেজে পড়া বন্ধু। কালো ঘোড়ার মতো চক্‌চকে চেহারা, উল্টো-করে ফেরান চুল ; অশোক জানে যে, অশোক বাড়ি না থাকলে সে আসে ; যায়। মাঝে মাঝে জুলি তার সঙ্গে বাইরেও দেখা করে। কোনো রেস্তোরাঁতে খায়।

নীরেনদের একটি কটেজ আছে গঙ্গার ধারে। শ্রীরামপুরে। সেখানেও যায়। সব জানে অশোক। অথচ জুলির চোখ চেয়ে বিশ্বাস করতে পারে না যে, সে অসৎ। ওর চোখে চাইলে মনে হয়, ও বড় যন্ত্রণা পাচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা ছাড়া বিশ্বাসঘাতকতার কোনো চিহ্ন জুলির চোখে দেখেনি কখনো। জুলি ওকে ভালোবাসে এবং অশোকের প্রতি সমস্ত ব্যাপারেই জুলি সৎ। কেবল যেদিন নীরেনের সঙ্গে জুলির দেখা হয়—সেদিন রাতে জুলির চোখের কালো মণি দুটি মৌটুসী পাখির মতো স্পন্দিত হতে থাকে ওর বুকের যন্ত্রণাটা চোখে এসে বাসা বাঁধে। জুলির প্রতি সমবেদনাও হয় অথচ ওকে ক্ষমা করতেও ইচ্ছে করে না। কিন্তু ক্ষমা ও করে দেয়, কারণ ওর বিশ্বাসে এখনো ফাটল ধরায়নি জুলি। সুস্থ মেলামেশার যে সীমা ও মনে মনে এঁকে রেখেছে, সেই প্রান্তসীমা জুলি কখনো লঙ্ঘন করে গেছে বলে মনে হয়নি ওর।

আর্গুমেন্ট শেষ করে সেন সাহেব বসে পড়লেন। একটি ছাইরঙা স্যুট পরেছিলেন সেদিন। ওডিকোলোন মাখানো সাদা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন, তারপর ফিসফিস করে অশোককে বললেন, কেমন বুঝলে?

বোঝবার তো কিছু নেই স্যার। জিত। জিত হয়ে গেছে।

মিস্টার হোড়, একটু নড়ে চড়ে বসে রথের মেলার "আহ্লাদি" পুতলের স্বামীর মতো মাথা নেড়ে বললেন।

সেন সাহেব বললেন, না-আঁচালে বিশ্বাসই নেই। দ্যাখো, কি হয়।

ফ্যানটা চিড়িক্ চিড়িক্ করে ঘুরতে লাগল। কোর্ট রুমের জানলা দিয়ে অশোক দেখল, আমগাছের ডালে একটি কাক গদ-গদ গলায় একটি সাদা-গলা মেয়ে-কাককে কি যেন বলছে।

মেম্বাররা উঠে গেলেন।

সেন সাহেব বললেন, আমি চলি অশোক। হাইকোর্টে একটা ম্যাটার আছে। হবে না বোধহয়; তবুও একবার যাওয়া দরকার। সেন সাহেব চলে গেলেন তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে।

মিস্টার হোড় অশোককে ডাকলেন।

কেমন বুঝলেন স্যার?

অশোক চটে উঠল, বলল দেখুন, আপনাকে রানিং কমেন্টারি দিতে পারব না। শুনলেন তো সবই।

মিস্টার হোড় মুখে ক্ষমার হাসি এনে বললেন, আহা! চটবেন না স্যার।

আসুন এদিকে একবার আসুন।

বারান্দার কোণায় ডেকে নিয়ে মিস্টার হোড়, তাঁর ঢোলা, ঝলঝলে টেরীলিনের প্যান্টের পকেট থেকে তাড়া তাড়া ঘামে-ভেজা একশ টাকার নোট বের করে দিতে লাগলেন।

অশোক তার স্যুটের এ-পকেট ও-পকেটে নোটগুলি ভরে রাখতে রাখতে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, কি ব্যাপার?

মিস্টার হোড় বললেন, সেন সাহেবের। আট আছে। মানে আট হাজার। ট্রাইব্যুনালের অর্ডার পেলে আর দু হাজার দেবো। ওঁকে বলবেন।

অশোক নিজের ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ক্যাপাসিটিতে এই কেস রিপ্রেজেন্ট করছে না। করছে, তার অফিসের হয়ে। এই কেসের জন্যে তার অফিসকে মিস্টার হোড় কত টাকা দিয়েছেন বা দেবেন তা অশোক জানে না। সে মাস গেলে মাইনে পায়। তা ছাড়া অন্য কিছু না।

অশোক ভাবল, মুখ ফুটে মিস্টার হোড়কে বলেই ফেলে কথাটা : বলে, যে সিনিয়রকে ফী দিলেন, জুনিয়রকে কিছু দেবেন না ? বলি বলি করেও, বলতে পারল না কথাটা অশোক। অশোকও এ কেসে কম খাটেনি। ওর বাড়িতেই পিসতুতো বোনের বিয়ে হল। অথচ ও গত সাত দিন সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা অবধি এই কেস নিয়েই ডুবে থেকেছে। অনেকেরই অনেক অন্যায় কথা শুনতে হয়েছে। বিদ্রূপাত্মক কথা। কিন্তু অশোক চিরদিনই এই কর্মবিমুখ, পরনিন্দামুখর, ঈর্ষা জরজর সমাজে বিশ্বাস করে এসেছে যে, "ইন আ ম্যানস লাইফ, নাথিং কামস্ বিফোর ওয়ার্ক।"

কাজকে জীবনের ব্রত করেছে ও। পূজো।

অশোকের খুব ইচ্ছা করলো যে, বলে একবার বলে।

এ সব লোক মুখ ফুটে না বললে দেবে না , কোনো দিন দেয়নি।

কিন্তু মিস্টার হোড় সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছেন। পিছনে ফিরে তাকাচ্ছেনও না।

অশোক সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইল, ভাবল, মুখ ফেরালেই বলবে। মিস্টার হোড় হঠাৎ মুখ ফেরালেন ও হাত নেড়ে বললেন ; সেন সাহেবকে বলবেন, রসিদ চাই না।

অশোক নিজের কথা কিছুই বলতে পারল না, মিস্টার হোড়ের কথার উত্তরে মাথা নোয়ালো।

তারপর, বেয়ারাদের বিস্ফারিত চোখের সামনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গাড়ির দরজা খুলল। দরজা খুলে ভিতরে বসল। অফিসের গাড়ি। ও নিজেই চালায়। বড় গরম লাগতে লাগল অশোকের।

গাড়িটা তেতে আগুন হয়ে গেছে। স্যুটটা ঘামে জবজব করছে। সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় গায়ে পাউডার দিয়েছিল। বুঝতে পারছে, গেঞ্জির ভিতরে গলে গলে পিঠ-চুঁইয়ে ঘামের সঙ্গে পড়ছে। মোজা-জুতো-মোড়া পায়ের পাতা দুটি জ্বালা করছে।

গাড়িটা স্টার্ট করল। গীয়ার দিতে গিয়ে বাঁ-হাতটা বাঁ পকেটে লাগল—অনেকগুলো টাকাতে পকেটটা ভারী হয়ে আছে।

গুরুসদয় রোডের ট্রাইব্যুনাল অফিস থেকে ধর্মতলা স্ট্রীটে কল্যাণ সেনের এয়ারকণ্ডিশানড্ চেম্বারে পৌঁছতে সময় লাগবে অনেক বেশী। কিন্তু অশোককে পৌঁছতেই হবে। কতক্ষণ পরের বোঝা হয়ে বেড়াবে এমন করে ?

রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন না ? কি যে বলেছিলেন মনে পড়ল না অশোকের, শুধু মনে পড়ল ; বলেছিলেন টাকা জিনিসটা আদৌ ভালো নয়।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। লাল আলোতে দাঁড়াল। ডান দিকে একটি রেডিও-রেফ্রিজারেটরের দোকান। অশোক একবাব তাকাল।

আজও অফিসে বেরুবার সময় জুলি বলেছিল, হায়ার-পারচেজে একটা রেফ্রিজারেটর কেনো না গো ? একদিন বাজার করে কতদিন রাখা যায়। কোকাকোলা রেখে দেওয়া যায় কিনে। কেউ এলে দেওয়া যায়। আরো কত কি রাখা যায়। তুমি বেশ কিপ্টে আছ ! যাই বল বাবা।

অশোক মনে মনে হাসে। কিপ্টেই বটে। কিপ্টে নিশ্চয়ই ! কিন্তু সে কেবল নিজের বেলায়—। অন্য কারো জন্যে কিছু করবার বেলায় সে কিপ্টে নয় ; কোনোদিনও ছিল না। যাক, টাকা হাতে না থাকলে কি কেউ মন দেখাতে পারে ? আজকালকার মন তো অন্য কিছু দিয়ে দেখানোও যায় না।

আসলে জুলির অনেক শখ আছে। অশোকেরও কি নেই ! এটা করবে, সেটা করবে ;

পুজোর সময় দূরে কোথাও বেড়াতে যাবে। আরো কত কী, কত কী করবে··· । কত কিছু ভাবে দুজনে মিলে অনেক কিছু ভাবে।

একটা ফ্রিজের দাম কত? আড়াই তিন হাজার ?

অশোকের পকেটে এখন নগদ আট হাজার টাকা। সুকল্যাণ সেন কখনো মিস্টার হোড়কে শুধোবেন না, উনি কত টাকা দিয়েছেন। মিস্টার হোড় কখনো সুকল্যাণ সেনের ঘরে ঢোকার সাহসই পাবেন না। ওসব লোকের একটা জন্মগত হীনম্মন্যতা থাকে। ওঁরা অনেক কিছু করতে পারেন হয়তো ; আবার অনেক কিছু করতে পারেনও না।

অশোক ভাবল, যদি দু হাজার টাকা রেখে দিয়ে, বাকি টাকা সেন সাহেবকে দিয়ে বলে, মিস্টার হোড় মাত্র ছ হাজারই দিলেন। আর দু হাজার অর্ডার পাবার পরে দেবেন।তবে সেন সাহেব নিশ্চয়ই কিছু বুঝতে পারবেন না। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, সেন সাহেব নিজেও কি সত্যিই ভেবেছিলেন, যে হোড সত্যি সত্যিই এক কথায় এতগুলো টাকা দেবেন ? তাছাড়া অশোককে অবিশ্বাস করার প্রশ্নও ওঠে না।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আবারও দাঁড়াতে হল! ভীষণ গরম লাগছে। গাড়ির আয়নাটা ঘুরিয়ে দিয়ে অশোক নিজের মুখটা দেখল। এমন করে কাছ থেকে ও নিজেকে অনেক দিন দেখেনি। ঘামে চুলগুলো ভিজে গেছে, কপালে শুয়ে রয়েছে নাকটা লালচে দেখাচ্ছে—দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে গলা বেয়ে। অশোক আয়নার দিকে চেয়ে বলল, এই যে, উনি মাত্র ছ' হাজার দিলেন। অশোক পুলকিত হয়ে দেখল, ওর মুখে কোনোরকম ভাবান্তর হল না। আর একবার মহড়া দিয়ে নিল। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের নাট্যরূপ দিয়ে ওরা নাটক করত। অনেকে বলত, অশোক খুব ভালো অভিনেতা। ও নাকি খুব ন্যাচারাল অভিনয় করে। আজ অশোকের মনে হল, ওরা ঠিকই বলত।

দুটি ড্রেনপাইপ-পরা ছেলে বই-খাতা হাতে নিয়ে রাস্তা পেরুচ্ছিল। বোধহয় সেণ্টজেভিয়ার্সে পড়ে।

একজন বলল, বল ? তাই না ?

অন্যজন বলল, আরে, সব, সব। আজকাল চুরি না করে উপায় আছে ? ইট্স্ আ ভিসাস্ সার্ক্‌ল।

ট্রাফিক লাইটটা হলুদ হল। অশোকের মনে হল একটা হলুদ বৃত্ত ওর চোখের সামনে ঘুরছে। ভিসাস সার্কলের রঙ কি হলুদ হয় ?

কাকেই বা জিজ্ঞেস করবে ?

নিজের উপরই রাগ হল।

জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল। অ্যাকসিলারেটরে যত জোরে পারে চাপ দিল। মনে মনে বলল—শালা ! এত দ্বিধা কিসের ? আমি কি ফালতু নাকি ? সিনিয়ার পাবে, আর জুনিয়রকে কিছুই দেবে না ? কেন না ? না কেন ?

তারপরই অশোক মনস্থির করে ফেলল।

ওর ভীষণ ঘাম হতে লাগল।

দেখতে দেখতে কখন ধর্মতলা স্ট্রীটে পৌঁছে গেল।

সোজাই লিফ্‌টে করে উপরে গেল। ডান পকেটে দু হাজার টাকা, থার্ড—ফ্লোরে পৌঁছেই ল্যাভাটরীতে গিয়ে আলাদা করে ফেলবে ও। বাঁ পকেটে ছ হাজার।

বড় বড় পা ফেলে বেশ সৃপ্রতিভভাবে সেন সাহেবের চেম্বারের স্যুয়িং-ডোর খুলে ঢুকলো অশোক—। দরজাটা বলে উঠল, কিয়্যা কাঁও।

চমকে এবং একটু ভয় পেয়ে মুখ তুলে চাইল অশোক।

সেন সাহেব কোটটা খুলে ফেলেছেন কিন্তু একটি ফিকে হলদে-রঙা হাফ-হাতা সোয়েটার পরে বসে আছেন। ঘরে এয়ার-কণ্ডিশনার চলছে বলে।

অশোকের আবার সব গোলমাল হয়ে গেল। সেন সাহেবের সোয়েটারের সমস্ত হলুদ রঙ একটি হলুদ বৃত্ত হয়ে ঘুরতে লাগল ওর চোখের সামনে।

কি হল ? বোসো ?

বেয়ারা দুটি কোকাকোলা নিয়ে ঘরে ঢুকলো সঙ্গে সঙ্গে।

এ কি ? দুটি কেন ? আপনি কি জানতেন আমি আসব ?

তোমার হাব-ভাব দেখেই কোর্টে বুঝেছিলাম, মক্কেল তোমায় আজ কিছু টাকা দেবে। আরে এতটুকুই না বুঝলাম তো কিসের ওকালতি করি ?

দাও। এনেছ নাকি কিছু ?

অশোক খুব তাড়াতাড়ি তোতলাবার মতো করে বলে উঠল—মানে, ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, দিলেন ; মানে সব নয় ; আট হাজার। আট হাজার টাকা।

সেন সাহেব বললেন, মোটে আট হাজার ? অর্ডার পেলে আরও দু হাজার দেবেন।

অশোক আবার বলল, হ্যাঁ।

সেন সাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমাকে কিছু দিল ?

অশোক লজ্জার সঙ্গে মাথা নাড়ল, মুখ নামিয়ে। নেতিবাচক।

হুঁ। সেন সাহেব স্বগতোক্তি করলেন।

অশোক দু পকেটে একসঙ্গে হাত গলিয়ে টাকাগুলো বের করে টেবলে রাখলো। বললো, গুনে নিন।

ভারমুক্ত হল ও। একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

সেন সাহেব টাকাগুলো একটি একটি করে গুনে নিলেন। অশোক ভাবল, উনি হয়তো বলবেন ; নাও হে। এই পাঁচশ আমিই তোমাকে দিলাম। কিংবা নিদেনপক্ষে একখানি একশ টাকার নোট ?

না। সে রকম কিছুই ঘটলো না। সেন সাহেব টাকাগুলো নিয়ে আয়রনসেফে তুলে রাখলেন। প্রত্যেকটি নোট।

এক-চুমুকে কোকাকোলা শেষ করে অশোক বলল, আমি তাহলে আসি ?

যাবে ? আচ্ছা এসো।

কেন জানে না, অশোকের খুব ভালো লাগতে লাগল। খুবই হালকা লাগতে লাগল ওর ! খুব খুশী-খুশী লাগতে লাগল। নীচের পানের দোকানে এসে দাঁড়াল অশোক। বলল, এক প্যাকেট ভালো ফিলটারটিপ্ড সিগারেট দাও তো ভাই।

দোকানে একটি বড় আয়না টাঙানো ছিল। প্রায় ফুলসাইজ। ভালো করে চোখ তুলে চাইল। দেখল, ক্লান্তিমাখা ওর দিনান্তের মুখটি ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য, পাংশু হয়ে আছে। মুখটি হতাশায় হিম হয়ে আছে।

সিগারেটের প্যাকেটটি হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে অশোক বুঝতে পারলো, ও অভিনেতা নয় ; কোনোদিন ছিলই না। যারা ওর অভিনয়ের প্রশংসা করে বেড়াতো এতদিন, তারা অভিনয়ের কিছুই বোঝে না। আস্তে আস্তে হেঁটে, ভাবতে ভাবতে ; ও পথটুকু পেরুলো।

অশোকের মনে হল, যেন সততার সুন্দর ঘর পার হয়ে এসে সততা ও অসততার দুই ঘরের মধ্যবর্তী চৌকাঠে পা রেখে ও দাঁড়িয়ে আছে। অজানিতে এতদিন দাঁড়িয়ে থেকেছে।

কিন্তু কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে তা ও জানে না। অশোকের মতই জুলি এবং ওদের চারপাশে—ওরা যাদের চেনে জানে, সকলেই বোধহয় অনুক্ষণ এই দুঘরের মধ্যবর্তী চৌকাঠে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনো অসতর্ক মুহূর্তেই ওদের মধ্যে যে-কেউই অসততার ঘরে পা ফেলতে পারে। আজকের জীবন বড়ই মার্জিনাল, ভঙ্গুর।

এ কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে অশোকের শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো।

পরিসর

সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। ভোরবেলা থেকে আকাশটা মেঘলা। ভেজা হাওয়ায় ডালপালা উথাল-পাথাল করছে। চারিদিকেব গাছ-গাছালিতে বৃষ্টি-থামা আকাশে সারারাত জলে-ভেজা পাখিগুলো এখন লাফিয়ে ঝাপিয়ে ডানা শুকোচ্ছে।

জায়গাটা ভারতবর্ষ আর বার্মার সীমান্তবর্তী একটি ছোটো গ্রাম। নাম "মোরে"। মোরের পাহাড়ের উপরের ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে আছি। দু পেয়ালা চা খাওয়া হয়ে গেছে, এক্ষুনি চান করতে যাবো এমন সময় চোখে পড়লো নিচ থেকে পাহাড়-ঘেরা রাস্তা বেয়ে কালো শাড়ি-পরা এক মহিলা ডাকবাংলোর দিকে উঠে আসছেন।

একজন মহিলার আজ সকালে আমার কাছে আসার কথা ছিলো। তবে, এত সকালে নয়।

ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিং মানে. কলকাতায় আমি এক মহিলার কাছ থেকে একটি চিঠি পাই কিছুদিন আগে। মনে করা যাক, তাঁর নাম শ্রীমতী। শ্রীমতী খুব রাগের সঙ্গে লিখেছিলেন যে, আপনারা লেখকরা বড়ই নিষ্ঠুর। আপনাদের লেখায় প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় বিবাহিতা মহিলারা তাঁদের প্রেমিকদের সঙ্গে কত সহজে মেলামেশা করেন, কত সহজে তাঁবা স্বামীর কাছ থেকে যা পাননি তা আনন্দের সঙ্গে পেতে পারেন অন্য কারও কাছ থেকে। অথচ বাস্তব জীবনে আমাদের স্বামীরা কোনও সময়েই ঘুমিয়ে থাকেন না। আমাদের মনের মতো কেউ কাছে এলেই চোখ বড় বড় করে জেগে থাকেন। কিন্তু, কেন ? কেন আমরা বাস্তবে স্বামী ছাড়া মন খুলে কথা বলার মতো একজন লোকও জীবনে পাই না ? পাই না এমন কাউকেই, যাকে হয়তো আমি ভীষণ ভাবে চাই। বাস্তবে আপনাদের গল্প সত্যি হয় না কেন ?

এ চিঠির মধ্যে আমার 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসের একটি বিশেষ মুহূর্তের কথার উল্লেখ ছিলো। শ্রীমতী ক্রোধের সঙ্গে জানতে চেয়েছিলেন যে, এমন এমন মুহূর্ত জীবনে আসে না কেন ? যদি আসেই না, তবে এ নিয়ে লেখালিখি কেন ?

চিঠি অনেকেই লেখেন প্রিয় লেখককে। কোনও লেখক উত্তর দেন. কোনও লেখক বা দেন না। কিন্তু সে সব চিঠিতে লেখকের লেখার কথা অথবা লেখকের প্রশংসা ছাড়া কিছু থাকে না। এ চিঠিটি ব্যতিক্রম ছিলো। শ্রীমতী লেখক হিসেবে আমার বাস্তবতাকে কটাক্ষ করেছিলেন।

তাই অফিসের কাজে যখন মোরেতে যাচ্ছিলামই, যাওয়ার আগে একটি চিঠি লিখেছিলাম শ্রীমতীকে। বলেছিলাম, আমি সাত তারিখে (জুলাইয়ের) মোরে পৌঁছবো এবং

আট তারিখ সকালে উনি যেন আমার সঙ্গে ডাকবাংলোয় দেখা করেন।

ততক্ষণে শ্রীমতী ডাকবাংলোর কাছে এসে হাজির।

হাতে একটা লেডিজ ছাতা। গায়ের রং কালো। বুদ্ধিমতী মুখ। বয়স বোধহয় তিরিশ-একত্রিশ হবে। বর্ষাবিধুর সকালের উথাল-পাথাল পটভূমিতে কালো শাড়ির এই বিক্ষুব্ধ মহিলাকে ভারী শান্ত দেখাচ্ছিলো।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করলাম।

মহিলা অত্যন্ত সপ্রতিভ। আপ্যায়ন অগ্রাহ্য করে বললেন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলাম।

বললাম, আড়াল থেকে মেঘনাদ বধ বাণ ছাড়ার চেয়ে সম্মুখ সমর ভালো। অন্তত অনেক সৎ। বলুন, আমার উপরে এত রাগ কেন?

রাগ, কারণ আপনি বানিয়ে বানিয়ে গল্প লেখেন।

সব গল্পই তো বানিয়েই লেখা হয়, যদিও কোথাও না কোথাও তার সত্য একটু থাকে, কষ্ট করে লুকিয়ে রাখা, চোখের-জলের মতো। কিন্তু বানিয়ে না লিখতে পারলে, লেখক কি হওয়া যায়?

আমি বলছি, মানে,....।

এইটুকু বলেই, মহিলা নার্ভাস হাতে ওঁর কালো হাতব্যাগটার ওপর হাত বোলাতে লাগলেন যেন, খুব লজ্জা পাচ্ছেন এবং যা বলতে চাইছেন তা বলবেন কিনা ভাবছেন।

আমি ওঁর সিঁথির সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে রইলাম এবং ওঁকে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

উনি বললেন, আমার আপনাকে অনেক কথা বলার ছিলো। আমি কোনও মনোমতো লোক পাই না বলার। পাইনি কখনওই। যদি বা কখনও পেয়েছি, বা বলেছি; তারা বোঝেওনি আমার কথা। যদি কোনও সুক্ষণে এমন লোকের দেখা পেয়েওছি যে আমার কথা বুঝবে, তার আবার শোনার সময় হয়নি। আমি জানি, আপনি হয়তো বুঝবেন আমার কথা; কারণ, আপনারা, সাইকো-এনালিস্টদেরই মতো। মানুষের মনে যখন ঝড় ওঠে, সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়; তখন আপনাদের কাছে এলে বোধ হয় শান্তি পাওয়া যায়। কারণ, আপনারা মানুষকে বোঝেন। মানুষই আপনাদের লেখার বিষয়। কিন্তু....।

একটু থেমে গিয়ে বললেন, আপনার কি শোনার মতো সময় হবে?

আমি বললাম, আজ তো রবিবার, আজ আমার ছুটি। ডাকবাংলোয় বসেই থাকতাম। নয়তো পড়তাম। কাজ কিছুই নেই আজ। —আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন কী বলার আছে আপনার।

শ্রীমতী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনার জন্যে খুব ভালো করে হরিণের মাংস রান্না করেছি। আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেবো। খাবেন।

আমি হাসলাম, বললাম, বেশ। কিন্তু এ কি কথা শোনার পারিশ্রমিক?

শ্রীমতী হাসলেন। বললেন, ঠিক তা নয়। এটা প্রণামী। সাধু সন্দর্শনে এসেছি তো!

—আমি সাধু কখনওই ছিলাম না, হতেও চাই না কোনওদিন। কিন্তু অসাধুও নই। তবে হরিণের মাংস খুব রেলিশ করে খাবো। আমরা বড় আজে-বাজে কথা বলছি, এবার আপনি আপনার কথা বলুন।

শ্রীমতী গলার মটরমালায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, কী দিয়ে যে আরম্ভ করি বুঝতে পারছি না। সব যে এলোমেলো হয়ে আছে, সমস্ত কথাগুলিই আমার বুকের মধ্যে;

এই সকালেরই মতন।

আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স মাত্র পনেরো বছর। তখন সেক্স সম্বন্ধে আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিলো না। জানতাম, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কি, তবে সেই কি-টা কী রকম তা জানতাম না। বিয়ের পরই আমার স্বামী আমার অল্প বয়স, আমার কচি মন এ সব কিছুর কথা ভুলে গিয়ে আমার উপর সেক্সটা এমনভাবে চাপিয়ে দিলেন যে, এই ষোলো বছরের বিবাহিত জীবনে কোনওদিন তাঁকে সম্মানের চোখে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। ঐ ব্যাপারে আমিও যে একজন অংশীদার, আমার মন বা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছারও যে একটা ভূমিকা আছে, এটা সেই ফুলশয্যার রাতে যেমন, আজও তেমনই ; কোনওদিনও বুঝতে চাননি তিনি। কখনও বুঝতে চাননি যে, স্ত্রীকে খাওয়ালে পরালেই বা প্রতি রাতে তার শরীরের কাছে এলেই স্ত্রীকে ভালোবাসা হয় না।

কিন্তু তিনি দেখতে শুনতে ভালো। বিদ্বান। বুদ্ধিমান। ভালো চাকরি করেন। ভালো পরিবারের মানুষ।

এই ভীষণ কষ্ট ছাড়া, যে কষ্টর কথা কাউকে বলা যায় না ; আমার আর কোনও কষ্ট নেই। তাই....

এ সময়ে আমি বাধা দিয়ে বললাম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসেন না।

শ্রীমতী হাসলেন। বললেন, পুরুষের অভিধানে "ভালোবাসা"র অর্থবাহী একটাই শব্দ আছে। সে শব্দটা বড় জ্বলন্ত। কিছু মনে করবেন না, খুব কম পুরুষই জানেন ভালোবাসা বলতে কি বোঝায়!

একটু থেমে বললেন, অথচ উনি যে আমাকে ভালোবাসেন না একথা ওঁকে বিশ্বাস করানো যাবে না। কারণ, আমরা এক সংসারে ষোলো বছর ধরে রয়েছি, মেয়েটিকে মানুষ করলাম ও এখনো করছি। এখনো বড় ডাবল-বেড খাটে নীল আলো জ্বালানো বেডরুমে শুচ্ছি—তবুও কি করে বলি যে আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি না ? মিস্টার এ্যান্ড মিসেস অমুক হয়ে নেমন্তন্নে যাচ্ছি। লোকের সামনে ভালোবাসার অভিনয় করছি। তারপর প্রতিরাতে ফিরে এসে কড়িকাঠ বা ঘুরন্ত সিলিংফ্যান বা দেওয়ালের স্থির টিকটিকির দিকে চেয়ে একটি মৃতদেহ সমর্পণ করছি আমার স্বামীকে। কারণ, এতে তাঁর অবিসংবাদী অধিকার। পাঁচশো লোক খাইয়ে, বাজনা বাজিয়ে, খাজনা দিয়ে তিনি আমার শরীরের জবরদখল নিয়েছিলেন আজ থেকে বহু বছর আগে। তাঁর "মহাল" তিনি ভোগ করবেন, এ অধিকার যা দিয়ে রুখতে পারি এমন লাঠিয়াল আমার তো নেই!

এই অবধি বলে, শ্রীমতী চুপ করে গেলেন।

আমিও অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর চৌকিদারকে ওঁর জন্যে চা আনতে বললাম। বললাম, আপনার যদি এতই অভিযোগ আপনার স্বামী সম্বন্ধে, তো তাঁর সঙ্গে থাকেন কেন ? ডিভোর্স করলেই পারেন!

ভদ্রমহিলা চমকে মুখ তুলে চাইলেন। তারপর খুব অসহায় মুখে বললেন, তারপর ? কি করে বাঁচবো ? আমাকে খাওয়াবে কে ? আমি কলকাতার এক অখ্যাত স্কুল থেকে স্কুল-ফাইনাল পাস করেছিলাম। কী আমার যোগ্যতা ? কে আমাকে চাকরি দেবে ? কি করে চলবে ? যাই হোক, তবু তো এই ঘরের আশ্রয়টা আছে! আছে মেয়েকে মানুষ করার দায়িত্বর ঘুম-পাড়ানী ওষুধ। তবু এখন শুধু একজনকেই অনিচ্ছুক শরীর সমর্পণ করছি। তখন শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার জন্যে কি কি যে করতে হবে তা তো আমার অজানা।

আমি হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, আপনার স্বামী ছাড়া জীবনে আর কেউ আপনার কাছাকাছি আসেননি ?

শ্রীমতীর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, এসেছিলেন; এসেছিলো। সেই স্মৃতিটুকু নেড়েচেড়েই তো দিন কাটাই।

কে সেই ভদ্রলোক ? আপনার বিয়ের আগে দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে ? না বিয়ের পরে ?

পনেরো বছর বয়সেই বিয়ে হয়েছিল আমার, তাই বিয়ের আগের প্রাপ্তবয়স্ক জীবন বলতে আমার সামান্যই ছিলো। বিয়ের পরেই দেখা হয়েছিলো তাঁর সঙ্গে।

হঠাৎই ভদ্রমহিলার চোখে-মুখে কী যেন এক আশ্চর্য নরম মহিমা আরোপিত হয়ে গেল। অনেকগুলো আলো যেন তাঁর বুকের অন্ধকারে ঠাণ্ডা ঘরটাতে দপ করে জ্বলে উঠল। ভালবাসা বা ভালোবাসার স্মৃতি যেমন করে আমাদের সকলের বুকের মধ্যেই জ্বলে ওঠে।

স্বগতোক্তির মতো উনি বললেন, তখন আমরা দার্জিলিংয়ে—উনি সেখানেই পোস্টেড। ভদ্রলোক ওঁরই নিচে কাজ করতেন। ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে জীবনে ভালোবাসা যে কত বড় পাওয়া তা বুঝতে পারিনি।

কী করে আপনাকে বোঝাবো যে উনি আমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতেন। আমার বাঁ হাতে একটা ব্যথা হতো আর্থরাইটিসের তখন; অথচ তখন আমার একমাত্র মেয়ে আড়াই বছরের ছিলো। ওকে কোলে কাঁখে করে দার্জিলিংয়ের উঁচু নিচু পথে আমার স্বামীর সঙ্গে আমাকে যেতে হতো এখানে-ওখানে। কোনওদিনও আমার স্বামী আমাকে বলেননি যে, খুকুকে আমার কোলে দাও। তোমার কষ্ট হচ্ছে! অথচ উনি দেখতে পেলেই দৌড়ে আসতেন। আমার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে খুকুকে কোলে নিতেন। বলতেন, বৌদি! আপনার কষ্ট হচ্ছে; আমাকে দিন।

কোথাও কখনও একসঙ্গে খেতে বসে উনি সব সময়ে চোখ রাখতেন, আমি খাচ্ছি কি না ? আমার জন্যে খাবার আছে কি না ? মানে, আমার স্বামী কখনও যা আমাকে দেননি বা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে বুঝতেও পারেননি সেই সব সামান্য অথচ অসামান্য দানে উনি আমাকে সব সময়ই ভরিয়ে রাখতেন। মন আমার সবসময় কৃতজ্ঞতায়, ভালো লাগায় ওঁর প্রতি নুয়ে আসতো। উনি আমাদের বাড়ি এলে, ওঁর জন্যে চা এনে ওঁর সামনে দশ মিনিট বসে থাকলে মনে হতো যেন এক দারুণ পাওয়া পেলাম। তাঁর গলার স্বর, তাঁর চোখ-চাওয়া সব, যেন আমার কাছে দারুণ রোমান্টিক লাগত। মনে হতো একেই বুঝি ভালোবাসা বলে।

বললাম, এবার চা-টা খান। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে একেবারে।

তারপর শুধোলাম, আপনি কখনও সেই ভদ্রলোকের শরীর চাননি ? শুধু কি মনই চেয়েছিলেন ?

শ্রীমতী হঠাৎ চমকে উঠলেন। পেয়ালা-ধরা হাতটা যেন একবার কেঁপে গেলো।

বললেন, মিথ্যা বলবো না আপনাকে। চেয়েছিলাম। কিন্তু উনি খুব লাজুক ছিলেন। কখনও আমার কাছে শারীরিক কিছু দাবি করেননি। ইচ্ছে হয়তো ওঁর ছিলো। কিন্তু সে ইচ্ছে কখনও প্রকাশ করেননি।

মনে পড়ে, একবার আমার স্বামী ট্যুরে গেছিলেন। আমি খুকুকে নিয়ে একা ছিলাম। উনি আমাদের পাশের বাংলোয় থাকতেন। সে সময়ে আমরা দুজনে দুজনের মনের খুব

কাছাকাছি এসেছিলাম। কিন্তু শরীরের নয়। উনি ব্যাচেলার ছিলেন এবং স্বভাবত ভদ্রলোক ও রুচিসম্পন্ন বলে শরীরের চেয়ে মনকেই বোধ হয়.বেশি দাম দিতেন।

আমি চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর শুধোলাম, আপনার স্বামী আপনাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দিলেন ?

উনি হাসলেন। বললেন, উনি এখানে নেই। নইলে একা নিশ্চয়ই আমাকে আসতে দিতেন না। সঙ্গে আসতেন।

আমি হেসে বললাম, কেন ? সাহিত্যিকরা বুঝি খুব খারাপ লোক হন ?

উনিও হাসলেন। বললেন না, তা নয়। তবে উনি কখনওই আমাকে একা কোথাও যেতে দেন না। ওঁর নিজের প্রয়োজন ছাড়া। উনি কাল গেছেন ইম্ফলে। অফিসের কাজে। তাই এত কথা একা একা বলতে পারলাম আপনাকে।

আমি বললাম, তা তো হলো কিন্তু আমার উপর রাগের কারণটা যে এখনও বোঝা গেলো না।

শ্রীমতী বললেন, হয়তো আমি বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। তা ছাড়া, এ হয়তো রাগ নয় ; অভিমান। তারপর হঠাৎই বললেন, এবার আপনি আমাকে কিছু বলুন। আমার জীবনের এই অতৃপ্তি, এই অশান্তি সম্বন্ধে একজন লেখকের কি বলার থাকতে পারে তা আমি শুনতে চাই। বলুন, প্লীজ।

আমার কি মনে হয় জানেন ? সমস্ত বিবাহিতা মহিলারাই 'কোয়েলের কাছে'র বৌদিরই ছায়া। যদি কোনও বিবাহিতা মহিলা আমাকে বলেন, মানে, এমন মহিলা,যাঁদের অন্তত পাঁচ বছর বিয়ে হয়ে গেছে ; যে, স্বামী ছাড়া অন্য কেউই তাঁদের মনে দাগ কাটেননি, তাঁরা মিথ্যে কথা বলেন। শারীরিক সম্পর্কটা বড় কথা নয়। শরীর, আমার মনে হয়, চিরদিনই ইন্‌সিডেন্টাল ছিল ; এবং চিরদিনই থাকবে। আসল হলো মন। মানুষের মনের মতো দামী জিনিস তার তো আর কিছুই নেই। মনে মনে যাকে সব কিছু দেওয়া যায়, তাকে শরীরটা দেওয়া তো কিছুই নয়। তবে আমাদের মধ্যে অনেকেই শরীরের বাধা ছাড়িয়ে মনকে দেখতে পাই না। আমাদের চোখ, বিশেষ করে পুরুষের চোখ ; শরীরেই থেমে থাকে। শরীর পেরিয়ে শরীরের চেয়ে বহুগুণ দামী মনে পৌঁছয়ই না।

উনি বললেন, তারপর ?

আসলে কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কোনও ঝগড়াই নেই। যে স্বামীরা চিরদিন জেগে থাকতে চান, পাহারা বসিয়ে স্ত্রীর শরীর ও মনের জমিদারীর মালিকানা বজায় রাখতে চান, তাঁরা জানেন না যে, লখীন্দরের বাসরঘরের লোহার ঘরেও সূক্ষ্ম শরীরে সাপের মতো প্রেমের প্রবেশ সম্ভব। জোর করতে গেলে, বাধা দিলে ; সেই সূক্ষ্ম প্রেমকে শুধু ত্বরান্বিতই, ব্যাপ্তই করা হয়। আমার তো মনে হয়, আপনার উচিত আপনার স্বামীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা। কারণ তাঁর ব্যবহারই আপনার জীবনে অন্য কাউকে জানতে দিয়েছিল, কাছে আসতে দিয়েছিল মনের।

আরো বলুন। খুব ভালো লাগছে শুনতে।

উনি বললেন।

আপনি বোধ হয় জানেন না বা খোঁজ রাখেন না যে, জীবনের যে-কোনও সম্পর্কেই অভ্যাস ও দস্তুরটাই বড়। সব সম্পর্ক পুরনো হলে, একঘেয়ে হলে, তাতে ক্লান্তি ও বিরক্তি আসেই। খুব কম লোকই জানেন, সম্পর্ক নতুন রাখতে। এবং "সম্পর্ক" কথাটার মানেটা কি ?

অথচ পৃথিবীটাই এরকম ! এর মধ্যেই আমাকে, আপনাকে, আমাদের সবাইকেই বাঁচতে হবে। তাই পথ চলতে যতটুকু ভালোবাসা, ভালো ব্যবহার পাওয়া যায়, তাই মনের কোণে জমিয়ে রাখতে হয়। এমন কোনও বর্ষার দিনে, একা জানলায় বসে, ঘরের ভিতরের অন্ধকারকে ভুলে গিয়ে ঘরের বাইরের একখানি আলোকিত বারান্দার দিকে চেয়ে কেয়াফুলের গন্ধভরা বাতাসে মুখ তুলে জীবনের গ্লানিকে ভুলতে চেষ্টা করতে হয়।

আপনাদের সাহিত্যিকদের জীবনও কি সে রকমই ?

আমাদের প্রত্যেকের জীবনই, সাহিত্যিকের জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। অন্ধকার ঘরটাই বাস্তব। তার মধ্যেই বছরের সব দিন গোনা। তবু আবার প্রত্যেক নারী ও পুরুষের জীবনেই একটি করে আলোকিত বারান্দাও থাকে। সে বারান্দার স্বপ্ন দেখেই আমাদের প্রত্যেকেরই দিন কাটে। কখনও কখনও বা আমরা প্রত্যেকে মহুয়ার গন্ধ-ভরা কোনও সুন্দর চাঁদনী রাতে বা স্তব্ধ শীতের সোনালী দুপুরে পা টিপে-টিপে সেই বাসমতি বারান্দায় এসে দাঁড়াই। সেখানে এসে দাঁড়ালেই আমাদের বুকের মধ্যে তোলপাড় করে। ইচ্ছে করে, সমস্ত জীবন এই বারান্দাতেই আনমনে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু তা তো হয় না!

কেন হয় না ? হয় না কেন ?

হঠাৎ কোনও দাঁড়কাক কর্কশ গলায় ডেকে ওঠে। কোনও দানবীয় দোতলা বাস ডিজেলের ধোঁয়া ছড়িয়ে কুৎসিত গর্জন করে মাথার মধ্যের সব মিষ্টি দুষ্টু ইচ্ছেগুলোকে পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘরের মধ্যে থেকে স্বামী বা স্ত্রী বা ছেলেমেয়েরা সেই একঘেয়ে, পুরনো সামাজিক চাহিদা বা কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভিতরপানে ডাক দেয়। আমরা সকলে এবং প্রত্যেকেই তাড়াতাড়ি আবার ঘরের অন্ধকারে ফিরে আসি। অভ্যেসে, একঘেয়েমিতে ; সংসারের জাঁতাকলে। আমরা প্রত্যেকেই চোখের আড়ালে কান্না লুকিয়ে বেড়াই, হাসিখুশী আমরা প্রত্যেক বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষ। কখনও-সখনও, ন'মাসে ছ'মাসে, ঘুমে বা স্বপ্নে বা জাগরণে যখনই সেই আলোকিত বারান্দায় এসে দাঁড়াই একা একা ; তখনই সেই শুকিয়ে-রাখা চোখের জল বাইরে আসে। চোখ ঝাপসা হয়ে যায়।

আমি জানি না, আপনাকে বোঝাতে পারলাম কি না যে, আপনার জীবনে, আমার জীবনে ; ঘর এবং বারান্দা দুটোই সত্যি। দুটোই অবিচ্ছেদ্য। ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অথচ আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন ঘরের মধ্যে নিঃশ্বাস নিই। এবং প্রশ্বাস ফেলি। এবং সেই একফালি স্বপ্নের আলোকিত ও বাঙ্ময় বারান্দাটুকুর জন্যেই বেঁচে থাকি। আপনি বাঁচেন, আমি বাঁচি ; আমরা সকলে বাঁচি।

শ্রীমতী চুপ করে উদাস চোখে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ আমার মনে হলো, এতো কথা বললাম, বানিয়ে বললাম না তো ? এ কি আমার মনের কথা ? এ কি সত্যি কথা ? কথাগুলো কি বাইরের পাগল হাওয়ার সঙ্গে ভেসে গেলো ? না ওঁর মনে পৌঁছলো ?

শ্রীমতী আমার দিকে মুখ ফেরালেন। দেখলাম, তাঁর দুচোখে জল টলটল করছে। উনি বিদায়-সম্ভাষণ পর্যন্ত জানালেন না।

উঠে দাঁড়িয়ে, হাতটা জড়ো করলেন বুকের কাছে।

বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময়ে, মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, ঘরে ফেরার সময় হলো।

দেখলাম, ওঁর জল-ভেজা মুখে এক আশ্চর্য প্রসন্ন হাসির আভাস ফুটে উঠেছে।

আমি বারান্দাতেই বসে রইলাম।

ঘরটা বড় অন্ধকার ; বড় স্যাঁতসেঁতে।
আমি বারান্দাতেই বসে রইলাম।

গ্রহান্তর

এ পাড়ার রমেনবাবুকে চেনেন না এমন কেউই নেই। রমেনবাবু, মানে রমেন রায়। হোম ডিপার্টমেন্টে খুব বড় চাকরি করতেন। অনেকদিন হল রিটায়ার করেছেন। স্ত্রী নলিনীবালা বেঁচে আছেন। তবে, বহাল তবিয়তে নয়। নানারকম অসুখে তিনি প্রায়ই ভোগেন। ছেলেরা সকলেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। রোজগারপাতিও ভাল সকলের। প্রত্যেকের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বড় মেয়ে রাণু। তার বিয়ে দিয়েছেন কাস্টমস্-এর এক অফিসারের সঙ্গে।

শীতকাল।

রমেনবাবু বাইরের ঘরে বিকেলবেলা বসেছিলেন। ঠিক বিকেল নয়। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। এমন সময় তাঁর বাল্যবন্ধু হরেনবাবু ঘরে ঢুকলেন। হরেন মৈত্র। বরেন্দ্রভূমির মানুষ। তীক্ষ্ণনাসা, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। হরেনবাবু ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ দম নিলেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে বললেন, আছিস কেমন ?

চলে যাচ্ছে রে।

চলে গেলেই হলো।

হরেনবাবু বললেন।

তারপর ? তোর সেই চাকরিটার কিছু হলো ? সেই যে সাইকেল ম্যানুফাকচারিং না কি একটা কোম্পানিতে। রিটেইনারশিপের কথা বলেছিলি।

হরেনবাবু একটু কাশলেন। বললেন, হলো আর কই ? হলে তো বেঁচে যেতাম। বাড়িতে বসে হাঁফিয়ে উঠলাম। তার উপর তোর বান্ধবী সুনীতির যন্ত্রণায় তো আর পারি না। ছেলেবেলায় শুনতাম, আসল দাম্পত্য প্রেম নাকি শরীর ঢিলে হয়ে যাবার পর—একেবারে রিয়েল কামগন্ধহীন সত্যিকারের ভালবাসা। আমার তো ভাই প্রাণ যাবার যোগাড়।

কেন ? হলোটা কি তোর ?

হবে আর কি ? এত বছর ঘর করার পরে হঠাৎ সুনীতির মনে পড়েছে যে আমি ওঁকে নাকি জীবনে মর্মান্তিকভাবে ঠকিয়েছি। সারা জীবন আমার তদ্বির তদারকী, আমার জন্যে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক রেঁধে, শোবার সময়ে ইসাবগুল এগিয়ে, গড়গড়ায় তামাক সেজে এবং....।

এই বলে হরেনবাবু একবার চারধার দেখে নিয়ে বললেন, এবং আমার জন্যে বছর বছর ছেলে বিইয়ে তাঁর নাকি জীবনের সর্বস্বই হারিয়ে গেছে।

রমেনবাবু ডিবে থেকে একটা পান বের করে মুখে দিলেন, তারপর লুঙির কোণা দিয়ে রুপোর পানদানিটা মুছতে মুছতে উদাসীন মুখে বললেন, পান খেতে পারবি ? তোর দাঁত তো নতুন বাঁধানো।

হরেনবাবু মাথা নাড়লেন। জানালেন যে, পারবেন না। তারপর রমেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর স্ত্রীর এহেন আচরণ সম্বন্ধে রমেনবাবুর কি মতামত জানার জন্যে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলেন।

রমেনবাবু জীবনে কখনো তাড়াহুড়া করেননি। পানটা ভাল করে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, এই সব কুবুদ্ধি শেখাচ্ছে কে ? কোন বৌমা ?

হরেনবাবুর গলা অভিমানে ভারী হয়ে এল। বললেন, সব বৌমাই ! সঙ্গে ছেলেরাও আছে। তারা সকলে মিলে তার মাকেও দলে টেনেছে। তারা সকলেই একমত যে, আমি বুড়ো নাকি সারা জীবন শুধু নিজের দিকটাই দেখে এসেছি। আর কাউকেই দেখিনি।

রমেনবাবু মুখ নিচু করে বললেন, এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন ? এ তো তবু ভালো আমার অফিসের বড়বাবু আমারই কন্টেম্পোরারি, রিটায়ার করেছেন। এসে বলছিলেন তাঁর ছোট ছেলে নাকি তাঁকে বলেছে, "আমাকে পৃথিবীতে আনতে বলেছিল কে ? আনলেই যখন, তখন কেন ভালভাবে লেখাপড়া শেখাবে না, কেন জামা কাপড় কিনে দেবে না আমরা ত স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি ?"

এরপর রমেনবাবু এবং হরেনবাবু দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

এমন সময় রমেনবাবুর সেজ বৌমা ঘরে ঢুকলেন। বাইরে কোথাও যাবেন। ছিপছিপে চেহারা, মিষ্টি মুখ, কপালে একটি টিপ, সিঁথেয় সামান্য সিঁদুর আছে কি নেই বোঝা যায় না।

হরেনবাবু বাঁধানো দাঁতে একগাল হেসে বললেন, ভালো আছো তো রমা ?

হ্যাঁ ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন কাকাবাবু ? অনেকদিন ত আসেন না।

হ্যাঁ মা, এই কাজ-কর্মে সময় পাই না। যদিও সবই অ-কাজ। যে কাজ করে টাকা রোজগারই না হলো সে আবার কাজ কি ?

কাকীমা ভাল আছেন ?

মোটামুটি। তবে জানো তো ওঁর হাই-ব্লাডপ্রেসার। এতো বছর সংসার করে করে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বেচারী।

রমেনবাবু বললেন, কোথায় চললে ? রমা ? শ্যামল ফেরেনি অফিস থেকে ?

আমার কলেজের এক বন্ধুর আজ বিয়ের তারিখ। আমাদের খেতে-বলেছে। ও অফিস থেকে সোজা যাবে, আমি একটা জিনিস কিনে নিয়ে যাব।

খুব ভাল। বেশ। বেশ। যাও।

রমেনবাবু ও হরেনবাবু দুজনেই বললেন।

রমা চলে গেল।

একটুক্ষণ পর রমেনবাবু বললেন, কী রকম বুঝলি ?

বোঝার আর আছে কি ? আজ ম্যারেজ-অ্যানিভাসারী, কাল জন্মদিন, পরশু ইংরিজি-খাওয়া, তারপর দিন চীনে-খাওয়া এই চলেছে আর কী ! আরে তোর ছেলে বৌরা করলেও করতে পারে। প্রত্যেকে ভাল রোজগার করে। তোর এমন প্রাসাদের মত বাড়িতে থাকে। ভাড়া লাগে না। আমার তো তোর মত অবস্থা নয়। তাও আমার ছেলে বৌয়েরাও সমানে তাল দেয়। এই আমি, হরেন মৈত্র হাজার টাকা মাইনেতে পাঁচ-পাঁচটা ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শেখালাম, মানুষ করলাম, আর তারা প্রত্যেকে চাকরিতে ঢুকে এখনি

দু-তিন হাজার টাকা রোজগার , কিন্তু সবই স্বামী-স্ত্রীতে ফুঁকে দেয়। বাড়ির খরচ সব আমার। যতদিন বেঁচে থাকবো, যতদিন ধরে প্রাণ থাকবে, ততদিন আমাকেই চালিয়ে যেতে হবে সবকিছু।

সে কি রে ? তোর ছেলেরা সংসারে কিছুই দেয় না ?

দেয় না বললে মিথ্যা বলা হয়। যে হাজার পায়, সে একশো দেয়। যে দু হাজার পায়, সে পঞ্চাশ দেয়। সকলেই বলে, যে তাদের নিজেদের পার্সোনাল খরচ আছে। ভবিষ্যৎ আছে। ছেলেপিলে হয়েছে। অথবা হবে। আজকাল ছেলেপিলে হলেও তো একটি কি দুটি। তার জন্যেই এতো বড় বড় কথা। ওনাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ আছে, কেবল আমাদের বুড়ো-বুড়িদেরই নেই। আমাদেব ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের ভবিষ্যৎ স্থবির হয়ে গেছে ; ফসিল হয়ে গেছে।

রমেনবাবু বললেন, চা খাবি ?

না। চা আজকাল শুধু সকালেই এক কাপ খাই। অম্বল হয়।

কি খাবি বল ?

কিছু খাবো না। নলিনী কোথায় ?

নলিনী গেছে রাণুর বাড়ি। নাতির চিকেন-পক্স হয়েছে, দেখতে। নলিনীর বাতের ব্যথাটা বড়ই বেড়েছে। আজ তো আবার পূর্ণিমা।

আ্যা। নলিনী, যাই বলিস, সেই গানটা বড় ভালো গাইতো রে। মনে আছে রমেন ? সেই যে আমরা সকলে মিলে একবার হাজারিবাগে গেছিলাম। দোলের দিন ছিল, না রে ? কি যেন লাইনগুলো ? এখন আর মনে থাকে না সব। "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা", তাই না ?

হুঁ।

হুঁ কি রে ?

কিছু না, এমনিই হুঁ।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইলেন। কথাবার্তা হলো না।

রমেনবাবুর বড় ছেলের ছোটো ছেলে ভিতর থেকে বাইরে এলো লাফাতে লাফাতে, গান গাইতে গাইতে।

"হাম্ ত গ্যয়ে বাজার্‌সে লানেকা রোট্টি, রোট্টি মোট্টি কুছ্ না মিলু পিচ্ছে পড়ে মো—ট্টি।

এই জিজো, চুপ কর। রমেনবাবু ধমকে উঠলেন।

জিজো অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেলো।

বলল, দাদু। বাবা না টেলিফোন করেছিলো। মাকে বলতে বলেছে, আজকে লছমন্‌দাসের বাড়িতে কক্‌টেল-পার্টি আছে। আসতে দেরি হবে।

তা আমাকে বলছিস কেন ?

বারে ? মা তো নেই। মামাবাড়ি গেছে।

মাকে ফোন করে বলে দে।

বারে, মামাবাড়ির সকলে আজ মুনলাইট পিকনিকে গেছে, এখন ত কোলকাতায় কাটাকাটি কম হচ্ছে, তাই।

—বুঝেছি। যা, পড় গিয়ে।

জিজো, "রে মাম্মা। রে মাম্মা। রে—এ—এ"....করতে করতে সিঁড়ি টপকে চলে গেল

দোতলায়।

আজকাল এই কক্‌টেল-পার্টিও কেমন বেড়ে গেছে দেখেছিস। মদ খাওয়া যেন জল-ভাত হয়ে গেছে। আবার শীতের মধ্যে মুনলাইট পিকনিক। পারেও বাবা এরা! ভাব দেখে মনে হয়, জীবনে সব যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। যা চাই, সব এক্ষুনি চাই।

হরেনবাবু মুখ নিচু করে বললেন,—বলিস না আর, মেয়েরা পর্যন্ত খাচ্ছে।

—কি ?

—আর কি ? মদ।

—আচ্ছা এরা কি আনন্দ পায় বলতো ? এমন করে ওরা কি পায় ? মাঝে মাঝে, বুঝলি রমেন ; আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, এরা সুখী কি না ! যে ভুলগুলো ওরা এখন করছে, এগুলো কিভাবে ওরা শোধরাবে ? তোর কি মনে হয ?

মনে অনেক কিছুই হয়। কিন্তু বলে লাভ কি ?

আরও কিছুক্ষণ ওঁরা চুপচাপ বসে রইলেন। রমেনবাবু বাটা খুলে আর একটা পান খেলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, নলিনী এখনো ফিরলো না। ফেরা উচিত ছিলো।

হরেনবাবু বললেন, তুই আজকাল হাঁটতে যাস না ? সকালে বিকেলে ?

যাই। তবে বিকেলে বড় একটা যাই না। আগে তো যাওয়া একেবারেই বন্ধ ছিলো। নকশালদের কাটাকাটির ভয়ে। আর এখন আবার ঠাণ্ডাটা বড় জোর পড়েছে।

—পড়বেই তো। যা বৃষ্টি গেলো ! মনে আছে, নাইনটিন থার্টিফোরে, আমার বিয়ের বছর ঠিক এই রকম ঠাণ্ডা পড়েছিল।

তুই এখনো সে রকমই মিথ্যুক আছিস। বুঝলি হরেন।

কেন ? কেন ? এ কথা বলছিস কেন ?

নতুন বউয়ের সঙ্গে শুয়েছিলি, শীত বুঝতি কি করে ?

হরেনবাবু হেসে উঠলেন। রমেনবাবুও হাসলেন। এতক্ষণ পর ওঁরা এই প্রথম হাসলেন। হরেনবাবু বললেন, ঘরভর্তি নাতি-নাতনি। শালা, তোর মুখ এখনো ঠিক হলো না।

রমেনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, তুই কি এখন উঠবি ? তাহলে চল তোকে বাস-স্টপ অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—চল না, তা হলে খুব ভাল হয়।

তুই একটু বোস্, আমি বাঁদুরে টুপি আর লাঠিটা নিয়ে আসি। প্যান্টটাও পরে আসি।

—তাই যা। আর শোন, তোর কাছে চ্যবনপ্রাশ আছে ?

—আছে, কিন্তু বড় বৌমা চ্যবনপ্রাশ খেতে দেয় না। বলে তেলাপোকার ডিমের মত গন্ধ বেরোয় ও থেকে। আমাকে একগাদা ভিটামিন-সি ট্যাবলেট কিনে দিয়েছে। তাই নিয়ে আসছি। কটা নিয়ে যা পকেটে পুরে। এবেলা ওবেলা খাস। ভালোই হবে। বৌমা ভাববে, আমি নিয়মিত খেয়ে খেয়ে ফুরিয়ে ফেলেছি। লক্ষ্মী শ্বশুর।

॥ ২ ॥

রমেনবাবু ও হরেনবাবু যখন বাড়ি থেকে বেরোলেন তখন প্রায় সাতটা বাজে। তারা হাঁটতে হাঁটতে সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে এসে পড়লেন। চারিদিকে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব। ধোঁয়ার জাল গাছগুলির মাথা ছেড়ে উঠতে পারেনি। তারই মধ্যে বাসগুলো ডিজেলের কালো ভারী ধোঁয়া ছেড়ে তাকে আরও ভারী করে তুলছে। এখানে ওখানে কেরোসিনের বাতি জ্বেলে ফুচ্‌কাওয়ালা ভেলপুরিওয়ালারা ফুটপাথের পাশে পাশে বসে আছে। চারিদিকে কেমন যেন একটা অস্বাস্থ্যকর থমথমে পরিবেশ। নিঃশ্বাস-রোধকারী বিষণ্ণতা।

হাঁটতে হাঁটতে রমেনবাবু ভাবছিলেন, তার মনের যেখানে যেখানে যতগুলি আনন্দের উৎস ছিল, সবই যেন একে একে শুকিয়ে গেছে। আয়নায় নিজের দিকে তাকালেই আজকাল রমেনবাবুর বড় কষ্ট হয়। তোবড়ানো-গাল, সাদা শনের মত চুল, তাও সামনের দিকের চুল সবই উঠে গেছে। দু চোখে পৃথিবীর সমস্ত নিরাশা আর রিক্ততা। চোখে কোনও ঔজ্জ্বল্য নেই। ব্যাঙের পিঠের মত নিষ্প্রভ ঠাণ্ডা চোখ। অথচ আয়নার ঠিক উপরেই তাঁর আর নলিনীবালার একটি ফোটো আছে বিয়ের সময়কার। সে ফোটো এখন যে দেখে, সেই তাকিয়ে থাকে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের সেই প্রয়োজনীয় চকচকে যুবক আজকের এই অপ্রয়োজনীয় খসখসে বৃদ্ধকে যেন উপহাস করে সবসময়।

কিছুক্ষণ পরে রমেনবাবু হরেনবাবুকে শুধোলেন, কি রে? তোদের দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেলো। একবার যাবি না এবারে।

—নাঃ। হরেনবাবু বললেন অভিমানের গলায়। শালা, তোর দেশ বুঝি হলো না?

আমার তো উত্তর বঙ্গ আর তোর তো খাস পূর্ববঙ্গ। তা, যাবি না কেন?

দূর, আমার নিজের ঘর, যে ঘরে বারো মাস, গত পঁয়তাল্লিশ বছর কাটালাম, তাই-ই এখন আমার কাছে বিদেশ। ছেলে-মেয়ে স্ত্রী, সকলেই বিদেশি। আজ আর অত দূরের দেশে গিয়ে আমার কোন আপনজনের দেখা পাবো বল? আসলে এখন আমাদের একমাত্র দেশ, যে দেশে আমাদের যাবার সময় হয়েছে, তা একটাই। সেই অজানা দেশ। কি বলিস—?

বলেই, আঙুল দিয়ে উপরের দিকে দেখালেন।

হুঁ।

হুঁ না। সেটাই সত্যি।

একটু পর রমেনবাবু বললেন, দেশের কথা তোর মনে পড়ে না? একবারও পড়ে না?

পড়ে। মাঝে মাঝেই পড়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। স্বপ্ন দেখি, ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ইলিশমাছের নৌকো এসে লেগেছে ঘাটে: নাকে যেন জলের গন্ধ, নৌকোর গন্ধ, মাঝির গায়ের গন্ধ, সকালের গন্ধ, মাছের গন্ধ পাই। কখনও সখনও গঞ্জের স্বপ্ন দেখি, পাটালি গুড়ের পাহাড়, ঝোলা গুড়ের হাঁড়ি, এই সব। এই সব ত আজকাল স্বপ্নই! বল? তবে কি জানিস? স্বপ্নগুলোকে, আমাদের জীবনের সব স্বপ্নগুলোকেই নির্ভেজাল স্বপ্ন রাখাই ভালো। স্বপ্নের মধ্যে বাস্তবের কোনো জল ঢুকলেই সব শেষ। কাল আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমার ছোট বৌমা থোড় আর নারকোল দিয়ে একটা তরকারি রেঁধেছে আমার জন্যে। আমি মাটিতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে খাচ্ছি। সুনীতি একটা মটরবালা পরে, লাল কস্তাপেড়ে শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিয়ে, লাল টুকটুকে পান-খাওয়া মুখে আমার সামনে বসে খাওয়া-দাওয়া তদারকি করছে। ছোট বৌমা বলছে, বাবা! আর একটু নিন।

আপনি এই তরকারী খেতে ভালবাসেন.। আর একটু নিন।

—বাঃ। রমেনবাবু স্বগতোক্তি করলেন। ভাবলে, অবাক লাগে, না রে ? আমরা যা ভালবাসি, ভালবাসতাম, তা আজকাল আর কেউই ভালবাসে না। আমরা যা ভালবাসি, তা কেউই করতে বা দিতে চায় না। আশ্চর্য লাগে। আসল ব্যাপারটা কি জানিস ? ওদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে কোনও কম্যুনিকেশন নেই। আমাদের যাই বলার ছিলো, ওদের তার কিছুমাত্রই বলতে পারি না। আর ওদেরও....

ওদের আবার বলার কি থাকবে ? ওদের যা বলার সবই আমরা বুঝতে পারি। ওরাই বুঝতে চায় না আমাদের কথা। কখনও বুঝতে চাইলে তো বুঝতে পারবে ?

আমরাও কি বুঝতে চাই ? জানি না। ওদের যা বলার ছিল তাও হয়তো ওরা বলতে পারে না আমাদের।

হরেনবাবু বললেন, রমু। একটা জায়গায় যাবি ?

কোথায়।

বাবা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রর কাছে।

—তিনি আবার কে ? তুই জোটাসও যতো বাবা মা। তুই কি সারাজীবনই অনাথই থাকবি ?

সে কি রে ? নাম শুনিসনি ? তাঁর কত শিষ্য। একবার চল, মনের এই অশান্তি দূর করে আসবো। আমার সম্বন্ধী এঁর খোঁজ দিয়েছেন। একদিন চল, সকাল আটটা কুড়ির লোকালে চলে যাই। আধ ঘণ্টার পথ। যাবি ?

ইচ্ছে তো করে। কিন্তু বিপদ আছে।

কিসের বিপদ ?

আরে নলিনীকে নিয়ে বিপদ। সারা জীবন তাকে গুরু করতে মানা করে এলাম, কত ধম্‌কে-ধাম্‌কে বললাম. এ সব বুজরুকি, আর শেষে কিনা বুড়ো বয়সে নিজেরই এই অধঃপতন। যেতে পারি, তবে নলিনী যেন ঘুণাক্ষরে না জানে।

আরে পতন তো চিরকাল অধোলোকেই হয়। কে আর কবে উর্দ্ধলোকে পড়েছে বল ? তাছাড়া নলিনী জানবে কি করে ? আমি তো বলবো মাছ ধরতে যাচ্ছি। সুনীতিও কি জানতে পেলে রক্ষা রাখবে নাকি ? সারা জীবন আমি তো ওকে বলে এসেছি, পতি পরম গুরু, এর চেয়ে বড় গুরু আর কে আছে !

আচ্ছা ভেবে দ্যাখ্, একটা কথা, আমার ও তোর স্ত্রীরা সারাজীবন বেশ বাধ্য রইলো, চমৎকার ব্যবহার করল। আমাদের গুরুজ্ঞানে দেখলো, অথচ এই শেষ বয়সে এসে এমন বিদ্রোহ করে উঠলো কেন বলত ?

—সেই তো ভাবি। কিছু বুঝতে পারি না। কেন এমন হলো। আমার মনে হয়, বৌমাদের সঙ্গ-দোষে। দেখাদেখি স্যাখা নাচে। চল যাওয়া যাক। আমি তা হলে আগামী রবিবার সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলি। বাবার.ওখানেই প্রসাদ খাবো। বিকেলের দিকে ফিরে আসবো সকালে গিয়ে।

রবিবার, মানে তো পরশু। আজ তো শুক্রবার। তাই না ?

—হ্যাঁ। পরশু।

—ঠিক আছে' বলে, রমেনবাবু পথে লাঠিটা একটু ঠুকলেন।

ঐ একটা ন নম্বর বাস আসছে। আমি তা হলে চলি। হরেনবাবু বললেন।

আচ্ছা, আয়। সাবধানে উঠিস। থামুক ভাল করে আগে।

ন নম্বব বাসটা এসে গেল। হবেনবাবু উঠে গেলেন। বাসটা ছেড়ে দেবে এমন সময় দোতলা থেকে একটি ফুটফুটে অল্পবযসী মেয়ে তবতব কবে নেমে এল। পথে নেমেই, দোতলাব জানলায মুখ তুলে চাইলো। বমেনবাবুও মুখ তুলে চাইলেন দেখলেন একটা সুদর্শন ছেলে মুখ বাড়িযে আছে উপব থেকে। ওবা দুজনে দুজনকে হাত নাড়ল মুখে কিছু বললো না। বাসটা ছেড়ে দিলো। বাসটা ছেড়ে দিতেই মেয়েটি এদিকে মুখ ফেবালো। মুখ ফেবাতেই বমেনবাবু দেখলেন, তাঁব বড নাতনী হাসি।

বমেনবাবু ও হাসি পবস্পব পবস্পবেব মুখের দিকে অপলকে চেয়ে বইলেন। বমেনবাবুব মনে হল, হাসিব সমস্ত মুখে একটা দাকণ খুশি ছডিয়ে আছে। ওব উজ্জ্বল দুটি চোখ আনন্দে উত্তেজনায চকচক কবছে। এই বিষণ্ণ নিবাশ শীতার্ত বাতে কুযাশা আব ধোঁযায ম্লান পথেব ঘোলাটে আলোব নীচে দাঁড়িযে হঠাৎ বমেনবাবুব মনে হলো, হাসি যেন অন্য কোনও গ্রহেব মানুষ। ওব সঙ্গে বমেনবাবুব তাঁব চাবিধাবেব পৃথিবীব যেন কোনওই মিল নেই।

অনেকক্ষণ পব হাসি বমেনবাবুব দিকে এগিযে এসেই হেসে উঠলো। বলল ও-ও-ও, আমাব ডার্লিং দাদু, আমাব লক্ষ্মী দাদু, এটা কি পবেছো মাথায? তোমাকে ঠিক একটা ভাল্লুকেব মত দেখাচ্ছে।

বমেনবাবু গম্ভীব হয়ে গেলেন। বললেন, তা কী হবে! বুড়োদেব ঠাণ্ডা বেশি।

--ঠাণ্ডা বেশি বলে তুমি মাথায ঐ বকম একটা জিনিস পববে? না কালই আমি তোমাব জন্যে একটা ভাল টুপি কিনে আনবো। তোমাব জন্যে একটা জিনিস এনেছি। তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম যে! কোথায চললে, এই পোশাকে? কাব অভিসাবে। বলো না দাদুমণি?

বমেনবাবু এই নাতনীকে বড ভালবাসেন। ও যখনি আসে, ওব হাসি ওব প্রাণেব উচ্ছ্বাসে বমেনবাবুব সব গুমোট ও ফুঁ দিযে দূবে সবিয়ে দেয। মনে মনে ওকে খুব ঈর্ষা কবেন বমেনবাবু। হযতো ওদেব জেনাবেশানেব সকলকেই কবেন।

এই নাও দাদু। তোমাব জর্দা। তোমাব ফেভাবিট ব্রান্ড।

--বমেনবাবু হাত বাড়িযে লালবঙা জর্দাব কৌটাটা নিয়ে বললেন, হাত নাড়লি কাকে? ছেলেটি কে?

হাসি কিছুক্ষণ দাদুব মুখেব দিকে চেযে বইলো, তাবপব বলল, তোমাব চোখ তা হলে যত খাবাপ বলো, ততো খাবাপ হযনি। দেখেই যখন ফেলেছো তখন কেমন দেখলে বলো?

দেখতে পেলাম আব কই? দেখাব আগেই তো বাস ছেড়ে দিলো।

ও তোমাব নাতজামাই।

বমেনবাবু স্তব্ধ হযে গেলেন। কিছুক্ষণ কথা বলতে পাবলেন না। চুপ কবে বইলেন।

হাসি বললো, চলো আমবা এগোই। লেকেব দিকে যাবে? চলো না একটু পাযচাবী কবি। তুমি যেন আমাব বয-ফ্রেন্ড।

বমেনবাবু কথা না বলে অন্যমনস্কেব মত হাঁটতে লাগলেন। তারপব হঠাৎ বললেন, কি? বেজিস্ট্রীও হযে গেছে নাকি?

হাসি হেসে উঠলো। বললো, কী মুশকিল? বেজিস্ট্রী কেন, ভাল কবে জাঁকজমক কবেই বিয়ে হবে, যখন হবে। এখনও হযনি। কিন্তু একটা কথা, তোমার তো পুটুর-পুটুর করে সব কথা দীদাকে বলা চাই। দীদাকে বা আমাব মাকে যেন এসব কথা বলো না। বললে, কিন্তু

তোমার সঙ্গে কখনও কথা বলবো না।

বলবে না তো ? বল। প্রমিস ?

প্রমিস।

রমেনবাবু বললেন।

তার মানে, তোর বাবা এসব জানে এবং সে তোকে প্রশ্রয় দেয় ?

রমেনবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন।

—'প্রশ্রয় দেয়' বলছো কেন দাদু। আমি তো কোনও অন্যায় করছি না।

—হুঁ।

—হুঁ কি ?

—কিছু না। ছেলেটি করে কি ? নাম কি ? কার ছেলে ?

অতো প্রশ্নের জবাব একবারে দেওয়া যায় নাকি। এসো এই বেঞ্চে বসো। চিনাবাদাম খাবে দাদু ?

—না।

—আইসক্রীম ?

—না। কাশি হয়েছে

—ফুচকা ? খাও না দাদু। খেয়ে দেখোই কেমন লাগে। এই বলে, হাসি ফুচকাওয়ালার দোকানের সামনে দুটি শালপাতার ঠোঙা চেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রমেনবাবু এমনই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছিলেন যে, কোনও কথা বলতে পারলেন না। তা ছাড়া, কথা বলার আগেই হাসি একটি জল ভরা ফুচকা তার মুখে পুরে দিল।

ফুচকা খেয়ে দাদুর হাত টাত ধুইয়ে হাসি দাদুকে নিয়ে এসে বেঞ্চে বসল। তারপর বললো, এবার বলো দাদু তোমার কি কি প্রশ্ন আছে ?

—না কোনও প্রশ্ন নেই। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না আমরা তোদের এই দুনিয়ায় একেবারে অচল হয়ে গেছি

—দাদু একটা কথা বলবো ?

—বল কি বলবি ?

—দাদু, ব্যাপারটা কি জানো তোমরা সব সময় তোমাদের নিজেদের সুখ নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামিয়েছো। জগতে যা কিছু ঘটছে সব কিছুকেই তোমাদের নিজেদের দিক ও স্বার্থ দিয়েই বিচার করে এসেছো। ফলে, আমার সুখ মামা মামীদের সুখ, দীদার সুখটাও যে তোমারও সুখ এই কথাটাই তুমি কখনও বুঝতে পারোনি। তুমি কখনওই ভাবো না যে, তুমি একটা বড় গাছের মত। তুমি হচ্ছো গিয়ে "ফাদার অব দা ফ্যামিলি"। তোমাকে ঘিরেই আমরা সকলে হয়েছি, আছি। এই দারুণ পৃথিবীতে এসেছি। তাই তোমার এই টুকরো টুকরো তুমি-গুলো যদি খুশি হয়, সুখী থাকে, তা হলে তোমার মধ্যে তো এই সমস্ত সুখের যোগফলই জমে থাকা উচিত। বুঝলে দাদু, আমার মনে হয়, একটা বয়সের পর মানুষের নিজের সুখ আর তার নিজের সুখ থাকে না, তার ছেলে-মেয়ের সুখ, নাতি-নাতনীর সুখ নিয়েই তখন তাদের সুখ। তুমি কি এটা মানো না দাদু ?

রমেনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, মানবার, বোঝবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারিনি এখনো।

এখনো পারোনি, কিন্তু চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে। তোমাদের সময় আর আমাদের সময় এক নয় দাদু। জীবন সম্বন্ধে ধারণা বদলে গেছে। জীবনের মানে, সম্পর্ক, সে ছেলের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কই বল, বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়ের সম্পর্কই বল, সবই বদলে গেছে। প্রতি

মুহূর্তেই বদলাচ্ছে। এখনও যদি তোমার নিজের চারপাশে তোমার পুরানো জানাগুলোর পরিমণ্ডল গড়ে তার মধ্যে তুমি একটা আর্টিফিসিয়াল স্যাটেলাইট হয়ে বসে থাকো তা হলে তোমার তো মন খারাপ লাগবেই দাদু। কি ? বুঝলে ?

বোঝার চেষ্টা করছি।

হ্যাঁ তাই ভালো। আমার দাদুর মতো এমন একজন ইন্টেলিজেন্ট লোক এটুকু বুঝতে পারবে না, তা আমি কখনওই মানি না।

তোর লেকচার তো শুনলাম, এবার আমার নাতজামাই-এর কথা বল্।

—হাসি আবার হাসলো। বললো, তা পাত্র ভালোই। চেহারা আমার তো ভালই লাগে। আশা করি, তোমারও লাগবে। ডাক্তারি পড়ে ফাইনাল ইয়ার। প্রত্যেকবার ফার্স্ট—কি সেকেন্ড হয়। নাম, চাঁদ। চাঁদ মালহোত্রা।

রমেনবাবু চমকে উঠলেন, বললেন, বলিস কি রে ? পাঞ্জাবী ?

হাসি আবার হাসলো। বললো, বারে ! কত লোক চাঁদে চলে গেল, আর আমি এক হাজার মাইলও যেতে পারবো না ?

—হুঁ। ছেলের বাবা কি করে ?

—বাবা নেই। পাঞ্জাবের দাঙ্গার সময় পাকিস্তানীরা কেটে ফেলেছিলো। মা আছেন। মা খুব ভাল। দারুণ মুরগী বাঁধতে পারেন। তুমি কি রাজমা খেয়েছো কখনও দাদু ? তোমাকে খাওয়াবো।

রাজমাটা আবার কি জিনিস ?

দারুণ ভেজিটেবল্ প্রোটিন। খেলে বুঝবে। চাঁদের এক বড় দাদা আছেন, তিনি ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে। নো ননদিনী। চাঁদের মা আমাকে খুব ভালবাসেন।

আর সে ছোকরা ?

কে ? চাঁদ ?

হুঁ।

রমেনবাবু বললেন।

হাসি মুখ ফিরিয়ে দাদুর দিকে চেয়ে হাসলো। বললো, জানি না। বোধ হয় বাসে। তবে, তুমি দীদাকে যতখানি ভালবাসো ততখানি কি আর বাসে ? না বাসা সম্ভব ?

—হুঁ।

—কি যে তুমি সব সময় হুঁ হুঁ কর না দাদু ভালো লাগে না। চলো এবারে বাড়ি চলো। ঠাণ্ডা লাগলে, দীদা আমাকে বকে একসা করবে।

—চল্।

রমেনবাবু, নাতনীর পাশে পাশে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন। পথে হাসি আবার বললো, তোমার প্রতিজ্ঞা মনে আছে তো ? মাকে আর দীদাকে যেন বলবে না।

—তোর দেখছি নিজে মেয়েমানুষ হয়েও মেয়েমানুষদের ওপর মোটে ভরসা নেই।

—আমরা যে মেয়ে, এতদিন তো আমরা কূপমণ্ডুক হয়েই ছিলাম দাদু। ছেলেরা যতখানি উদার হয়, হতে পারে ; আমরা তা এখনো যে হতে পারি না। জানাবো না কেন ? সময় হলে আমি নিজেই জানাবো। তবু কুরুক্ষেত্র সামলাবার ভার কিন্তু তোমার আর বাবার।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলেন দুজনে।

হঠাৎ হাসি বললো, আচ্ছা দাদু, তুমি সামনের রবিবার কি করছো ?

আমি আবার কি করব ? বাংলা ইংরিজি দুটি খবরের কাগজ পড়বো তন্ন তন্ন করে। তারপর আর কি ? খাবো, ঘুমোবো, বিকেলে বারান্দায় বসে থাকবো, সন্ধ্যেয় বাঁদুরে টুপি পরে বেড়াতে বেরোবো, রাতে তোর দাদার সঙ্গে ঝগড়া করবো, তারপর ঘুমুবার চেষ্টায় সারা রাত জেগে থাকবো। এই বয়সে আবার করার মত আর কিছু থাকে নাকি। যা করার ছিল সবই শেষ।

তা হলে শোনো দাদু, এবার থেকে প্রত্যেক রবিবার তুমি আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

কোথায় ?

আমরা যেখানে যেখানে নিয়ে যাবো। কোথায় যাবো তা আমরা আগে থাকতে ঠিকই করি না।

কি যে বলিস। তোদের সঙ্গে আমি বুড়োমানুষ কি করে যাবো ?

তুমি যেতে চাও না বলো ? বুড়ো তো তুমি জোর করে নিজেকে করে রেখেছো। পৃথিবীর মধ্যে থেকে, তোমার হাতে তৈরি সংসারে থেকেও তুমি মঙ্গলগ্রহের লোকের মতো একলা বসে আছো। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবেই। কাল আমি চাঁদকে ফোন করে সব ঠিক করে রাখবো। রবিবার ঠিক ছটার সময় সাদার্ন অ্যাভিন্যু আর লেক রোডের মোড়ে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা তোমাকে তুলে নেবো। যদি না আসো, তা হলে খুব খারাপ হবে।

রমেনবাবু বললেন, রবিবার ?

—হ্যাঁ, রবিবার। কেন ? আমার চেয়েও বেশি সুন্দরী কারও সঙ্গে তোমার রবিবারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নাকি ?

হাসি বললো।

—না, তা না, তবে।

—তবে-ফবে না। তুমি আসবে।

—হুঁ।

—ঠিক আসবে তো ?

—হুঁ।

॥ ৩ ॥

শনিবার ভোরবেলা রমেনবাবুর চাকর রামাচরণ হরেনবাবুর বাড়িতে একটি খাম নিয়ে উপস্থিত হলো। হরেনবাবু কানে গরম সর্ষের তেল ঢেলে খোল পরিষ্কার করছিলেন রোদে বসে। চিঠিটা খুলে দেখলেন।

"ওঁ সত্যমেব জয়তে"

ভাই হরেন,

অদ্য সকাল হইতে আমার রক্তচাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্বদা মস্তক ঘূর্ণন হইতেছে। এমতাবস্থায় তোমার সহিত জ্ঞানানন্দবাবাকে দর্শন করিতে যাওয়া অবিবেচকের কাজ হইবে বলিয়া মনে করি।

পত্রে তোমার কুশল জানাইবে মনে কিছু করিবে না।

ববিবাব সন্ধ্যায আমাকে ডাক্তাবেব নিকট যাইতে হইবে অতএব ক্লেশ স্বীকার কবিযা আমাকে দেখিতে আসিও না। তোমাব বাড়িতে ফোন না থাকায বাধ্য হইযা পত্র লিখিতে হইল। আমাব জন্যে কোনওরূপ চিন্তা কবিও না। ইতি—

শ্রীনগেন্দ্রমোহন বায

শ্রীহবেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র
বন্ধুববেষু।

সেদিনেব দুপুব যেন আব পাব হয না

অনেকবাব বমেনবাবু বাবান্দায পাযচাবি কবলেন শীতেব বিকেলেব বিষণ্ণ সোনালি বোদ বাবান্দাব বেলিং এব ক্ষীণকায ছাযাগুলিব পাশ থেকে সবে গিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যেন এক্কা দোক্কা খেলে।

এক সময বমেনবাবু একসঙ্গে দুটি পান মুখে ফেলে পাখা বোরালেন আজ আব বাঁদুবে টুপি পবেননি। আলমাবি খুলে একটা ফুল তোলা টুটালেব টাই বেব করে পরেছিলেন একটি ছাই ছাই গবম স্যুটেব সঙ্গে। বিটাযাবমেন্টেব আগে ঐ শেষ স্যুট কালো জুতো বামাচবণকে দিযে ভালো করে পালিশ কবিযে নিযে পবেছিলেন

ঘড়ি দেখে সিঁড়ি দিযে নামবাব সময নালনীবালা বললেন অনেকদিন পব তোমাকে বেশ সাহেব সাহেব দেখাচ্ছে গো। কতদিন এসব জামাকাপড় পাবো না পবে না কেন? পবলেই পাবো। চাটুজ্জে। সাহেবেব বাড়ি যাচ্ছো একটু সেজেগুজে তো যেতে হয়। জামাকাপড়েব উপবও মনেব ভাব নির্ভব কবে

প্রায দশ মিনিট হযে গেলো বমেনবাবু লেক বোড আব সর্দাব আর্ভিন্যাব মোড়ে দাঁড়িযে আছেন। কাকব দেখা নেই

হঠাৎ তাব প্রায গা ঘেঁষে একটা স্কুটাব চলে গেলো স্কুটাবটা একটু এগিযে গিয়েই থেমে গেলো হাসি নেমে পড়ে দৌড়ে এলো স্কুটাবটা পার্ক কবিযে ছ ফুট লম্বা বেশ হ্যান্ডসাম একটি ছেলে এসে বমেনবাবুব হাত দু হাতে চেপে ধবে বলল হ্যালো দাদু। নাইস মীটিং ভ্য।

হাসি বললো শিগগিবী চল দাদু। আমবা প্রথমে সিনেমায যাবো খুব ভালো একটা ছবি হচ্ছে। বাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুবেব ছবি দেখে তাবপর চাঁদেব বাড়িতে যাব। সেখানে আমাদেব নেমন্তন্ন। চাঁদেব মা তোমাব জন্যে সর্ষে শাক আব আলু ভুড়কা বেঁধে বাখবেন। তোমাকে নিযে যাচ্ছি শুনে তিনি ভীষণ খুশী।

বমেনবাবু কিছু বলাব সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না

তিনি দেখলেন তিনি স্কুটাবেব পেছনে বসে আছেন তাঁব সামনে হাসি চাঁদের গাযে লেপ্টে বসে আছে। আব চাঁদ চালাচ্ছে। বমেনবাবুব চোখেব সামনে হাসিব সবুজ শাড়ির আঁচলটা পতপত করে উড়ছে, মনে হচ্ছে আঁচল নয যেন কোনও নিশান কোনও বিশেষ যুগেব নিশান। কোনও অন্য গ্রহব নিশান।

প্রথমে খুব ভয় কবছিল। জীবনে এই প্রথম স্কুটাবে চড়লেন তিনি কিন্তু এখন ভয় কেটে গেছে। ঝাঁকুনি দিযে স্কুটাবটা দাৰুণ জোবে ছুটে চলেছে। হাওযাব ঝাপটা লাগছে চোখেমুখে। হঠাৎ বমেনবাবুব মনে হলো স্কুটাবটা যেন একটা উল্কাপিণ্ড

কোনও অন্য গ্রহেব দিকে প্রচণ্ড বেগে দৌড়চ্ছে তাঁকে নিযে।

কুচিলা-খাঁই

জীপের স্টীয়াবিং ধবা বাঁ হাতেব কব্জিব দিকে তাকালাম।

ঘড়িব বেডিয়ামে বাত আড়াইটা চকচক কবছে।

সেই দুপুব দুটোয কটক শহব ছেড়েছিলাম। তাবপব মহানদী আব বিরূপাব এ্যানিকাট্ পেবিয়ে ঢেনকানলেব উপব দিয়ে এসে, হিন্দোল পেবিয়ে অঙ্গুলে এসে পৌঁছলাম। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেবে আবাব বওযানা হয়ে পূর্ণাকোটেব মোড়ে এসে বাঁয়ে ঘুবেছিলাম। তাবপবও চলেছি পাহাড়ে জঙ্গলে, চড়াইয়ে উৎবাইয়ে। শীতেব পথেব বাঙাধুলোয গা-মাথা সব একাকাব হয়ে গেছে। জার্কিনেব জলপাই-বংটাব উপব ধুলোব আস্তবণ এমনভাবে পড়েছে যে, ড্যাশবোর্ডেব মৃদু আলোয বঙটাকে খযেবী বলে মনে হচ্ছে।

জীপেব হেডলাইটে দেখলাম, সামনেই একটা শালেব খুঁটিব গাযে সাদা এক ফালি তক্তাব উপব কালোতে লেখা 'টুম্বকা ফবেস্ট বেস্টহাউস।'

একটি প্রায সমকোণিক বাঁকে মোড় নিতেই চাকাগুলো আপত্তি জানিয়ে কিচ কিচ কবে উঠলো। ঢুকে পড়লাম টুম্বকাব বাংলোব হাতায। সামনে পড়ে বইলো হিমেভেজা ভুবাগুব বাস্তা। গাঢ় অন্ধকাবে একটা ফ্যাকাসে স্বপ্নেব মতো।

তাবপব জামাকাপড় ছেড়ে, হিপ-ফ্লাস্ক থেকে দু বড় ঢোঁক হুইস্কি খেযে শুযে পড়েছিলাম তিনটে নাগাদ।

ভোব হযেছে এখন।

কুচিলা-খাঁই পাখিবা ডাকছে পাশেব আব সামনেব পাহাড়েব উপবেব কুচিলা গাছগুলো থেকে। ইক্ক ইক্ক ইক্ক, ই কঁক্ক, ই কক্ক ক হ্যাঁক হ্যাঁক।

দিলো ঘুমটাব বাবোটা বাজিয়ে। এমন অসভ্য অভদ্র পাখি ভাবতবর্ষেব পাহাড় জঙ্গলে আব দুটি নেই। অন্য অনেক পাখি ডাকে বটে। তবে, তাদেব ডাক এমন শ্রুতিকটু কিংবা অপ্রযোজনীয নয। কোটবাব বাচ্চা যেমন বিনা কাবণে লাফায, এবা তেমনি বিনা কাবণে ডাকে। সব সমযই খাই-খাই কবছে, আব বিবাট ডানা আব বিশ্বলোভী ঠোঁট দিয়ে যা পাচ্ছে তাই ঠোকবাচ্ছে। এমন লম্ফঝম্পমান পাখিব তেলে বাত সাববে না, তো বাত সাববে কিসে?

ভেবেছিলাম অনেকক্ষণ ঘুমোবো। হ'ল না তা। জানালা দিয়ে ডিসেম্ববের সুনীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। এমন আশাবাদী আকাশ বহুদিন দেখিনি। ঝক-ঝকে বোদ্দুব হাওযায উড়ছে। ছুটি—ছুটি—ছুটি। কম্বলটা সবিয়ে উঠে বসলাম চৌপাযাতে। উঠে বসতেই দেখলাম, বাংলোব পাশেব ফাঁকা জায়গাটাতে, কুঁয়োতলাব কাছে কাপড় শুকোনোব

দড়িতে কী একটা গোলাপী পদার্থ ঝুলছে।

চোখ কচলে ভাল করে দেখলাম। প্রথমে বিশ্বাস হলো না। ভাবলাম, কাল রাতের নেশা কাটেনি। কিন্তু আবার ভালো করে চাইতেই, ইচ্ছা না করলেও পদার্থটির উপস্থিতি বিশ্বাস করতেই হলো। একটি গোলাপী-রঙা নাইলনের প্যান্টি। মেয়েদের অন্তর্বাস। এই নিবিড় জঙ্গলে, হাতি-বাইসন-বাঘ অধ্যুষিত পাহাড়ে, এ কোন মেমসাহেব যে, এই ভেঙে-পড়া, ছুঁচোয়-ভরা বাংলোয় এসে রয়েছে?

ঘরের বাইরে যেতে সাহসে কুলোল না। বাঘ-ভাল্লুকের ভয় আমার নেই। কিন্তু প্যান্টি।

ঘর থেকেই হাঁক দিলাম 'চৌকিদার'।

'কহন্তু আইজ্ঞা'।

বলে, চৌকিদার এসে দাঁড়ালো।

সে আমাকে আগেও দেখেছে অনেকবার। তর্জনী দিয়ে রমণী-বাসটি দেখাতেই, সে কাছে এসে বললো, ছিল্তিয়া মেম্বসাহেব। পড়শু আসিচি। মত্তে কহিলা, সাত্তদিন রহিবে।

মনে মনে ভাবলাম জ্বালালে দেখছি। কোথায় একটু নিরিবিলি খেয়ালখুশি মতো দিন কাটাবো গভীর জঙ্গলে, না কোত্থেকে ছিল্তিয়া মেম্বসাব এসে জুটলো। অভাগা যেখানে যায়, সাগর শুকায়ে যায়।

হাত-মুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় পরে, বারান্দায় আসতেই দেখলাম বারান্দার সামনের ঝাঁকড়া চেরিগাছটার পাশে, যেখানে উদার একরাশ রোদ আর এক ঝাঁক ছাতারে পাখি হুটোপাটি করছে, ঠিক সেইখানটিতেই বেতের চেয়ার পেতে একটি বিদেশীনি বসে আছে, বাংলোর সামনের পাহাড়টির দিকে চেয়ে। পাহাড়টি, বলতে গেলে, একেবারে বাংলোর গেটের গা ঘেঁষেই উঠেছে। অনেকগুলো কুচিলা খাঁই ইক্ক ইক্ক করছে। কুচিলা গাছগুলোতে পাখা ঝাপটাচ্ছে, উড়ছে বসছে। এক কথায় এই সুন্দর শান্ত শীতের সকালের সবটুকু সৌকুমার্য ওদের কদর্য সশব্দতায় চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে

মেয়েটি কুচিলা খাঁইগুলোকে দেখছিলো, এক-দৃষ্টে চেয়েছিলো কুচিলা গাছটির দিকে। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখলাম ছিল্তিয়া মেমসাহেবকে দেখে নাস্তিকের মতিভ্রম হল।

এমন স্নিগ্ধ শান্ত, সমাহিত সৌন্দর্য আগে আমি আর দেখিনি। মেমসাহেবের যে এমন বাঙালী মেয়ের কমনীয়তা থাকতে পারে, তা আমার ধারণারও বাইরে ছিল। একটি ফিকে হলুদ রঙের গরম পোশাকে সে বসেছিলো। ডান পায়ের উপর বাঁ পা তুলে। তার গ্রীবাহেলনের মনোরম ভঙ্গী, তার বসার ভদ্রভাব তার আত্মতন্ময়তা, সমস্ত মিলেমিশে আমার একটি চমক লাগলো। এই সুস্নাতা সুগন্ধি, বিদেশি মেয়েটি প্রকৃতির অন্য অনেক সুন্দরী ফুলেরই মতো এখানে এই টুম্বকার জঙ্গলে আমার চোখকে তৃপ্ত করবে যে এমন কথা কাল রাতে ভাবতে পারিনি। বিরক্তি কেটে গিয়ে একধরনের হাইলি ইমপার্সোনাল আসক্তি জন্মালো সেই সকালটির প্রতি।

ভাবলাম। ওকে ডোন্ট-কেয়ার করে বন্দুক-কাঁধে বেরিয়ে পড়ি। আজকের খাওয়ার সংস্থান করতে হবে। এ থালে আদৌ চলবে না যে, ওকে আমার ভালো লেগেছে।

এই ভেবে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, চেরী গাছটাকে বাঁয়ে ফেলে হনহনিয়ে এগিয়ে গেলাম

কিন্তু মেমসাহেব পেছন থেকেই সুপ্রভাত জানালো। অতএব ভদ্রতার খাতিরেই ফিরতে হলো।

মেমসাহেব অহেতুক ফর্মালিটি এড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ঐ যে পাখিগুলো চেঁচা-মেচি করছে, ওগুলোর নাম কী ? চৌকিদার বলছিলো, 'কুলা-খাঁই'।

আমি হেসে বললাম "কুলা-খাঁই" নয়। "কুচিলা-খাঁই" বাংলায় আমরা বলি ধনেশ পাখি। ইংরিজি নাম 'The Greater Indian hornbill।' ওদেরই ছোট সংস্করণকে বলে Lesser Indian Hornbill বা ছোট্‌কি ধনেশ। ওদের বলে বড়কি ধনেশ। "কুচিলা-খাঁই" ওড়িয়া নাম।

মেমসাহেব খুলে বললো, They are a nuisance to this scerenity.

তক্ষুণি বেরুনো হলো না।

ওখানে বসে আর একবার কফি খাওয়া হলো।

সীনস্থিয়া জোন্‌স বললো যে, আমি এসে পড়াতে নাকি খুবই ভালো হলো। এক ধরনের বিশেষ লতা সম্বন্ধে গবেষণা করছে ও। আমি শিকারে প্রায়ই এখানে আসি শুনে ও বললো, তাহলে তো খুব ভালোই হলো, আপনার এখানের জঙ্গল পাহাড় সব চেনা আছে। তাছাড়া কাল তো আমি বিকেলে হাতির তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেঁচেছি। শিকার তো প্রত্যেক বারই করেন। এবার একটু অবলার সহায় হোন ! নইলে, আমায় শূন্য হাতে ফিরতে হবে। লতা সংগ্রহ হোক্ আর না হোক, ভয়-মুক্ত হয়ে জঙ্গলে পাহাড়ে বেড়িয়ে বেড়ানোটাও তো একটা আনন্দের মতো আনন্দ।

বললাম, তথাস্তু। তবে একটু-আধটু শিকার তো করতেই হবে। পট-হান্টিং নইলে খাবেন কী। এখানে তো আর দোকান হাট নেই। টুম্বকা গ্রামটিও বড় ছোট। এবং মানুষেরা ভারী গরীব।

সীনস্থিয়া বললো, কেন ? টিনের খাবার ? সব সঙ্গে আছে।

টিনের খাবারে আমার অরুচি। এখন উঠি গোটা দুই মুরগী মেরে আনি।

কিন্তু তক্ষুণি ওঠা হলো না। সীনথিয়া উঠতে দিলো না। বললো, বসুন না একটু।এমন সুন্দর সকাল। একটু গল্প করা যাক।

সীনস্থিয়া অনেক কথা জিজ্ঞেস করলো, আমার নাম কী, কী পেশা ? শিকার করতে ভালোবাসি কেন ? আর কোনো নেশা আছে কি না ? কী কী জানোয়ার মেরেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচুর ছেলেমানুষী প্রশ্ন।

অন্য জায়গা এবং অন্য কেউ হলে হয়তো সব কথার উত্তর দিতাম না। কিন্তু মানুষে যখন আমার মত ছুটি কাটাতেই আসে তখন একটা অকেজো ছেলেমানুষীর রেশ মাখানো থাকে সেই সমস্ত ছুটিটাতে। বরঞ্চ তখন বুড়োমানুষী করতেই মন চায় না।

শেষকালে আড্ডার মায়া কাটিয়ে উঠলাম। সীনস্থিয়া বললো, তাহলে মারবেনই মুরগী, ছাড়বেন না ?

বললাম, আগে মারিই !

তবে মারুন। রান্না কিন্তু আমি করবো।

ভাবলাম, আরে এ যে গৌরীপুরী বৌদি আমার ! কোথায়, কোন থালায়, কার হাতে যে, কার ভাত বাড়া থাকে, তা কি কেউ জানতে পায় ?

বন্দুকটা নিয়ে বাংলোর হাতা পেরিয়ে পাহাড়ের নিচের সুঁড়ি পথে হারিয়ে গেলাম।

পরদিন বিকেলে চা খাওয়ার পর সীনথ্থিয়াকে বললাম, চলুন মাছ ধরে আসি।

কোত্থেকে ?

—কেন ? ভুরাগুির পথে যে জলপ্রপাতটা আছে, সেখান থেকে।

আছে বুঝি ? জলপ্রপাত ?

দেখেননি এখনো ? আপনি অবশ্য আগে আসেননি এদিকে। জানার কথাও নয়। চলুন নিয়ে যাচ্ছি। বাংলো থেকে বড় জোর দু ফার্লং হবে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম লালচে-মাটির রাস্তার উপরে সেই জলপ্রপাতে। বেশ উঁচু জল পড়ছে, ঝরঝরিয়ে ! নিচে বেশ গভীর জল। একটু পুকুরের মতই হয়েছে সেখানে। সেখান থেকে জল তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে চলে গেছে জঙ্গলের গভীরে। জলটা উপর থেকে যেখানে পড়ছে সেখানে হাজার হাজার বড় ছোট সাদা সাপের মতো ফেনা কিল্‌বিল্ করছে। আর বড় বড় পাহাড়ী মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে জলের স্বচ্ছ ফোয়ারায়।

সীনথ্থিয়া তো দেখে অবাক ! বাংলোর এত কাছে এমন সুন্দর জায়গা ! অথচ কেউ বলেনি ওকে।

একা একা অবশ্য এখানে বেশি না-আসাই ভালো। বলে, ওকে সঙ্গে করে, যেখানে ঝর্ণাটা বিভিন্ন ধারায় ভাগ হয়ে গড়িয়ে গেছে সেখানে নিয়ে গিয়ে জলের ধারে শম্বরের পায়ের দাগের সঙ্গে বাঘের পায়ের দাগও দেখালাম। সীনথ্থিয়া একটুও ভয় না পেয়ে বললো, আমাকে একদিন বাঘ দেখাবেন ?

হেসে বললাম, বাঘ দেখাবো কিনা হলপ করে বলতে পারি না। আমাদের বাঘ লাজুক। সিংহর মতো "আমাকে দ্যাখো!", "আমাকে দ্যাখো" করে বেড়ায় না। তবে দেখতে চাইলে, বাইসন-চরুয়া মাঠে নিয়ে গিয়ে বাইসন অবশ্যই দেখাতে পারি।

বাচ্চা মেয়ের মতো ভুরু নাচিয়ে ও বললো, তবে তো ভালোই হয়।

বেশ তো। দেখাবো বাইসন। পুরো দলটাই নিশ্চয় দেখাবো।

একটা বড় পাথরের উপর বসে আমরা ছিপ ফেলছিলাম। হাত-ছিপ্। তবে সুতো মজবুত। আস্তে আস্তে বেলা পড়ে আসছিলো। শীতের বনে, জঙ্গল-পাহাড়ে, আসন্ন সন্ধ্যায় কী যে সে এক করুণ রাগিনী বাজতে থাকে তা কী বলবো। ঘরের মানুষকে সে-সুর ঘরে ডাকে। প্রিয়জনকে যে-সুর কাছে টানে। আর আমার মতো খোদার-ষাঁড়কে আরো বাউন্ডুলে করে তোলে।

আদিবাসী ছেলেদের বুকের চেটোর মতো বুক চিতিয়ে জলপ্রপাতের উপরের পাথরগুলো আকাশের দিকে চেয়ে কখন সন্ধ্যাতারা উঠবে সেইক্ষণ গুনছে। সেখান থেকে একটি ময়ূর বার বার ডেকে উঠছে কেঁয়া, কেঁয়া। একটা কোটরা হরিণও জল-প্রপাতের ডানদিক থেকে ডাকছে ব্বাক্, ব্বাক্, ব্বাক্।

রাইফেলটাকে হাতের কাছে টেনে রাখলাম।

এই টানছে। টানছে। ফাৎনা ডুবলো।

চেঁচিয়ে উঠল, সীনথ্থিয়া।

বললাম, টানো, টানো। এক হ্যাঁচকা টান মারলো, সীনথ্থিয়া। মাছটা শেষ সূর্যের আলো আর জলপ্রপাতের জলের ছটায় মুক্তির জন্যে শেষ বারের মতো ঝিক্‌মিক্ করে উঠলো। তারপরই সঙ্গের বেতের ঝুরিতে তাকে পুরে ফেলা হলো।

সীনথ্থিয়া আনন্দে লফাচ্ছিলো। একটা আকাশী নীল-রঙা স্কার্ট আর ফিকে গোলাপী

হাতওয়ালা উলের সোয়েটার পরেছে ও। ওর নরম, স্বপ্নিল সোনালী চুলে জলের গুঁড়ি হাওয়ায় এসে জমছে। তার উপর ক্লান্ত পৌষের বিষণ্ণ রোদের চুমু লেগেছে। মনে হচ্ছে, সীনস্থিয়া জোন্স নয়, যেন এক প্রাচীন আর্যকন্যা তার উদ্ধতা কোমল গ্রীবাভঙ্গিতে এই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র আমারই এই একজোড়া পোড়া চোখকে ধন্য করবে বলে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই কেন জানি না আমার ওকে ভীষণ পেতে ইচ্ছা করলো। ওর মতো সুগন্ধি, সুহাসিনী, স্বচ্ছতোয়া নারী আমার জীবনে এলে ভাবলাম হয়তো আমার তীব্র রুক্ষ পৌরুষের জ্বালা আর থাকবে না।

এই ভাবনাটা মনে ব্যাপ্ত হতে না হতেই কোথা থেকে এক ঝাঁক ছাতারে পাখি ছ্যাঃ। ছ্যাঃ। ছ্যা ছ্যাঃ। করতে করতে কোণাকুণি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো।

আমার ছিপেও একটা মাছ উঠলো। বেশ বড়ো মাছ।

এদিকে সন্ধ্যা এসে জলপ্রপাতের মাথায় তার কালো চুল মেলে দাঁড়িয়েছে দেখলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সং্যাতারাটি পিদিম হাতে আমাদের পথ দেখাতে এলো। বনের পাতায় শিরশিরানি তুলে তার পিছু পিছু একটা হাওয়াও এলো হরিণের পেছনে চিতা যেমন আসে।

আমি আর সীনস্থিয়া বাংলোর দিকে ফিরে চললাম।

চলতে চলতে, সীনস্থিয়া বললো, গোটাম, চলো। আমরা এখানে সাঁতার কাটবো। আপত্তি আছে তোমার?

আপত্তি কিছু নেই। তবে সাঁতার কাটার চেয়ে শুধু স্নান করাটাই ভালো হবে। ওখানের পাথরগুলো ভারী অসমান আর জলের তলায় কোথায় যে উঁচু আর কোথায় নিচু তাতো তুমি দেখতে পাবে না। গতবার আমার এক পাইলট-বন্ধু এইখানে এসে সাঁতার কাটতে গিয়ে কলারবোন ভেঙে ফিরেছিলো। বেচারার কেরিয়ারটাই খতম হয়েছিলো একটু হলে।

সীনস্থিয়া ওর ডানহাতের পাতায় আমার বাঁ হাতের পাতাটি নিয়ে বললো, আমাকে ভয় দেখিও না। তা ছাড়া, তুমি তো আছো। তুমি থাকতে আমার ভয় কী?

এমনভাবে সীনস্থিয়া কথাটা বলল যেন আমার উপর ভরসা করেই এই অবলা নারী এই রকম জায়গায় লতা খুঁজতে এসেছিলো। তবু, যাকে ভালো লাগে, যার সঙ্গ ভালো লাগে, যার হাতে হাত ছোঁয়ালে শিশু বয়সে মার স্তনে হাত ছোঁয়ানোর মতো নিশ্চিন্ত স্বস্তি বোধ করা যায়, সে যদি এমন করে বলে যে, আমি আছি জেনে সে নিশ্চিন্ত, তার চেয়ে বড়ো কিছু প্রাপ্তি আছে বলে তো আমি জানি না। যাকে ভালো লাগে কিংবা যাকে ভালোবাসি, তার সবটুকু বিশ্বাস যদি আমার উপর ন্যস্ত হয়, তাহলে আমি তার জন্যে কী না করতে পারি। হয়তো প্রাণও দিতে পারি। তাছাড়া, একটা প্রাণের জন্ম তো একটা জৈব দুর্ঘটনা বই নয়। কিন্তু ভালোবাসা তো দুর্ঘটনা নয়। সে যে এক স্বেচ্ছারোপিত ব্যথার ফুল। যার অবয়ব নেই। তবু যার বুকে তা থাকে, সে নড়লে-চড়লেই সেই ভালোবাসা ঝুমঝুমিয়ে বাজে।

সীনস্থিয়াকে দেখে যে আমার ভারতীয় বলে মনে হয়েছিলো তার কারণ ছিলো। ওর মা ভারতীয়, বাবা ইতালীয়। পরে অবশ্য বিচ্ছেদ হয়ে গেছিলো দুজনের। তার চেয়ে বেশী কথা ওর সম্বন্ধে জানতে পারিনি। এবং জানতে চাইওনি। তাছাড়া ও নিজের থেকেই, খুশিমনে নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিলো, তাই শুনেছিলাম।

গতকাল সকালে ওর সঙ্গে পাহাড়ে গেছিলাম। এই পাহাড়-জঙ্গলে একা একা ঘোরা ওর পক্ষে সত্যিই সম্ভব হতো না। হাতি প্রচুর আছে। তাছাড়া, বাইসন এবং ভাল্লুকও আছে।

এদের কাছ থেকেই অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী। কালকে তো প্রায় আমাদের গায়ের উপর দিয়েই একটা ভাল্লুকের বাচ্চা ডিগবাজী খেয়ে চলে গেছিলো। সীনন্থিয়া খিলখিলিয়ে হেসে বলেছিলো, দ্যাখো, দ্যাখো গৌতম! একটা ভাল্লুক খাঁই!

আমি ওর কথার ধরন দেখে হাসি চাপতে পারলাম না। কুচিলা খাঁই নাম শুনে সব জানোয়ারের নামের পেছনেই ও খাঁই বলতে শুরু করেছে। অথচ দাঁনেশ পাখি, কুচিলা, বা নাক্স-ভোমিকা গাছে বসে তার ফল খায় বলেই ওড়িশাতে তাদের নাম কুচিলা খাঁই।

জঙ্গলে পাহাড়ে চৈতন্য হবার পর থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনেক গাছ দেখেছি। অনেক ফুল দেখেছি। অনেক লতা দেখেছি। অথচ তাদের সকলের বৈজ্ঞানিক নাম কখনো জানিনি। তাদের স্থানীয় নাম জেনেছি। তাদের ভালোবেসেছি। এই ... জঙ্গল, এতে আসন, শাল, পিয়াশাল, সেগুন, কুচিলা, মহুয়া এবং নানারকম ... ছাড়া আরও কত শত গাছ, লতা, ঝোপ-ঝাড় আছে।

একরকম মোটা সোটা, গাঁট্টা গাঁট্টা বাঁশ দেখিয়ে সীনন্থিয়া বলেছিলো, এদের নাম কি জানো? Bamboosa Robusta! আর ওটা কি বলোতো? Bamboosa Ardensia. যখনি ফুল ধরতে শুরু করবে তখনি এদের মরবার পালা শুরু হবে। শুকিয়ে যাবে ধীরে ধীরে। বাঁশফুল মানেই যমদূত।

আমি বললাম বাঃ! চমৎকার নিয়ম তো। মানুষদের জীবনেও এরকম হওয়া উচিত। ফুল যখন ধরেই গেল, ফুল-ফলন্ত হবার পরে বেঁচে থাকবার কি মানে হয়, জানি না! মৃত্যু, সার্থকতার অনুগামী হওয়াই তো উচিত! সার্থকতার পরও বাঁচানোর মধ্যে কোনো যথেষ্ট অনুপ্রেরণা কারোই থাকার নয়। সার্থক হবার চেষ্টাই তো জীবন। তুমি কি বলো? পাহাড়চূড়োয় পৌঁছবার পরও কি কেউ সেখানে থেকে যায়? নেমেই আসে। প্রত্যেক আরোহীই তার বুকের মধ্যে একজন অবরোহীকে বয়ে বেড়ায়। এটাই নিয়ম।

সীনন্থিয়া নীল-রঙা এক গুচ্ছ ফুল হাতে দোলাতে দোলাতে বললো, মৃত্যু যদি সার্থকতার অগ্রগামী হয় তা হলে?

আমি কিছু বলি না। আমি শুধু শুনি।

আমি বললাম।

গাছপালার মসৃণ গা বেয়ে পিছলে, উদার সূর্যের সহস্র সোনালি আঙুল সমস্ত বনভূমির শরীরে আদর ছোঁওয়াচ্ছিলো। আমরা হাঁটছিলাম। শিশির ভেজা ঘাস, লতা পাতা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোচ্ছিলো। তার সঙ্গে কত শত নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ মিশে মন্থর শীতার্ত হাওয়া রোদের আঙুলে কাঁপছিলো। নানারকম হাইবিসকাস এর মুখে সকালের মুখের ছবি দেখছিলাম। সীনথিয়া আপনমনে এক-একটা উদ্ভিদের বিরাট বিরাট বৈজ্ঞানিক নাম বলছিলো, স্বগতোক্তির মতো। আর সেই নামের বহর শুনে, যে লতা, যে ফুলকে ছোট বেলা থেকে দেখেছি, তাদেরই খুব রাশভারী বলে মনে হচ্ছিলো।

আমি বললাম, Emerson-এর সেই কবিতাটা পড়েছো?

কোন কবিতা?

সীনন্থিয়া বললো।

যতটুকু মনে ছিলো, আমি তাই আবৃত্তি করলাম—

> **..."But these young scholars, who invade our hills**
> **Bold as the engineer who fells the wood,**

Love not the flower they pluck and know it not;
And all their Botany is Latin names—"

সীনথিয়া বললো, Superb! Superb!

আচ্ছা গোটাম্ তুমি এই জঙ্গল পাহাড়কে খুব ভালোবাসো না ? যদি তোমার মতো করে ভালোবাসতে পারতাম।

আমি বললাম, তোমার ভালাবাসা জঙ্গল-পাহাড়ের মতো নির্জীব বস্তুতে অপচয় করবে কেন ? ভালো যদি বাসতে চাও তো তোমার কি পাত্রের অভাব ?

সীনথিয়া কথাটার জবব দিলো না। এড়িয়ে গেলো এবং কেমন ব্যথিত ও চকিত চোখে আমার দিকে ওর নিভৃত চোখ তুলে চাইলো। লক্ষ করলাম।

আমার সীনথিয়া মেমসাহেবকে ভীষণই ভালো লাগছিলো। জীবনে যা আমি বরাবর ভয় করে এসেছি, সরবে যাব বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছি ; সেই নীড়-বাঁধার মতো লজ্জাকর ও স্থাবর মনোবৃত্তিটা আমারও মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। মনে মনে তাকে অনেকবার বন্দুক উঁচোলাম। কিন্তু সে কিছুতেই ভয় পেলো না।

॥ ৩ ॥

রাত আটটা হবে। বারান্দায় বসেছিলাম। বাংলোর সামনে কিছুই চোখে পড়ে না। জমাটবাঁধা কালো অন্ধকার, চোখের সামনে মনের জমাটবাঁধা ভাবনারই মতো ভারী হয়ে বসে আছে। পাহাড়টাই বেশী ভারী ; না অন্ধকারটাই বেশী, ঠাহর করতে পাচ্ছি না। পাহাড়ের নিচের সেগুন গাছের জঙ্গলে জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে আর নিবছে ! অমাবস্যার রাতের সমুদ্রের ঢেউয়ের বুকের ফস্ফরাসের মতো। এই ঘনান্ধকার ভয়-গর্ভ রাতের একটা সুপুরুষ ব্যক্তিত্ব আছে। এই অন্ধকার রাতে, বন-পাহাড় যেমন ভাবে অদৃশ্য ও অসাধারণ ভাবে নিজেকে নিরুচ্চারে ব্যক্ত করে তেমন আর কোনো সময়েই নয় ! প্রকৃতির বুকের কোরকে যে শক্তিমান পুরুষ বাস করেন, সেই পুরুষ এই অন্ধকারেই প্রতীয়মান হন। যাঁদের চোখ আছে, তাঁরাই তাঁকে দেখতে পান।

বাংলোর পেছনের টুম্বকা গ্রামে সারি সারি আলপনা-দেওয়া ছোট ছোট মেটে ঘর। ছোট উঠোন। পাতকুয়ো। দু-একটি শান্ত, বিজ্ঞ, গোরু। গুটিকয় চঞ্চল-পোষা মুরগী এবং অনেক নগ্ন, অসুস্থ-অথচ সদাহাস্যময় শিশু। এই নিয়েই টুম্বকা গ্রাম। এখন রাত নেমেছে। কালো রঙের তুলির আঁচড়ে সব মুছে গেছে। নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। গ্রামের পেছনের ধানক্ষেতে হাতি নেমেছে। মাচায় বসে ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে ছেলেরা শীতের রাতে পায়ের নিচে সরায় কাঠের আগুন নিয়ে। শাল কাঠের মশাল করে তাতে আগুন জ্বেলে আন্দোলিত করছে। হাতির দল বৃংহন করতে করতে আবার পাহাড়ে ফিরে যাচ্ছে।

সীনথিয়া, চৌকিদারের হাতে বাসনপত্র দিয়ে বাবুর্চিখানা থেকে বারান্দায় এসে উঠলো। বললো, শিগগিরি। শিগগিরি এসো, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

নড়বড়ে কাঠের টেবলে খাবার সাজিয়ে, কম্পমান লণ্ঠনের আলোয় আমার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে, আমার জঙ্গলের প্রেমিকা বললো, খাও, গোটাম, শুধু করো।

মুসুরীর ডালের স্যুপ, ফ্রায়েড রাইস্ এবং মুরগীর রোস্ট্। এ জঙ্গলে রোজ রোজ এমন খাবার খাবো, আর শুধু তাই নয়, এমনভাবে খাবো ; কে ভেবেছিলো ?

খেতে খেতে বললাম, তুমি আমার অভ্যেস খারাপ করে দিচ্ছো। আর চারদিন পরে যে চলে যাবে, তখন কী খাবো ?

সীনথিয়া বললো, কেন ? এবেলা খিচুড়ি ওবেলা খিচুড়ি, তাছাড়া তোমার ঘোড়ামার্কা রাম তো আছেই। তোমার মতো মানুষ, মানুষ না হয় ঘোড়া হয়ে জন্মালেই পারতে।

বলেই, খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

তারপরেই গম্ভীর এবং নিচু-গলায় আমাকে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো, তুমি খুব মজার ছেলে। তোমার মধ্যে খুব প্রাণ আছে। যে মেয়ে তোমাকে বিয়ে করবে সে খুব সুখী হবে।

মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বললাম, এই জ্ঞানের ভয়েই পালিয়ে জঙ্গলে থাকি জঙ্গলেও যদি জ্ঞান দাও তো পালাবার জায়গা দেখি না।

সীনথিয়া বললো, আমি ঠাট্টা করছি না। যা বলছি তা সত্যি কি না দেখো।

ভাবলাম, এও তো আর এক জ্বালা। যাকে মনে মনে ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে, যাকে প্রেয়সী বলে ভেবে আকাশকুসুম কল্পনা করছি সেই হঠাৎ পিসীমা বনে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলো। পড়াশুনাটা করলে কী করে কথা গুছিয়ে বলতে হয়, তা শিখতে পারতাম। একেইতো কাউকে আমার আদপে কিছু বলারই থাকে না, যদি বা বলার মতো কোনো কথা জমে তাও মনে মনে হাঁড়ির মধ্যে খিচুড়ির মত টগবগ করে, বলা আর হয় না।

আমি কিছুই বললাম না, উত্তরে চুপ করেই রইলাম। কারণ, আমি জানতাম বলার সময় এখনো আসেনি। জীবনে একটা ভীষণ রকম প্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্যে একটু মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। অন্তত আমার পক্ষে।

আমরা চুপচাপ খাচ্ছিলাম। সীনথিয়া চামচে করে একটু একটু ফ্রায়েড রাইস আলতো করে মুখে তুলছিলো তারপর নিঃশব্দে চিবোচ্ছিলো। ওর হাঁটায়, কথা বলায়, চোখের চাউনিতে, এমন কি খাওয়াতেও এমন একটা শান্ত শ্রী, এমন একটা সহজীয়া বেশ ছিলো যে ওকে দেখে আমার মনে হতো ওর জীবনে বোধ হয় কোনোদিনও ওকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে হয়নি। নিজে যা ভালো বলে মনে করেছে, সেই শুভবুদ্ধি থেকে একচুলও নড়তে হয়নি। তাই বোধহয় কোনো বাধা আসেনি এ পর্যন্ত ওর ইচ্ছা বা রুচির বিরুদ্ধে।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগতো ও যখন হাসতো। প্রথমে চোখের তারায় একটু বিদ্যুতের ছটা দেখা যেতো, তারপর সেই ছটা ছড়িয়ে যেতো সমস্ত মুখময়। তারপর পাতলা দুটি জিনিয়া ফুলের পাঁপড়ির মত ঠোঁটে, দু সারি সুচারু দাঁতে, সুকুমারী চিবুকে।

আমি ভাবতাম, এমন করেও কি কেউ হাসতে পারে ? কিংবা কোনো মেয়ের হাসি এমন ভাবে কোনোদিন দেখিনি বা দেখবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন হয়তো বা।

সীনথিয়া যতক্ষণ কাছে থাকতো ততক্ষণই আমার সমস্ত সত্তা ঘিরে একটি সুগন্ধ উঠতো অনুক্ষণ। ওর সান্নিধ্যে কোনো জ্বালা ছিলো না। কোনো কামনার ধারালো ছুরি কখনো আমাকে ফালা ফালা করতো না। ওর সান্নিধ্য, আমার অনেক নৈরাশ্যের অতল গহ্বর আলোকিত করে রাখতো। আমার অনেক ভালোলাগাকে মৌসুমী ফুলের মতো সমস্ত সত্তা-জুড়ে ফুটিয়ে তুলতো। মনে মনে, আমি নিজে যা নই তাই মনে হতো। মনে হতো, আমিও ওর মতো শুচি, পবিত্র, ওর মতো সবল। মাঝে মাঝে এমন হতো যে আমার ওকে নিয়ে নীড় বাঁধবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে এমন একটা ধারণাও আমার মনের মধ্যে শিকড় গাড়বার চেষ্টা করতো। তখন সত্যিকারের ভালোবাসার সন্তান যে বিনয়, সেই বিনয় এসে আমাকে তুড়ে বলতো, 'তুই একটা অপদার্থ'। অমনি, 'মুই অতি ছার' ভাব নিয়ে নিজের

নৈরাশ্যের অভ্র-খনির ভেজা-সিঁড়ি বেয়ে, অন্ধকারে, অনিশ্চয়তায় আবার নেমে যেতাম।
আর যাই হোক, বোকা আমি কোনদিনই ছিলাম না। আমি জানতাম, আমি বুঝতে পারতাম যে, সীনথ্থিয়া যে-কোনো কারণেই হোক আমাকে পছন্দ করে। মানে, নিছক পছন্দ করার জন্যে নয়। আমাকে ওর বিশেষ এক ভাবে ভালোও লাগে। ওর চাউনি, ওর কথার সুর, আমার সামান্য সুখের জন্য ওর উৎকণ্ঠা ; সবই লক্ষ করতাম। বুঝতে পারতাম, আর অবাক হয়ে যেতাম এই ভেবে যে, এই ছাত্রীটির পড়াশুনার চেয়েও আমার প্রতি আগ্রহ অনেকই বেশি বলে। ওর মধ্যে কোনো সস্তা জিনিস ছিলো না। কোনো ন্যাকাপনা ছিলো না। আমার এই উদ্দাম জংলীপনা ওকে আকৃষ্ট করেছিলো। ওর দুচোখে আমি আমার এই আলো-হাওয়া—বন-পাহাড়ের জীবনকে শুষে নেওয়ার আকুতি দেখতে পেতাম। ভারী ভালো লাগতো। এত ভালো আমার কোনোদিনও লাগেনি। কোনো বাঙালী মেয়ের মধ্যে আমি এমন জঙ্গল-উন্মাদনা দেখিনি।
খাওয়র পর, বারান্দায় বসে আর একটু গল্প করা হলো।
সীনথ্থিয়া বললো, তুমি রোজ আমাকে ঠকাচ্ছো। কাল আমাকে চান করতে নিয়ে যেতেই হবে সেই জলপ্রপাতে !
হবে'খন। রাত তো পোয়াক্।
তারপর যে যার ঘরে শুতে গেলাম।
শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, সীনথিয়া প্রায়ই আমাকে বলে You are a darling! You are so sweet! ইত্যাদি, ইত্যাদি ! অথচ এমন করে বলে, যেন পাশের বাড়ির মহিলা তার পাশের বাড়ির মহিলার ছেলেকে বলছেন। ওকে আমি যেমন বুঝতে পারি, তেমন আবার একেবারেই বুঝতে পারি না ওকে আমার ভীষণ ভালোলাগে। ওরও যে আমাকে ভালো লাগে তা বুঝতে পারি। অথচ কথাবার্তায় এমন একটা সম্মানজনক ও সম্ভ্রান্ত দূরত্ব ও বজায় রাখতে চায় যে, আমার তা ভালোলাগে না। ও বোধ হয় ভয় পায়, পাছে, এই জঙ্গল-পাহাড়ে, দুরন্ত, বেপরোয়া ছেলে এমন কিছু আবদার করে বসে, যা ওর দেবার সাধ্য নেই।
জানি না। কিছুই জানি না।
"কুচিলা খাঁই"-এর ডাকের জন্যে কোনোদিনই সকালে ভালো করে ঘুমুনোর জোটি নেই। রোজ সকালে, আর শুধু সকালে কেন ? সমস্ত সময়ই তো ইঁক ইঁক, ইঁক, হ্যাঁক্ হ্যাঁক্

ঘুম থেকে উঠতেই, সীনথ্থিয়া বাইরে থেকে আমায় ডেকে বললো, গোটাম্ Will you please shoot a couple of these noisy filthy birds! They are telling on my nerves really! They are telling on my nerves!
চৌপায়াতে বসে বসেই বললাম, কেন ? তোমার কি বাত হয়েছে না কি ?
সীনথিয়া রেগে বললো, না না সত্যি বলছি। এই পাখিগুলোকে আমি আসা অবধিই সহ্য করতে পারছি না।
প্রাতরাশ খেয়ে সীনথিয়ার সাদা স্ট্যান্ডার্ড-হেরাল্ডে চেপে আমরা ঝর্নাটায় গিয়ে পৌঁছোলাম। তখনো জল বেশ ঠাণ্ডা। আমি বললাম, আর একটু পরে নেমো, অসুখ করে যাবে। সীনথিয়া বললো, বেশ। তবে আগে চলো, জলপ্রপাতের মাথায় সে সুন্দর জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, সেখানে উঠি। জলটা কোথা থেকে আসছে দেখবো।
চলো ঝোঁক যখন হয়েছে, তখন তো আর বাধা শুনবে না !

জলপ্রপাতটা বেশ উঁচু। জলাধারটি প্রায় একশ ফিট উঁচু হবে। তবে সেখানে তিন চারটে প্রপাত। কম-বেশি পনেরো কুড়ি ফিট উঁচু, এদের মাথায় আব এক মালভূমি।

পাকদণ্ডী ঘুরে উপরে উঠতেই চোখ জুড়িয়ে গেলো। আমিও কোনোদিন উপরে উঠিনি। গভীর জঙ্গল আর লতাগুল্মর আড়াল থেকে চওড়া পাথরের ক্ষয়েরী আর কালো চাতাল বেয়ে জলধারা কুল্‌কুল্‌ করে বেয়ে আসছে জঙ্গলময় মালভূমির মধ্য দিয়ে। এসে, শীতের সকালে ক্রীড়াচ্ছলে, রামধনু-চুল উড়িয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে নিচে। উপরে জলধাবার দুধারে লতাপাতা ঝুঁকে পড়েছে। দুধারই চমৎকার ছায়া শীতল। রোদে পাথর যতটুকু গরম হয়েছে, তাতে তার উপর শুয়ে থাকতে ভারী আরাম। জলধারার দু'ধারে থোকা-থোকা কী একটা জংলী লতায় ফিকে নীল ফুল ফুটে আছে। চৌকিদার বলছিলো, ওদের নামে গিলিরী। পাথরের কালোতে ক্ষয়েরীতে, জলের ফেনিল সাদাতে, আর এই নীল লতাব নীলে এমন এক অপার্থিব ছবির সৃষ্টি হয়েছে, কী বলবো। সীনথিয়া লতাগুলোর কাছে গেলো। তারপর বললো, এগুলোর নাম কী জান? প্যাশানফ্লাওয়ার। এগুলো জংলী লতা মোটেই নয়। নিশ্চয়ই কোনো সৌখীন লোক এখানে এনে কোনোদিন লাগিয়ে গেছিলো।

আমি ভাবলাম, কে জানে! হবে হয়তো! চৌকিদার ফরেস্ট অফিসেব কর্মচারী। সে প্যাশানফ্লাওয়ারের কি জানে?

সীনথিয়া বললো, আমি এমন জায়য়া ছেড়ে নিচে যাচ্ছি না।

সেই জলাধার ছেড়ে সামান্য এগোলেই বেশ গভীর দু'তিনটি জায়গা আছে। যেখানে জল এক কোমর থেকে বুক অবধি। সবচেয়ে মজা হচ্ছে যে, ওখানে জল একেবারে স্ফটিক-স্বচ্ছ। মন হারালেও মন কুড়িয়ে নেওয়া যায়।

সীনন্থিয়া ফ্লাস্কে করে কফি বানিয়ে এনেছিলো।

আমি বললাম, তুমি চান করো, আমি কফি খাই।

ও বললো, তুমি চান করবে না নাকি?

করবো। জল একটু গরম হোক।

হালকা গোলাপী রঙের একটা সাঁতারের পোশাক পরেছিলো সীনথিয়া। ঝকঝকে জলেব মধ্যে একটা গোলাপী হাঁসেব মতো মতো দেখাচ্ছিলো ওকে। বাদামীতে-সাদাতে মেশানো ওর আশ্রয়াকুল হাত দুখানি জলের মধ্যে ফোয়ারা ওঠাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে ও বলছিলো, সব কফি খেও না কিন্তু!

আমি কফিতে চুমুক দিচ্ছিলাম, আর ভাবছিলাম এ'কদিন শিকারে আমি প্রায় গেলামই না। অথচ কী করে যে কটা দিন কেটে গেল টেরই পেলাম না। সীনথিয়া তো আর দু'দিন বাদেই চলে যাবে। তারপর সময়টা সকাল বেলার কুয়াশার মতো একেবারে আমার উপর চেপে বসবে। তবু বেশ কাটলো একটা দিন। এতো কাছে থেকেও এত দূরে কী করে থাকতে হয়, সীনথিয়ার কাছে তা শেখার আছে।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সীনন্থিয়া চীৎকাব করে উঠলো, হেল্প! হেল্প!

তাকিয়ে দেখি, জলের তোড়ে ও নিচে প্রপাতের দিকে ভেসে চলেছে আব প্রাণপণে হাত পা দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। সেখান থেকে প্রথম প্রপাতটি বড় জোর তিরিশ চল্লিশ ফিট মতো হবে।

কাণ্ডজ্ঞান-রহিত হয়ে লাফিয়ে পড়লাম জলে। জল তো সেখানে সামান্যই। হাঁটুভবও নয়। কিন্তু কী পিছল লাফাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রচণ্ড আছাড় খেলাম। হাঁটুতে এমন একটা চোট লাগলো পাথরের উপর পড়ে যে, মনে হলো অজ্ঞানই হয়ে যাবো। অজ্ঞান যে

কেন হলাম না জানি না। কিন্তু সীনথিয়া বেঁচে গেলো। আমার পাশ দিয়ে ভেসে যাবার সময় ওর হাত আমার হাতে লাগলো এবং আমি প্রায় শোওয়া অবস্থাতেই এক হাঁচ্‌কা টান দিয়ে একটা বড় পাথরে দু'পায়ে ভর রেখে, ওকে আমার কাছে টেনে আনলাম।

ভয়ে বেচারীর মুখ চোখ শুকিয়ে গেলেও, ওর ঠোঁটে সেই আশ্চর্য হাসিটি লেগেই ছিলো। কিছুটা অভাবনীয়তায়, কিছুটা প্রাণপ্রাপ্তির আনন্দে ও অস্ফুটে কী যেন বলে উঠলো, বুঝলাম না।

সীনথিয়াকে বাঁচতে পেরে যে আনন্দ হলো না তা নয়। কিন্তু হাঁটুটাকে বোধহয় আর কোনো দিনও সোজা করতে পারবো না।

আমরা দুজনে কোনোরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে কিনারে এসে পৌঁছলাম তারপর সীনথিয়া নিজে প্রথমে উঠে আমাকে উঠতে সাহায্য করলো। কোনোরকমে পাথরে পৌঁছেই চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। হাঁটুটার মাংস একেবারে থেঁথলে গেছিলো। তার উপর রক্ত চৌয়াতে শুরু করেছিলো। সীনথিয়া কী করবে বুঝতে পারছিলো না। প্রথমে হাত দিয়ে রক্তটা মুছবার চেষ্টা করলো। তারপর হঠাৎ অভাবনীয় ভাবে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কপালে চুমু খেলো। তারপর অনেকক্ষণ আমার ভিজে বুকে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ওরকম চাপা মেয়ে যে কী করে এমন বেহিসাবী হলো, ভাবতে পারছিলাম না। আমি কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে বললাম, তুমি কি পাগল হলে বোকা মেয়ে! আমার কিছুই হয়নি।

সীনথিয়া তবু শুনলো না। আমার পাশে অসহায়ের মতো বসে, আমার দিকে চেয়ে থাকলো। সোনালী চুলে-মোড়া ওর জল-ভেজা শ্বেতা গ্রীবার দিকে তাকিয়ে চিল্‌কা হ্রদের একটি রাজহাঁসের কথা আমার মনে হলো। যাকে আমি গুলি করেছিলাম। তরপর বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বাঁচাতে পারিনি।

॥ ৪ ॥

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। সকালের চা খাওয়া হয়ে গেছে। বারান্দায় ইজী চেয়ারে বসে আছি। হাঁটুতে ব্যান্ডেজ বেঁধে।

লোকজন যোগাড় করে বাঁশ নিয়ে স্ট্রেচার বানিয়ে সীনথিয়া ঝর্নার ওপর থেকে আমাকে কাল নামিয়ে দিয়ে এসেছিলো। নিজে গাড়ি চালিয়ে গিয়ে পূর্ণাকোট থেকে ডাক্তার এনেছিলো। ডাক্তার ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গেছেন আর বলেছেন যে, হাড় ভাঙেনি ; তবে বিশ্রামের প্রয়োজন।

চতুর্দিকের বন-পাহাড় আজ সকালে রোদ ঝলমল্ করছে। মহানদীর অববাহিকার এই আশ্চর্য সুন্দর বনভূমি তাব সব সৌন্দর্য মেলে ধরেছে রোদে ; মহার্ঘ্য গালচের মতো। বারান্দার থামগুলোর ছায়ার সঙ্গে রোদটা কাটাকুটি খেলছে। সীনথিয়া বাংলোর সামনে নুড়ি বিছানো ড্রাইভে পাইচারী করছে। প্রথম যেদিন আমরা ঝর্নায় যাই মাছ ধরতে, সেদিনকার সেই পোশাকটিই পরেছে আজ সীনথিয়া। ফিকে নীল স্কার্ট আর ফিকে গোলাপী সোয়েটার।

সীনথিয়াকে দেখছি চুপ করে বসে। পাশাপাশি দুটি ছোট ঘর। মাঝে বসার ও খাওয়ার

ঘর। বাইরে টানা বারান্দা। বারান্দাতে বসে আছে সীনথিয়া। যেতে-আসতে চোখাচোখি হলেই ও চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। কী যেন ভাবছে ও। বোধহয় কালকের কথা। বোধহয়, ভেবে লজ্জা পাচ্ছে। আমিও ভাবছি। ভাবছি, ওকে দু'একদিনের মধ্যেই বলবো সেই কথাটা। বুলবুলি পাখির সঙ্গে বাসা বাঁধার কথা!

এমন সময় দুটো কুচিলা খাঁই পাখি পাহাড় থেকে উড়ে এসে বাংলোর সামনের গাছটার ডালে বসে কুৎসিত গলায় ডাকতে লাগলো হ্যাঁক্ হ্যাঁ হ্যাঁক্ করে। পাখিদুটোকে দেখেই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। পাখিদুটো প্রকাণ্ড ঠোঁটদুটো দিয়ে ডালে ঘষতে লাগলো আর বিরটা বিরাট ডানাদুটো ঝাপ্টাতে লাগলো।

সীনথিয়া দৌড়ে আমার ঘরে ঢুকে শট্‌গানটা নিয়ে এসে বললো, মারো তো গোটাম, মারো তো! এগুলো সব সময়ে আমাকে ভয় দেখায়।

ইজীচেয়ারে বসে বসেই গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটি পাখি গাছের ডালেই লটকে রইলো মগডালে। অন্যটা ইক্ক ইক্ক করতে করতে উড়তেই উড়ান মাবলাম তাকে।

কিছুক্ষণ আগে থেকেই দূর জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটি গাড়ির এঞ্জিনের গুনগুনানি শুনতে পাচ্ছিলাম। একটি পরেই গাড়িটা দেখা গেল।

একটা বড় কালো গাড়ি। এখন কাছে এসে গেছে। পূণাকোটের দিক থেকে আসছে। এবারে বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়লো। দেখলাম, একটা কালো রোলসরয়েস। গাড়ির বনেট থেকে কোনো দেশীয় রাজ্যের পতাকা উড়ছে পতপতিয়ে। দেশীয় রাজ্যের নাম্বার-প্লেট লাগানো।

গাড়িটা এসে বারান্দার সামনেই দাঁড়ালো। সেই গাড়ির পাশে আর্মির ডিসপোজাল-সেল থেকে কেনা আমার ধুলি-ধুসরিত জীপটি লজ্জাতে অধোবদন হয়ে রইলো। উর্দিপরা সোফার এসে পেছনের দরজা খুলে ধরলো। একজন মোটাসোটা, ছোটোখাটো ভদ্রলোক নামলেন। পরনে খুব দামী গরম কাপড়ের স্যুট। র‍্যাংকিন বা বরকত-আলির কাছ থেকে বানানো। মাথায় স্ট্র হ্যাট। বয়স কম করে পঞ্চাশ টঞ্চাশ হবে।

হঠাৎ সীনথিয়ার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

ওর চোখ দেখে মনে হলো, এ ওর চোখ নয়। ছুলোয়া শিকারে তাড়া খেয়ে শিকারীর সামনে-পড়া কোনো চিতল হরিণীর চোখ। যার বাঁচা হল না। হবে না।

লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে সীনথিয়াকে বলল, what are you up to? Why am I paying that old bitch for?

সীনথিয়া চোখে আগুন ঝরিয়ে দু'হাত তুলে সমর্পণের ভঙ্গীতে বললো, Alright! You have your wa,, Now! for God's sake, keep your bloody mouth shut.

আমি কিছু বোঝা বা বলার আগেই, সীনথিয়া প্রায় আমার হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়েই নিলো। একবার লোকটার দিকে তুললোও। কিন্তু পরক্ষণেই আমার ঘরে গিয়ে রেখে এলো।

রেখে এসে, আমার ইজীচেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে, সীনথিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, গোটাম, আমি যাচ্ছি।

ওর হাত চেপে ধরে আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছো?

ও বললো, আমার অতীতে ফিরে যাচ্ছি। আমি খারাপ, আমি খারাপ; আমি মিথ্যাবাদী। আমি খারাপ।

ওকে কাছে টেনে আমি বললাম, তুমি ভালো ; তুমি ভালো ; তোমার অতীত নেই তোমার কেবল ভবিষ্যৎ আছে।

সীনথিয়া আমার মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত যেন কী ভাবলো, তারপর লোকটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, এটা আর একটা কুচিলা খাঁই।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও বললো, চললাম. গোটাম্। তোমাকে মনে থাকবে। তুমি আমাকে ভুলে যেও।

বলতে বলতেই বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

ওর ওভারনাইটার পড়ে রইলো ওর ঘরে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, সীনথিয়া সীনথিয়া!

কিন্তু উত্থান-শক্তি রহিত—আমার চিৎকার ডুবিয়ে দিয়ে মহারাজার রেলেস-রয়েস গাড়ি বাংলোর হাতা পেরিয়ে গিয়ে পুর্ণাকোটের পথে পড়লো। বদখত লোকটা নিজেই গাড়িটা চালাচ্ছিলো।

পিছনে পেছনে সোফার সীনথিয়ার স্টান্ডার্ড-হেরাল্ড চালিয়ে নিয়ে গেলো।

সেই ভাঙা-সকালের রাঙা-আলোয় একা একা বসে রইলাম টুম্বকার বাংলোর বারান্দায়। হাওয়ার দোলায় মরা কুচিলা-খাঁই পাখি দুটোর পালকগুলো আন্দোলিত হচ্ছিলো।

ফ্ল্যানেলের শার্ট-এর নিচে আমার শক্ত দুই বাহুর গুলি পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠলো. চোয়াল দৃঢ় , কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম. বড় দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারলাম জীবনে প্রথমবার যে, গায়ের জোর অথবা বন্দুকের গুলির চেয়েও অনেক বেশি শক্তিধর, অনেক বেশি নিষ্ঠুর হচ্ছে টাকা। আজে-বাজে মানুষের হাতের অঢেল টাকার মতো মারাত্মক সর্বনাশা আর কোনো অস্ত্রই নেই এই পৃথিবীতে।

পাক্কিটাডাও চোক্‌রা

রিং-টাং চা বাগানের ম্যানেজার গিলিগান উদোম হয়ে বাথরুমের লাগোয়া ঘরে, দুটি পা ইজীচেয়ারের লম্বা কাঠের হাতলে তুলে দিয়ে বসেছিলো আর গিলিগানের খিদমদ্‌গার, ব্যক্তিগত বেয়ারা অনামা, ইতালিয়ান জলপাই-তেল মাখাচ্ছিলো তার সাংঘাতিক ওল্‌-এর মতো শরীরে।

পার্সেলে ডেইলী টেলিগ্রাফের বাণ্ডিল, আর্মি নেভি স্টোরস-এর প্রি-ক্রিসমাস্ ক্যাটাল্‌গ সব এসেছে আজ। কবে পার্সেল আসে সেই অপেক্ষায় হাঁ করে থাকে "হ্যারো-ইটনের" লালমুখো ছাত্ররা।

কাগজ মেলে বসে, গিলিগান্ গভীর মনোযোগের সঙ্গে "হোম"-এর খবর পড়ছিলো আর অনামা, সাহেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, প্রতি রোমকূপে রোমকূপে মালিশ করে করে পরতে পরতে তেল বসাচ্ছিল তার শরীরে।

একটু পরই অন্য বেয়ারারা কেরোসিনের টিনে গরম জল বয়ে নিয়ে এসে বাথ-টাবে ঢেলে দেবে। জল গরম হচ্ছে বাংলোর পিছনে বাবুর্চিখানার সামনের নিমগাছতলায়। একটি পেল্লায় কাঠের উনুনে।

ভাল করে চান করার পর বাথটাব থেকে বেরোলে, অনামা তাকে তোয়ালে দিয়ে মুছে জামাকাপড় পরিয়ে দেবে। তার পর সার সার ফুলের টব-বসানো চওড়া বারান্দায় সাদা-রঙা বেতের চেয়ারে বসে আজ বীয়ার খাবে গিলিগান ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ম্যাক-আর্থারের সঙ্গে।

ম্যাক-আর্থার স্কটস্‌ম্যান। কয়েক দিনের ছুটিতে জঙ্গল ছেড়ে এসেছে। গিলিগানরা জংলী সাহেবদের বলে "জাংগল-ওয়ালা।" যারা ব্যবসা করে বা বানিয়া, সেই সব সাহেবদেরও ছোট চোখে দেখে আর্মির এবং সিভিল সার্ভিস-এর সাহেবরা। ওদের ঠাট্টা করে বলে, "বক্সওয়ালা"।

কোলকাতার মিসেস উড, মেমসাহেবদের জন্যে জামা কাপড় বানিয়ে লোক মারফত পাঠাতেন সাহেবদের বাংলোতে বাংলোতে। লোকগুলো তাদের বাক্স বিছিয়ে বসত বারান্দায়। সেই থেকেই বানিয়াদের নাম হয়েছে "বক্স-ওয়ালা"।

গিলিগানের একজোড়া ঝুপড়ি নস্যিরঙা পুরুষ্টু গোঁফ ছিলো। ম্যাক-আর্থারের মুখময় রূপোলী-রঙা দাড়ি গোঁফ। জাংগল-ওয়ালারা হাজামৎদের সেবা থেকে বঞ্চিত ছিলো বলেই দাড়ি কামানো বা গোঁফ ছাঁটার বিলাসিতা বিশেষ থাকতো না। বাঘ, হরিণ, ভাল্লুক, বুনো মোষ আর বাইসনের চামড়াতে মোড়া থাকতো তাদের বাংলো। হাতীর দাঁত ও পাও

থাকতো। প্রত্যেক ফরেস্ট বাংলোর একটি ঘর তাদের জন্যে রিজার্ভ করা থাকতো তখনকার দিনে।

স্কটল্যান্ডের উৎসব "হ্যাগেস"। হ্যাগেস-এর সময়ে কার্ড পাঠাতো ম্যাক আর্থার সব সাহেবদের লেখা থাকতো "উ্য আর ইনভাইটেড্ টু সী দ্যা হ্যাগেস"। স্কটিশ-কিল্ট পরে ধুমসো সাহেবরা নাচানাচি করতো। বিলিতি ব্যান্ড বাজতো। তা দেখে এবং শুনে, আমাদের মত নেটিভরা ধন্য বোধ করতো নিজেদের। খিদমদগারীর মধ্যে, পরের পদসেবা ও পদলেহনের মধ্যে, পরম আত্মসম্মানজ্ঞানহীনতার মধ্যেও বেঁচে থাকার তালিম আমরা বহু বছর আগেই নিয়েছিলাম। শুধু তাইই নয়, এই আত্মাবমাননার মধ্যে আমরা চিরদিন এক পরম শ্লাঘাও বোধ করে এসেছি।

মাঝে মাঝেই বাংলোতে বড়া খানার আয়োজন হত। অনেক সাহেব-মেম আসতেন ঘোড়ায় চড়ে। তখন গাড়ি সবে এসেছে ভারতবর্ষে; তবে ঐরকম জংলী জায়গার সাহেবদের কাছে মোটর গাড়ি ছিলো না। মোটব চলার মত রাস্তাও তখনও বিশেষ হয়নি। হুইস্কি বইতো জলের মতো। তারপর ডিনার সার্ভড হলে তার সঙ্গে শেরী আর পোর্ট। ডিনারের পর লীডিং-লেডি অন্যান্য মেমসাহেবদের নিয়ে বসবার ঘরে এসে বসতেন। সাহেবরা খাবার ঘরে গুলতানি করতেন। তারপর সকলে বসবার ঘরে এলে যে সবচেয়ে বাঘা সাহেব তার মেমসাহেব বলতেন এবার আমরা উঠবো।

তাঁরা চলে গেলে তবেই অন্যরা যেতে পারতেন। প্রোটোকোল এইরকমই ছিলো।

তখনকার দিনে ঐ সব জংলী জায়গায় খুব কম মেমসাহেবই আসতেন। ব্যাচেলার সাহেবদের বাংলোর আউট-হাউসে একজন করে নেটিভ রক্ষিতা থাকতো। গিলিগানেরও ছিলো। অনামারই বউ সে। নাম কুজাতা। সেই আউট-হাউসকে বলা হত "বিবিখানা"।

সাহেব রাতে অনামার নিজেরই স্ত্রীকে সম্ভোগ করবে বলে ভাল করে সাহেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জলপাই—তেল লাগিয়েছিল অনামা। আলেকজান্ডার এমনি এমনি বলে যাননি: সত্যিই সেলুকাস। বিচিত্র এ দেশ।"

ঘুঘুডাকা, ছায়াঢাকা, পাতা-ফিসফিস দুপুরে অনামা তার বউ কুজাতার কাছে যেতো। বৌকে আদর করতে করতে শুধোতো তোকে কে বেশী আনন্দ দেয়? সাহেব, না আমি? সাহেব কী আমার থেকেও ভালো!

অনামার নির্লোম বুকে মাথা নামিয়ে হারামজাদী মাজরীর মত কুজাতা বলতো মিটিমিটি হেসে, দুজনে দুরকম। দুজন পুরুষ কখনও একরকম হয় নাকি? কুজাতা বলতো, সাহেবের গায়ে পচা টক-দইয়ের গন্ধ। আরও বলতো, নস্যিরঙা চুলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সাহেবের পুরুষাঙ্গটি দেখলেই তার নাকি বুনো-বেজীর কথা মনে হতো। মস্ত একটা বেজী।

অনামা বলতো, আর আমারটা?

তোরটা দিশী সাপ। বাদামী সাপ। ফণা নেই, ছোবল নেই। হেলে সাপ। এলেবেলে।

অনামা গর্বে আনন্দে সাহেবের বেজীর স্তুতিতে হি-হি করে দাঁত বের করে হেসে বলতো তাইই ত বেজীর হাতে মরলো সাপ এ জন্মে। বল্? সাপ কি পারে বেজীর সঙ্গে কখনও?

গিলিগানের ঔরসে কুজাতার গর্ভে যে ছেলেটি জন্মেছিল তার বয়স এখন বারো। তার রঙও সাহেবদেরই মতো। চুলও নস্যিরঙা। বড় হলে সেও হয়তো বেজী পুষবে একটা। যে বেজী খেলে বেড়াবে যুবতীদের পেলব কোমল উরুমূলের দূর্বাঘাসে।

গিলিগান সাহেবের দয়ার শরীর। ক্লাবে ছেলেটাকে একটা কাজও জুটিয়ে দিয়েছেন। অদ্ভুত কাজ। একমাত্র এদেশে এবং হয়ত আফ্রিকার কোনো কোনো জায়গায় এই চাকরিতে

বহাল হয় ছোঁড়ারা। ছোঁড়ার ডেজিগনেশান্ "পাক্কি তাড়াও চোক্‌রা।"

সাহেবরা যখন ক্লাবের লনে বসে গল্প করেন, পান করেন, খানদান ; তখন নানারকম পাখি এসে তাঁদের বিরক্ত করে। যদিও মস্ত মস্ত রঙীন সব গার্ডেন-আম্‌ব্রেলা পোঁতা থাকে। তবুও। ফিস্-ফ্রাই নিয়ে বেয়ারা আসছে, হঠাৎ কাকে-চিলে ছোঁ মেরে ফ্রাই হাওয়া করে দিলো। পড়ে রইলো শুধু আলু ভাজা।

এই ছোঁড়াদের কাজই ছিল পাখি-তাড়িয়ে বেড়ানো। লালরঙা শর্টস আর নীলরঙা শার্ট পরে হাতে ডাণ্ডা নিয়ে তারা তাদের বাপেদের রক্ষা করতো পাখি-জনিত বিরক্তি থেকে। তাই-ই নাম ছিল, "পাক্কি টাড়াও চোক্‌রা।"

ছোঁড়া মাইনে পেত পাঁচ টাকা। ছোঁড়া তার মা-বাপের হদিস জানতো না। জন্মের পরই অন্য বাগানের কুলি-লাইনে তাকে চালান করে দিয়েছিলো গিলিগান্। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, টাইফয়েড, কালাজ্বর, সাপ, বিছে—ওসব কিছুর হাত থেকেই যখন বেঁচে উঠলো ছোঁড়া, ভক্ত পেল্লাদের মত, তখন দয়াময় বে-বাপ তাকে ক্লাবে এই চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলো।

॥ ২ ॥

ক্লাবে এক বুড়ো বেয়ারা ছিলো। যারা অল্প বয়সেই আত্মসম্মান খোয়ায় জীবনে, তারা বুড়ো হলে বেজন্মা শেয়ালের মত হয়ে ওঠে। সেই বিহারী বুড়ো আর বাঙালী ক্যাশিয়ারবাবু মিলে পরামর্শ করে একদিন ছোঁড়াকে বলল : তোর বাপ কে ? তা তুই জানিস ?

"পাক্কি টাড়াও চোকরা" বলল, আমার বাপ পল্টনে আছে। যুদ্ধ করছে পেশোয়ারে। মাও গেছে বাপের সঙ্গে।

তোর মুণ্ডু। সে যুদ্ধ করছে, "বিবিখানায়"। তোর মায়েব সঙ্গে। অন্যরকম যুদ্ধ। ঐ দ্যাখ, তোর বাপ। ঐ যে গিলিগ্যান সাহেব।

গিলিগানের পাশে উইক-এন্ডে গল্ফ খেলতে-আসা পুলিশ সাহেব রবার্টসন বসেছিলেন। ছোঁড়ার মাথা গুলিয়ে গেল। কোনটা তার বাপ বুঝতে পারলো না। বুড়ো বেয়ারা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, গুঁফো গিলিগান্।

কথাটা শুনে ছোঁড়ার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু কি করবে বুঝতে পারলো না। ভাবতে লাগলো। ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লো সে রাতে। ভেবে কূল পেলো না।

শুধু পাখিই নয়। ক্লাবের এলাকার মধ্যে যা-কিছু ঢুকে পড়ে, সবই তাড়াতে হয় ছোকরাকে। ভুটান পাহাড় থেকে কখনও হাতীর দল নেমে আসে। বাঘ বা চিতার তাড়া খেয়ে দৌড়ে আসে বার্কিংডিয়ার। অথবা, মাদী শম্বর ; বাচ্চা নিয়ে। ছোকরা কাক তাড়ায়, চিল তাড়ায় ; ছাতারে তাড়ায়। সাপ তাড়ায়, বেজী তাড়ায় ; শুধু নিজের বে-বাপকে তাড়াতে পারে না। দৌড়ে বেড়ায় ছোঁড়া। তার লাল শর্টস আর নীল শার্টে রোদের মধ্যে তাকে একটা মস্ত রঙীন পাখি বলে মনে হয়। পাখির মত উড়ে বেড়ায় "পাক্কি টাড়াও চোক্‌রা।"

হ্যারো-ইটনে পড়া সাহেবরা যাকিছুই করে তার মধ্যে একটা ক্লাস থাকে। ক্লাব খুব পছন্দ করে তারা। রঙচঙে ছাতার নীচে বসে, ঝলমলে পোষাক পরে, হলুদে বুড়বুড়ি-ওঠা বীয়ার খেতে খেতে তাদের ঔরসের টুকরো-টাকরাদের রোদে ঝক্‌মক্ করতে দেখে খুব খুশী হয় তারা। "পাক্কি টাড়াও চোকরার" গতিস্মানতার মধ্যে এই হতভাগা দেশের অনেক দুঃখ গ্লানি এবং আত্মসম্মানজ্ঞানহীনতা প্রস্তরীভূত হয়ে থাকে। তাজমহলের এবং কোনারকের গর্বের

মতই পাক্কি টাডাও চোকরাদের অপমানের ও লজ্জার ইতিহাস পাশাপাশি লেখা থাকার কথা। যদি এই দেশে কখনও সৎ ও স্বাধীন ইতিহাস লেখা হয় ভবিষ্যতে। দেশের ইতিহাস।

এক সন্ধ্যায় গিলিগান বাংলোয় বারান্দায় বসে হুইস্কি-পানি খাচ্ছিলো। পায়ের কাছে শুয়ে-থাকা তার অ্যালসেসিয়ান কুকুর হঠাৎ ঘাউ-ঘাউ করে উঠলো। সাহেব চমকে চেয়ে দেখলেন বাঙালী ক্যাশিয়ারবাবু।

বাবু, হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সাহেবের পায়ে। কুকুরটার পায়েই এসে পড়লো তাঁর মাথাটা। কুকুরটা, মানুষটাকে সারমেয়রও অধম ভেবে লজ্জা পেলো। পা সরিয়ে নিলো।

কোঈ হ্যায় ?

সাহেব বললেন।

তারপরও বললেন, কোঈ হ্যায় ?

ডেক্কোটো কেয়া মাংতা বাবু ? হোয়াটস্ দ্যা ম্যাটার ?

বাবু, সাহেবের পা দু হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, ইওর লাইফ ইজ ইন ডেনজার স্যার। 'পাক্কি টাডাও চোকরা' সাহেবকে খুন করবে বলে মতলব করেছে।

গিলিগান্ অনামাকে শুনিয়ে, গলা তুলে বলল . কিন্তু কেন ? হোয়াই ?

বাবু বললো, তা জানি না সাহেব। কিন্তু জানি যে, খুন সে করবেই।

তার পাখি তাড়ানো ডাণ্ডার মধ্যে সরু ছুঁচোলো লোহার শিক ভবে নিয়ে একদিন সে আপনার বুকে ঢুকিয়ে বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে।

গিলিগান্ বললো, বাবু, ঊ্য ইণ্ডিয়ানস আর আনগ্রেটফুলস্।

বাবু ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বললেন সাহেবকে।

সাহেব সব খিদ্‌মদ্‌গার, বেয়ারাদেব চলে যেতে বললেন। এলাকা ফাঁকা হলে মীরজাফরের জাতের একজন মানুষ ফিস্‌ফিস্ করে অনেক কথা বললেন সাহেবের কানে।

গিলিগান্ রেগে আরও লাল হয়ে গেলেন। তক্ষুনি পুলিশের রবার্টসনের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন ঘোড়সওয়ার দিয়ে। ব্যাপারটা ত সোজা নয়। বাজাকে মাবার ষড়যন্ত্র, অর্থাৎ বিদ্রোহ। রিং-টাং-এর ইতিহাস থেকে ছোঁড়ার অস্তিত্ব, ছোঁড়ার নাম মুছে ফেলতে হবে। এক্ষুনি।

বাবু হাতজোড় করে দাঁড়িয়েই ছিলেন। কুকুরটাও বসল। কিন্তু বাবু দাঁড়িয়েই থাকলেন।

এবার গিলিগান্ একটু কাশলেন। বললেন, ন্যাউ টেল মী। হোয়াটস দা ডীল্। ডোন্ট টেল মী দ্যাট ঊ্য হ্যাভ কাম হিয়ার টু ওয়ার্ন মী উইদাউট এনি মোটিভ।

বাবু হাত কচ্‌লালেন। নাঃ। বাবুব বিশেষ বড় কিছু চাইবার ছিলো না। না, না, সেরকম বড় কিছুই নয়।

আসলে এ ঘটনা যে সময়ে ঘটেছিল, সেই সময়ের শিক্ষিত, স্বাধীন অধিকাংশ মানুষ : নিজেদের আজ যতখানি নীচে নামাতে পারেন, ততখানি নীচে নামিয়ে আনতে পারতেন না। ক্যাশিয়ারবাবুরা ত ছিলেনই। চিরদিনই ছিলেন। কিন্তু উঁচুতলার অধিকাংশ মানুষেরাই তখনও মানুষই ছিলেন। কুকুর কিংবা চড়ুই পাখি হয়ে ওঠে নি।

বাবু বললেন, হাত-কচ্‌লে , পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়াতে হবে। আর এক্সটেনশান চাই আরও দু' বছর।

সাহেব ক্লাবের অনারারী সেক্রেটারী। রিং-টাং-এ তার যে ক্ষমতা, তার সঙ্গে যে-কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার তুলনা করা চলে।

সাহেব এক মুহূর্ত কি ভাবলেন।

তারপর বললেন, ডান্।

॥ ৩ ॥

বাবু চলে গেলেন, গিলিগান্ হাঁক ছাড়লেন, বললেন, কোঈ হ্যায় ? এক বড়ড়া পেগ্। হুইস্কি এণ্ড পানি।

অনামা দৌড়ে গেল হুকুম তালিম করতে। তার বৌ তখন বিবিখানায় চান করে উঠে কহ্-খস্ আতর মাখছিলো সারা শরীরে ঘষে ঘষে। গিলিগান আতরের গন্ধ বড় ভালোবাসেন।

একটা ব্রেইন-ফিভার পাখি বাইরের অন্ধকারে চমকে চমকে ডাকছিলো। গিলিগান একবার বাইরের অন্ধকারে তাকালেন। এমন অন্ধকার, যেন মনে হয় মুখে থাপ্পড় মারছে। এমন অন্ধকারেই বাবুদের মুখ লুকোতে সুবিধে হয়।

তারপর হুইস্কির গ্লাস তুলে নিয়ে গিলিগান ভাবতে লাগলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ-রাজ তার নিজের জোরে টিঁকে নেই। কখনওই ছিলো না। এই ক্যাশিয়ার বাবুদের মত লোকগুলোই, যে ক্ষমতা তাদের নয়, সেই ক্ষমতা নির্লজ্জের মত, আত্মসম্মানজ্ঞানহীনতায় তুলে দিয়েছে শাসকদের হাতে। চাবুক হাতে করে এদের সামনে দাঁড়ালেই হলো। চাবুক মারা পর্যন্ত অপেক্ষা করার মত সময়েরও দরকার নেই এদের। হাওয়াতে সপাং-সপাং শব্দ শুনেই কেঁই-কেঁই করে কুকুরের মত পায়ে পড়ে এরা। এই মহান ভারতের মানুষ।

হুইস্কিতে একটা চুমুক দিয়ে নিরুচ্চারে গিলিগান বললেন "গড সেভ দ্যা কিং"।

॥ ৪ ॥

গিলিগান-এর এবং কুজাতার জারজ সন্তান লাল টুকটুকে ছেলেটা ক্লাবের প্যান্ট্রির মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো। ক্যাশিয়ারবাবুর সঙ্গে আসা চারজন ঘোড়সওয়ার পুলিশ ওকে পেটে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুললো। ক্লাবের ক্যাশবাক্স থেকে একশো টাকা চুরি গেছে। টাকাটা দেওয়ালে ঝোলানো ছোঁড়ার জামার পকেট থেকেই বেরুলো। হাতে-নাতে চোর ধরা পড়লো। এখনকার মতো তখনও আইন একটা প্রচণ্ড তামাশাই ছিল।

তখন অবশ্য দিনকাল, রীতি-নীতি অন্যরকম ছিলো। আজকের দিনের গিলিগান আর ক্যাশিয়ারবাবুরা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে এ ধরনের অনেক নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করেন। তখনকার দিনের ব্যাপার-স্যাপার বড় সোজাসুজি এবং ক্রুড ছিলো। ভণ্ডামি, কম ছিলো অনেক। অস্ত্রশস্ত্রও আজকালকার মত এত বিধ্বংসী ও কুটিল ছিলো না। ইনকাম-ট্যাক্স, কাস্টমস্, ফেরা অ্যাক্ট ইত্যাদি কত অস্ত্র আছে এখন দিশি স্বৈরাচারীদের হাতে। দিশি স্বৈরাচারী!

ছোঁড়াকে হাত-কড়া পরিয়ে ঘোড়ার পিঠে পিছমোড়া করে বেঁধে সদরে নিয়ে গেলো। ঘোড়সওয়ার পুলিশেরা।

ওরা চলে যেতেই, ক্যাশিয়ারবাবু একশো টাকার নোটটা বুড়ো বেয়ারাকে দিয়ে বললো,

তুমি পঞ্চাশ নিয়ে আমাকে পঞ্চাশ দিও।

চারদিন পর এস-পি রবার্টসন ছোঁড়াটাকে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলো। বললো, যাঃ, তোর ছুটি। রবার্টসনরা আর পুলিশের ইনফর্মার এবং দালালরা তখনও ছিলো। এখনও আছে। একই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে। বদলায়নি কিছুই।

কোমরে-বাঁধা হোলস্টার থেকে আস্তে করে ওয়েব্‌লি-স্কটের রিভলবারটা বের করে নির্ভুল নিশানায় "পাক্কি টাডাও চোকরার" হৃদয় যাতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তেমন করে একটি গুলি করলো পেছন থেকে রবার্টসন। ছোঁড়া এই দেশের সোঁদা-গন্ধ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। দমকে দমকে রক্ত বেরুতে থাকলো টুকটুকে মুখটি থেকে। কাৎরাতে কাৎরাতে ছোঁড়া বললো "আঃ, মা! আঃ, বাবা!

মরার সময় ওর মনে হলো যে, এই দেশটা শুধু গিলিগানের নয়, ক্যাশিয়ারবাবুর নয়; বুড়ো বেয়ারাটারও নয়; দেশটা তার, তার কুজাতা মায়ের, তার অনামা বাবার এবং কোটি কোটি মানুষের, যারা এখনও কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়ে আছে; সারমেয়র মত লেজ নাড়ছে। যতদিন ওরা গিলিগানদের মদত জোগাবে, ততদিন গিলিগানরাই মস্‌নদে বসে থাকবে। বংশপরম্পরায়।

পুলিশের ডায়ারীতে লেখা হলো, যেমন পরে বহুবার হয়েছে। ডায়রীতে লেখা হলো: "শট্, হোয়াইল ট্রায়িং টু এস্কেপ ফ্রম পোলিস্ কাস্টোডি।"

রিভলবারের আওয়াজে নির্জন জঙ্গলের মধ্যে শয়ে-শয়ে পাখি উল্লাসে কাকলিমুখর হয়ে উঠলো পাক্কি টাডাও চোক্‌রাটির মৃত্যুতে। যে পাখীদের সে তাড়িয়ে বেড়াতো, সেই ছোট্ট ছোট্ট পাখি, ছোট্ট ছোট্ট সুখের সব পাখিরা সবাই আনন্দে মাতলো।

রিভলবারটি হোল্‌স্টারে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে রবার্টসন নিরুচ্চারে বললো,: "গড সেভ দ্যা কিং।"

বুলির 'পা'

রাসবিহারী অ্যাভিন্যু আর ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে লাল আলোতে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিলো। জানালার পাশে বসে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়েছিলাম মোড়ের দিকে। হঠাৎই মনে হলো, যেন পারুলকে দেখলাম।

সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের আলোয় জানুয়ারির মাঝামাঝির ধোঁয়াশা আর ডিজেলের ধোঁয়াকেও সুন্দর দেখাচ্ছিলো। দেখলাম, শেয়াল-রঙা ছেঁড়া-র‍্যাপারখানি গায়ে জড়িয়ে পারুল হেঁটে যাচ্ছে প্রিয়া সিনেমার দিকে। ক্লান্তিতে ন্যুব্জ। রোগাও হয়ে গেছে অনেক। হাতে একটি লাঠি।

বুকটার মধ্যে এমন করে উঠলো যে, কী বলব ! লোকলাজ ভুলে চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে করলো পারুলের নাম ধরে। উত্তেজনায় সিট থেকে প্রায় উঠেই দাঁড়িয়েছিলাম। পরক্ষণেই আস্তে আস্তে বসে পড়লাম।

পারুলই তো...

অনেক কিছুই বলার ছিলো ওকে। কিন্তু যে-সব কথা তামাদি হয়ে গেছে সে-কথা আর বলা যায় না কাউকেই। ওকে আমার দেওয়ারও ছিলো অনেক কিছু। কিন্তু দেওয়ার সময়েরও একটি সময়সীমা থাকেই ; পাওয়ার সময়েরই মতো। সেই সময়ের মধ্যে দেওয়া বা পাওয়া না হলে এই এক জীবনে তা দেওয়া অথবা পাওয়া আর বোধহয় হয়ে ওঠে না।

আলো সবুজ হতেই গাড়ি এগোলো ড্রাইভার। যাকে পারুল বলে ভেবেছিলাম, তার কাছে চলে গিয়ে পাশ কাটিয়ে গাড়ি এগিয়ে গেলো। বুকের গভীর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস উঠে এসে বাইরের ধোঁয়াশায় মিশে গেলো।

মনে মনে বললাম, পারুলের জন্যে আর কিছুমাত্রই করতে এ-জীবনে পারবো না। তার অভিশাপ বাকি জীবন আমাকে বয়ে বেড়াতেই হবে। আমার চেয়েও বেশি হয়তো রিমাকে। পারুল কিন্তু কোনো দিনও মুখে কিছুই বলেনি আমাকে। তবু, মনে হয়।

বাড়ি ফিরে চান-টান করে খাওয়ার টেবিলে যখন খেতে বসলাম তখন খেতে খেতে আমি বললাম, আজ ঠিক পারুলের মতোই একজনকে যেন দেখলাম, জানিস বুলি !

পারুলদি ?

আমার কিশোরী মেয়ে বুলি খাওয়া থামিয়ে চমকে উঠলো।

বুলি, আমার একমাত্র মেয়ে, এখন ক্লাস সিক্স-এ পড়ে। একমাত্র ছেলে চুপুও খাওয়া থামালো। মুখে কেউই কিছুই বললো না।

রিমা বললো, খাওয়ার সময় পারুলের কথা না বললেই হতো না কি ? আজ জগু

কড়াইশুঁটির চপ্‌টা কেমন করেছে তা তো খেয়ে বলবে ? সারাটা দুপুরই ও এই নিয়ে মক্‌শো করেছে। পুর নিয়ে অনেকই এক্সপেরিমেন্ট। পুরটা বানানো আর ভাজাটাই আসল। পুরে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছে। জানো ?

বুলি বললো, যেমনই করুক জগুদা, আর যাই-ই দিক পারুলদির মতো কড়াইশুঁটির চপ্‌ কেউ করতে পারেনি আজ অবধি। আর পারবেও না।

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। খাওয়া বন্ধ করে। হাত থামিয়ে। একেই বোধহয় সভা-সমিতিতে বলে "মৃতের আত্মার প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থে দুই মিনিট নীরবতা পালন।"

কোনো মৃতকেই মানুষ চিরদিন মনে রাখে না। মহান মানুষেরা হয়তো তাঁদের কীর্তির মধ্যে বেঁচে থাকেন অনেক দিন। আর পারুল অথবা আমার মতো সাধারণ মানুষেরা বেঁচে থাকে কড়াইশুঁটির চপ্‌ অথবা প্রভিডেন্ট-ফান্ড-এর টাকাটার পুরোটাই দান হয়ে যাওয়ার পারিবারিক শোকের মধ্যে।

খাওয়া-দাওয়ার পর রিমা বললো, টিভি দেখবে ?

বুলি বললো, ওর অনেক পড়া। পড়বে।

বুলি চলে গেলো। চুপুও উঠলো। আমাদের বাড়ির চারটে বাড়ি পরেই নতুন মাল্টিস্টোরিড বাড়িতে স্নিগ্ধদের ফ্ল্যাটের ভি সি আর-এ মোৎজার্ট-এর জীবনীর উপরে যে ছবিটি সাড়া জাগিয়েছে তাই দেখতে যাবে ও। "অ্যামিডিয়াস" না কী যেন !

খাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে শোয়ার ঘরে এসে আমি জানালার পাশে চেয়ার টেনে বসলাম।

একসময় আমি ভাবতাম যে, একজন আধুনিক নগর-ভিত্তিক মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় লজ্জা হচ্ছে তার একঘেয়েমি। এই প্রাত্যহিক. মান্‌ডেন্‌ মিনিংলেস দিনগুলি-রাতগুলির গতানুগতিকতা তাদের প্রত্যেককেই সবসময় ক্লিষ্ট করে রাখে। কিন্তু পারুলের মতো কারোর কথা যেই মনে হয়, তখন মনে হয় যে ; তারা সকলেই, আমারই মতো নিশ্চয়ই বোঝে যে, মানুষের লজ্জাকরতম লজ্জাটি হচ্ছে তার অহংবোধ।

পারুল আজ থেকে পনেরো বছর আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিলো। তখন চুপু ছোট। বুলি হয়ইনি। চাকরিতে আমার এতো পদোন্নতিও হয়নি। পারুল এসেছিলো রাঁধুনি হিসেবে। তারপর নিজের গুণে ও আন্তরিকতায় কী করে যে সে হাউসকিপার, বেবি-সিটার, কেয়ারটেকার, আয়া, দারোয়ান, একই সঙ্গে সব কিছুই আস্তে আস্তে হয়ে উঠেছিলো তা আমরা লক্ষ পর্যন্ত করিনি।

পারুলের উপরে বাড়ি ছেড়ে আমরা কত জায়গায় বেড়াতে গেছি। বুলি যখন ছ'মাসের, তখন তাকে পারুলের জিম্মাতেই রেখে মধ্যপ্রদেশে বেড়াতে গেছিলাম একবার। বন্ধুবান্ধব সকলেই শুনে অবাক হয়ে গেছিলো। কিন্তু কী করব ! যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে এলে আর সেখানে ফেরা যায় না। কেউ ফিরিয়েও নেয় না। পারুলরাই অবলম্বন আমাদের। রিমারও তখন খুবই বেড়াবার শখ ছিলো। পারুল আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছিলো।

বুলি কথা বলতে শেখার পর পারুলকে প্রথমে ডাকতো 'পা' বলে।

পারুল হেসে বলতো, কোন 'পা'রে বুলি ? ডান, না বাঁ ?

আরও একটু কথা শেখার পর বুলি বলতো 'পারু'। পারুল হাসতো। বলতো আমাকে দেবদাসের পারু করে দিলে গো ! বুলি বড় হয়ে যাবার পর অবশ্য "পারুদি" বলেই

ডাকতো। পারুলদির সঙ্গে বুলির যে ধরনের সখ্য, মমত্ব ও স্নেহের সম্পর্ক ছিলো তা হয়তো তার মায়ের সঙ্গেও ছিলো না। পরবর্তী জীবনে তার কোনও প্রিয় সখীর সঙ্গেও বোধহয় হয়নি। ভূতের ভয় থেকে বয়ঃসন্ধির ভয়ের কথার সব কিছুই বোধহয় বুলি পারুর কাছেই শুনেছিলো। রিমার সময় ছিলো না।

পারুলের নিজের ছেলে ছিলো একটি। সে দশ বছর বয়সে নাকি কলেরাতে মারা যায়। অনেকই বছর আগে। পারুলদের বাড়ি ছিলো লক্ষ্মীকান্তপুর না ক্যানিং কোথায় যেন। 'দোকনো' ভাষায় কথা বলতো। পান খেতো বাড়িতে বানিয়ে। দোক্তা দিয়ে। প্রতি মাসেরই এক তারিখে দুটি ষণ্ডা-গুণ্ডা ছেলে আসতো পারুলের কাছে মাইনের টাকা নিতে। তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতো যতক্ষণ না টাকাটা হস্তগত করে। পারুলকে আমরা পুজোর সময়ে এবং পয়লা বৈশাখে নতুন শাড়ি-জামা ইত্যাদি ছাড়াও দু'মাসের মাইনে বোনাস হিসেবে দিতাম। এবং দিয়ে শ্লাঘা বোধ করতাম। টাকা যাই-ই পেতো ও, ওই ছেলে দুটিই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে যেতো। পারুল দশ বিশ টাকা রাখতো নিজের কাছে। হয়তো হাত-খরচা হিসেবেই। মাস-পয়লা ছাড়াও নানা দরকারে মাসের মধ্যে একাধিকবার ছেলে দুটি এসে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকতো "পিসি! অ পিসসি!"

রিমা বলতো, পারু, তোমার বুড়ো বয়সে কী হবে? সব টাকাই ওদের দিয়ে দাও কেন? একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দিই, তাতে রাখো।

পারুল হাসতো। বলতো, কী যে বল দিদি। ওরাই তো আমার সব। আপন ভাইপো। ওরাই দেখবে। আমার আর আছেটা কে? তারপর বুলি আর চুপুর দিকে চেয়ে বলতো, ওরাও দেখবে। কী? দেখবে না? ওরাই তো সবচেয়ে আপন আমার। আমার ভাইপোদের চেয়েও অনেক বেশি।

বুলি আর চুপু কিছু না বুঝেই বলতো, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই!

পারুলের দু'পায়েই আর্থারাইটিস্ ছিলো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডপ্রেসার অস্বাভাবিক রকম বেশি হয়ে গেলো। হাঁটতে লাগলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ভাইপোরা এসে প্রায়ই এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, ওটা করতে হবে বলে উপরি-টাকা নিয়ে যেতে লাগল। টাকা অবশ্য রিমাই দিতো। স্কুলের এবং কলেজের সময়ের মধ্যে রান্না করে উঠতে পারতো না পারুল প্রায়ই। অফিসেও আমাকে প্রায়ই না-খেয়েই যেতে হতো। রিমা এবং আমি ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলাম মানুষটার উপরে মাত্র দুটি মাসেই। অবলীলায় ভুলে গেলাম যে, দীর্ঘ পনেরো বছর সে আমাদের জন্যে কী করেছে আর করেনি।

একদিন রিমা রাতে আমাকে ডেকে বললো, বুঝলে, একটি অল্পবয়সী মেয়ে পেয়েছি। লাজুক প্রকৃতির, স্বভাবও ভালো। চুপু এখন বড় হচ্ছে তো। তাই কুৎসিত দেখতে বলেই ওকে রাখবো ঠিক করেছি। খালি বাড়িতে থাকবে। আগুন নিয়ে খেলা। আমি কোনো রিস্ক নিতে চাই না।

আমি বললাম, কী যে বলো! কিন্তু পারুল! পারুলকে কী করবে?

ওকে তিন মাসের মাইনে দিয়ে ছুটি দিয়ে দেবো। এ বাজারে তো আর কাউকে বসিয়ে খাওয়ানো যায় না। মানুষ নিজের মা-বাবাকেই আজকাল বসিয়ে খাওয়াতে পারে না, তার কাজের লোককে!

ওকে কে দেখবে?

কেন? ওর ভাইপোরা। তারাই তো ওর সব। তাছাড়া এতো বছর পারুলকে আমরা কম টাকা তো দিইনি। শুনেছি ওর গ্রামে না কোথায় পাকা বাড়িও করে নিয়েছে পারুল।

তাছাড়া সারা জীবন দেখবার দায়িত্ব গভর্নমেন্টই নেয় না তো আমরা নেবো কোত্থেকে।

আমি বললাম, একদিন আমরা গিয়ে দেখে এলেই তো পারি পারুলের বাড়ি সত্যিই আছে কি না ? ওর খোকা আর খোকনরা তো ওকে ঠকাতেও পারে !

তোমার মতো অত প্রেম আমার নেই। কালকে আমার অবস্থা যদি পারুলের মতো হয় আমার প্রিন্সিপালও কি আমাকে বিদেয় করে দেবেন না ? তিন মাসের মাইনেও দেবেন কি না সন্দেহ। সবাই তো আর তোমার মতো ভালো কোম্পানিতে চাকরি করে না। অত ভাবলে চলে না। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সকলকে যেতে হয়ই। তাছাড়া নতুন কাজের লোকটি কোথায় থাকবে ? কোয়ার্টার তো একটিই ! এ কি তোমাদের বাড়ি ? যে, প্রচুর ঘর। একতলার একটা ঘর পারুকে দিয়ে দেওয়া যেতো। আমাদের এই টু-বেডরুম মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাটে এক্সট্রা একজন মানুষেরও তো জায়গা নেই।

পারুল খুব কেঁদেছিলো। ওর কান্নার শব্দ কোনো দিনই কেউ শুনতে পেতো না। কিছু কিছু নারীর কান্না ওইরকমই হয় ; সমুদ্রপারের বৃষ্টির মতো।

তারপর একদিন—লাল গোলাপ আঁকা ওর ছোট্ট টিনের-তোরঙ্গটি নিয়ে বুলির থুতনি ছুঁয়ে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ করে হেলতে-দুলতে পারুল সত্যিই চলে গেছিলো।

আর্থারাইটিস-এর জন্যেই ও অমনি হেলেদুলে নইলে চলতে পারতো না। মোটাও হয়ে গেছিলো প্রচণ্ড।

বুলি কিন্তু ফিস্‌ফিস্ করে কাঁদেনি। ডাক ছেড়েই কেঁদেছিলো সেদিন। শিশুর কাছে ঘোড়েল এবং বিষয় ও স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কদের যুক্তি আদৌ গ্রহণীয় হয়নি। যখন তখন পথে-ঘাটে পড়ে পারুল মারা যেতে পারে একথা জেনেও তাকে কেন যে এমন করে ছাড়িয়ে দিলাম এ নিয়ে ছোট্ট বুলি তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়াও করেছিলো খুবই।

খাবার টেবলে বসে বুলির দিকে চেয়ে আমি ভাবছিলাম যে, এক দিন বুলিও অবলীলায় রিমা হয়ে উঠবে। আমাদের সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, আমাদের বিবেককে, শুভবুদ্ধিকে নিজ স্বার্থের কাছে নীরবে এবং নেপথ্যে বলি দেওয়াবে। পাতি-বুর্জোয়াদের ভিড়ের মধ্যে সামিল হয়ে যাবে বুলি।

সে রাতে পথে পারুলকে দেখার মাস দুয়েক পরে আমার বন্ধু সীতেশ ফোন করে বললো যে, পারুল নাকি লাঠি-ঠক্‌ঠকিয়ে ওর বাড়ি গেছিলো কিছু সাহায্যের জন্যে। পাশের বাড়ির কাজের লোক মতি পারুলের গ্রাম চিনতো। তাকে দিয়ে এক রবিবার খবর নিতে পাঠালাম। সে এসে বললো, পারুলকে তার ভাইপোরা তাড়িয়ে দিয়েছে। পারুলের পনেরো বছরের রোজগারের প্রতিটি টাকাতে তারা ধান-জমি, বাড়ি, গরু, সবই করে নিয়েছে। তাদের বউদের সঙ্গে পারুলের বনেনি বলে তারা ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে পিসিকে। পারুল এখন নাকি লেক-এর কাছে সাদার্ন অ্যাভিন্যুর ফুটপাথের এক গাড়ি-বারান্দার নিচে রাত কাটায় এবং সারা দিন নাকি পথে পথে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায়।

কথাটা শুনে বড়ো ভয় হলো। না, পারুলের জন্যে নয় ; বন্ধু ও পরিচিতরা আমাদের সম্বন্ধে কী আলোচনা করবে তা ভেবে।

পর দিনই অফিস থেকে ফেরার পথে ড্রাইভারকে বললাম, সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে যেতে। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দেখি, দুটি ইঁটের উপরে বসানো একটি পোড়া কালো মাটির হাঁড়িতে শুধু ভাত সেদ্ধ করছে পারুল। দেখলে ওকে চেনা যায় না। মনে হয়, যেন জন্মানোর পর থেকেই ও ভিক্ষা করছে। ভিখিরিদের বুঝি অতীত থাকে না কোনো।

পারুলকে বাড়িতে দেখা করতে বলে এলাম পর দিন সকালে। গাড়ি থেকে নেমে

ভিখিরির সঙ্গে কথা বলা যায় না। কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে। কী মনে করবে আমাকে! পারুল বললো, অত দূর যে যেতে পারবোনি দাদাবাবু! লাঠি নিয়েও চলতে পায়ে বড়োই লাগে। তা শুনে, ওকে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, রিক্শা করেই এসো।

পর দিন রিক্শা করে কিন্তু এলো না পারুল। হেঁটেই এলো। টাকাটা বাঁচিয়েছে। ভিখিরি হয়ে গেলে মানুষ মিথ্যেবাদীও হয়ে যায় বোধহয়। দশটা টাকা অনেকের কাছে অনেকই টাকা। ছেঁড়া, দুর্গন্ধ; নোংরা শাড়ি। পা-ময় গা-ময় ধুলো। রিমা তো ওকে ঝকঝকে বসার ঘরে ঢুকতে পর্যন্ত দিলো না। বাইরের বারান্দাতেই বসিয়ে রাখলো। বললো, কত রোগের জার্মস যে ওর পায়ে থিক্থিক্ করছে, কে জানে!

আমি পারুলকে বললাম, তোমার কী ক্ষতি করেছি আমরা যে তুমি আমার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা চাও? এতে কি অসম্মান করা হয় না আমাদের?

পারুল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো আমার মুখের দিকে চেয়ে।

তারপর বললো, সম্মান-অসম্মানের কথা তো ভাবিনি দাদাবাবু। খিদে বড়ো ভীষণ জিনিস। কী করে বোঝাবো আপনাদের!

রিমা বললো, ছিঃ ছিঃ। তুমি এতো নীচ!

পারুল চুপ করে রইলো। ওর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামলো। আবারও ফিস্ফিসে বৃষ্টি নামলো সমুদ্রপারে।

রিমার অলক্ষ্যে গাড়িতেই ওকে তুলে নিয়ে আমাদের ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ানের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে প্রেসক্রিপশান লেখালাম। উনি ওর হিসট্রি জানতেন। নানা রোগ এসে বাসা বেঁধেছে পারুলের মধ্যে। বয়সও হয়েছে ষাটের বেশি। দু'মাসের মতো ওষুধ কিনে দিলাম ওকে। তারপর একশো টাকা দিয়ে বললাম, পারুল, তোমাকে প্রতি মাসে আমি পঞ্চাশ টাকা করে দেবো। প্রতি মাসের তিন তারিখে এসে নিয়ে যেও। অথবা তুমি রাতে যে গাড়ি-বারান্দার নিচে থাকো সেখানেই কাউকে দিয়ে পৌঁছে দেবো।

দাদাবাবু, আপনি বড়ো দয়ালু!

সেই বাক্যটি এবং পারুলের রোগ-পাণ্ডুর জলভরা চোখ দুটি প্রায়ই কানে এবং চোখে ফিরে ফিরে আসে আমার।

এই বন্দোবস্ত চললো দু মাস। তারপরই এক দিন রিমা বাড়ি ফিরেই তুলকালাম কাণ্ড বাধালো। ওর খুড়তুতো দাদা প্রদীপের বাড়িতে গিয়েও নাকি পারুল ভিক্ষে চেয়েছে কাল সকালে। প্রদীপের স্ত্রীকে রিমা একেবারেই দেখতে পারে না। রিমার ধারণা, বড়লোকের মেয়ে বলে দেমাকে পা পড়ে না মাটিতে। আপস্টার্ট। অশিক্ষিত। সে কলকাতার সকলকে বলে বেড়াচ্ছে যে, "অ্যাই তো! দ্যাখো! কী শিক্ষিত বড়লোকই না রিমারা! যে-মানুষটা এতো কিছু করলো এতো দিন ধরে তার আজ এই দশা! সম্মানেও কি লাগে না? কেমন ছোটো মানুষ বলো তো!"

আমার মাসতুতো দাদার বাড়ি সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে। সেও বললো এক দিন যে, পারুল লাঠি-ঠক্ঠকিয়ে ভিক্ষা চাইতে গেছিলো তার কাছেও। পারুল নাকি বলেছিলো, দাদাবাবু-দিদি খুবই দয়ালু। আমাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেন। বলেছেন দেবেন যত দিন বাঁচি। কে দেয় বলুন? কিন্তু পঞ্চাশ টাকাতে তো খাওয়া এবং ওষুধ চলে না। এমনকি ফুটপাথে থেকেও চলে না। তারপর জাতে মেয়ে তো! শরীর ঢাকতেও তো এক বিরাট খরচ!

মাসতুতো দাদার কাছে শুনে, আমারও বড়োই রাগ হলো। আমার পরিচিত কারো কাছে

না যেতে বলা সত্ত্বেও পারুল তবু গেছে ভিক্ষা করতে আবারও !

পরের মাসে টাকা নিতে এলো না কিন্তু পারুল। আমিও ড্রাইভারকে দিয়ে সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে টাকা পাঠালাম না। রাগ করেই। সত্যিই বড়ো অপমানিত বোধ করেছিলাম।

চুপুর এক বন্ধু চুপুকে স্কুলে বললো, কেওড়াতলার কাছে নাকি দেখেছে পারুলকে আগের দিন। ফুটপাথে ভিক্ষা চাইতে।

রিমা রেগে গিয়ে বললো, ভালোই তো। লাস্ট ডেস্টিনেশনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

চুপু আর বুলি বললো, ওরা গিয়ে পারুলদিকে নিয়ে আসবে।

ছেলেমেয়েকে রিমা বললো, নিজেরা রোজগার করো, পায়ে দাঁড়াও ; তারপর আদিখ্যেতা কোরো।

ওরা চুপ করে যে যার ঘরে চলে গেলো।

তার দিন দশেক বাদে পারুলের ভাইপো দুজন সন্ধেবেলা এসে বললো, পিসি মরে গেছে বাবু। খবর পেয়েই আমরা এয়েচি। সৎকারের খরচ দিন।

কখন ?

আমি অপরাধীর গলায় বললাম।

আজ ভোর রাতে। শীতটা খুব জোর পড়েছে তো ! বহু বুড়ো-বুড়িই টেঁসেছে আজ।

কোথায় ঘটলো ঘটনাটা ?

সে খুব ভেবেচিন্তেই মরেছে আমাদের পিস্‌সি। এক্কেবারে কেওড়াতলার শ্মশানের সামনেই। ফুটপাতে।

ওদের থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছিলো আমার। অনেক দিন পর মারামারি করতে ইচ্ছে করছিলো। সত্যিই।

টাকা দিয়ে ওদের বিদেয় করে দিলাম। তখন বুলি ও চুপুও বাড়ি ছিলো না। থাকলে, হয়তো শেষ-দেখা দেখতে চাইতো।

আমি যেতে পারতাম শ্মশানে। কিন্তু আমার মতো একজন মানুষের এক ভিখারিনীর দেহ সৎকারের জন্যে কেওড়াতলায় যাওয়াটা এই সমাজের মনঃপূত নয়। তাছাড়া, গেলেই নানা চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হতো, এ-পার্টিতে সে-পার্টিতে দেখা-হওয়া মানুষ। নানা কৈফিয়ত দিতে হতো নানাজনকে। না, না। তা হয় না।

বুলি-চুপুরা এখনও ছেলেমানুষ। এখনও ওরা জানে না যে, শেষ দেখা কখনওই দেখতে নেই, যদি তেমন শেষ-দেখা না হয়। সবাইকেই সুন্দরতম দিনে, সুন্দরতম সাজে দেখে রাখতে হয়। সেইটুকুই শুধু থাকে স্মৃতিতে।

পর দিন রবিবার ছিলো। ব্রেকফাস্ট-টেবলে ছেলে-মেয়েকে রিমা হঠাৎ বললো, অ্যাই। জানিস তো, পারুল মরে গেছে।

পারুলদি ? কবে ?

বলেই, বুলি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

বুলিটা আমার এখনও ঈশ্বরী।

চুপুও খাওয়া থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

রিমা আমাকে বললো, তোমাকে আরেকটা আলু-পরোটা দিই ?

উত্তর দিলাম না কোনো। শুধু ঘাড় নাড়িয়ে জানালাম, না।

আজকালকার সব মেয়েরাই কি রিমারই মতো ? অবুঝ, নিজসুখমগ্ন ; হৃদয়হীন ?

ভাবছিলাম, কেনই যে পারুল এমনভাবে ফুটপাথে না-খেয়ে মারা গেলো, এই মহৎ

জনগণতান্ত্রিক সোনার সংবিধানের দেশে কে বা কারা যে তাকে অলক্ষ্যে খুন করে গেলো, সেই রহস্য অথবা আমার এবং রিমার অসহায়তা বা অপারগতা যে ঠিক কতখানি তা আমার শোকস্তব্ধ অপাপবিদ্ধ অনাবিল ছেলেমেয়েকে বুঝিয়ে বলা যাবে না। এখন বলা গেলেও, ওরা বুঝতে পারবে না। বলা যাবে না কোনো দিনও, যদি-না তারা নিজেরাই বড় হয়ে ওঠার পর আমাদের দুজনকে, আমাদের পারিপার্শ্বিককে এবং আমাদের সমাজ ও দেশের প্রকৃত স্বরূপকে সত্যিই আবিষ্কার করতে চায়। কিন্তু তেমন ভালো কি আমার ও রিমার মতো নষ্ট-ভ্রষ্ট দম্পতির ছেলেমেয়েরা কখনওই হবে ? ওরা কি আমাদের চেয়েও বেশি আত্মতুষ্ট, আত্মমগ্ন, নিজসুখপরায়ণ হবে না ?

আমাদের সাততলার ছোট্ট, স্বয়ংসম্পূর্ণ সুখ-ভরপুর ফ্ল্যাটের ড্রয়িং-কাম ডাইনিং-রুমে তখন উত্তরের জানালা দিয়ে হাওয়া আসছিলো। সে হাওয়ায় কোনো ফুলের গন্ধ ছিলো না।

বারুদের গন্ধ তো নয়ই ! অথচ, থাকা উচিত ছিলো।

চুনাওট এবং ইতোয়ারিন

ইতোয়ারিন্‌কে দূর থেকে দেখতে পেয়েই খুব জোরে দৌড়ে যাচ্ছিলো উদ্বিগ্ন মুঙ্গলি। তার মোটা সস্তা নোংরা লাল শাড়িটা ফুলে ফুলে উঠছিলো জোলো হাওয়ায়।

কালো মেঘে আকাশ আদিগন্ত ঢেকে ছিলো। জুগগি পাহাড়ের ওপার থেকে বৃষ্টি-ভেজা হাওয়া ছুটে আসছিলো দমকে দমকে দূরাগত বৃষ্টির ছাঁট বয়ে। এক ঝাঁক সাদা বক দূরের হোন্দা বাঁধের জলা থেকে উড়ে আসছিলো সাদা কুন্দ ফুলের মালারই মতো দুলতে দুলতে।

এখানেও বৃষ্টি আসছে। মোরব্বা ক্ষেতের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে পাটকিলে-রঙা একটা ধাড়ি খরগোশ দ্রুত দৌড়ে গেলো মুঙ্গলির পায়ে পায়ে। ভিজে হাওয়ায়, নিমের ফুলের গন্ধ ভাসছে। একটা মস্ত গহুমন সাপ ধীরে ধীরে ঢুকে গেলো উই-ঢিবির পাশের ইঁদুরের গর্তে। একবার নাক তুলে গন্ধ নিলো ষোড়শী মুঙ্গলি জোলো হাওয়ায়। নিমফলের, খরগোশের এবং সাপের।

সুরাতিয়া দিদিদের ক্ষেতের বেড়ার এ-পাশের কদমবনে কদমফুল ভরে রয়েছে। তার গন্ধও ছিলো হাওয়াতে। নানা রকম মিশ্র গন্ধ। ঝিম্ ধরে আসে তাতে।

একদিন ঐ কদমবনের নিচে মুঙ্গলি কাড়ুয়া চাচার ব্যাটা পুনোয়ার সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ খেলেছিলো গত বছরের আগের বছর। হঠাৎই মনে পড়ে গেলো ওর। এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতে গিয়ে পুনোয়া পড়ে যাচ্ছিলো বার বার। আর মুঙ্গলির কী হাসি!

সেই পুনোয়া গত বছর এমনই এক বর্ষার দিনে জুগগি পাহাড়ে মূল কুড়োতে গিয়ে গহুমন সাপের কামড়ে মারা গেছিলো। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়েছিলো। নীল হয়ে গেছিলো সারা শরীর। মনে পড়তেই, মনটা খারাপ হয়ে গেল মুঙ্গলির। ওদের জীবন এবং মরণ এমনই! কোনো জোয়ার-ভাঁটা নেই। মানুষ-মানুষীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আছে শুধু। একচল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে অথচ দেশের অধিকাংশ মানুষই এই মুঙ্গলিদের মানুষের-মর্যাদা দিলো না।

অনেকদিন আসে না মুঙ্গলি এদিকটাতে। এই অবাধ্য অসভ্য ইতোয়ারিনটাই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে এলো ভুল করে, ভুল পথে; আজ এই ভেজা দুপুরে। এদিকে এলেই পুনোয়ার কথা মনে পড়ে যায়। আর মন খারাপ করে।

পিচের রাস্তা ধরে নিপাসিরা থেকে খুব জোরে পর পর তিন-চারটে ট্রাক ও একটা বাস সারি বেঁধে দৌড়ে আসছিলো। ইতোয়ারিন তো কিছুই বোঝে না। বুদ্ধু একটা। যদি চাপা

পড়ে মরে ! সেই ভয়েই দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছে মুঙ্গলি। তার আঁচল এই দৌড়ে সরে যাওয়াতে তার নবীন পেলব মসৃণ স্তন দুটির বৃন্তে ভিজে হাওয়া সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু শাড়ি সামলাবার সময়ও আর নেই। ট্রাকগুলো আর বাসটা এসে পড়লো বলে ! ইতোয়ারিনও উদোম টাঁড়টা পেরিয়ে গিয়ে প্রায় পিচ রাস্তায় ওঠার মুখে। সর্বনাশ হবে এখুনি।

প্রথম ট্রাকটার নিচে প্রায় পড়ে পড়ে ইতোয়ারিন, ঠিক এমনই সময়ে রাস্তার পাশের চাপ-চাপ নরম সবুজ ঘাসের ঢাল-এর মধ্যে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েই মুঙ্গলি জাপটে ধরলো ইতোয়ারিনকে। তারপর দুজনে মিলে জড়ামড়ি করে গড়াতে গড়াতে ঢাল গড়িয়ে নেমে এলো উদোম টাঁড়ে। হাঁটু গেড়ে বসে ইতোয়ারিনকে তার দু-উরুর মধ্যে চেপে ধরে দু'হাতে ওর দু'কান ধরে আচ্ছা করে মুলে দিয়ে বললো, "ট্রাকোয়াকা নিচে যা কর আাইসেহি এক রোজ মরেগী তু !"

ইতোয়ারিন ঘুচুক-ঘুচুক, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে আওয়াজ করলো মুঙ্গলির কথার জবাবে। সোহাগ জানালো। মাদী শুয়োরের সোহাগের রকমই আলাদা।

বেলুনের মতো পটাং করে ফেটে যাবি একদিন তা বলে দিলাম।

আবার স্বগতোক্তি করলো মুঙ্গলি। রাগের ও অনুযোগের গলায়।

কোনো উত্তর না দিয়ে ইতোয়ারিন ওর হেঁড়ে মাথাটা মুঙ্গলির উরুতে শুধু একবার ঘষে দিলো আদরে।

মুঙ্গলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চল্ হঠ্।

বলে, বস্তির দিকে রওয়ানা হলো। ইতোরিয়ান্ চলতে লাগলো ওর পায়ে পায়ে। বড় রাস্তা থেকে একটু ডান দিকেই লালমাটির কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তা বেয়ে কিছুটা গেলেই ভাঙ্গী বস্তী। মানে, ধাঙ্গরদের বস্তী। বস্তীর লাগোয়া একটি তালাও। বর্ষার জল পেয়ে তিন ধার থেকে লালমাটি ধুয়ে এসে পড়েছে সেই তালাওতে। বছরের এই সময়টাতে যেই চান করুক সেখানে, মানুষ অথবা শুয়োর ; তার গায়ের রঙ লাল হয়ে যায়। এই তালাওটিই ভাঙ্গী বস্তীর প্রাণ।

তালাওর তিনপাশে জলের উপরে ঝুঁকে পড়েছে ঝাঁটি জঙ্গল এবং পুটুসের ঝাড়। কটুগন্ধ গাঢ় কমলা-রঙা ফুল এসেছে পুটুসের ঝাড়ে ঝাড়ে। পাড়টা উঠে গেছে তিনদিকে উঁচু হয়ে। তারপর জুগ্‌গি পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে মিশেছে সেই চড়াই।

এক সময়ে ঘন শালের বন ছিলো এই চড়াইয়েই। সে বন গিয়ে মিশে গেছিলো জুগ্‌গি পাহাড়ের বনের সঙ্গে। ওঁরাও মুণ্ডারা তখনকার দিনে জেঠ-শিকারের পরবে ভালুক কুটরা অথবা হরিণ শিকার করতো। কখনও কখনও শিয়াল, সাপ অথবা খরগোসও। মুঙ্গলি তখন শিশু ছিলো। তবু স্পষ্ট মনে আছে।

জঙ্গল এখন আর নেই। কেটে সব সাফ করে দিয়েছে ঠিকাদারেরা। ভাঙ্গী বস্তীর কাছের দুই বস্তীর লোকেরাও, বাড়ি বানাবার জন্যে। জ্বালানী কাঠের জন্যে। মুঙ্গলিরা নিজেরাও কেটেছে কিছু। এখন কিছু বুনো পলাশ, যাদের প্রাণশক্তি আর বাড় এই ভাঙ্গী বস্তীর শুয়োদেরই মতো ; ঝাঁটি জঙ্গল এবং পুটুসই শুধু আছে।

দু-একটি খরগোস, বুনো শুয়োর এবং কিছু বটের তিতির ওরই মধ্যে ইতিউতি ঘোরাঘুরি করে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে, অথবা বৃষ্টির ঠিক পরে এক আশ্চর্য নরম হলুদ আলোয় বন-প্রান্তর ভরে যায় এবং সূর্য, পাহাড়ের ওপাশে ডুবে যাওয়ার ক্ষণটিতে, মাথা তুলে, গলার শির-ঝুলিয়ে বার বার ডেকে তারা জানান দেয় যে, তারা এখনও আছে।

বড় রাস্তাটা পিচের। মাঝে মাঝেই গড়্হির অথবা নিপাসিরার দিকে মার্সিডিস ট্রাক এবং সার্ভিসের বাস চলে যায় জেঠ-শিকারীর তীর-খাওয়া বড়কা দাঁতাল-শুয়োরের মতো প্রচণ্ড জোরে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে করতে।

রাস্তাটা ব্রিটিশদের আমলে বানানো। তখন অবশ্য পিচ ছিল না। লাল মাটির রাস্তাই ছিলো। কিন্তু পোক্ত ছিল। বর্ষায় ভাঙতো না। চুরি হতো না তখন সরকারী কাজে। মুঙ্গলি শুনেছিলো তার নানার কাছে।

রাস্তাটার দু'পাশে বড় বড় অনেক প্রাচীন গাছ ছিলো। মেহগনি, শিশু, নানারকম কেসিয়া। কিছু জ্যাকারাণ্ডাও। সাহেবরাই লাগিয়ে গেছিলো।

শুধু আশে-পাশের বনের পাহাড়ের গাছ কেটেই মানুষের ক্ষিদে মেটেনি। এখন পথপাশের বড় বড় গাছগুলোর গা থেকে পুরু ছালও তারা তুলে নিচ্ছে। তাই দিয়েই ফুলবাগ শহর আর গড়হির আর নিপাসিরা বাজারের হালুইকরেরা উনুন ধরায়। মানুষের মতো আগ্রাসী ক্ষিদে খুব কম জানোয়ারেরই আছে। শুয়োরের ক্ষিদেও হার মানে এই ক্ষিদের কাছে।

কোনোরকম বাছবিচার না করে শুয়োরগুলো সব কিছুই খায়। মানুষের ময়লা থেকে, যা কিছুই মাটি কুড়িয়ে পায়। আর ওদের অন্য কাজ বংশ বৃদ্ধি করা। রাক্ষসের মতো সর্বক্ষণ খাওয়া আর রমণ করাই হলো শুয়োরদের একমাত্র কাজ।

বড় রাস্তার বাঁদিকে মুসলমানদের মস্ত বস্তী কাছে একটি। মাইল খানেক দূরে। ডানদিকেও আরেকটি আছে। গিরিয়া পাহাড়ের নিচে।

ভাঙ্গী বস্তী থেকে পিচ রাস্তায় উঠলেই কয়েকটি দোকান। একটি পুরোনো পিপ্পল্ গাছের নিচে দোকানগুলো গজিয়ে উঠেছে। একটি মুদিখানা, পানবিড়ির দোকান ; একটি চায়ের দোকান। তার সামনে শালকাঠের তক্তা দিয়ে খুঁটি পুঁতে বেঞ্চিমতো বানানো। বৃষ্টিতে, রোদে, ফেটে-ফুটে গেছে। তার উপরে চা খেতে খেতে আড্ডা মারে ভাঙ্গী বস্তীর মানুষে এবং ঐ দুই বস্তীর মানুষেও।

ঐ দোকানগুলোরই উল্টোদিকে টাঁড়ের মধ্যে দিয়ে লালমাটির পায়ে-চলা পথ চলে গেছে এঁকে বেঁকে দূরে। সেখানে কাহারদের বস্তী আছে। এই পিপ্পল্ গাছের উল্টোদিকে কাহার বস্তীতে যাবার পথেই শুক্কুরবারে শুক্কুবারে হাট বসে। হাটের নাম জুগগি হাট। শুঁড়িখানা আছে। হাটের দিনে ঢালাও মহুয়া খায় মুঙ্গলিদের বস্তীর সকলে শালপাতার দোনায়। সারা সপ্তাহের রোজগার ওখানেই চলে যায়।

আগে হাট বসতো রবিবারে রবিবারে। তবে শুক্কুরবার "জুম্মা বার" বলে এবং এই এলাকা মুসলমান-প্রধান বলে গরিষ্ঠদের সুবিধার জন্যে রবিবারের বদলে আজকাল শুক্কুরবারেই হাট বসে। পঞ্চায়েত তাই ঠিক করে দিয়েছে।

ভাঙ্গী বস্তির ভগলু আর ফুলবাগের দিকের মুসলমান বস্তীর গিয়াসুদ্দিনের বয়স হয়েছে প্রায় সত্তরের মতো। দুজনেই ব্রিটিশের হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লড়াই করেছিলো। গিয়াসুদ্দিন লড়াই করেছিলো বার্মাতে আর ভগলু মধ্যপ্রাচ্যে। যদিও তারা আলাদা আলাদা রেজিমেন্টে ছিলো কিন্তু এখন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হয়ে গেছে। যুদ্ধে যখন যোগ দেয় তখন দুজনেই কিছুদিন একসঙ্গে ছিলো রাণীক্ষেত ক্যান্টনমেন্টে। শিকারের দোস্তী, যুদ্ধের দোস্তী, একবার হলে ; জীবনভর তা অটুটই থাকে।

চায়ের দোকানের আড্ডাতে বীরহানগরের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারও সাইকেল নিয়ে আসে। থাকে বীরহানগরেই। ফুলবাগের পথে। এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল পথ। বয়স

হবে মাসটারের কুড়ি-একুশ। সবে বি· এ· পাশ করেছে। অনেক খববাখবর রাখে সে। চেহারাটিও ভারী সুন্দর। জাতে সে ভূমিহার। কিন্তু তার স্বভাবের জন্যে এ অঞ্চলের মুসলমান, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, চামার, ভোগতা, কোল্‌হো, ওঁরাও, মুণ্ডা সকলেই ভালোবাসে তাকে। মুঙ্গলিও ভালোবাসে। মাস্টারকে দেখলেই মুঙ্গলির বুকটা ধ্বকধ্বক করে ওঠে। সারা শরীরে একটা অনামা ব্যাখ্যাহীন ঝিকিঝিকি ওঠে। এমনটি অন্য কাউকে দেখলেই হয় না। তেমন ঝিকিঝিকির কথা শুধু মুঙ্গলির বয়সী মেয়েরাই জানে।

সেদিন বিকেলবেলা বীরহানগরের নবীন মাস্টার, নাম ওর সরজু, প্রবীণ ভগলু আর গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে বসে চায়ের দোকানের সামনে আড্ডা মারছিলো। দুপুরে খুব বৃষ্টি হয়ে যাবার পর এখন আকাশ পরিষ্কার। সন্ধ্যে হতে দেরী আছে এখনও ঘন্টাখানেক। মাস্টার নবীন বলেই এমন অনেক কিছুর খোঁজ রাখে, যা প্রবীণেরা আদৌ জানে না। আবার ঐ দুই প্রবীণ তাদের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে এতো কিছুই জমিয়ে রেখেছে, যে নবীন মাস্টার হাঁ করে তাদের কথা শোনে। যৌবনের বিকল্প বার্ধক্য নয়। বার্ধক্যের বিকল্পও নয় যৌবন। যাদের শেখার ইচ্ছা ও মন আছে তারা একে অন্যের কাছে অনেকই শিখতে পারে।

সকলেই এক ভাঁড় করে চা খাবার পর ভগলু বুড়ো গিয়াসুদ্দিন বুড়োকে বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে, "বোলো ইয়ার।"

॥ দুই ॥

ইতোয়ারিন মুঙ্গলির বড় আদরের মাদী শুয়োর। রবিবারে জন্মেছিলো তাই তার নাম দিয়েছিলো মুঙ্গলি, ইতোয়ারিন্। ইতোয়ারিনের চার ভাই-বোন ছিলো। তারা সবাই বিক্রি হয়ে গেছে জুগগির হাটে। এইবার পাল খাওয়াবে মুঙ্গলি ইতোয়ারিনকে। এক পাল বাচ্চা সম্পত্তি বাড়বে মুঙ্গলির। বাচ্চাগুলোকে বেচে দেবে জুগগির হাটিয়াতে কিন্তু মুঙ্গলিকে বেচবে না।

মুঙ্গলি রোজ দিনশেষের আবছা অন্ধকারে, নিজে যখন তালাওতে চান করতে নামে, তখন ইতোয়ারিনকেও চান করায় নিজে হাতে। জলে নেমেই আশ্চর্য কায়দাতে সাঁতার কেটে তালাওর গভীরে চলে যায় ইতোয়ারিন। মুঙ্গলিও সাঁতরে গিয়ে তার পিঠে চড়ে। দুই অরমিতা কুমারীর এই এক খেলা। একজন নারী। একজন শুয়োরী। শুয়োরী হলেও ইতোয়ারিন্‌কে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে মুঙ্গলি। পোষা পাখির মতো। তারপর রাতে কাঁচামাটির সোঁদা-গন্ধ ঘরে ইতোয়ারিন্‌কে কোলবালিশ করে মুঙ্গলি শুয়ে থাকে। মুঙ্গলির বাবা ঝড়ু ওকে বকে খুব। কিন্তু শেষমেষ থেমে যায়। মা-মরা মেয়ে। তাছাড়া মুঙ্গলিও বা আর কতদিন থাকবে ঝড়ুর কাছে? মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। আগেকার দিন হলে তো আট-ন' বছরেই বিয়ে হতো তারপর গওনা হলে শ্বশুরবাড়ি যেতো। দিন পাল্টে গেছে। প্রতিদিনই পাল্টাচ্ছে দিন। তবু এবারে তার বিয়ে-থার কথা ভাবতে হবে। ভাবে ঝড়ু।

মুঙ্গলিও কাণাঘুষোর এসব কথাশোনে। গা-শিরশির করে বিয়ের কথায়, অনামা ভালো লাগায়। জীবনের এখনও অনেকেই বাকি আছে। অনেক ভালো লাগা বাকি আছে এখনও। দারিদ্র্যই শেষ কথা নয়। দরিদ্রদেরও বড়লোকী থাকে। এ সব কথা শুনে মুঙ্গলির কেবলই সরজু মাস্টারের কথা মনে হয়। ওর বিয়ের কথা তাই উঠলে মনখারাপও লাগে। সরজুকেও তো মুঙ্গলি কোনোদিনও পাবে না।

মাইল সাতেক দূরের শহরের ফুলবাগ মিন্যুসিপ্যালিটির জমাদার মতির ছেলকে ঝড়ুর পছন্দ। মতি, ঝড়ুর বন্ধুও বটে। অনেক দিনেরই বন্ধু। মতির ছেলে জগনু এ বছরই মতি রিটায়ার করলে মতির জায়গায় চাকরি পাবে কাজটা যদিও বাজে। এখনও খাটা-পায়খানা আছে অনেকই ফুলবাগ শহরে। নামেই শহর ব্রিটিশদের সময়ে যেমন ছিলো তা থেকেও অনেক ঘনবসতিপূর্ণ এবং নোংরা হয়ে গেছে। উন্নতি কিছুই হয়নি। অবনতিই হয়েছে। তবু ঝড়ু ভাবে, মরদের কাজের আবার খারাপ ভালো কি ? যার যা কাজ। নিজেকে বোঝায় ওই সব বলে। তাছাড়া কজন মানুষই বা কাজ পায় ? পাঁচ বছর বাদ বাদ ভোটের আগের বক্তৃতা তো অনেকই শুনলো। লাশকাটা ঘরের ডোমেদের কাজের থেকে তো এ কাজ অনেকগুণেই ভালো ! সারাদিন খাটা-খাটনি করে দুটি মকাই বা বাজরার রুটি আর হিং-দেওয়া খেসারির ডাল গরম-গরম খেতে যদি পায় মুঙ্গলির ভাবী স্বামী এবং মুঙ্গলি, তাই তো অনেক পাওয়া ! বেশি লোভ নেই ঝড়ুর। তার মেয়ে মুঙ্গলি যে রাজরাণী হবে এমন আশা করে না সে।

॥ ৩ ॥

দুপুরবেলা।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

মাটি থেকে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ উঠছে।

মুঙ্গলি ইতোয়ারিনকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঈদ্‌গার দিকে চলে গেছিলো। সারা বছর এই পুরো অঞ্চলটা ফাঁকাই পড়ে থাকে। দুই সম্প্রদায়েরই ভিখিরী, নেশা-ভাঙ্গ করনেওয়ালারা, হিন্দু এবং মুসলমানদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, গরু, ছাগল, চরে বেড়ায়। তবে শিশুকাল থেকে মুঙ্গলি দেখে আসছে যে ঈদের আগে এ জায়গাটার চেহারাই যেন পাল্টে যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। ঝাঁট দেওয়া হয় সাজানোও হয়। সাদা চাদর পাতা হয় তিনদিকে দেওয়াল-ঘেরা জায়গাাতে। ইমাম সাহেব অথবা মোল্লা সাহেবের জন্যে উঁচু পাটাতন বাঁধা হয়। ভাঙ্গী বস্তীর ডানদিক-বাঁদিকের দুটি গাঁয়ের মুসলমানেরা নতুন জামা পরে টুপি মাথার চড়িয়ে ঈদের নামাজ পড়তে আসে ঈদ্‌গাতে।

যখন ছোটো ছিলো, একবার, মুঙ্গলি তার বাবা ঝড়ুর সঙ্গে অনেকদিন আগে এসে বাবার হাত ধরে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলো ঈদের নামাজ পড়া। বড় হবার পর আর এদিকে আসে না ঈদের দিনে। বস্তীর বড় মেয়েরা বারণ করে দিয়েছে। কোনো মেয়েরাই আসে না হিন্দু বস্তীর। মুসলমানের মেয়েরাও আসে না। ওদের ধর্মে মেয়েদের অন্যরকম চোখে দেখা হয়।

প্রতি বছরই ঈদের দিন সন্ধ্যেবেলায় গিয়াসুদ্দিন-নানা টিফিন-ক্যারিয়ারে করে বিরিয়ানি-পোলাউ, মুরগীর চাঁব আর ফিরনি নিয়ে আসে তার বন্ধু ভগলু নানার জন্যে। জাফ্‌রান দেওয়া বিরিয়ানির স্বাদ প্রতি বছরই পেয়ে আসছে মুঙ্গলি আর ঝড়ু, ভগলু নানার দয়ায়। বড় সোহাগভরে চেটেপুটে খায় ঝড়ু, ভগলু নানা আর ও। গিয়াসুদ্দিন নানাও ওদের আনন্দ দেখে খুশি হয় খুব। বিরিয়ানিতে যে জাফ্‌রান দেয় তা নাকি আসে কাশ্মীরের উপত্যকা থেকে।

ঈদ্‌গার ওপাশে একটি ছোটো মসজিদ আছে। মোল্লা রমজান হাজী থাকেন সেখানে। প্রতিদিন কাক ডাকারও আগে মসজিদে নামাজ পড়েন রমজান হাজী। তারপর দিনে রাতে,

বিভিন্ন প্রহরে। ওদের নামাজের ভাষা বোঝে না মুঙ্গলি অথবা মুঙ্গলিদের বস্তীর অন্য কেউই। ভাষাটা উর্দু বোধ হয় নয়। হিন্দুস্থানের ভাষা নয়। গিয়াসুদ্দিন চাচারাও পুরো বোঝে কিনা তা জানে না। তবে শুনতে বেশ লাগে। আল্লার প্রশংসা থাকে কি সেই সব নামাজে ? কে জানে ? ইদানীং মসজিদের সবদিকে লাউডস্পীকারও লেগেছে। ফুলবাগ, নিপাসিবা, গড়হি সব জায়গার মসজিদেই। আজানের সময় বহু দূর দূর থেকে শোনা যায় তা মাইকের জন্যে। জুগগি পাহাড়ের পাদদেশে ধাক্কা মেরে আওয়াজ হা-হা করে ফিরে আসে।

পিপ্পল্ গাছের নিচের চায়ের দোকানে সেদিনও আড্ডা হচ্ছিলো। গিয়াসুদ্দিন চাচা আসেনি সেদিন। সরজু মাস্টার বললো, বুঝলে ভগলু নানা, শোনা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের পয়সাওয়ালা সব দেশে থেকে নাকি প্রচুর টাকা আসছে ভারতবর্ষে। আরবদের স্বপ্ন নাকি সমস্ত পৃথিবীকেই একটি মাত্র ইসলামিক রাষ্ট্র করে তোলা। প্লেন যারা ছিনতাই করলো সেদিন সেই গেরিলারা বলেছিলো না !

পাকিস্তান ও বাংলাদেশও কি এই অঢেল টাকার লোভেই ইসলামিক রাষ্ট্র হয়ে গেলো ?

ব্যাপারটা ভালো নয়।

বললো, ভগলু নানা।

ভারতবর্ষকেও ইসলামিক রাজ্য করে তোলার চক্রান্ত চলছে চারদিকে। বিদেশী রাষ্ট্রদের মদত তো আছেই। চোখ কান খুলে না রাখলে একদিন বড়ই বিপদ হবে।

সরজু মাস্টার বললো।

তা কেন হবে ? আর হবেই বা কি করে ? ভগলু চাচা বলেছিলো, অবিশ্বাসের গলায়। হিন্দুস্থানের মধ্যেই পাকিস্তান হবে ?

মুঙ্গলির বাবা ঝড়ুও সেদিন চা খেতে গেছিলো। তাই জিগগেসও করেছিলো ভগলু নানাকে। ঝড়ু গাঁওয়ার সোজা লোক। লেখাপড়াও জানে না ও নিজেই বললো, ধ্যাত্। তাও কখনও হয়। যেমন এখন আছি সকলে মিলেমিশে তেমনই থাকবো চিরদিন।

সরজু মাস্টার বলেছিলো, সবই হতে পারে !

ছোকরা সরজু মাস্টারের কথাটা কারোই ভালো লাগেনি।

॥ ৪ ॥

ঈদ্গার চারপাশে বড় বড় গাছ। বেশিই তেঁতুল। পথের পাশে পিপ্পল্ ছাড়াও একটা বড় নিমগাছ আছে। কিন্তু ঈদের নামাজ, গিয়াসুদ্দিন চাচারা কখনই ছায়াতে পড়ে না। যেখানে একটুও ছায়া পড়ে না সেখানেই সার সার করে হাঁটু গেড়ে বসে সকলে নামাজ পড়ে। সাদা নতুন কাপড় বিছিয়ে নেয় নিচে।

নামাজ পড়তে কিন্তু হিন্দুদের পুজো-টুজোর মত আদৌ সময় লাগে না বেশি। নামাজের তিনটি ভাগ আছে। মুঙ্গলি তো শুনেছেই, দেখেওছে দূর থেকে শিশুকালে। বড় বড় জায়গাতে ইমাম এবং ছোট ছোট জায়গাতে মোল্লা সাহেব কোরাণ থেকে কিছু পড়ে শোনান। তাকে বলে "খুট্‌বা"। প্রত্যেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তা শোনেন। তাতে মিনিট পাঁচেক সময় যায় বড় জোর। তার পরেই সকলে একসঙ্গে দু'হাত তুলে "দুয়া" মাঙ্গেন। এক মিনিট, কী দু মিনিট ! তারপর নামাজ শেষ হয়ে যায়।

তারপর হিন্দুদের দশেরার মতো প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। এই

বিরাদরী দারুণই ভালো। হাসিমুখে একে অন্যকে বলেন "ঈদ মুবারক"। প্রত্যেকের বাড়িতেই সেদিন ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্তো থাকে। যার যেমন অবস্থা। কানে থাকে, তুলোয়-মাখানো আতর।

মেয়েরা কেউই আসে না নামাজে। মেয়েরা সব কিছু থেকেই বাদ। এইটা ভেবেই ভারী খারাপ লাগে মুঙ্গলির। মুসলমানদের কাছে মেয়েরা মানুষ বলেই গণ্য নয় না কি ? পরদা আর বোরখার মধ্যেই থাকে কি আজীবন ? দাসীবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন অধিকার কি মেয়েদের নেই ? বাইরের পৃথিবী পুরোপুরিই বন্ধ কি ওদের কাছে ? বেচারারা ! যেহেতু ঐ দু বস্তীর বড মেয়েরা বাইরে একেবারেই আসে না, ওদের সুখ-দুঃখের কথা জানারও উপায় নেই কোনো মুঙ্গলিদের।

মুঙ্গলি ভাবে, ভাগিাস মুঙ্গলি ভাঙ্গী ছাড়া অন্য গাঁয়ে জন্মায়নি। জন্মালে ও আত্মহত্যা করতো। ওর স্বাধীনতাকে বড়ই ভালোবাসে মুঙ্গলি। প্রাণ গেলেও এই স্বাধীনতা, এই ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানো, এই বৃষ্টিতে ভেজা, জুগ্‌গি পাহাড়ের পায়ের কাছে বসে রোদ পোয়ানো, সেজে-গুজে হাটে যাওয়া, শুক্কুরবারে শুক্কুরবারে ; দুর্গাপুজো দেখতে যাওয়া ফুলবাগ শহরে, ঝুমরী—গিলাতে দশেরার মেলাতে গিয়ে গরম জিলাবি খাওয়া আর কাঁচের চুরি কেনা ; এসব কিছুকেই ও কখনই ছাডবে না।

মেয়েদের পায়ের নিচে দাবিয়ে রেখে পুরুষদের যে "বিরাদরী" তার প্রতি মুঙ্গলির অন্তত কোনো শ্রদ্ধা নেই। কোটি কোটি এমন সব মেয়েদের জন্যে দুঃখে মুঙ্গলির বুক ফেটে জল আসে।

এলো-মেলো পায়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো মুঙ্গলি হঠাৎ চোখ তুলে দেখলো আকাশ আবারও কালো করে আসছে।

মুঙ্গলি বললো, চল্‌রে ইতোয়ারিন। ঘর লওট যাব

ইতোয়ারিন সায় দিলো।

বললো, ঘ্যোঁৎ ঘোঁৎ !

॥ ৫ ॥

আজ ঈদ।

ট্রাকে করে, বাসে করে, দলে দলে মানুষেরা আসছে চুরিক থেকে ঈদ্‌গাতে। অনেকগুলো মাইক লাগানো হয়েছে। পথের পাশে দোকান বসেছে অনেক। মেলার মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে পুরো জায়গাটা। দোকানে নানারকম মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে। ফল, মোরগা, আণ্ডা, বক্‌রীর বাজার বসেছিলো গতকাল। গরু কাটা হয়েছে দু গ্রামেই। পিজরাপোলের গরু নয়। নধর গরু।

পুলিশ এসেছে এক ট্রাক। পাছে, নামাজ পড়ার সময়ে নামাজীদের কোনোরকম অসুবিধে হয়, তাই। প্রতিবারই আসে নামাজ পড়ার ঘণ্টাখাকে আগে। নামাজ পড়া শেষ হলে আবার ফিরে যায় কোতোয়ালিতে। পথের দোকানে চা-পান খেয়ে। চলে-যাওয়া তাদের উঁচু গলার গাল-গল্প চলন্ত-ট্রাক থেকে উড়ে আসে ভাঙ্গী বস্তীর মানুষদের কানে।

মুঙ্গলির বাবা ঝড়ু সকালেই বলে গেছিলো ; বাড়ি ঘর সব পররিষ্কার করে রাখতে। ঝড়ু গেছে এক বোঝা শালপাতার দোনা নিয়ে ফুলবাগ শহরে বেচতে। ভাঙ্গী বস্তী নামেই ভাঙ্গী বস্তী। আজকাল ধাঙ্গড়ের কাজ করে খুব কম মানুষই। সাহেবী "সিস্‌টেম" "কমোড"

হয়ে গিয়ে ধাঙড়দের প্রয়োজন কমে গেছে। শহরের মানুষেরা নিজেরাই বা তাদের বাড়ির কাজের লোকেরাই কমোড পরিষ্কার করে নিতে পারে। এসিড পাওয়া যায় বোতলে। কমোড পরিষ্কার করার। বাজারে নানা রকম ব্রাশও কিনতে পাওয়া যায় লম্বা-বেঁটে হাতলওয়ালা।

বাড়ি ঘর পরিষ্কার করতে বলে গেছে বাবা, কারণ কাল নাকি ফুলবাগ শহর থেকে মেহমান আসবে। তার ভাবী শ্বশুর।

শ্বশুর কেন ? মুঙ্গলি নিজেকে শুধিয়েছিলো। সেই মতি না ফতির ছেলে যে সে নিজে আসবে না কেন ? যার সঙ্গে মুঙ্গলির সারাজীবন দুঃখে-সুখে ঘর করতে হতে পারে তাকে একবার চোখের দেখাও দেখবে না পর্যন্ত নিজে বিয়ের আগে ? মুঙ্গলির কি কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই ? বাবা কি তাকেও পরাধীন করে দিলো ?

আর মাস্টার ? সরজু মাস্টার ? কত কী জানে শোনে সে ! একদিন মাস্টারের সঙ্গে একাই আলাপ করবে মুঙ্গলি। ঠিক করেছে মনে মনে। অনেক কথা বলবে তাকে। পলাশ বনে বসন্তদিনে একা একা চড়া বেলায় ঘুরতে ঘুরতে কী বলবে তার মহড়াও দিয়েছে অনেকবার। কিন্তু বলা হয়নি কোনো দিনও। ধাঙড় বলে কি চিরদিন এই সমাজেই থাকতে হবে মুঙ্গলিকে ? ভাবী রাগ হয় মুঙ্গলির একথা ভেবেই। মাস্টারের মুখটা কেবলই বার বার মনে আসে। চান করার সময়, ঘুম আসবার আগে, স্বপ্নের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে, জুগগি পাহাড়ের ঢালে ঝাঁটি-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাক-ভেজা ভিজতে-ভিজতে।

একটা বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ে মুঙ্গলির। ও জানে যে এ স্বপ্নও ওর অনেক স্বপ্নরই মতো সত্যি হবে না। মুঙ্গলি এও জানে যে, প্রত্যেক মেয়ের মনের মধ্যে যে-মানুষ থাকে, তার সঙ্গে ঘর করার বরাত ভারতের সাধারণ মেয়েদের হয় না ; কী হিন্দুর ! কী মুসলমানের !

বাবা বলেছে, শুয়োরের মাংস নিয়ে আসবে গামারিয়ার হাট থেকে। আর ছোলার ডাল। আটাও আনবে কলে-পেষা। কাল ভালো করে বাঁধতে হবে মুঙ্গলিকে। ফুলবাগের মতি না ফতি, হবু শ্বশুর না ফসুর ; তার জন্যে।

ইতোয়ারিনকে মুঙ্গলি বস্তীর অন্য শুয়োরের সঙ্গে কোনোদিনই মিশতে দেয়নি। সে যে তার পোষা প্রাণী। তার সখী। আজেবাজে জিনিসও খেতে দেয় না। ওরা যা খায়, তার থেকেই একটু দেয়। তাছাড়া, জঙ্গল পাহাড়ে বা টাঁড়ে এইজন্যেই তো সঙ্গে করে নিয়ে ফেরে রোজই যাতে ইতোয়ারিন মূল খুঁড়ে খেতে পারে। মহুয়ার সময়ে মহুয়া, আমলকির সময়ে আমলকি, আমের সময় জংলী আম।

তেঁতুল একেবারেই খেতে পারে না বেটি। মুখে দিলেই মুখ যা ভ্যাটকায় ! হেসে বাঁচে না মুঙ্গলি দেখে।

মোরব্বার দড়ি দিয়ে সামনের খোঁটাতে ইতোয়ারিনকে সকাল থেকে ভালো করে বেঁধে রেখে যত্ন করে উঠোন নিকোচ্ছিলো মোষের গোবর দিয়ে মুঙ্গলি। ঠিক সেই সময়ই ঈদগা থেকে মাইকগুলো সব একসঙ্গে গমগম্ করে উঠলো। মোল্লা সাহেবের গলা ! এ তো "খুৎবা" নয়। এ তো বড় উত্তেজিত ক্রুদ্ধ গলা। তার উপরে বিজাতীয় ভাষা। মরুভূমির গন্ধ আছে এই ভাষায়। কী ভাষা কে জানে ? নামাজের এই অংশকেই তো "খুৎবা" বলে। এর পরেই "দুয়া" মাঙ্গার কথা। তারপরই নামাজ শেষ।

মাইকের আওয়াজ গমগম্ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিলো। "খুৎবা" শুনতে শুনতেই হঠাৎ মাইকে একটা প্রচণ্ড শোরগোল উঠলো। সেই শোরগোল, বিরক্ত ক্রুদ্ধ জনরব হয়ে অসংখ্য মাইকের মধ্যে দিয়ে অনেক জোরে ভেসে এলো এদিকে।

পাশের ঘরের সুরাতিয়া দিদি চেঁচিয়ে বললো, আররে। এ মুঙ্গলি ! ইত্‌নি হুল্লাগুল্লা কওন্ চি কি ?

মুঙ্গলির উঠোন নিকোনোর সামান্যই তখনও বাকি ছিলো। তার হাতে গোবর

বিরক্তির গলায় বললো সে, কওন্ জানে, কওন্ চি কি ?

সুরাতিয়া দিদি বোধহয় ঘরের বাইরে গিয়ে শিমুগাছটার নিচে কালো পাথরের স্তূপের উপরে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো, ব্যাপার কি তা ভালো করে দেখবার জন্যে গলা লম্বা করে। তার গলার অপস্রিয়মাণ আওয়াজেই বুঝলো মুঙ্গলি। শিমুলতবিটা উঁচু। ওখান থেকে পিচ রাস্তা, মসজিদ আর ঈদ্‌গা সবই দেখা যায়।

পরক্ষণেই, সুরাতিয়া দিদির আতঙ্কগ্রস্ত চিৎকার শোনা গেলো, পুলিশোয়াকে মার দেল হো। পাত্থল্ ফেক্‌তা হ্যায় ঢের্‌সা উনলোগোনে সব্বে মিলকর্।

কাহে লা ?

মুঙ্গলি শুধোলো আরও বিরক্তি কিন্তু উদাসীনতারই সঙ্গে, ঘর নিকোনো শেষ করতে করতে।

ঘরের মধ্যে থেকেই শুধোলো। সামান্য কাজ তখনও বাকি ছিলো।

ম্যায় জানু ক্যায়সি ?

উত্তেজিত গলায় সুরাতিয়া দিদি বললো।

এবার গোবর-হাতেই মুঙ্গলি বাইরে এসে শিমুলতলিতে সুরাতিয়া দিদির পাশে দাঁড়ালো। দেখলো, নামাজীরা ফটাফট্ পাথর মারছে পুলিশদের। পুলিশদের মধ্যে দুজন পড়ে গেলো। অনেক পুলিশেরই মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। লাল রক্ত। ফিন্‌কি দিয়ে। তখন একজন পুলিশ রাইফেল ভীড়ের দিকে তুলে গুলি করলো। গুড়ুম্ করে শব্দ হলো।

সুরাতিয়া দিদি অত্যন্ত ভীত এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বললো, ভাগ্ ভাগ্। জলদি ঘর ভাগ্ যা, মুঙ্গলি।

বলতে বলতেই সুরাতিয়া দিদিও দৌড়তে দৌড়তে নামলো নিচে। মুঙ্গলি কিন্তু তখনও দাঁড়িয়েই ছিলো। পুলিশের সঙ্গে জনতার মারমারি কখনও দেখেনি আগে।

ততক্ষণে বস্তীর মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। মরদরা কেউই নেই এখন বস্তীতে। একমাত্র বুড়ো রিটায়ার্ড বউ-মরা নিঃসন্তান ফৌজী ভগলু নানা তার ঘরের সামনে মাটির দাওয়াতে বসে তখন দাড়ি বানাচ্ছিলো মুখের সামনে আয়না ধরে। সেও গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে এসে মুঙ্গলির পাশে দাঁড়ালো।

এমন সময় হঠাৎ মুঙ্গলি দেখলো, ইতোয়ারিন্ ঐ ভীড়ের মধ্যে থেকে ভীষণ ভয় পেয়ে দৌড়ে আসছে লাফাতে লাফাতে ভাঙ্গী বস্তীর দিকে। ইতোয়ারিন্ যে কখন মোরব্বার দড়ি ছিঁড়ে ওদিকে চলে গেছিলো টেরই পায়নি মুঙ্গলি। অন্য কেউও না। ঈদের নামাজের জন্যে অনেকই দোকান-পাট বসেছিলো ওখানে আজ। কিছু খাবার লোভেই কি চলে গেছিলো ? কিন্তু দড়িটা ছিঁড়েই বা গেল কি করে ? মোরব্বা, মানে সিসাল্-এর দড়ি।

মুঙ্গলি ভাবলো, সাধে কি আর মুসলমানেরা শুয়োরকে হারাম বলে ! শুধু হারামই নয়, ইতোয়ারিন্ একটি নিমকহারামও বটে। এতো তাকে যত্নে রাখে তবুও খাবার লোভে গেলো ! হারামজাদী !

জল্‌দি আ। জল্‌দি আ। আ। আজ তোরা টেংরি তোড়ব্।

চরম বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলো ক্রুদ্ধ হতচকিত মুঙ্গলি। যদি পুলিশের গুলি বা পাথর লাগে ইতোয়ারিনের গায়ে, এই ভয়ে ও সিঁটিয়ে ছিলো।

টেংরী-ভাঙার ভয়ের চেয়েও রাইফেলের গুলির শব্দে অনেক বেশি ভয় পেয়ে ইতোয়ারিন্ প্রাণপণে থপ্থপ্ করে দৌড়ে আসছিলো। পুলিশদের উপরে শয়ে শয়ে পাথর পড়ছিলো তখন। নামাজ বন্ধ হয়ে গেছলো। এবারে আবারও গুলির শব্দ হলো পরপর কয়েকবার। পাথর-বৃষ্টির মধ্যে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে গুলি করছে পুলিশরা।

ইতোয়ারিন বস্তীতে না পৌঁছানো অবধি মুঙ্গলি অপেক্ষা করছিলো। এমন সময় নামাজীদের ভীড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন আঙুল তুলে দেখালো ইতোয়ারিন্ আর মুঙ্গলির দিকে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই একদল মানুষ পাগলের মতো দৌড়ে এলো ইতোয়ারিনের পিছু পিছু।

এক গালের দাড়ি কামানো, অন্য গালে সাবান নিয়ে ভগলু নানা আতঙ্কগ্রস্ত গলায় বললো, ভাগ্ বেটি। ভাগ্ যা সব্বে বস্তী ছোড়কর্। তুরন্ত্। ভাগ্ সুরাতিয়া! ভাগ্ মুঙ্গলি! সব্বে ভাগ।

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি কি পালানো যায়?

যৎসামান্য সম্বল, তা সে যতো সামান্যই হোক না কেন, তা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অতো সোজা নয়। মেয়েদের পক্ষে তো নয়ই। মুঙ্গলি প্রথমে নিজেদের ঘরের দিকে দৌড়ে এলো। কিন্তু নিজেদের ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই একটি তীব্র আর্তচিৎকার শুনলো ভগলু নানার। কী হলো দেখতে না পারলেও বুঝলো যে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেলো। পরক্ষণেই, রে-রে-রে করে শয়ে শয়ে নামাজীরা ভাঙ্গী বস্তীর ঘরে ঘরে ঢুকে পড়লো। পালাতে, মেয়েরা একজনও পারলো না।

মুঙ্গলির উপরে অনেকগুলো দাড়ি-গোঁফওয়ালা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ-ভরা রাগী, কামার্ত, কুৎসিত মুখ নেমে এলো। নেমে এলো, অনেকগুলো হাত ওর সারা শরীরের আনাচে-কানাচে। সুরজ মাস্টারের মুখটা হঠাৎ ভেসে উঠলো একবার এক ঝলক চোখের সামনে। তারপর মুহূর্তেই তার শাড়িখানি ফালাফালা করে ছিঁড়ে তাকে মাটির মেঝেতে চিৎ করে শুইয়ে ফেললো মানুষগুলো।

সুরাতিয়া দিদি তীব্র চিৎকার করে ককিয়ে কেঁদে উঠলো। বললো, হায় রাম!

সুরাতিয়া দিদির বয়স হবে তিরিশ। ছেলেমেয়ে নেই কোনো। প্রতি ঘর থেকেই বিভিন্ন বয়সী নারীর আর্ত চিৎকারে পুরো বস্তী খানখান্ হয়ে গেলো। তালাও-এর জল ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। বাইরে থেকে শিশুদের আর্তনাদ।

তীব্র, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে মুঙ্গলি শুনলো একজন নামাজী ওকে বলেছ, "হারাম ভেজিন্ থী নামাজ মে? শালী! হরামজাদী!"

দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়া একটি অবলা অবোধ যুবতী শুয়োরী ইতোয়ারিনের হাতেই যে একটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত প্রাচীন ধর্মের পুরো সম্মান নির্ভরশীল ছিলো, এই জটিল এবং অবিশ্বাস্য কথাটা মুঙ্গলির মোটা মাথায় কিছুতেই ঢুকছিলো না।

হতভম্ব, স্তব্ধ হয়ে গেছিলো ও।

॥ ৬ ॥

জ্ঞান যখন ফিরলো মুঙ্গলির, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। রাত নেমে এসেছে। তার বাবা তখনও ফেরেনি। বস্তীর অন্য পুরুষেরা যদিও ফিরে এসেছে, বস্তীর বেশির ভাগ ঘরই আগুনে পুড়ে গেছে। মুঙ্গলিদের ঘরও। তার ভাবী শ্বশুর না ফসুর, মতি না ফতির আসা

হলো না।

চোখ মেলে দেখলো মুঙ্গলি যে, জুগ্‌গি পাহাড়ের নিচে ঝাঁটি-জঙ্গল-ভরা জমিতে শুয়ে আছে সে আরও অনেকের সঙ্গে। দুই পা রক্তে ভেজা। ভেজা শাড়ি। গায়ে অনেক জ্বর, বড় ব্যথা। ধাইমা তাকে কী সব জড়ি-বুটি করছেন। ধাইমাকে মানুষগুলো ছোঁয়নি। সাদা চুলের অশীতিপর বুড়ী।

ভগলু নানার উদার বুকটা কসাই-এর গরু-কাটা ছুরি দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেছে ওরা। তার ওপর অন্য একজন পেটে একটা ছুরি ঢুকিয়ে মোচড় দিয়ে নাড়িভুঁড়ি সব বের করে দিয়েছে। শিমুলতলিতে শকুন পড়েছে ভগলু নানার উপরে। শেয়ালে-শকুনে ঠুকরে খাচ্ছে সেই মৃতদেহ।

পুরুষেরা ছিলো না বলেই প্রাণে বেঁচে গেছে। যদিও মানে মরে গেছে মেয়েরা। চতুর্দশীর রাত আজ। আলো আছে। সদরের লাশ-কাটা ঘরে যখন ভগলু নানাকে নিয়ে যেতে আসবে পুলিশ তখন তার লাশের বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বস্তীর ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে দশ-বারোজনকে ঐভাবেই কুপিয়ে কেটেছে ওরা।

শকুন বসে আছে চাঁদভাসি আকাশের পটভূমিতে জুগগি পাহাড়ের ঢালে পলাশবনের ডালেও। চারধারে কান্না, বিলাপ আর আর্তনাদ।

মুঙ্গলির বাবা ফিরলো হাতে শুয়োরের মাংস আর ছোলার ডাল নিয়ে ফুলবাগ থেকে হেঁটে। যানবাহন সব বন্ধ।

মুঙ্গলি শুনতে পেলো, সরজু মাস্টার কথা বলছে দূরে পুরুষদের জটলার মধ্যে বসে। তার গলা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে মুঙ্গলি বড় কষ্ট হতে লাগল ওর। বড় কষ্ট। পুজোয় লাগার আগেই দলিত, পিষ্ট, গলিত হয়ে গেলো ফুল।

দশরথ চাচা বললো, মুঙ্গলি শুনলো, শুয়োর ওদের কাছে "হারাম"। মুঙ্গলির ইতোয়ারিন্ যদি ঘুরতে ঘুরতে ওখানে না যেতো...।

শুয়োরও তো ঈশ্বরের সৃষ্টি! মুঙ্গলি তা ইতোয়ারিন্‌কে ইচ্ছে করে পাঠায়নি। সে গেলেও তো লাথ মেরে তাকে তাড়িয়েও দিতে পারতো ওরা। তাহলেই তো মামলা মিটে যেতো।

সরজু মাস্টার বললো।

না তা তাড়ায়নি। ওদের ধর্মে আঘাত লেগেছিলো বলে...। হঠাৎ গিয়ে-পড়া শুয়োরীর মতো একটা বদবু, সুরত্‌হারাম মাদী জানোয়ার অতগুলো সুস্থ স্বাভাবিক এবং অসংখ্য শিক্ষিত মানুষকেও পাগল করে দিলো! পুলিশদের না মেরে, সকলে পাথর মেরে ইতোয়ারিন্‌কেও না-হক মেরেই ফেলতো! মুঙ্গলি না-হয় কাঁদতো খুবই। আর কী হতো? তাছাড়া পুলিশদেরই বা মারলো কেন?

কোনো যুক্তি...কোনো যুক্তি কি?

পুলিশদের মারলো, পুলিশেরা শুয়োরটাকে অ্যারেস্ট করেনি বলে। আটকায়নি বলে।

ওদের ধারণা, পুলিশেরা চক্রান্ত করেই নাকি নামাজের মধ্যে শুয়োর ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। এ চক্রান্তর মধ্যে ভাঙ্গী বস্তীর মানুষেরাও ছিলো।

দশরথ চাচা বললো।

সরজু মাস্টার বললো, ক্যা বাৎ!

দশরথ চাচা বললো, ইতোয়ারিনকে তো মুঙ্গলি বেঁধেই রেখেছিলো। ঈদের নামাজ তো আর ঈদ্‌গাতে এই প্রথম বারই হলো না! এতো বছর ধরে হচ্ছে। কোনোদিনও এমন ঘটনা

বা দুর্ঘটনা ঘটেনি। ওরা ভাবলো কি করে যে, চক্রান্ত ছিলো এর পেছনে? এতো বদ্‌মেজাজ কিসেরওদের? ভাবে কি ওরা নিজেদের? মানুষ এমন অন্ধও হতে পারে? গিয়াসুদ্দিন চাচার মতো মানুষও তো সেখানেও ছিলো! সেও কি বোঝাতে পারলো না? এমন অবুঝপনা! ভাবা যায় না। সত্যিই ভাবা যায় না।

গিয়াসুদ্দিন চাচা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

কে বললো?

সমস্বরে অনেকেই বলে উঠলো অবিশ্বাসের গলায়।

সরজু মাস্টার বললো, হ্যাঁ, তাই।

ইস্‌স! তাই?

স্তব্ধ হয়ে গেলো সকলে।

হ্যাঁ। পুলিশেরা তো আর দেখে দেখে গুলি করেনি।

দশরথ চাচা বললো, নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই করেছিলো।

সরজু মাস্টার বললো, ভগলু নানা যেমন ওদের ছুরিতে ফালা-ফালা হয়ে গেছে তেমন গিয়াসুদ্দিন চাচাও পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা কতগুলো মাথামোটা ধর্মান্ধ লোকই চিরদিন লাগিয়ে এসেছে। কী হিন্দু, কী মুসলমান! আর তাতে মারা গেছে চিরদিনই ভগলু নানা অরা গিয়াসুদ্দিন চাচাদের মতো ভালো, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ, যুক্তিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, হৃদযবান মানুষেরাই। এই হচ্ছে সবের নতীজা।

ওরে এসব আলোচনা আস্তে করো। কে শুনে ফেলবে। তারপর পুলিশ এসে আমাদেরই ধরবে। গরীবের সহায় তো কেউই নেই।

ওদের মধ্যে থেকেই কে একজন বললো। অন্ধকারে তাকে ঠিক ঠাহর হলো না।

ঝড়ু বললো, আবার যদি ওরা আমাদের কোতল করার জন্যে ফিরে আসে? কি হবে?

দশরথ বললো, আবারও যদি আসে তবে আমরা তো আর মেয়ে নই, এসেই দেখুক না। আসোয়া, তীরধনুকগুলো? এসেই দেখুক। মেয়েদের একা পেয়ে যারা এমন করে যেতে পারে সেই মানুষগুলো কি মানুষ?

সব আছে হাতের কাছেই।

আসোয়া বললো।

দোষটা তো আসলে এই ভোটের কাঙাল বদমাশগুলোরই! বেয়াল্লিশটা বছর চলে গেছে। এখনও মুখ বুঁজে থাকবো? ফিরে এসেই দেখুক না তারা!

সরজু মাস্টার বললো, ঠিক বলেছো। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে বাস করেও ন্যায্য কথা যদি না বলার সাহস থাকে তবে ঐ শিমুলগাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেই পড়ো ঝড়ু চাচা। প্রত্যেক অন্যায়েরই একটা সীমারেখা থাকে। সেই সীমান্তে অন্যায়কে যদি আটকাতে না পারি আমরা তবে আর কোনোদিনও সেই অন্যায়কে আটকাতে পারবে না। এমনিতেই অনেকই দেরী হয়ে গেছে।

ঝড়ু বললো, রিলিফ আসবে না সদর থেকে? এই বস্তীর জন্যে?

দশরথ বললো, এসেছে তো। কে যেন বললো, এ বস্তীর জন্যে কিছুই আসেনি। রিলিফ-টিলিফ ঐ দুই বড় বস্তীরই জন্যে। পাঁচ ট্রাক খাবার-দাবার। এয়ার-কন্ডিশনড গাড়ি করে সামনে পি-পি পাঁ-পাঁ করে ঢেঁড়া বাজানো এসকর্ট কার নিয়ে কালো মতো বদবু এম· এল· এ· ধবধবে সাদা পোশাক পরে এসে ঐ দুই বস্তীতেই ঘুরে গেছেন; আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে কোনো ব্যাপারেই কোনো চিন্তার দরকার নেই। পুলিশের যে কোতোয়াল

ঈদ্‌গাতে ডিউটিতে ছিলো তাকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করা হয়েছে এবং শুয়োরের যে মালিক, একটি মেয়ে ধাঙ্গী বস্তীর মুঙ্গলি, তার শুয়োর শুদ্ধ তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজসাহেবকে দিয়ে এই শুয়োরঘটিত চক্রান্তর গোড়া ধরে টান দেবার জন্যে বিচারবিভাগীয় তদন্তও করানো হবে। ট্রাক ট্রাক ওষুধও এসেছে। লঙ্গরখানাও খোলা হয়েছে। গুলিতে আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে গিয়ে সদরের হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়ে গেছে। মারা গেছে ন'জন। তার মধ্যে ন'জনই পুলিশের। আহত দশ। তার মধ্যে পুলিশের ছ'জন আর চারজন নামাজী।

মুঙ্গলিকে অ্যারেস্ট করবে। এম· এল· এ-র মতে মুঙ্গলিই এই দাঙ্গা বাধাবার মূলে ? সত্যিই এস· পি· নিজেই আসছেন অনেক ভ্যান পুলিশ সঙ্গে নিয়ে সদর থেকে। গাগারির পুলিশ চৌকি নামাজীরা ইতিমধ্যেই আক্রমণ করে পুড়িয়ে দিয়েছে। অনেক পুলিশ মরেছে নাকি সেখানে।

পুলিশ, হাতে রাইফেল নিয়েও মরে গেলো ? রাইফেল হাতে নিয়ে পাথর খেয়ে কি করে মানুষ মরে তা জানি না। এ আমাদের মহান ভারতবর্ষেই সম্ভব।

আররে ! হিন্দুস্থানের পুলিশের রাইফেলের ট্রিগার থাকে রাজনৈতিক নেতাদের আঙুলে। পুলিশেরা সব পুতুল। বহু জন্মের অনেক পাপ থাকলে তবেই কোনো ভদ্রলোক মহান ভারতীয় গণতন্ত্রে পুলিশের চাকরি করতে আসেন। পুলিশের চাকরিতে ঢোকার পর অবশ্য অনেকেই আর ভদ্রলোক থাকেন না।

রিলিফ আসেনি।

কেন আসবে ?

ওখানে এলো আর এই গ্রাম কি দোষ করলো ?

আসোয়া শুধোলো।

এত দুঃখেও সরজুমাস্টার হেসে ফেলে বললো, সে সব কোনো কারণই নয় আসোয়া। ওরাও মানুষ, আমরাও মানুষ।

তবে ?

ঝড়ু বললো হতবাক হয়ে, তবে এই তফাত্‌টা কেন ? কিসের জন্যে ?

হাঃ ! চুনাওট্‌তো এসে গেলো ! আর কত দেরী ? ঐ দুটি বস্তী মিলিয়ে যে পুরো ছটি হাজার ভোট ! আর ঝড়ু চাচা, তোমাদের এখানে মাত্র তিনশো ভোট। শুয়োরদেরও যদি ভোট থাকতো, তা ধরেও। আর সেই ভোটের প্রত্যেকটি তো তোষণ-নীতির কারণে গদীতে-আসীন দলগুলোই পেয়ে আসছে। চিরদিনই। গদী রাখতে হলে কোনো গদী-লোভীরই মুসলমানদের সলিড্‌ ভোটগুলি না পেলে চলে না এই কাঁরডারি জেলাতে। তোমাদের জন্যে কাদের মাথাব্যথা আছে বলো ? এখন ইতোয়ারিনের মতো শুয়োরীরাই এই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারাই এখানে দাঙ্গা বাধায়, ভোট আনে ; অথবা ভাঙায়। রাজা-উজির বানায়।

মুঙ্গলি তার কানের কাছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনলো একটা। হাত বাড়িয়ে গা ছুঁলো ইতোয়ারিনের।

ইতোয়ারিন্‌ও তো জাতে মেয়েই ! বে-ইজ্জৎ হওয়ার ভয়ে, সেও বুঝি তখনও থর্‌থর্‌ করে কাঁপছিলো।

মুঙ্গলি তার হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলো ইতোয়ারিনের মুঙ্গলির মাথার উপরে কালো আকাশের পটভূমিতে বাজে-পোড়া একটা শিমুলের ডালে ডালে শকুনগুলো

, অন্ধকারে অন্ধকারতর পিণ্ডের মতো বসে ছিলো সার-সার সবুজ নীল তারাদের পটভূমিতে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিলো যে, তারাই বোধহয় এ দেশের হতভাগ্য মানুষদের শেষ অভিভাবক।

অনীশের জন্মদিন

গত রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল।

বনের মধ্যের এই পর্ণকুটিরের টালির ছাদ ভেদ করে অনেক জায়গায় জল গড়িয়ে পড়েছিল। বাথরুমের বাল্টি, প্লাস্টিকের মগ, রান্নাঘরের ডেকচি সব বিভিন্ন জায়গায় পাততে হয়েছিল মেঝেতে মাঝ রাতে উঠে।

শুধু ওর চৌপাই এবং বিছানাটা শুকনো ছিল। তবে সেজন্যে চৌপাইটাকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে ঘরের মধ্যে চারপাশে ঘুরপাক খেতে হয়েছিল।

এতসব ঝামেলা-ঝক্কি পুইয়ে ও যখন বাইরের গাছ-গাছালি, বাথরুমের টিনের চাল এবং টালির ছাদে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন রাত প্রায় দুটো।

চতুর্দিক থেকে পুলকভরা পাখির ডাক শুনতে শুনতে বর্ষাভোরের ঠাণ্ডা মিষ্টি আমেজে চাদর গায়ে-দিয়ে-শোওয়া অনীশ যখন চোখ মেলল, তখন ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, আজ ওর জন্মদিন।

বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে বাইরে চাদর-গায়ে দিয়ে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল অনীশ। হাওয়া নেই কোনও। কিন্তু নানারকম গাছ-গাছালি, লতাপাতা, পাখ-পাখালির নরম গা থেকে একটা সোঁদা সোঁদা বৃষ্টিভেজা বর্ষার গন্ধ উঠছিল। নানারকম পাতা, ফুল ঘুঘুর বুকের খসে-পড়া পালক সব ঝরেছিল জঙ্গলের মধ্যে এদিকে ওদিকে।

চাদরটাকে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে নিজের মনে বলল, আজ আমার জন্মদিন! হঠাৎই, সম্পূর্ণ বিনা কারণে নির্জনবাসের একাকী অনীশের, এই সকালে, এই প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় ভালো লাগতে লাগল।

জন্মদিন ব্যাপারটা চিরদিনই ওর কাছে একান্ত নিরুত্তাপের ছিল। মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে জন্মদিন ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণত কোনও সমারোহ হয় না। অন্তত ওদের বাড়িতে হত না। বরাবর জন্মদিনের ভোরে ও একা নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়াত। নিজের মুখ সেদিন সকালের আলোয় নতুন করে দেখত। কিন্তু প্রতি জন্মদিনে ওর ভীষণ খারাপ লাগত। মনে হত, একটা পাতা ঝরে গেল, একটা ফুল ঝরে গেল সাজানো তোড়া থেকে।

প্রতি জন্মদিনে বেলা বাড়লে ও বইয়ের দোকানে গিয়ে একটা বই কিনে তাতে লিখত, 'আমার জন্মদিনে আমাকে দিলাম। ইতি— অনীশ।'

যৌবনে পা দিয়ে প্রথম ও জানতে পেরেছিল যে জন্মদিনটি, যে জন্মায় তার কাছে ততটা না হলেও, যারা তাকে ভালোবাসে তাদের কাছে তা দারুণ একটা দিন। ও ওর

জীবনে জন্মদিনের প্রথম উপহার পেয়েছিল মুনমুনের কাছ থেকে। এক শ্রাবণের বিকেলে বৃষ্টিভেজা গড়ের মাঠে মুনমুন ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। একটা হালকা গোলাপী এবং খুব হালকা নীলের কাজ করা টাই এবং ঐ কাজের এক জোড়া মোজা নিয়ে। উপহারের উপর মুনমুনের হাতের ভালোবাসার গন্ধ লেগেছিল, ওর বুকের সমস্ত তরুণ নিষ্কলুষ আন্তরিক উত্তাপ সে উপহারকে উষ্ণ করে রেখেছিল।

এ পর্যন্ত আর কোনওদিন, আর কোনও উপহারে এত খুশি হয়নি ও।

ও তার আদরের মুনমুনের সঙ্গে একদিন ঘর বেঁধেছিল। সেই বাঁধা-ঘর অনেক বছরের জলে-রোদে কালবোশেখীর ঝড়ে বড় একঘেয়ে, বিবর্ণ, বৈচিত্র্যহীন হয়ে গেছিল। আজ মুনমুন ইচ্ছা করলেও আর তেমন করে অনীশকে কোনও উপহার দিতে পারবে না। তা ছাড়া, বোধ হয় মুনমুনের সেই ইচ্ছাটাও আজ মরে গেছে।

ওর জীবনের খুশির, ভালো লাগার গ্রাফগুলো চুড়োতে পৌঁছেছিল যৌবনের প্রথমে, সেই প্রথম প্রদোষে. কিন্তু তারপর থেকেই সব উষ্ণতা, সব সুখ ; সব আনন্দ নিম্নমুখী ঢাল বেয়ে ক্রমান্বয়ে জোরে নামতে থেকেছে।

আজ ও মধ্য যৌবনের সমতল উপত্যকায় একা দাঁড়িয়ে আছে। এখানে আর কেউ নেই। এই পাখিরা ছাড়া, এই ভোরের আশ্চর্য আবেশ ছাড়া, চতুর্দিকের ঘন গহন বন ছাড়া ওকে আনন্দিত করে, বা ওকে নিয়ে আনন্দিত হয় এমন কেউই আর অবশিষ্ট নেই।

তার প্রতি অনেকেরই ব্যবহার দেখে অনীশের মনে মাঝে মাঝেই সন্দেহ জাগত যে, ও আদপে জন্মেছিল কি না। ওর মনে হত ও বোধ হয় ভেসে এসেছিল। যে ভেসে আসে, তার কাছে পৃথিবীর কোনও সম্পর্কেই কোনও শিকড় থাকে না। জন্মসূত্রে যে-সব আত্মীয়তা ও পেয়েছিল সে সব সম্পর্কের কথা বাদ দিলেও, ব্যবহারের গুণে যে সব সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠা করেছিল তাতেও বুঝি কোনও শিকড় ছিল না। তার মনকে সে সর্বতোভাবে অন্য অনেক মনে ওতপ্রোতভাবে, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াতে চাইলেও কোনও মনেই তার সত্তা প্রোথিত থাকেনি। জোরে হাওয়া উঠলেই, স্বার্থের ঢেউ লাগলেই, তাদের নিজেদের সুখ, নিজেদের সাধ, নিজেদের ঘরের সঙ্গে কোনও রকম সংঘাত উপস্থিত হলেই তারা সজোরে তার কাছ থেকে সরে গেছে। ফলে, অনীশের কেবলি মনে হয়েছে যে, ও সত্যিই কোনও ভাসমান অনাদরের উদ্ভিদ। এ পৃথিবীতে ওর সত্যিই কোনও শিকড় নেই—নেই অপত্য স্নেহের উষ্ণ আশ্রয়ে, নেই প্রেমেরও পরম পেলব মাটিতে।

তাই, একা থাকলেই আজকাল বড় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে ওর। ওর নিজের জন্যে একা একা স্বার্থপরের মতো ও কখনও কোনওদিন বাঁচতে চায়নি। কেউই হয়ত চায় না। কিংবা কে জানে, হয়ত একদল লোক থাকে, সব সময়ই ছিল ; যারা শুধু নিজেদের জন্যেই নিজেদের সুখ ও স্বার্থের চরিতার্থতার জন্যেই এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, বাঁচতে চায়। অনীশ যেহেতু তেমনভাবে বাঁচতে চায়নি এবং যেহেতু আজ অনীশের জীবন সম্বন্ধে কারওই বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই—যেহেতু তার শুধুমাত্র নিজের জন্যেই তাকে এ পৃথিবীতে একজন লোকও চায়নি, অনীশের কেবলই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে!

অনীশ এমন কোনও বিরাট প্রতিভাবান কেউ নয় যে সে মরে গেলে ময়দানে তার স্ট্যাচু হবে। অনীশের এমন কোনও জাগতিক বা অজাগতিক বিরাট কর্ম ও কর্তব্য নেই করার যে, তাকে যে-কোনও ভাবেই হোক বেঁচে থাকতে হবেই। তার মতো একজন নির্গুণ, সাধারণ, সস্তা লোকের বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়াতে কারোরই কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার সময় তার জন্যে চোখের জল ফেলার মতো একজনও লোক যে

নেই, তাও অনীশ জানে। জানে যে, তাকে কেউই মিস্ করবে না তার নিজের জন্যে। অন্য অনেকের স্বার্থপূরণ করা ছাড়া, নিজের জন্যে কিছুই না পেয়ে, শুধু অন্য অনেক স্বার্থপর লোকদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসেবে বেঁচে থাকবার কোনও মানে যে নেই, এ কথা অনীশের বার বার মনে হয়।

অনীশ জানে না কেন আজকাল অনীশের কেবলি মরে যেতে ইচ্ছা করে। কতবার সে কুয়োর সামনে একা একা নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে স্থির হয়ে দাঁড়ায়—কতবার বন্দুকের নল কপালে ঠেকিয়ে কি ভাবে ঘোড়া টানবে তা ভাবে।

এই সকালে অনীশ এক প্রাপ্তিহীন জীবন ও বিফল ; ব্যর্থ শীতল মৃত্যুর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবে আজ ও কি করবে ? কি ওর করা উচিত।

কিন্তু জীবন, জীবনের নিরন্তর প্রবহমান স্রোত কারও জন্যেই থেমে থাকে না। অনীশের জন্যে তো নয়ই। তাই অনীশকেও উদ্দেশ্যহীনভাবে সে স্রোতে ভাসতে হয়, যতদিন না নিজের চেষ্টায় নিজেকে ও অকালে থামায়।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল অনীশ। আজ ওদের যেতে হবে টোড়িতে। চান্দোয়া-টোড়ি। সেখানে বড় হাট বসবে শনিবারে। ধানের বীজ কিনতে যাবে ও। বর্ষা নেমে গেছে। এখন না লাগালে আর ধান লাগানো যাবে না। সকলেই বলছে, এবার দেরি করে এলেও ভালোই বর্ষা হবে।

চা-জলখাবার খেয়ে চানটান করে তৈরি হযে নিয়ে পাকদণ্ডীর পথ দিয়ে মানি এবং মানির সাকরেদকে নিয়ে স্টেশনের দিকে চলল ও।

পথ গেছে উঁচু-নীচু টাঁড় পেরিয়ে। এখানে ওখানে মহুয়া গাছ, কুঁচ ফলের গাছ, পিটিসের ঝোপঝাড় ; বুনো নিম। মাথার উপর মেঘলা বিষণ্ণ আকাশ।

ওদের পায়ের শব্দে চমকে উঠে তিতির উড়ে গেল ঝোপ থেকে ডানা ফর্‌ফরিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে অনীশের আবার খুব ইচ্ছা হল মরে যেতে। কেবলি মনে হতে লাগল যে জীবনে বেঁচে থাকার মতো যথেষ্ট কারণ না থাকলে শুধু শুধু বেঁচে লাভ কি ? তেমন করে তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকই বেঁচে থাকে, শুধু বাঁচবার জন্যে। কিন্তু তা কি বেঁচে থাকা ?

ও সব সময় খুব ভাবে, একা থাকলে বেশি ভাবে। ঐ ওরাঁওদের সঙ্গে জংলী টাঁড় পেরোতে পেরোতে ওর মনটা হঠাৎ এক বিধুর বিষাদে ভরে যায়।

ওর জন্মদিনে ওর ভীষণ মরবার ইচ্ছা করতে থাকে।

ট্রেনটা এসে গেল। বাঁশের সঙ্গে বাঁধা দড়ি এবং ঝুড়ি নিয়ে মানিরাও ওর সঙ্গে উঠল। ওদের নিয়ে জনাকীর্ণ একটা থার্ডক্লাশ কামরায় উঠে জানলার ধারে বসল।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। পাহাড়ে, জঙ্গলে, উঠতি-যৌবনের পাহাড়ী নদীর শরীরে নিঃশব্দে ভরাট বৃষ্টি পড়ছিল।—ট্রেনটা সেই বৃষ্টি মাথায় করে ছুটে চলল হু-হু করে—মহুয়া-মিলন পেরিয়ে।

দেখতে দেখতে এসে গেল টোড়ি। ট্রেন থেকে নেমে সব যাত্রীরা শোভাযাত্রা করে হাটে গিয়ে পৌঁছল।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে স্টেশন থেকে কিছু দূরেই হাট লেগেছে। মুরগী, ছাগল, টায়ার-সোলের জুতো, কাঁচের চুড়ি, তাজা সবজী, ছাতু-ভুজিয়া, নাপিত ভায়ার ব্রিক-সেলুন সবই আছে, নেই শুধু ধানের বীজ, যার জন্যে অনীশের আসা।

ওদের সঙ্গে নিয়ে সারা হাট তন্ন তন্ন করে খুঁজল অনীশ ; কিন্তু কোথাও বীজ পাওয়া

গেল না। ভুল খবর নিয়ে এসেছে সে। ভুল জীবনের মতো। এখানে।

এদিকে দুপুর প্রখর হয়েছে। মেঘের আড়ালে-থাকা সূর্যের যে তেজ তা আড়াল-হীন সূর্যের তেজের চেয়েও অনেক বেশি। প্রখর ক্ষিদেও পেয়েছে। আজ যাই হোক ওর জন্মদিন, কিছু একটা ভালো মন্দ খেতে হয় তা সেলিব্রেট করার জন্যে। সকলেই তা করে, সে জন্যেই।

মানি আর কিনুকে অনীশ ছিটের জামা আর টায়ার সোলের চটি কিনে দিল। ওরা মহা খুশি। তারপর ছাতু খাওয়াল ওদের পেট পুরে।

এরপর ওরাই বলল, তুই কিছু খেলি না বাবু? ছাতু খাবি?

ও হাসল, বলল, ছাতু খেয়ে অভ্যেস নেই।

ওরা দূরের একটা হলুদ ফুল ফুল চাদরের সামিয়ানা-টাঙানো দোকান দেখিয়ে বলল, বাবু, ওখানে যা। গোস্তরুটি পাবি।

দোকানের সামনে ভিড় ছিল। মাটিতে একটা চাটাই পাতা তাতে মিঞাভাইরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে খাচ্ছেন। ওর ভিড় ভালো লাগে না। একটু দূরে গাছতলায় বসে ও খাওয়ার ফরমাশ করল।

দূরে একটা অশ্বত্থগাছে অনেক কবুতর ওড়াওড়ি করছিল। একবার উড়ছিল, আর একবার বসছিল। সামনে সারি-বাঁধা খাপরার চালের ঘরগুলি। পেছনের স্টেশনে মালগাড়ি শান্টিং হচ্ছে। তার গদাম্ গদাম শব্দ ভেসে আসছিল। কাছেই একটা লাল-রঙা ঘোড়া, চরে চরে নতুন-গজিয়ে-ওঠা ঘাস খাচ্ছিল। ঘোড়াটার নাকের সামনে একটা ঘাস ফড়িং ঘুরে ঘুরে উড়ছিল।

ও গাছতলায় হেলান দিয়ে বসে দূরের কোনও নির্দিষ্ট বস্তু নয়; দূরের দিগন্তের বাড়ি ঘর, গাছপালা, আকাশ, সব কিছুর দিকেই চেয়েছিল। ওর চোখের লেন্স দুটোকে কোনও অদৃশ্য ক্যামেরাম্যান 'ইনফিনিটিতে' ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দেখছিল, আবার দেখছিলও না। ও জেগে ছিল, আবার ঘুমিয়েও ছিল। ওর সমস্ত সত্তার অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বও একই সঙ্গে এক অলস অঙ্গে বিরাজ করছিল।

এমন সময়ে একটা লুঙি-পরা বাচ্চা ছেলে এসে বলল, বাবু।

দেখল, লাল গোলাপফুল আঁকা কলাইকরা রেকাবিতে লাল দগদগে গোস্ত—এবং সঙ্গে মোটা রুটি—অন্য রেকাবিতে।

ছেলেটি বলল, খানা লায়া।

রেকাবিটা হাতে নিল, দগদগে গোস্তের দিকে একবার চাইল, ঠিক এমনি সময় একটা সাদা দুধেল গরু পেছন থেকে চরতে চরতে এসে ওর পাশে দাঁড়াল। গরুটার বড় বড় কালো চোখ, গায়ে গরুসুলভ মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। গরুটা দুবার কান নাড়ল পট পট করে। তারপর চরতে চরতে আবার চলে গেল।

ছেলেটাকে ডাকল। বলল, হো গ্যায়া।

রেকাবিতে একটু আমড়ার চাটনি ছিল। চাটনিটুকু রুটির উপর ঢেলে নিয়ে অনীশ একটি রুটি রেখে দিল। আর সব নিয়ে যেতে বলল।

রুটিটা খেতে খেতে ভাবতে লাগল সে জন্মে থেকে এ পর্যন্ত দারুণ কিছু ভালোভাবে না কাটলেও এত খারাপভাবেও আর কখনও ওর জন্মদিন কাটেনি। তাকে আজ সবাই ত্যাগ করেছে। তার জন্যে পৃথিবীর কারওই আর কিছুমাত্র নরম অনুভূতি অবশিষ্ট নেই।

রুটিটা গলায় আটকে গেল, তারপর জল দিয়ে দিয়ে কোনওক্রমে খেল সেটাকেও। ওর

ভিতরের অবুঝ এমোশনাল লোকটার চোখ দুটো জলে ভরে এল।

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছছিল। এমন সময় দেখতে পেল একজন ভদ্রলোক হাটের ভিড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেন দ্রুতপায়ে ওরই দিকে আসছেন।

ভদ্রলোকের পরনে একটা সবুজ লুঙ্গি, মাথায় তালিমারা একটা ছাতা, হাতে হাট-করার লাল-রঙা কাপড়ের থলে।

ভদ্রলোক কাছে এসেই ছাতাধরা হাতের সঙ্গে অন্য হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। তারপর অবাক-গলায় বললেন, আপনি ? এখানে ?

অনীশ চিনতে পারল না ভদ্রলোককে। বলল, আপনাকে····।

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন, ইন্দিরা গান্ধী কি সকলকে চেনেন ?

অনীশ বলল, মানে ?

ভদ্রলোক বললেন, আপনারা বিখ্যাত লোক, আপনাদের অনেকে চেনে তা বলে কি আপনারা আপনাদের সব এ্যাডমায়ারারদের চিনতে পারেন ? তা কি সম্ভব ? আমাকে আপনি চেনেন না। একবার কলকাতায় একটা ঘরোয়া সাহিত্য-সভায় আপনাকে দেখেছিলাম।

পরক্ষণেই ভদ্রলোক আঁতকে উঠে বললেন, ওকি ? আপনি এখানে খেলেন না কি ? উঠেছেন কোথায় ? কবে এসেছেন ?

অনীশ বলল, আমি খিলারিতে আছি। এখানে এসেছিলাম ধানের বীজ কিনতে। কিন্তু পেলাম না। এ ছাড়া তো খাওয়ার কোনও জায়গা নেই দেখলাম।

ভদ্রলোক একদৃষ্টে অনীশের মুখের দিকে চাইলেন।

বললেন, ফিরবেন তো বিকেলের গাড়িতে ? গাড়ি সাড়ে তিন ঘণ্টা লেট। বীজ যখন পেলেনই না, তো চলুন আমার সঙ্গে, আমার কোয়ার্টারে।

ওঅবাক হল। বলল, কেন বলুন তো ?

ভদ্রলোক রাগ রাগ গলায় বললেন, কেন আর ? খাবেন, বিশ্রাম করবেন ; আর কেন ? আমরা থাকতে এই রোদের মধ্যে মাঠে বসে গোস্ত-রুটি খাচ্ছিলেন আপনি ? ছিঃ ছিঃ।

খাইনি। মানে কখনও খাইনি যে তা নয়। তবে এখানে বিশেষ করে আজ এ পরিবেশে খেতে পারলাম না।

ভদ্রলোক পাশে পাশে হাঁটছিলেন। ওর মাথায় ছাতা ধরে। অনীশ যেন সত্যিই ভীষণ কোনও দামী লোক।

হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন, আজ মানে ? আজ কি কোনও বিশেষ দিন ?

ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গীতে হেসে ফেলল, বলল, বিশেষ দিন কিছু নয়। তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে বলে ফেলল, আজ আমার জন্মদিন।

ভদ্রলোক উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, কী দারুণ খবর শোনালেন আপনি। মা শুনে খুব খুশি হবেন।

ও কোনও কথা বলল না।

মানিদের বলে দিয়েছিল স্টেশনে গিয়ে প্লাটফর্মে যেন ওর জন্যে অপেক্ষা করে। ট্রেন যখন এত লেট তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে যেতে ওর কোনও আপত্তির কারণ ছিল না।

রেললাইন পেরিয়ে ওপাশে ভদ্রলোকের বাড়ি। বাড়ি মানে কোয়ার্টার। দুটি ঘর, মধ্যে একফালি উঠোন, বাইরে একটু বারান্দা। বাড়ির সামনে বেড়া মতো দিয়ে লাউ কুমড়ো লাগানো হয়েছে।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমার নাম অনিমেষ। অনিমেষ রায়।

অনিমেষ দরজার কড়া নাড়লেন।

একটি বাচ্চা ছেলে এসে দরজা খুলল।

অনিমেষ ডাকলেন, মা, ও মা, দ্যাখো কাকে এনেছি। এক্ষুনি পায়েস রাঁধো। আজ অনীশবাবুর জন্মদিন।

অনিমেশ অনীশকে নিয়ে একেবারে মহিলার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

ভদ্রমহিলার বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি হবে। উনি জানলার পাশের ইজিচেয়ারে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে অনীশের গায়ে মাথায় হাত বোলালেন।

বললেন, ওমা! এ যে দেখছি ছেলেমানুষ। তুমি বাবা এমন এমন বই লেখ কি করে?

অনিমেষ বলল, মা, উনি কিন্তু খাবেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, খাবেন বৈকী। আমাদেব কি সৌভাগ্য বল দেখি। তুই ঐকে পেলি কোথায়?

অনিমেষ বলল, সে সব বলব মা, তুমি আগে পায়েসটা রেঁধে ফেল।

বলেই অনিমেষ অনীশকে নিয়ে ওর ঘরে এলেন। বললেন, দেখুন। দেখেছেন?

ও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

দেখল, এই গণ্ডগ্রামে বিহারের এই জঙ্গল পাহাড়ে ঘেরা ছোট জায়গাতে অনিমেষের ঘরের দেওয়ালেব তাকে অনীশেব লেখা সমস্ত কটি বই-ই পর পর পাশাপাশি সাজানো আছে।

ও অনেকক্ষণ কোনও কথা বলল না। মুখ নিচু করে চুপ করে রইল।

অনিমেষ একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলল—বসুন।

জানলা দিয়ে অনিমেষের মুখে আলো এসে পড়েছিল। ক্লান্ত ক্লিষ্ট মুখ, কিন্তু মুখের মধ্যে ভারী একটা শান্ত নির্লিপ্ত ভাব। এ ধরনের মুখে কখনও বিরক্তি দেখা যায় না। ঐরা বোধ হয় বিরক্তি কাকে বলে জানেনই না।

অনিমেষ নিজেই কথা বলল। বলল, সামান্য একটা চাকরি করি কাঠের বড় ঠিকাদারের কাছে। মা ও ছেলের চলে যায় কোনও রকমে।

বিয়ে করেননি?

অনিমেষ লজ্জা পেল। বলল, মা চাপ দেন খুব, কিন্তু যা মাইনে পাই তাতে দুজনেরই চলে না ভালো করে। কিছু মনে করবেন না, আমার ভাবতেই খারাপ লাগে যে, একজন জলজ্যান্ত সুশ্রী যুবতী মেয়ে আমার জন্যে, আমারই কারণে কোনও দুঃখ পাবে। সত্যি ভাবলে খারাপ লাগে, বিশ্বাস করুন। কাউকে আদর করে রাখতে না পারলে এই ব্যাপারটা আমার কাছে স্বার্থপরতা বলেই মনে হয়।

তারপর অনিমেষ আবার বলল, আপনার লেখাগুলো পড়লে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু জমজমাট মিলনান্তক লেখা লেখেন না কেন?

ও হাসল।

বলল, হয়ত লেখকের নিজের জীবনটা মিলনান্তক নয় বলে।

অনিমেষ উজ্জ্বল চোখ তুলে বলল, আপনার কি কোনও গভীর দুঃখ আছে।

কথাটা এড়িয়ে গেল। বলল, এমন মানুষ কি আছে, যার কোনও-না-কোনও দুঃখ নেই? যার নেই, বলতে হবে তার দুঃখবোধই নেই।

জানি না, তবে জানেন, আমার না মাঝে মাঝেই খুব মরে যেতে ইচ্ছা করে। যতদিন মা

আছেন, ততদিন অবশ্য উপায় নেই। মা না থাকলে কিছু একটা করেও ফেলতে পারি। বলা যায় না। আমি খুব এমোশনাল, সেন্টিমেন্টাল। আপনার লেখা তাই-ই বোধ হয় পড়তে এত ভালো লাগে। আপনার লেখা পড়লেই কিন্তু আমার খুব বাঁচতে, বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে, জানেন? বিশ্বাস করুন, আপনার লেখা পড়লে মনে হয় দুঃখরও একটা মহানুভবতা আছে, ঔদার্য আছে। মনে হয়, দুঃখ বোধ হয় শুধু ভয় করারই নয়, সমস্ত দুঃখ ছাপিয়েই বোধ হয় কোনও গভীর আনন্দ শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের ঘরে জমা হয়। জানি না কেন, সত্যি বলছি, আমার ভীষণভাবে এ কথা মনে হয়। মনে হয় দুঃখী লোকদের সুখটা কেবল দুঃখী লোকরাই বোঝে।

পরক্ষণেই অনিমেষ ছেলেমানুষের মতো অনীশের হাঁটু ছুঁয়ে বলল, দেখুন, আপনার কিন্তু অনেকদিন বাঁচতে হবে, আপনাব উপরে আমার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। বিশ্বাস করুন, বানিয়ে বলছি না। আপনার জন্মদিনে আমাকে কথা দিতে হবে।

অনীশ হাসল। বলল, আপনি বড় ছেলেমানুষ।

তা যা বলেছেন। আপনার চেয়ে মোটে দু বছরের বড়।

এত বেশি এমোশনাল হলে শুধু কষ্টই পাবেন। এমোশনাল হওয়া বা এমোশনাল লেখা, কোনও গুণের কথা নয়।

অনিমেষ হঠাৎ চুপ করে গেল। বলল, দোষ গুণ জানি না। বড় ভালো লাগে। যতদিন বাঁচব এমনি করে বাঁচতেই ভালো লাগে।

যাকগে এসব কথা। আপনি যে এসেছেন, আমার ঘরে বসে আছেন—এ কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। জন্মদিনে, সকলে কি যেন বলে, কি যেন বলতে হয়—ঐ যে, কি একটা বলে না ইংরিজিতে, ওঃ মনে পড়েছে। বলেই, বলল, মেনী মেনী হ্যাপি রিটার্নস অফ দা ডে।

অনীশ জানলা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল।

ও মনে মনে বলছিল, এমন সার্থক জন্মদিন ওর জীবনে আর বুঝি কখনও আসেনি।

অনিমেষের শীর্ণ, অভাবগ্রস্থ, যুদ্ধরত সুন্দর সুপুরুষ মুখের দিকে তাকিয়ে অনীশ স্বগতোক্তি করল, বেঁচে থাকবেন অনিমেষ, আপনি আপনারা; আমার মতো কোনও হতভাগা স্বল্পখ্যাত লেখকের জন্যে। বদলে আমরা বেঁচে থাকব আপনাদেয় জন্যে। একজন সিনসিয়ার পাঠকের দেখা পাওয়ার চেয়ে বড় সার্থকতা, বড় পরিপূরণ, একজন স্বল্পখ্যাত লেখকের জীবনে আর কি থাকতে পারে?

ও বলল মনে মনে, আপনি জানেন না, কখনো জানবেন না অনিমেষ, আজকে আপনি কী এক আশ্চর্য উপহার দিলেন। আমার সবচেয়ে বেশি মন খারাপের, একা একা জন্মদিনের সমস্ত মেঘলা আকাশের আদিগন্ত দ্বিধাকে আপনি কি দারুণভাবে দ্বিখণ্ডিত করলেন।

ও আবারও মনে মনে বলল, এমন উপহার আমাকে আর কখনও কেউই দেয়নি, হয়ত দেবেও না কেউ, কোনও জন্মদিনে।

অনিমেষ একদৃষ্টে অনীশের মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। কথা বলছিলেন না কোনও। এমনভাবে চেয়ে যেন অনীশ মানুষ নয়, কোনও দেবতা-টেবতা।

ঐ ঘরে বসে, হঠাৎ এক ক্বচিৎ কৃতজ্ঞতায় ওর সমস্ত মন নুয়ে এলো। ও ভাবলো, ও মনে মনে বললো, ওর কী সৌভাগ্য! ও একটু লিখতে পারে, ওর মনের জমানো কথাকে ও সত্যর কাঠামোতে বসিয়ে কল্পনার তুলি বুলিয়ে কত অচেনা লোকের মনে ছড়িয়ে দিতে পারে।

মনে হল, আজ থেকে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণকেই ও ওর জন্মদিন বলে মনে করবে। নিজের জন্যে না হলেও, অন্যের জন্যে, অনিমেষদের জন্যে ওর বাঁচতে হবে।

আপাত শুভ্র

আমার সঙ্গে পতুবাবুর, মানে পতুমেসোর আলাপ, বলতে গেলে, আকস্মিকভাবেই। আমাদের এক বন্ধু সুমিতের মামাব বাগানবাড়ি ছিলো বারাসত উজিয়ে গিয়ে বাদুর কাছে। পতুমেসোর বাড়িটি ছিলো ; বাড়ি না বলে, বাসস্থানই বলা ভালো, ঐ বাগানবাড়িরই প্রায় লাগোয়া। মাঝে মাঝেই আমরা বন্ধুরা দল বেঁধে যেতাম ঐ বাগানে পিকনিক করতে। কখনও রাতে থেকেও যেতাম। তাস খেলা হতো, গান-বাজনা, কখনও বা অভিনয়ের মহড়াও !

সবে সাত দিন হলো চাকরি পেয়েছি স্টেটব্যাঙ্কে। তারই সেলিব্রেশান করতে বন্ধুদের জোরোজুরিতে যাওয়া হয়েছে সেবারে। শনিবার রাতে পৌঁছে খুব হৈহৈ হয়েছে। সকালে দেরী করে উঠে আমরা শুয়ে-বসে আড্ডা মাবছি। জলখাবারের পাট শেষ হয়ে গেছে। সুমিত গেছে মালীকে সঙ্গে করে মাংস আনতে। এমন সময়ে চমৎকৃত হয়ে দেখি, তিনটি মেয়ে আম কুড়োচ্ছে আম বাগানে। তাদের সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা বলা চলে না তবে প্রত্যেকের মুখে একটা আলগা শ্রী ছিলো। যেন তিনটি হরিণী।

বাগানে অনেকই আমগাছ ছিলো। আম কুড়োবে কি তারা, আমার বন্ধুরা এবং আমিও আমাদের সবকটি তরুণ হৃদয় কল্পনাব আমেরই সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মিশিযে দিলাম তাদের পায়ের কাছে। দেখি, কার কারটা নেয়। জানালার ধারে আমাদের হুড়োহুড়ি এবং মুগ্ধতা, যা আদৌ অশোভন ছিলো না, কুরুচিকরও নয় ; তাদের চোখে পড়েছিলো। তারা হেসে, একটি করে আম হাতে নিযে ফিরে গেলো। হৃদয় নিলো না আম ; তা বুঝতে না দিয়ে।

ভালোলাগার মতো মেযে তো কতোই দেখা যায় ! কিন্তু এই তিন বোনের মধ্যে কোনো বিশেষ ব্যাপাব ছিলো। তাদের তেল-মাখানো খোঁপা, কোমর ছাপানো চুল, মা-মাসীমাদের মতো করে শাড়ি পরাব ধরন এবং তাদের মুখের গভীর সৌম্য এবং সম্ভ্রান্ত গ্রাম্যতা আমাদের সকলকেই একসঙ্গে মুগ্ধ করে ফেললো।

কলকাতার সুন্দরীদের মধ্যে আজকাল কোনো রকমফেরই চোখে পড়ে না। সকলেই একরকম করে শাড়ি পরে। কেউই চুলে তেল দেয় না। এবং চুল ছাঁটে। ভুরু প্লাক্ করে। ভুরু আঁকে। শাড়ির চেয়ে সালোয়ার-কামিজ বেশি পড়ে। কেউ কেউ বা আমাদেরই মতো ট্রাউজারস বা জিনস। উপরে পাঞ্জাবি।

যাই হোক, আমরা এইরকম আন-সফিস্টিকেটেড, পিওর, গ্রাম্য সুন্দরী তার আগে দেখিনি কখনও তাই সত্যিই শোকাহত হয়ে পড়েছিলাম ওরা চলে যাওয়ায়।

সুমিত বাজার করে ফিরলো। সব শুনে বললো, তোদের তো অবস্থা রীতিমতো খারাপ

দেখছি ! ইডিয়টস্‌ । এখনও কেউ প্রেমে পড়ে ? এই অলমোস্ট টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরিতেও ?

রসিক প্রদীপ বললো, বুকে হাত দিয়ে ; শুধু প্রেম নয়, মাসস্‌-প্রেম । একটা হিল্লে কর ভাই আমাদের । নইলে তোদের পুকুরেই আমরা তিনজনে মিলে ডুবে মরবো । আমাদের মধ্যে চতুর্থজন, সুহৃদ । সে চুপচাপই ছিলো ।

সুমিত বললো, ভাবনা কি ? আমি মাসীমাকে বলছি । যা ভালো রান্না করেন না মাসীমা ! শুঁটকি মাছ, কাউঠ্‌ঠা, ভেটকি মাছের কাঁটা-চচ্চরী । তারপরে হিজ-হুজ হুজ-হুজ এলেম ।

প্রদীপ বললো, গড়গড় করে বলে গেলি একগাদা নাম । ওগুলো কি জিনিসরে ? চাইনীজ ডিস নাকি ?

ধ্যাৎ । এগুলো বাঙাল-রান্না পদ্মাপারের নয়, একেবারে চাঁটগার : বিজাতীয় রান্নাই যদি খেতে হয় তাহলে কিন্তু বাঙালদেরই ! বুঝেছিস ! কোথায় লাগে থাইল্যান্ডের বা চাইনিজ ডিশ ।

সুমিত গিয়ে উজ্জ্বলকে ডেকে নিয়ে এলো । মেয়ে তিনটির দাদা । চমৎকার ছেলে । আমাদেরই সমবয়সী । লম্বা-চওড়া, সপ্রতিভ । কথায় একটু চাঁটগাঁইয়া টান আছে শুধু ।

বললো, আগামী সোমবার ভিলাইতে যাচ্ছে । ট্রেনিং-এ ।

একটু পরেই উজ্জ্বলের বাবা এলেন, সুমিতের পতুমেসো । সেই থেকে আমাদেরও পতু-মেসো । ভারী ভোলা-ভালা মানুষ । হাতে মস্ত একটি পেতলের জামবাটি । কুচকুচে কালো টাক নাড়িয়ে পতুমেসো সুমিতকে বললেন এই যে বাবা ! তোমার মাসীমা পাঠিয়ে দিলেন ।

কি মেসোমশায় ?

সিঙ্গিমাছের চচ্চড়ি, কালো-জিরে কাঁচালংকা আর বেগুন দিয়ে জম্পেস করে রেঁধেছেন তোমাদেরই জন্যে শুঁটকি মাছও পাঠিয়ে দিচ্ছি : বম্বে-ডাক । মনে হবে, মাংস । এখনও একটু বাকি আছে ।

উনি চলে গেলে সুমিত বলেছিলো, ভারী ভলো মানুষ রে ! যখনই আসি কত কী করেন । অথচ সম্পূর্ণ বিনা-স্বার্থে । এমন মানুষ আজকাল বেশি চোখে পড়ে না ।

॥ ২ ॥

মনে আছে উজ্জ্বলের ছোট তিন বোনের নাম ছিলো দীপিতা, ঈশিতা আর ঈপ্সিতা ।

বলাই বাহুল্য বছর চারেক কেটে গেছে তার পরে । ওদের একজনকেও আমাদের মধ্যে কেউই বিয়ে করিনি । কারণ কোনো অবকাশের মেঘলা দুপুরে ঝিরিঝিরি হাওয়া-বওয়া জীবনের সুখময় রোম্যান্টিকতায় পৃথিবীর সব যুবতীকেই বিয়ে করতে ইচ্ছে যায় সব যুবকেরই । কিন্তু সে সব ঘটনা পঞ্চাশ বছর আগে ঘটতো । এখন হিসেবী, সাবধানী মানুষের মন ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাল্টায় ।

এখনকার দিনের যুবকেরা, মেয়ের বাবার অবস্থা, মেয়ের চাকরি, কী পাবে না পাবে, সব না দেখে আদৌ এগোয় না । খবরের কাগজের সম্পাদকের দপ্তরে "জহর ব্রত" আর সতী"র বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় চিঠি লিখেই পাত্রপাত্রী কলাম নিয়ে হামলে পড়েন অনেক শিক্ষিত ছেলে এবং তাঁদের শিক্ষিত বাবা-মায়েরাও ।

না। আমি অথবা প্রদীপ অথবা সুমিত আমরা কেউই বিয়ে করিনি দীপিতা বা ঈপ্সিতা বা ইপ্সিতাকে। যদিও প্রদীপ এবং সুমিত বিয়ে করেছে বড়লোকের মেয়েদের। দেখতেও মন্দ নয় দুজনেই। দুজনেই এম· এ· পাশ। প্রদীপ মারুতি গাড়ি পেয়েছে। সুমিত ব্যবসা।

সুমিত এবং পতু-মেসোর পৌনঃপুনিক অনুরোধে উজ্জ্বলের জন্যে আমাকে একটি মেয়ে দেখে দিতে হয়েছিলো। দেখছিলো অনেকেই, আমারটাই বিঁধে গেলো।

আমাদের পাড়ার ফুচ্‌কুদা ভারী কেউকেটা· লোক।ব্যবসাটা ওঁর যে ঠিক কিসের তা কেউই জানে না। উনি বলেন, অর্ডার-সাপ্লাইয়ের। তবে ভালো অর্গানাইজেশান আছে বলে মনে হয়। কারণ নিজেকে খাটতে হয় না একটুও। বিনা পরিশ্রমেই এমন রমরমা ভালো অর্গানাইজেশান ছাড়া কিছুতেই হতে পারে বলে মনে হয় না।

পাড়ার লোকেদের সঙ্গে ব্যবহারও ভালো। তাঁর স্ত্রী নমিতাদিও খুবই মিশুকে।

উজ্জ্বলের বিয়েতে ঘটকালি করাটাই কাল হয়েছিলো আমার। ভাবলেই এতো খারাপ লাগে। ফুচ্‌কুদাকে তো ভালো বলেই জানতাম। কিন্তু এখন মনে হয় যে, তাঁর ভালো করাটা আদৌ উচিত হয়নি।

না, না। ডিভোর্স টিভোর্স নয়।

পতু-মেসো মানুষটি খুবই কষ্ট করেছেন সারাটা জীবন। মেয়েরাও প্রত্যেকেই যদিও শ্রীময়ী এবং শিক্ষিতা তবুও টাকা ছাড়া যে আজকাল বিয়ে হওয়া ভারী মুশকিল। তাই উজ্জ্বলই ছিলো পতু-মেসোর একমাত্র ভরসা। উজ্জ্বল যদি পায়ে ভালো করে দাঁড়ায়, এবং তার স্ত্রী যদি মন্দ-বুদ্ধির না হয় তবে উজ্জ্বল এক-এক করে নিশ্চয়ই তিন বোনকেই বিয়ে দিতে পারবে ভালো করে উজ্জ্বল যদি বউ নিয়ে আলাদাও থাকতে চায়, তো থাকুক না। সেখানেও যদি দীপিতাকে রাখে তাহলেও উজোর কোনো ভালো বন্ধু-বান্ধবই ওকে বিয়ে করবে। টাকাই তো সব নয়। এখনও তো ব্যতিক্রম কিছু আছে। তাই সকলকেই বলতেন, ছেলের জন্যে ভালো মেয়ে খুঁজতে। মেয়েদের না হলো, ছেলের তো হোক। বিয়েটা।

ফুচ্‌কুদা আর নমিতা বৌদদের বাড়ি ছেলেবেলায় সরস্বতী আর দুর্গাপুজোর দাঁচা আনতে যেতাম তখন ওঁদের মেয়ে শাশা আর ছেলে চকোর খুবই ছোট ছিলো। এই রবরবাও তখন হয়নি। এখন দেখি, শাশা বারান্দাতে ম্যাক্সি বা জিনস্ পরে দাঁড়িয়ে থাকে, হাত নাড়িয়ে ইংরিজিতে কথা বলে। ইংরিজিই যেন মাতৃভাষা। বাংলা একটা গণ্য করার মতো ভাষাই নয়। ও ভাষায় শুধু কেরানী আর মাছওয়ালারাই কথা বলে এমনই একটা ভাব। এও আরেক রোগ হয়েছে আজকাল বাঙালীদের। কী কেলো! কথায় কথায় "ওহ্ মাই মাই!" "গুড গ্রেসাস্" "আউচ্" ইত্যাদি ছিট্‌কে বেরোয়! ইংরেজদের পদানত যখন ছিলাম আমরা তখন কিছু স্ব-ধর্ম, স্ব-সংস্কৃতি, স্ব-সংগীত, স্ব-ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কু-জাত একধরনের বাঙালীদের মধ্যে "ড্যাডি! ড্যাডি! ছাপ্পর-পর পিজন্ বৈঠে বৈঠে" সংস্কৃতি গজিয়ে উঠেছিলো ইংরেজদের জুতোর তলা চাটার জন্যে। তখন তারও মানে বোঝা যেত কারণ, তাতে লাভ ছিলো কিছু। "ডাউটফুল পেরেন্টজের" মানুষরা চিরদিনই বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ফায়দা উঠিয়েছে। তাদের সুন্দর ফিগারের স্ত্রীদের ভাঙিয়ে খেতেও তাদের বিবেকে বাধেনি! কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার চল্লিশ বছর কেটে যাওয়ার পর এই 'বিলেটেড' সাহেব-মেমদের ভাঁড়ামো যে-কোনো সুস্থরুচির শিক্ষিত, ইংরিজি-জানা মানুষের চোখেও অত্যন্তই বিরক্তিকর ঠেকে। শিক্ষাজাত ও সপ্রতিভতা। এক ধরনের জিনিস কিন্তু সপ্রতিভতার সস্তা র‍্যাপিং-পেপারের নির্মোক অন্য।

তবু, ফুচ্‌কুদার টাকা আছে এবং শাশা একই মেয়ে এবং উজ্জ্বলের বাবারও ইচ্ছে দে

উজ্জ্বলযেন একটি শক্ত খুঁটি পায় তার শ্বশুরের মধ্যে, তাই সম্বন্ধ করেছিলাম।

পতু-মেসো সদ্বংশজাত মানুষ। ছেলের বিয়েতে এক পয়সাও নেবেন না এবং মেয়েদের বিয়েতেও দেবেন না এক পয়সাও। এই ধনুক-ভাঙা পণ; যারা "গরু-ছাগলের" মতো ছেলে-মেয়ে বেচাকেনা করে সেগুলোকে পতু-মেসো মানুষ বলেই গণ্য করেন না।

কী করে কি হলো জানি না। ফুচকুদাকে উজ্জ্বলের কথাটা বলতে উনি বিশেষ গা না করে বললেন, দেখি আগে ছেলে কেমন? পরিবার কেমন? ঝপ করে কি মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়? আমার কাছে পতু-মেসোর ঠিকানাটি নেবার পর একেবারেই চুপ মেরে গেলেন।

খবর পেলাম আবার যখন, তখন বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ের দিন কুড়ি বাকি। ফুচকুদা তাঁর চাপরাশীকে দিয়ে বিয়ের চিঠি পাঠালেন। এক লাইন খামে লিখে: "বুঝতেই পাচ্চো, কী ঝামেলাতে আচি। আসা চাইই।"

শাশা এবং উজ্জ্বলের বিয়ের সময়ই ফুচকুদার বাড়িতে পতু-মেসো, দীপিকা, ঈশিতা এবং ইপ্সিতার সঙ্গে দেখা হয়ে ছিলো। সুমিতের সঙ্গেও।

পতু-মেসো ফুচকুদার দু হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন: আমার ছেলেকে আপনার হাতে সঁপে দিলাম।দেখবেন, আমি বড় অভাগা, দুর্বল এবং গরীব তো বটেই; আমার ছেলেকে যেন না-হারাতে হয়। ওই আমার এবং আমার মেয়ে তিনটির একমাত্র আশা-ভরসা।

ফুচকুদা তাচ্ছিল্যের গলায় অসভ্যের মতো বললেন, ন্যাকামি ছাড়ুনতো। আপনার ছেলে কি শিশু নাকি যে তাকে আমি যাদু করে রেখে দেবো? তাছাড়া, তা করবোই বা কেন? আমার কি নিজের ছেলে নেই? চকোর?

পতুমামা কীরকম যেন আহত চোখে, আস্তে আস্তে ফুচকুদার হাতটা ছেড়ে দিলেন।

আমার খুব খারাপ লাগছিলো। আমার মা বলতেন কক্ষণও বিয়ের ঘটকালিতে আর দাম্পত্য-কলহে থাকবি না। পরে দেখবি মিছিমিছি দু পক্ষেরই কাছে শত্রু হয়ে উঠেছিস।

বৌ-ভাতে ফুচকুদাতো বটেই পতু-মেসোও আমাকে নেমন্তন্ন করেননি। অবাক এবং আহত হয়েছিলাম।। বলতে গেলে, ঘটক হলাম গিয়ে আমি। আর আমাকেই কি না

পরে পতুমেসো একটি চিঠি লিখেছিলেন ইনল্যাণ্ড-লেটারে।

পরমকল্যাণীয়েষু, বাবা শুভ,

অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে জানাইতেছি যে তোমাকে উজ্জ্বলের বৌভাতে নিমন্ত্রণ জানাইতে পারিলামনা। অথচ তুমিই এই বিবাহের ঘটক।

কেন পারিলাম না, তাহা পরে কখনও সাক্ষাতে জানাইবো। এক্ষণে লিখিবার অসুবিধা আছে।

ভালো থাকিও। একদিন আসিও। তোমার মাসীমা তোমার কথা বলিতেছিলেন। প্রায়ই বলেন। নির্ভয়েই আসিও। আমার কোনো কন্যাকেই তোমার স্কন্ধারূঢ় করিব না। আমার কোনো কন্যাই অবরক্ষণীয়া হইয়াছেন এমনও নহে। তাছাড়া তাহারা নিজেরাই নিজেদের দায় লইতে সক্ষম।

ইতি আঃ পতুমেসো।

॥ ৩ ॥

তারপরে বহুদিন পতু-মেসোর বা সুমিতেরও আর কোনো খবর রাখি না। ওদের মামাবাড়ির বাগানেও যাওয়া হয়নি। আমাকে মাঝে হাজারীবাগে করে দিয়েছিলো। সেখানে একটি অ্যাকাউন্ট নিয়ে ঝামেলা হয়েছিলো। চাকরি যাওয়ারই উপক্রম হয়েছিলো প্রায়। তারপর বম্বেতে ট্রেনিং-এ গেলাম ফিরে ব্যাঙ্গালোরে।

কলকাতায় যখন থাকতাম তখন দু একবার দেখেছিলাম উজ্জ্বল ফুচকুদাদের বাড়িতে আছে। বারান্দাতে দেখতে পেতাম। বেড়াতে এসেছে সম্ভবত। একবার মায়ের কাছে শুনলাম যে, উজ্জ্বল প্যারাদীপ না হলদিয়া না ডিগবয় কোথায় যেন ট্রান্সফার হয়ে গেছে।

আমার এখনও বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। আমার পরের বোন সোমা গোঁ ধরেছে যে "পায়ে না দাঁড়িয়ে" বিয়ে করবে না। বিয়ে ওর অবশ্য ঠিকই হয়ে রয়েছে। সৌরীন ডাক্তার। প্রায়ই আসে আমাদের বাড়ি। সোমার পায়ে দাঁড়াতে এখনও বছর খানেক। মায়ের ইচ্ছা নয় যে, আমি সোমার বিয়ে না দিয়ে আগে বিয়ে করি। অবশ্য আমার কাউকে পছন্দও নেই। পছন্দ করার সময়ই নেই। মেয়েরাও বোধহয় সাধারণভাবে আমাকে অপছন্দ করে।

এক রবিবার সুমিতদের বাড়িতে গেছি। সুহৃদ, প্রদীপ, সকলেই এসেছিলো। সুমিত লেট-লতিফ। ছুটির দিনে দশটা অবধি ঘুমোয়। সকলে ওর ঘরে বিছানার উপরে বসে গুলতানি মারছি। এমন সময় সুমিত বললো, যাঃ চলে! ভুলেই গেছিলাম শুভ্র। তোর নামে একটি চিঠি এসেছে আমার কেয়ারে। পতুমেসোর কাছ থেকে।

সুহৃদ সুমিতের বিছানাতে শুয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে রবিবারের কাগজ পাতা-ফরফরিয়ে পড়ছিলো।

এ কথা শুনে হঠাৎ বললো, আমাকে লক্ষ করে দ্যাখ। দ্যাখ। এবার তোর ঘাড়টি মটকালো বলে। ঘাড় খালি যে রাখে তারই মরণ! যে ভদ্রলোকের নিজের ঘাড়ে তিন তিনটি অনূঢ়া কন্যা তিনি তোর মতো ব্যাচেলরের ঘাড় ভাঙবেন না তো কে ভাঙবেন? বেচারা! আর না ভেঙে করবেনই বা কি?

সকলেই ঝুঁকে পড়ে দেখতে গেলাম চিঠিটি একসঙ্গে। মধ্যে দিয়ে কাগজটাই ছিঁড়ে গেলো।

আমি ওদের দেখালাম, চিঠির উপরে "পার্সোনাল" লেখা।

ওরা বললো, সরি!

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান শুভ্র বসু

প্রযত্নে/পরম কল্যাণীয় শ্রীমান সুমিত চট্টোপাধ্যায়

১০০, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট,

কলকাতা-৭০০ ০২৯

বাবা শুভ্র,

উজ্জ্বলের বৌভাতে তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই এবং সে কারণে বৌভাতের পরে পরেই তোমাকে একটি পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্রে এমৎ কহিয়াছিলাম যে না-করার কারণ

তোমাকে পরে জানাইবো।

এক্ষণে জানাই যে, উজোর শ্বশ্রমহাশয় আমাকে বারণ করিয়াছিলেন। কহিয়াছিলেন যে পাড়ায় তাঁহার বিশেষ সম্মান আছে পাড়ার লোককে বলিতে হইলে এক হাজার মানুষকে বলিতে হইবে। তেমন সামর্থ্য কি আপনার আছে?

আমি কহিয়াছিলাম তাহা নাই সত্য। কিন্তু শুভ্রই যে এই বিবাহের মূলে। কিন্তু তিনি কর্ণপাত করেন নাই।

যে-কারণে আজ তোমাকে পত্র লিখিতেছি তাহা অতি করুণ। এমনকি তাহা তোমার নিকট বিশ্বাসযোগ্যও না হইতে পারে। কিন্তু আমি তোমা বই আর কাহাকেই এ কথা বলিতে পারিতেছি না। বাবা, এ যে বড়ই লজ্জার কথা, বাবা হইয়া নিজ পুত্র সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিবোই বা কি করিয়া?

আমার ও আমার স্ত্রীর প্রাণাধিক 'উজো', তাহার তিন ভগিনীর নয়নের মণি উজো হারাইয়া গিয়াছে। না, না, অন্যরূপ ভাবিও না। হারাইয়া গিয়াছে অর্থাৎ চুরি হইয়া গিয়াছে। সে প্রথমে দুর্গাপুরে জয়েন করিয়াছিলো। বিবাহের পরে ছয় মাস পর্যন্ত অনিয়মিত ভাবে একা আসিত। তাহার পর রাউরকেল্লাতে বদলী হইয়া চলিয়া যাইবার পর মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখিতো এবং টাকারও পাঠাইতো। তাহার পর হইতে তাহার আর কোনোই সংবাদ জানি না। সে যে কোথায় রহিয়াছে, কেমন রহিয়াছে গত দীর্ঘ দুই বৎসরে তাহার কিছুই জানি না।

তাহার দুর্গাপুরস্থ এক বন্ধু চিঠি লিখিয়া জানাইয়া ছিলো যে, সে সস্ত্রীক বিদেশে বেড়াইতে গিয়াছে। এবং ফিরিয়াই রাউরকেল্লা হইতে ভিলাই চলিয়া যাইবে। তাহাকে ট্রান্সফার করা হইয়াছে। পদমর্যাদাও বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমার পুত্রবধূ শাশাও গত আড়াই বৎসর হয় আমাকে, তাহার শশ্রূমাতাকে অথবা তাহার ননদিনীদিগকে একটিও পত্র লেখে নাই। প্রি পেইড টেলিগ্রাম পর্যন্ত করিয়াছি। উত্তর পাই নাই।

অদ্য হইতে প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে আমার বেয়াই মশাইয়ের নিকট নিরুপায় হইয়া একদিন গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া আমার পুত্রের বিশদ সংবাদ প্রার্থনা করি। এমন সময় আমি উজোর কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাই দোতলাতে।

ফুচকুবাবু একতলার বসিবার ঘরে আমাকে বসাইয়া রক্তচক্ষু করিয়া বলেন পতুবাবু, আপনার ছেলে, মনে করুন, চুরি হইয়া গিয়াছে। শিশুকালেও চুরি যাইতে পারিতো। দুঃখ করিবেন না। সে তো শিশ্রকালেও অপহৃত হইতে পারিতো। না হইয়া ভরা যৌবনে হইয়াছে। আপনি গাত্রোত্থান করুন। আপনার পুত্রের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নহে। উজ্জ্বল এখন আর আপনার পুত্র নহে, সে আমার জামাতা হইয়াছে। এবং তাহাই থাকিবে। ভবিষ্যতে আর কখনওই তাহার খোঁজ করিবার চেষ্টা করিবেন না এবং যত শীঘ্র সম্ভব আপনি এই স্থান ত্যাগ করিয়া যান।

আমি সংযম হারাইয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, জানোয়ার! তোমাকে আমি গলা টিপিয়া হত্যা করিব।

ফুচকুবাবুর দারোয়ান আর কুকুরে আমাকে প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলো। পেছনের গ্যারাজে আমাকে বলপূর্বক লইয়া গিয়া বন্ধ ভ্যানে চাপাইয়া সাদার্ন অ্যাভিন্যুর নির্জন স্থানে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। আমার চশমাটি ভাঙিয়া বাম চোখের নীচে অনেকখানি কাটিয়া যায়।

তুমি ভাবিতে পারো যে, এই সব আমার কষ্টকল্পিত ঘটনা। বিশ্বাস করিও, যে ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। ধাক্কা মারিয়া পথে ফেলিবার পূর্বে আমাকে এই বলিয়া শাসানো হইয়াছিলো যে, ভবিষ্যতে আবারও আসিলে মিথ্যা পুলিশ কেস দিয়া আমাকে চোর প্রতিপন্ন করিয়া তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। পুলিশের সঙ্গে তাঁহার খুবই দহরম মহরম।

একজন দুইজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে অনেকেরই আলাপ থাকিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সমগ্র পুলিশ বাহিনীর সহিত দহরম মহরম করেন তাঁহারা মানুষ আদৌ ভালো নহেন। হয় তাঁহারা নিজেরা চোর-জুয়াচোর অথবা খুনী বা চোরা-চালানকারী।

আমিও আর যাই নাই। আমার বেয়াই প্রতাপশালী ব্যক্তি এবং দুষ্ট ব্যক্তি, তাঁহার পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব। ক্ষমতা যদি দুর্জনের কুক্ষিগত হয় তখন তাহার রূপ হয় প্রলয়ংকরী।

আমি এক্ষণে অসুস্থ। এমনই অসুস্থ যে-শয্যা হইতে উঠিতে পর্যন্ত পারি না। মেয়েদের কাহারও বিবাহ হয় নাই। এমন যোগ্য পুত্র থাকিতেও সে নাই। এমতাবস্থায় আমার কী করণীয় তাহা তুমি ও তোমার বন্ধুরা মিলিয়া যাহা স্থির করিবে তাহাই মানিয়া লইব।

তুমি শুঁটকি মাছ খাইতে ভালোবাসো। যেদিন আসিবে তাহার তিনদিন পূর্বে একটি পোস্টকার্ড ফেলিয়া দিও। তোমার মাসীমা তোমার নিমিত্ত শুঁটকি মাছ রাঁধিয়া রাখিবেন।

অপেক্ষা করিবার সময় আমার আর বেশি নাই। যথাসম্ভব শীঘ্রই আসিও।

এই অসহায় সম্বলহীন বৃদ্ধের অপরাধ নিজগুণে মার্জনা করিও।

—ইতি আশীর্বাদক পতঞ্জলি রায়

স্তব্ধ হয়ে আমি চিঠিটি ওদের দিকে এগিয়ে দিলাম। সুমিত জোরে জোরে পড়লো, যাতে সকলে শুনতে পারে।

চিঠি পড়া হলে পর প্রদীপ বললো, কী কেলো বলতো!

সুহৃদ বললো, এতো আজকাল হরদমই হচ্ছে। জানিস না? ছেলে বা মেয়ের বাবার মধ্যে যে বেশি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সেই পাবলিক বা প্রাইভেট সেক্টরের বড় সাহেবদের বলে নিজের জামাইকে বা ছেলেকে বা পুত্রবধূকে যেখানে সেখানে ট্রান্সফার করিয়ে দিচ্ছেন। এমন জায়গায় করছেন, যাতে জামাইয়ের বা পুত্রবধূর "চুরি হয়ে যাওয়া" ছাড়া উপায়ই নেই।

মেয়ের হয়তো বনছে না শাশুড়ির সঙ্গে তো দে জামাইকে এর্নাকুলাম-এ ট্রান্সফার করে। যাক এবারে শ্বশুর-শাশুড়ি সেখানে গাঁটের কড়ি খরচা করে বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করতে! বছরে কতবার পারবে যেতে? আর গেলেও কোমরের ব্যথার চিকিৎসা করাবে আগে? না ঝগড়া করবে? আবার ধর, বাড়িতে প্রবলেম। পুত্রবধূ বড় ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করছে। এ দিকে পঙ্গু শ্বশুর। খিটখিটে শাশুড়ি। যেই জানা গেল, পুত্রবধূর বাবা জামাইকে ট্রান্সফার করাবার তালে আছেন, তখনই দে আরো বড় মুরুব্বী ধরে ট্রান্সফারের পথে কাঁটা বসিয়ে। কত লোক টাকাও বানিয়ে নিচ্ছে আজকাল এই করে।

বলিস কী রে!

হ্যাঁ রে। যার এলেম আছে সে সমুদ্রের ঢেউ গুণতে দিলেও টাকা বানায়। এলেম কী আর চাট্টিখানি কথা।

প্রদীপ বলো, তা ট্রান্সফার করলেও জানা যাবে না কোথায় ট্রান্সফার করলো?

উপর-মহলে জানা থাকলে তবেই না এমন ট্রান্সফার করানো সম্ভব? আর পতু-মেসো

অতি সাধারণ মানুষ। জনবল অর্থবল কিছুই নেই। তাঁর পক্ষে ছেলের বা জামাই-এর কোনো কলিগ্-টলিগ্‌কেও জানা না থাকলে কোথায় ট্রান্সফার হলো তা জানবেনই বা কি করে? তাছাড়া বড়সাহেব, অপারেটর, রিসেপশনিস্ট বা এরীয়া ম্যানেজারকে টিপেওতো রাখতে পারেন! তাঁদের ঠেকাচ্ছেটা কে?

তা ঠিক। আমি বললাম।

প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষিত বন্ধুরা পতু-মেসোর এই এস-ও-এসকে বিশেষ গ্রাহ্যর মধ্যেই আনল না দেখে একটু ব্যথিত হলাম আমি। ওরা "অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাসন" করেই নিজের নিজের কর্তব্য শেষ করলো।

সুমিতই একমাত্র বললো, তোকে লিখেছে "পার্সোনাল" চিঠি, তুই দেখে আয়। টাকাপয়সা কিছু দিতে হলে চাঁদা তুলে দেওয়া যাবেখন।

সুমিত চান করে তৈরী হলে ওবা সকলে গেলো টিটুর বাড়ি ভিডিও দেখতে। মোৎজার্টের জীবন নিয়ে ভিডিও ছবি "অ্যামেডিয়াস্"। ওখানেই খাওয়া দাওয়া করবে সকলে। টিটুর বৌদি নেমন্তন্ন করেছেন।

চা খেয়ে বললাম, আমি কিন্তু উঠছি। "অ্যামেডিয়াস" আমি দেখেছি। বৌদিকে বলিস কিছু মনে না করতে। চমৎকার ছবি। দেখে আনন্দ পাবি।

সুমিতদের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে মোটরসাইকেলটা স্টার্ট করতেই তার এঞ্জিনের ভট্‌ভট শব্দ যেন অ্যামপ্লিয়ারে শতগুণ বেড়ে উঠে আমার কানের মধ্যে ভট্‌ভট্ করে উঠলো। আমি সোজা চললাম বাদুর দিকে।

পতুমেসো প্রায়ান্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে অনেক কথা ভাবছিলেন। এখন বিছানা থেকেউঠতে পারেন না। কিছুকরতেও পারেন না করার মতো। শুধু ভাবতে পারেন।

যে-যুগে ভালোমানুষী ও সারল্যের মতো মুর্খামি আর দুটি হয় না সেই যুগে পতুবাবুর মতো সরল ভালোমানুষ যে কী করে জন্মান তা ভাবাই যায় না।

বাড়ি ছিলো চিটাগঙ্গ-এ। পাহাড়, সমুদ্র, সামুদ্রিক পাখি আর শুঁটকি মাছের দেশ। শিশুকালে একবার কক্সবাজারেও গেছিলেন।

সে সব এখন স্মৃতি। পার্টিশানের সময় ওঁর বয়স ছিলো বারো। আজ পনেরোই আগস্টে ছাপ্পান্ন হলো।

প্রথমে উদ্বাস্তু হয়ে গেছিলেন আসামে। সেখান থেকেও তল্পি গুটিয়ে আসতে হলো বাঙালী জাতির শেষ অবলম্বন এবং ক্ষয়িষ্ণু কলকাতাতে। তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ।

বাঙালীর চরিত্র যে কী প্রকার খারাপ তা নিয়ে পতুবাবুর কোনোরকম উত্তাপ ছিলো না কোনোদিনই উনি নিজস্ব সমস্যাসমূহ নিয়ে বড়ই ন্যস্ত ছিলেন। সমাজ, যুগ, দেশ, কাল, কংগ্রেস, সি পি এম, জনমোর্চা, রাজীব গান্ধী অথবা কিমি কাটকার ইত্যাদি কোনো কিছু সম্বন্ধেই দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষেরই মতো ওঁর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিলো না। পরম দুর্বিপাকের মধ্যেও খেতে পান আর নাইই পান ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো তিনি ঠিকই চালিয়ে গেছিলেন। মেয়েরাও ভালোই ছিলো পড়াশুনায় কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট ছিলো উজ্জ্বল। আসামে থাকার সময়ও আসাম সরকারের বৃত্তি পেয়ে পড়েছিলো। কলকাতাতে এসে পতুবাবুর বাদুর কাছাকাছি প্রায় বস্তির মতো আস্তানাতে থেকে "উজ্জো" এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এবং ফারস্ট হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়। বিরাট কোম্পানী থেকে ডেকে চাকরীর দেয় তাকে। এই বাজারে ক জনের ছেলেকে ডেকে চাকীর দেয়?

সুমিতের বড়মামার বাগানবাড়ির পাশ দিয়েই এল। অনেক দিন আসিনি এদিকে। বড়

শ্রীহীন হয়ে গেছে পুরো এলাকাটি গাছপালা তো নেই-ই নতুন নতুন নানা ঢঙের নানা ধাঁচের বাড়ি উঠেছে। আর বেড়েছে মানুষ এবং যানবাহন। পাখির ডাক শোনা যায় না। কর্কশ চিৎকার। রুক্ষ। আমগাছেরও বেশির ভাগই নেই।

পতু-মেসোর বাড়িটাও চেনা যায় না। টিনের চালের, পাকা দেওয়ালের বাড়ির একদিকের ছাদের টিন ঝড়ে উড়ে গেছে। পেঁপে গাছে দাঁড়কাক ডাকছে খাখা করে। মনে হচ্ছে সব বুঝি সত্যিই খেয়ে নেবে।

দীপিতা পুকুর থেকে নেয়ে উঠে পুকুরপাড়ের টিউবওয়েল থেকে জল তুলে স্বচ্ছ ভেজা শাড়িতে ভেজা চুলে কোমরে জলের ঘেড়া তুলে নিয়ে আসছিলো। প্রথমে আমি ওকে চিনতে পারিনি। ও-ও পারেনি আমাকে। কোথায় গেছে সেই ঢলঢলে রূপ!

হতবাক হয়ে আমি ভাবছিলাম, দারিদ্র্য যেখান দিয়ে হাঁটে তার দুপাশ বড় নোংরা করে যায়। শুয়োরেরা যেমন কচুবন উপড়োয়, দারিদ্র্যও তেমন শ্রী, সুখ; শান্তি, বোগোনভেলিয়া ফুলগুলিকে পর্যন্ত খেয়ে নিয়েছে দারিদ্র্য।

আমি মুখ নামিয়ে বললাম, পতুমেসো।

দীপিতা বললো, আসছি আমি।

বলেই, ভেতরে গিয়ে জামা পড়ে শাড়ি বদলে এলো জামাটাও ছেঁড়া। শাড়িরও তথৈবচ অবস্থা। বললো, বাবা অসুস্থ আপনার কথা বলেছি ভিতরে আসুন।

ভিতরে না গেলেই পারতাম।

পাঁচ ইঞ্চি সিমেন্টের দেওয়ালের প্রায় জানালাহীন ঘর। উপরে টিনের ছাদ। তেতে আগুন হয়ে আছে। পতুমেসো একটি তক্তপোষের উপর অতি মলিন বিছানায় শুয়ে আছেন একটি নোংরা তেলচিটে বালিশের উপর মাথা রেখে। চেনাই যাচ্ছে না। দড়ির মতো হয়ে গেছে শরীর।

মাসীমা একটি ভাঙা টিনের চেয়ার পেতে দিলেন বিছানা রপাশে।

বললেন, কেমন আছো শুভ্র ?

আমার নাম যে শুভ্র এ কথাটি মনে হয়ে বড় লজ্জা হলো আমার। এই ঘরে, এই বিছানাতে, এই মানুষের সামনে শুভ্রতার চেয়ে বড় ভ্রষ্টতা আর কিছুই হয় না।

আমি বললাম, কী হয়েছে মাসীমা ওঁর ?

পতুমেসো চোখ খুললেন হঠাৎই ভীষণ উত্তেজিত ভাবে। এ দিক ওদিক কাকে যেন খুঁজলেন। যেন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর মাথার কাছে। তারপর আমাকে দেখেই হাত চেপে ধরলেন। বুকের উপর ধরে রইলেন হাতটা।

ওঃ তুমি!

নিরাশ গলায় বললেন উনি। তারপরই চোখ বুজে ফেললেন।

বললাম, পতুমেসো, এসেছি। আমাকে সব খুলে বলুন।

দোষ শুধু আমাদের পাড়ার ফুচকুদাকে দিয়ে কি হবে ? আপনার এতো ভালো ছেলে উজ্জ্বল কি ইচ্ছে করলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতে না ? পারতো না যে, এ কথা অমি বিশ্বাস করি না।

না। ও পারে না। সত্যি। বিশ্বাস করো। ওর হাত-পা বাঁধা। ফুচকুর লোক পোস্ট-অফিসে পর্যন্ত আছে। উজ্জ্বলের তার মা ও বোনেদের কাছে লেখা চিঠিগুলি পর্যন্ত সেই দৈত্যর হাতে চলে যায়।

আপনার কি হয়েছে পতুমেসো ?

জিগ্যেস কোরো না। আমার পেটে ও গলায় ক্যান্‌সার। বড় যন্ত্রণা শুভ্র! কিন্তু যখনি দীপিতা, ঈশিতা আর ইঙ্গিতার মুখে চোখ রাখি তখুনি তাদের মনের যন্ত্রনা অন্য সব যন্ত্রণা অন্য সব যন্ত্রণাকে ডুবিয়ে দেয়। বড় যন্ত্রণা শুভ্র।

ফুচ্‌কুদাকে গিয়ে কি কিছু বলব?

মাথা খারাপ। ভগবানের কাছে তো বটেই, মানুষের কাছেও মাথা নোয়ানো যায়। কিন্তু উনি তো মনুষ্যেতর জীব। তার কাছে যেন মৃত্যুর ক্ষণেও মাথা না-নোয়াতে হয়।

তো কী করব?

তোমার তো অনেক জানাশোনা। যদি ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টে খোঁজ নিতে পারো!

নেব। আমি বললাম। উজ্জ্বল কি ওখানে আছে?

জানি না। চেষ্টা করে দ্যাখো। জানতে পারো কি না!

উজ্জ্বলের চিঠি না হয় আসছে না। উজ্জ্বল নিজেও কি একদিনের জন্যে আসতে পারে না?

আমার মনে হয় পারে না। তোমার ফুচকুদাকে তুমি চেনো না।

কী জানি!

এমন সময় দীপতি এলো। হাতে এককাপ চা নিয়ে।

বললো, চা খান।

ওর সঙ্গে চোখাচোখি হলো। আমার মনে হলো, আমি শিক্ষিত উপার্জনক্ষম যুবক। আমার শিক্ষা আমাকে কিছু কর্তব্য-দায়িত্ব দিয়েছে। দেওযাটা উচিত অন্তত। যে কারণে আমার শিক্ষা নিয়ে আমি গর্বিত।

দীপিতা তখনও দাঁড়িয়েছিলো।

আমি বললাম পতুমেসো, আমি দীপিতাকে চাইতে এসেছি।

কথাটা বলে ফেলেই ন্যায্য কারণে নিজের সম্বন্ধে আমি গর্বিত হলাম।

পতুমেসোর চোখ দুটো ঘোলাটে দেখালো।

বললেন, ভাড়া নেবে? ক রাতের জন্যে?

আমি মুখ নামিয়ে নিলাম।

কী হলো, বলো?

আমি বললাম, আমি দীপিতাকে বিয়ে করতে চাই।

বিয়ে?

দীপিতা?

আমি দীপিতার মুখে তাকালাম।

তারমুখে না-হাসি, না-কান্না, না-রাগ, না-লজ্জা, না-বিস্ময় ফুটে রইলো বে-মওকা কেটে-যাওয়া চাঁদিয়াল ঘুড়ির মুখের ভাবের মতো।

দীপিতা চলে গেলো ঘর ছেড়ে।

আমি বললাম ঈশিতা আর ইঙ্গিতা কোথায়?

ওরা অফিস করে। অফিসে গেছে।

কি অফিস?

জিজ্ঞেস করি না শুভ্র। শুভ্র, আমি ভয়ে কখনওই জিগগেস করি না। রোজ সকালে ডাল-ভাত আর আলু সেদ্ধ আর কচু সেদ্ধ খেয়ে চলে যায় হাতে দুখানি একসারসাইজ বুক আর বই নিয়ে। ফিরতে ফিরতে সাতটা-আটটা। কত টাকা পায় জানি না।

ওদের সঙ্গে দেখা হবে না তাহলে ?

হতে পারে, যেখানে ওরা দেখা দেয়। সে কোথায়, আমি তো জানি না শুভ্র।

আমি দীপিতাকে চাই।

সম্মানের সঙ্গে চাও ? সদ্বংশজাতা নারীর মতো যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে তো শুভ্র ? বিশ্বাস কোরো, দোষ ঈশিতা ইঙ্গিতারও নয়, দোষ আমার। দোষ সেই শালা নেতাদের যারা আমাকে আমার সম্পূর্ণ বিনাদোবেই রাতারাতি উদ্বাস্তু করেছিলো। দু দুবার। জিন্না আর নেহরুর।

আমি বললাম, পারবো। পারবো। মেসোমশাই।

আমার গলা ধরে এসেছিলো।

উঠে পড়ে, হেড-গীয়ারটা হাতে নিয়ে বললাম, আমি আবার আসবো। আমি কিন্তু দীপিতাকে চাই।

আবার যেদিন আসবো সেদিন যেন ঈশিতা আর ইঙ্গিতা বাড়ি থাকে। পোস্টকার্ড ফেলে আসবো।

পতুমেসো চুপ করে থাকলেন।

হাতটা তুললেন।

কার উদ্দেশে জানি না।

॥ ৪ ॥

পরদিন ভোরে চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ খুলেই দেখি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা-করা দুই যুবতীর ছবি। ঈশিতা আর ইঙ্গিতা। দুই বোন।

চা পড়ে গেলো খবরের কাগজে। আমি সোজা ফুচ্‌কুদার বাড়ি গেলাম। তিনি তখন প্রাতঃকালীন ভ্রমণ সেরে এসে যোগব্যায়াম করছিলেন।

একতলার বসার ঘরে ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর চটি ফটফটিয়ে নিচে নামলেন তিনি।

বললেন, পুলিসের কোনো বড়সাহেবকে বলতে বলছো তো ?

না। আমি আপনার কাছে এর জবাবদিহি চাইতে এসেছি।

জবাবদিহি ! অমার কাছে ? মুখ সামলে কথা বলো হে ছোকরা !

আপনিও মুখ সামলে কথা বলবেন। আপনি একটি ইতর, জানোয়ার। উজ্জ্বলকে এরকম করে ওর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন কেন ? আপনার মনে নেই পতুমেসো অনুনয় করে আপনাকে কি বলেছিলেন ? বিয়ের সময়ে।

হাঃ। তুমি বিয়ে করলে তুমিও বুঝবে। যে পুরুষ যখন যে নারীর স্তনে মুখ রাখে সে পুরুষ তখন তার।

মানে ?

মানে মাতৃস্তনে রাখলে মায়ের, স্ত্রীর স্তনে রাখলে স্ত্রীর, রক্ষিতার স্তনে রাখলে তার। উজ্জ্বল এখন শাশার। ব্যাটা ম্যাড়া যদি বাপমায়ের খোঁজ না রাখে সেই দোষ কি আমার ?

ফুচ্‌কুদা !

দ্যাখো ছোকরা। আমাকে ভয় দেখিও না। তেলাপোকা ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আমি ভয় পাই না।

এই দুটি নিষ্পাপ মেয়েকে হত্যার জন্যে আপনিই দায়ী।

নিষ্পাপ ? ফুঃ। তুমি যদি শুতে চাইতে কালই শুইয় দিতাম। অবশ্য এখন আর…

এই ইতরের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। চলে এলাম ওখান থেকে। ভাবলাম, মোটর সাইকেল নিয়ে আমি তখুনি যাই পতু-মেসোর বাড়ি। কিন্তু কী করবো গিয়ে ? আমি এমন ঘনিষ্ঠ নই যে, আমি গেলে ওঁরা শোকে সান্ত্বনা পাবেন। এই শোক এতোই গভীর, এতোই তীব্র যে, আমি গেলে বিব্রতই হবেন শুধু ওঁরা। তাই আমাদের পাশের বাড়ির ভন্টেকে ডেকে মোটর সাইকেলটা দিলাম। দীপিতার নামে একটা চিঠি দিয়ে, চিঠির মধ্যে এক হাজার টাা পাঠালাম। ভন্টেকে বললাম যে, পোস্টমর্টেমের পর কোথায় দাহ হবে তা জেনে যেখান থেকেই হোক আমাকে একটা ফোন করে দিতে। আর দাহর বন্দোবস্ত সব করতে। উজ্জ্বল এসেছে কি না তাও জানাতে বললাম।

ভন্টে ফোন করলো দুটোর সময়ে। বললো আজ যে রবিবার। দাহ আজ হবে না। পোস্টমর্টেমও হবে কাল। দাহ হতে হতে কাল। কি করবো ?

চলে আয়। দীপিতা কি বললো ?

চিঠিটা পড়লো। টাকাটা ফেরত দিয়েছে। বললো পরে চিঠি লিখবে তোমাকে শুভ্রদা।

পতু মেসো কি করছেন রে ? কেমন আছেন ?

শুয়ে শুয়ে গীতাপাঠ করছেন।

মাসীমা ?

কাঁদছেন না। দু চোখে আগুন। ছোট দু বোনকে নাকি প্রতি শনি রবিবারে দলের পর দল লোক দেখতে এসেছিলো গত দেড় বছর ধরে। রসগোল্লা সিঙ্গারা খেয়ে গেছে। গান শুনেছে, চুল দেখেছে, পায়ের নখ দেখেছে। পছন্দও করেছিলো সব দলই। শুধু দাবীর জন্যেই বিয়ে হয়নি কোথায়ওই। প্রত্যেকেরই ভালোরকম দাবী ছিলো।

বলিস কি রে ? জ্যোতিবাবুদের পশ্চিমবঙ্গেও এরকম হয় ?

সব জায়গাতেই হয় শুভ্রদা। সব জায়গাতেই নোংরা। উপরে শুধু একটি একটি সাদা চাদর পাতা। দুর্ঘটনায় মৃত মানুষের ডেডবডির উপরে যেমন পাতা থাকে। তোমার নামটা এবার পাল্টে ফেলো। হাইটাইম। তোমার তোমার এই শুভ্র নামটা মধ্যে কেমন একটা ভণ্ডামি-ভণ্ডামি গন্ধ আছে। এই দেশে ও নাম অচল।

হুঁ !

বলেই, লাইন রেখে দিলাম আমি।

॥ ৫ ॥

পরদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ভন্টেকে সঙ্গে নিয়ে বাদুতে গেলাম।

ভন্টে জার্নালিজম-এ এম. এ. করে বসে আছে। চাকরি নেই। কোনো বাঙালি ছেলেরই চাকরি নেই।

বাদুতে পৌঁছেই দেখি উজ্জ্বল।

মাসীমা মেসোমশাইয়ের পায়ের কাছে বসে হাউ-হাউ করে কাঁদছে।

বললো, অসুস্থ ছিলো চারদিন। গতকাল খবরের কাগজটা পর্যন্ত আমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিলো। তিন-চারদিন কোনো ফোন ধরতে দেয়নি। কলিগেরা এলে মিথ্যা কথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছে। দুপুরে এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন ছিলো। শালা যেতে মানা করছিলো। নিজেও শরীর খারাপ এই অছিল্যাতে যায়নি। গিয়ে দেখি সকলেই আলোচনা

করছে ঈশিতা-ইঙ্গিতাকে নিয়ে। কাগজটা চেয়ে একবার দেখেই সোজা নিচে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে একবার বাড়ি পৌঁছে টাকা-পয়সা চেকবুক নিয়ে এই আসছি। ফুচ্‌কু চৌধুরীর মেয়ে তার নাতি, তার দেওয়া চাকরি কিছুর সঙ্গেই আর সম্পর্ক রাখবো না। আর আমার বোনেদের সৎকার করে নিই আগে। ঐ লোকটার কী করি তোমরা দেখো।

চাকরি ছাড়বি কেন দাদা?

দীপিতা বললো। আতঙ্কিত গলায়।

চাকরির অভাব কি আমার? বাইরের কত জায়গা থেকে অফার পেয়েছি। কোথাওই যেতে পারিনি। তাছাড়া এখানেই চাকরি পাবো এক মাসের মধ্যে। ও জন্যে ভাবিস না। বিদেশ যাবার কথা ভাবছিলাম এই নোংরামির জন্যে। বড় নোংরা, বড় লোভ চারদিকে।

আমার আবারও মনে হলো আমার নামটা বড় লজ্জার। এই কালিমার মধ্যে শুভ্রকে আদৌ মানায় না।

পোস্টমর্টেম শেষ হবে বিকেলে। তার পর দাহ।

আমি বলাম, আমরা ঘুরে আসছি। সময়মতোই ফিরবো।

মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে ভণ্টে বললো, শালাকে কি করা যায় বলো তো! শালার বড্ড বাড় বেড়েছে।

আমি বললাম, ফুচ্‌কুদা কিন্তু ফট করে কাঠমাণ্ডু বা অন্য কোথাও চলে যেতে পারে। কাঠমাণ্ডু ওঁর ফেভারিট স্পট।

ভণ্টে বললো, প্রাণে মারলে হবে না। সারাজীবন পঙ্গু করে রাখতে হবে। শালার কত্ত টাকার গরম আর ধূর্তামি বেড়েছে দেখাই যাক। বস্তার মধ্যে ভরে রাবারের রড দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তুলো ধুনবো ওকে। হাড়গোড় ভেঙে দেবো। শারীরিক কষ্ট কাকে বলে, খিদে কাকে বলে; তা ওকেও জানাতে হবে। মৃত্যুর কাছাকাছি যেতে কেমন লাগে, তাও। ওর চোখ দুটো খুব্‌লে তুলে নেবো। ওকে পনেরোদিন গুম করে রাখতে হবে। কত পুলিশ আর বড়লোক ওর জানা আছে দেখি!

কোর্ট-কাছারি করলে হতো না?

আমি বললাম।

হতো। কিন্তু কাঁচকলা দেখাতো ও। আইন তো তামাশামাত্র। যার পয়সা আছে সেই সে তামাশা দেখতে পারে। তাছাড়া ও পার্টির মেম্বার বুঝলি। বাড়িতে কাগজ বলতে একমাত্র গণশক্তি রাখে। ব্যাপারটা বোঝ। ঐ শালাও নাকি কম্যুনিস্ট। পার্টির সকলেরই সঙ্গেই যোগাযোগ আছে। কী বিচিত্র দেশ মাইরী আমাদের!

এরাই শালা জ্যোতিবাবুদের মুখে মুতবে। এই নইলে একটা পার্টির সর্বনাশ কী এমনি হয়!

আমি ভাবছিলাম, পতুমেসো বোধ হয় ঠিকই বলছিলেন।

টেররিজম্! টেররিজম্ ইজ দ্যা ওনলি ওয়ে আউট।

ফুচকুদা'র বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মুখ-ভর্তি পানজর্দা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ফুচ্‌কুদা বললেন, কী ব্যাপার। আবার কি?

আমি বললাম ফুচ্‌কুদা আপনার একবার বাদুতে যাওয়া দরকার। উজ্জ্বল এসেছে।

উজ্জ্বল? আর উ্য ম্যাড?

হ্যাঁ। উজ্জ্বল।

ফুচ্‌কুদা চোখ মিচ্‌কে, বললেন, মানে?

এটা ওঁর আরেক কায়দা : গোলমালে পড়লে, উত্তর দেবার জন্যে সময়ের প্রয়োজন হলেই সমানে, মানে ? মানে ? করে যান। ছেলেবেলা থেকেই তো দেখছি।

বললাম, আমরা চলি।

যাওয়া নেই, এসো।

ভণ্টে মোটর সাইকেল চালাচ্ছিলো। আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু বললাম, ওখানেই ফিরে চল্।

হু হু করে গরম হাওয়া লাগছিলো চোখে মুখে। পিচ গলছিলো রাস্তার।

ভণ্টের পেছনে বসে ঝাঁকতে-ঝাঁকতে যেতে যেতে মনে হচ্ছিলো ফুচকুদার লোমহীন বুকটা কেটে যদি দেখা যায় তা হলে দেখা যাবে হৃদয় যেখানে থাকার সেখানে হৃদয় নেই। একটা ঘিনঘিনে ব্যাঙ বসে আছে। আর চোখ দুটির গর্তে করপোরেশনের ম্যানহোলের থিক্‌থিকে নোংরা।

জোরে মোটর সাইকেল ছুটছিলো।

ভাবছিলাম ফুচকুদার উপরে না হয় প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। কিন্তু যে মেয়ে-মদ্দরা দলে দলে সিঙ্গাড়া রসগোল্লা খেয়ে গত দেড় বছর ধরে প্রতি শনি-রবিবার ঈশিতা আর ইঙ্গিতাকে অপমান করে গেলো তাদের শাস্তি দেবো কি করে ?

খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে, তার মধ্যে আমার, সুমিতের, সুহৃদের, প্রদীপের এমন কি ভণ্টের আত্মীয়-বন্ধুরাও আছেন।

ভণ্টে বোধহয় ঠিকই বলেছে। যে-সাদা চাদরটা দিয়ে ঢাকা আছে সব কিছু, সমস্ত দেশ ; সেই চাদরটাকেই সরাতে হবে। সেটাই হবে আসলে উৎসে গিয়ে প্রতিকার ! প্রতিকারের মতো প্রতিকার। প্রতিবাদের মতো প্রতিবাদ।

আমরা জোনাকি

সমীর সকাল থেকে দোকান খুলে বসেছিলো। সকাল থেকে এখনও একজন খদ্দের আসেনি। না। একজন এসেছিলো। সেও কিছু কেনেনি। কাল রাতে একটি টাইম-পিস্ কিনে নিয়ে গেছিলো। সেটার রঙ পছন্দ হয়নি, তাই বদলে নিয়ে গেলো।

এই দোকান-করা সমীরের ভালো লাগে না। বাবা বেঁচে থাকতে বাবার অনেক আশা ছিলো যে, সমীর খুব বড় হবে। মানে, ছোট শহরের অখ্যাত ঘড়ির দোকানদারের চেয়ে বড় কিছু হবে। বি-এ-টা পাশও করেছিল সমীর সময় মতো। ভাল ভাবেই। তারপর কী ভাবে সমীরকে "বড়" করা যায় তা ভাবতে ভাবতেই সমীরের বাবা মারা গেলেন। এমন কিছু আর্থিক, সামাজিক বা খুঁটির জোর ওদেব ছিলো না যে, বাবার ঐ ভাঙ্গা ঘড়ির দোকানে-বসা ছাড়া সমীর অন্য কিছু করে।

রোজ সকালে পাজামার উপর খদ্দরের পাঞ্জাবী চড়িয়ে তার উপর বাবার গায়ের গন্ধ-মাখা পুরোনো আলোয়ানটা জড়িয়ে সমীর যখন সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে, পুরানীবাজারে সবজি মণ্ডীর পাশের ছোট্ট রঙ-চটা সাইনবোর্ড-টাঙ্গানো দোকানটার তালা খুলতো তখন এর মনে হতো আরম্ভতেই ও শেষ হয়ে গেছে জীবনে।

বাড়ি-দোকান, দোকান-বাড়ি ; তার বাইরে ওর জন্যে পৃথিবীতে যেন অন্য কিছুই আর ওর অপেক্ষায় থাকেনি। ও যেন খুব সুন্দর একটা ডিপার্টমেণ্টাল দোকানে অনেক কিছু সওদা করবে বলে, অনেক পথ হেঁটে পরিশ্রান্ত হয়ে এসে, শেষ-অবধি একদিন পৌঁছেওছিল। কিন্তু পৌঁছে দেখলো, সব সওদা শেষ হয়ে গেছে। ওর জন্যে কিছুই আর বাকি নেই। তারপর ধীরে ধীরে এই দীন দৈনন্দিনতাতে ও আজকাল অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ওর দোকানের কাউণ্টারে বসে, বাসের আসা-যাওয়া ; টাঙ্গা, রিক্সা, কচিৎ প্রাইভেট-গাড়ি, চেনা-অচেনা পথ-চলতি মুখের ভীড়, এই সব দেখতে দেখতে প্রতিদিন কখন যে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে নামে ওর যেন হুঁশই থাকে না।

ওর চশমাব কাঁচে মাঝে মাঝে ধুলো জমে ওঠে। ঘড়ি-মোছা শ্যাময় দিয়ে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করে নিয়ে আবার চশমাটা পরে নিয়েও পথের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

চামারীয়া—টাটীঝামা-বাত্রা। আইয়ে বাবু। আইয়ে ! বলে ড্রাইভারের অ্যাসিস্টাণ্টটি চা'এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিলো। যে-সব প্যাসেঞ্জার চা খেতে নেমেছিলো, তাঁরা তাড়াতাড়ি করে প্লেটে ঢেলে গরম চা খেতে লাগলো উঃ ! আঃ করে। বাস ছাড়বে এখুনি। ড্রাইভার বার কয়েক হর্ন বাজালো। সকলে সিগারেটের ও বিড়ির টুকুরো ছুঁড়ে ফেলে, পানের পিকের পিচ্‌কিরি ছুঁড়ে, তড়িৎ-ঘড়িৎ বাসে উঠে পড়লো। ধুলো উড়িয়ে

মন্থর গতিতে বাস চলে গেলো। বাস স্ট্যাণ্ডটা হঠাৎই ভীষণ খালি হয়ে গেল। শালপাতার ঠোঙ্গা, চায়ের ভাঁড়, সিগারেটের টুকুরো ; লাল মাটির উপরে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরেই উল্টোদিক থেকে আর একটি বাস এসে দাঁড়াল স্ট্যাণ্ডে।

অতুল লাফিয়ে নামল বাস থেকে। নেমেই দৌড়ে এলো সমীরের দোকানে। বললো, এই, দ্যাখ ঘড়ির ব্যাণ্ডটা বাসে বসে থাকতে থাকতেই ছিঁড়ে গেল। কী কেলেঙ্কারী বলতো ?

সমীর বললো, কেলেঙ্কারী কি রে ? হাঁটতে হাঁটতে বা বাসে উঠতে-নামতে যদি ছিঁড়তো তখন তো ঘড়িটাই যেতো ! বসা-অবস্থায় ছিঁড়েছে তো ভালই হয়েছে বল্ ?

অতুল বলল, ছিঁড়েই যখন গেলো তখন আর ভাল বলি কি করে ?

কথা না বলে, ঘড়িটা নিয়ে সমীর মুখ নীচু করে ঘড়ির ছেঁড়া ব্যাণ্ডটা খুলতে লাগল। মুখ নিচু করা অবস্থায়ই বলল, চা খাবি ?

অতুল বললো, খাওয়া।

বলে, অতুল নিজেই রাস্তার উল্টোদিকের পাণ্ডেজীর চায়ের দোকানের ছোকরার উদ্দেশ্যে হাঁক লাগালো, দো চায়ে লাও, জল্‌দি।

আয়া বাবু, আয়া বলে, উত্তর দিল ছেলেটি।

সমীর বললো, কেথায় গেছিলি ?

গেছিলাম একটু টাটীঝামা। ধান-টান কত হলো, কি হলো, আদৌ হলো কিনা দেখতে। এবারেও পুজোর সময় জ্যাঠামণিরা আসছে তো। মহা ঝামেলা। হিসাব দাও, পত্তর দাও, ধান নিয়ে মাহাতোর সঙ্গে লাঠালাঠি। বাপের গোয়ালে ধুয়ো দিয়ে বেশ তো এতোদিন কাটলো। জমিজমা যদি চলে যায় তবে কি খাব বলতো ? পড়াশুনাও তো আর করলাম না। একদম না খেয়েই মরবো।

সমীর ওকে আশ্বস্ত করে বললো, আরে যাবে না, যাবে না।

যাবে রে দোস্ত, সব যাবে। আর শালা যাওয়াই উচিত। বাবা ত এম-এ, ল পাশ করে সারাজীবন নড়েই বসলো না। বাইরের ঘরে বসে বসে শুধু সিগারেট খেলো আর খবরের কাগজের "লেটারস টু দি এডিটরস" কলামে চিঠি লিখলো। আমি তো বাবারই ছেলে ! বল ? এখন কি আর জোতদারী করার দিন আছে বসে বসে ? ভবিষ্যৎ যখন ভাবি তখন একেবারেই অন্ধকার দেখি। বুঝলি সমীর। এমন করে বাঁচার কোনোই মানে নেই।

সমীর ঘড়িতে একটা নতুন ব্যাণ্ড লাগানো শেষ করে ঘড়িটা কাউন্টারের উপর রাখলো।

কই তোর চা এল ?

ঐ তো আনছে।

বললো অতুল। ওর দুজনে একসঙ্গে চোখ তুলে দেখলো, ছেলেটা দু হাতে দু কাপ চা নিয়ে সত্যিই আসছে।

অতুল বললো, নে, চা খা।

তারপর বললো তোর ব্যাণ্ডের দাম কত ?

সমীর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। ওর ইচ্ছে করে না, বন্ধু-বান্ধব, চেনা-পরিচিত কারো কাছ থেকে দাম নিতে। অতুলের সঙ্গে ও স্কুলে পড়েছে, কলেজে পড়েছে।

অতুল বললো, কি রে ? তুই কি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছিস ? খদ্দের তো দিনে একটা কি দুটোই আসে। তাও যদি তাদের কাছ থেকে পয়সা না নিস, চলবে কি করে ?

সমীর বলল, পয়সা তো নিই। আর, চলে একরকম করে যাচ্ছেই। সংসার তো মা আর ছেলের। ভাল করে নাই বা চলল।

হঠাৎ অতুল বললো, হ্যাঁরে সমীর, মাসীমা কেমন আছেন ?

সমীর বললো, ভালো।

অনেকদিন থেকেই ভাবছি একবার যাবো যাবো তোদের বাড়ি, যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। জ্যাঠামণিদের সঙ্গে অতসী কোলকাতা থেকে ফিরলেই একদিন যাব। দেখিস ! ঠিক যাবো।

সমীর বললো, অতসী কেমন আছে রে ? ওর বর ভাল আছে ?

ভালই আছে। বেশ ভালো আছে। তুই তো বহুদিন দেখিসনি ওকে ? না ?

হুঁ। কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইলো সমীর।

প্রায় দু বছর হতে চললো। ও, মাঝে বিয়ের পর পর যখন এসেছিলো তখন আমি পাটনা গেছিলাম বাবাকে ডাক্তার দেখাতে। এলে, একদিন ওকে আসতে বলিস। মা খুব খুশী হবেন।

আর তুই ?

চোখ নাচিয়ে অতুল বললো।

সমীর ওর চশমাপরা চোখ দুটো তুলে অনেকক্ষণ অতুলের চোখের দিকে চেয়ে রইলো। যেন বুঝতে চাইলো ও কি বলতে চাইছে।

চোখ নামিয়ে বললো, আমিও হবো।

অতুল উঠলো। বললো, নে এই টাকাটা রাখ্। বলে, একটা পাঁচ টাকার নোট সমীরের দিকে এগিয়ে দিলো। বললো, পরে এসে ব্যালান্স নিয়ে যাব।

সমীর বললো, না, না এক্ষুণি নিয়ে যা। তুই কবে আবার আসবি এদিকে তার ঠিক কি ?

অতুল হাত বাড়াল। সমীর অন্যদিকে চেয়ে মুঠিবদ্ধ করে নোট ও খুচরো অতুলের হাতে ভরে দিলো। অতুলও সেদিকে না তাকিয়ে মুঠিবদ্ধ হাত পকেটে চালান করে দিলো। ওদের সম্পর্ক যে টাকা-পয়সা এসে নষ্ট করে দেবে তা ওদের দুজনের কেউই হতে দিতে চায় না। কত দাম, সমীর কত দিলো, অতুল কত নিলো, তা ওদের দুজনের কেউই মুখে বললো না। চোখে দেখলো না।

অতুল পথে পা বাড়ালো।

ও চলে গেলে সমীর আবার বসে রইলো দোকানে একা একা। ভাবছিলো, জীবনের সমস্ত সম্পর্ক থেকেই টাকা জিনিষটাকে আড়াল করে রাখা সম্ভব হলে কি ভালোই না হতো !

পথে আস্তে আস্তে ভীড় বাড়তে লাগলো। স্কুলে, কলেজে, কোর্টে, কাচারীতে লোকজন ছুটতে লাগল। সেই প্রবহমান জনস্রোতের দিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে সমীরের অনেক পুরোনো কথা মনে হতে লাগলো। অতসীর কথা।

চায়ের দোকানের ছেলেটি এসে চায়ের দাম নিয়ে গেলো। কাপগুলো তুলে নিয়ে গেলো। কলেজের কয়েকটা ছেলে ইতিমধ্যেই সেই দোকানের চেয়ার-টেবল দখল করে বসেছে। অনর্গল সিগারেট খাচ্ছে। কারো টেবল শূন্য। ফলে, অনেক খরিদ্দার এসে বসবার জায়গা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

গতকাল বিকেলে একদল ছেলে দোকানে এসে চা ও কচুরী খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে গেছে। দোকানের মালিক পাণ্ডেজী ভয়ে কিছু বলতে পারেননি। কিছু বললে, দোকান লুঠ হবার ভয় আছে। আশ্চর্য ! অথচ দোকানের মালিক জগদানন্দ পাণ্ডে ছোটবেলায় এ অঞ্চলের সব চাইতে নামকরা পালোয়ান ছিলেন। এখনো তিনি ইচ্ছা করলে কুড়িটা

কলেজের ছেলেকে একা মেরে শুইয়ে দিতে পারেন। অথচ তবু কাল বিকেলে তিনি কিছু বলেননি। শুধু ছেলেদের মধ্যে যে সর্দ্দার গোছের, তাকে বলেছিলেন, ঈ ঠিক নেই হ্যায় বাবু।

ছেলেটা ঝাঁকড়া চুলের ঘাড় ঘুরিয়ে হেসেছিলো, বলেছিলো, সব ঠিক্কেই হ্যায়।

তারপর, পাণ্ডেজীর টেবলের উপর রাখা কিছু মশলা খেয়ে ও ছড়িয়ে, সাইকেলে চড়ে, ওরা দল বেঁধে ক্রিং ক্রিং করে চলে গেছিলো।

সমীর বসে দেখেছিলো ও ভেবেছিলো, পাণ্ডেজীর ভয়টা ওঁর নিজের শরীরের ভয় নয়। মার দিতে বা মার খেতে তিনি ভয় পাবার লোক নন। কিন্তু তাঁর দোকান, তাঁর থরে থরে সাজানো মিষ্টি, তাঁর এতদিনের পরিশ্রমে গড়ে তোলা গুডউইল্, সাইনবোর্ডের উপরে লালের উপর কালোতে বড়ো বড়ো করে লেখা "পাণ্ডে-সুইটস্" দোকানের নাম, সব কিছুই নষ্ট হয়ে যাবার ভয় ছিলো, একটা মারামারি, কেলেঙ্কারীতে।

সমীর চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে ভেবেছিলো, মানুষের কিছুমাত্রও হারাবার ভয় থাকলে তাকে কিছু বলার বা করার আগে অনেক কিছুই ভাবতে হয়। মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হলে আবার নিরন্তর মাথা নীচু করেও থাকতে হয়। অনুক্ষণ ছোট হতে হয়। অন্যায়, অত্যাচার, অনেকই সহ্য করতে হয়। তবু বেঁচে থাকতে হয় ; বেঁচে থাকারই জন্যে।

ওওতো বেঁচে আছে। ওর সম্পত্তি নেই, ওর দোকানে কোনো খরিদ্দার নেই, ওর কোনো ভবিষ্যতের আশা নেই। ওর বুকে কারো ভালোবাসা নেই। যাকে ও ভালোবেসেছিল, ওর সর্বস্বতা দিয়ে ; সে তাকে প্রতিমুহূর্তে অপমান করে, অসম্মান করে ওকে পায়ে দলে চলে গেছে। তবুও বেঁচে আছে। তবুও বেঁচে থাকতে হয়। দিনের শেষে মা-ছেলেতে দুমুঠো খেয়ে শুয়ে পড়ার জন্যে। লাইব্রেরী থেকে কোনো বই এনে সেই বইয়েব শুক্‌নো পাতাব খনি খুঁড়ে সোনা আবিষ্কার করার জন্যে। অন্ধকার রাতের তারা-ভরা আকাশের অসীম নিস্তব্ধ দুর্জ্ঞেয়তার মধ্যে জীবনের মানে খোঁজার জন্যে। ও তবু এমনি করেই বেঁচে আছে। যদিও, ওর নতুন করে কিছুমাত্রই হারানোর ভয় নেই।

কিন্তু এ কি বাঁচা ?

সমীর অনেকদিন বোঝবার চেষ্টা করেছে একজন পুরুষ কেন বাঁচে ? সে কি শুধু লেখাপড়া করে, টাই-পরে অফিস যাওয়ার জন্যেই, একটা বিয়ে করার জন্যেই, শুধু বুড়ো হয়ে রিটায়ার করে হঠাৎ সেরিব্রাল কি করোনারী থ্রম্বোসিসে মরে যাবার জন্যেই বাঁচে ? কেউ কেরানী হয জীবনে। কেউ কেউ বড় সাহেব হয়। কেউ পিওন হয়। কেউ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। কেউ বা তার মত ছোটো দোকানদার হয়। কিন্তু শুধু এইটুকু হওয়ার জন্যে বা করার জন্যেই কি মানুষ বেঁচে থাকে ? এই অনুক্ষণ সরীসৃপের মত নির্জীব হয়ে, অন্য-নির্দিষ্ট পথে জীবনের বছর, মাস, দিনগুলো এক এক করে শেষ করার জন্যে, যৌবনে ঘুষ খেয়ে শেষ জীবনে হরিনাম করার জন্যেই কি মানুষ বেঁচে থাকে ?

সমীর কিছুতেই বুঝতে পারে না, মানুষ কেন বাঁচে ? এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পুরুষমানুষ কেন বেঁচে আছে ? কেন কলের পুতুলের মত লম্ফঝম্ফ করছে ? উকিলেরা কেন কালো কোট পরে হাত নাড়ছে, রিক্সাওয়ালা, বেশ্যার দালাল কেন অনুক্ষণ রিক্সার ঘন্টা বাজাচ্ছে ? কেন ছাত্রেরা বই-টুকে পরীক্ষা পাশ করছে ? কেন রাজনীতিকরা সর্বক্ষণ তাদের ভোটদাতাদের মর্মান্তিক ভাবে ঠকাচ্ছে ? কেন ? কেন ? কেন ?

কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। এই কেনর একটা উত্তর হয়ত কোথাও না কোথাও নিশ্চই লুকিয়ে আছে। কোনো একটা বোধ, চেতনায় কোনো একটা জাগরণের ঢেউ ; কিছু একটা

কোথাও নিশ্চয়ই আছে। নিজের বুকের মধ্যে, কী মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে ; কী কানের পাশে শিরার দপ্‌দপানির মধ্যে। যা, ওকে একদিন জানিয়ে দেবেই, বুঝিয়ে দেবে, একজন পুরুষ কি নিয়ে বাঁচে ? কিসের জন্যে বাঁচে ?

সমীর খুব ভাবে। হয়ত দোকানে ওর একা একা বসে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে জন্যেই এই ভাবনার রোগ ওর মাথায় ঢুকেছে। তবু, ও ভাবে। ও একা থাকতে ভালবাসে ওর মনে হয়, ও নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ। ওর কোনো পরিপূরকের দরকার নেই জীবনে কোনো বন্ধুর উচ্চ-হাসি, কোনো মেয়ের ভালোবাসার নরম হাত, কোনো ভগবানের আশীর্বাদ। কিছুতেই ওর প্রয়োজন নেই। ও এমনি একা একা ভেবেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে চায়, জীবনের মানে খুঁজে।

ও কেবলি ভাবে, পুরুষের কর্মজীবনের কোন্ কোন্ মুহূর্তে তারা সত্যিকারের বাঁচে ? নিঃশ্বাস ফেলার নামই কি বাঁচা ? পেট ভরে খাওয়ার নামই কি বাঁচা ? যে কোনো মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরার আর এক নামই কি বাঁচা ? ঠাকুরের মন্দির, খেলার মাঠ অফিসের টেবল, সাংসারিক পটভূমি, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, এই সব খণ্ড খণ্ড, টুকরো টুকরো বুটি-বসানো জীবনের একঘেয়ে ধূসর রঙের শাড়ির মধ্যে ঠিক কোন জায়গাটিতে একজন পুরুষ সত্যিকারের বাঁচে ? কোন্ মুহূর্তটিতে সে সবচেয়ে বেশী করে বাঁচে ?

সমীর ভাবে, মুখ নিচু করে ঘড়ির ব্যাণ্ড বদলাতে বদলাতে, সাইকেল রিক্সার প্যাঁকপ্যাকানি শুনতে শুনতে, ওর দোকানের ভাঙ্গা-চেয়ারটার ছারপোকার কামড়ে নড়ে চড়ে বসতে বসতেই ; একদিন ওর বোধিলাভ হবে। একদিন ও জানতে পারবেই, একজন পুরুষ কেন বাঁচে।

॥ ২ ॥

অতসীরা পরশু এসেছে। অতসীর বর আসেনি। অতসীর বর এক ওষুধের কোম্পানীতে বড় চাকরী করে। সে, চেহারা, শিক্ষা, বংশপরিচয়, চাকরী সমস্ত বিষয়েই প্রতি সাবজেক্টে এবং এগ্রিগেটে সমীরকে মর্মান্তিক ভাবে হারিয়ে দিয়েছে। এই জন্যেই বোধহয় সমীর অতসীকে হারানোর দুঃখটা সহ্য করে নিয়েছিলো বিধাতার অমোঘ বিধান হিসেবে। সমীর জানতো, অতসীকে দেবার মত সমীরের কিছুই ছিলো না ! শুধু রক্তজবার মত নির্ভেজাল হৃদয়-উপড়ানো নিঃশেষে-সমর্পিত এক অবিশ্বাস্য ভালোবাসা ছাড়া।

কিন্তু ভালোবাসার নিজের তো কোনোই দাম নেই। ভালোবাসার দাম কেউই দেয় না টাকারই মতো। বদলে কিছু বিনিময় করার থাকলে, পাবার থাকলেই ভালোবাসা দেওয়া চলে। যেখানে প্রতিদানে কিছু পাবার নেই, সেখানে কেউই মিছিমিছি ভালোবাসা খরচ করে না।

বিশেষ করে, অতসীরা।

অতসী কাল বাড়িতে এসেছিলো। দুপুর বেলা। রবিবার ছিলো। সমীরের মায়ের সঙ্গে অতসী গল্প-টল্প করলো। মা, ধনেপাতা-কাঁচালঙ্কা দিয়ে চাল্‌তা মেখেছিলো। অতসী উঠোনের রোদে পিঠ দিয়ে বসে মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে টাগ্‌রাতে জিভ দিয়ে টাক্ টাক্ শব্দ করতে করতে চোখ-মুখ নাচিয়ে চাল্‌তা মাখা খেলো। সমীরের ঘরের জানালা দিয়ে সমীর দূর থেকে ওকে দেখছিল।

এমন সময় পাশের বাড়ির রবির মা, আসাতে অতসী বললো, মাসীমা আপনারা গল্প

করুন, আমি সমীরদার ঘরে যাচ্ছি। একটু গল্প করে আসি।

সমীর ঘরেই বসে একটা বই পড়েছিলো। একটা পুরোনো খাট। মাদুর পাতা। বিছানাটা বালিশ-লেপ সুদ্ধু গোটানো ছিল মাথার কাছে। সমীর ওর নড়বড়ে টেবলটার সামনে বসেছিলো। একটা বই সামনে নিয়ে। বইয়ে ওর মন ছিলো না। জানালা দিয়ে ম্লান রোদ এসে ঘরে পরে ছিলো। বাইরের সেগুন গাছের বড় বড় পাতাগুলোতে পেছন দিক থেকে রোদ পড়ায় পাতাগুলোকে লালচে দেখাচ্ছিল। রবিদের বাড়ির কুঁয়োতলায় কেউ জল তুলছিলো। লাটাখাম্বা উঠছিলো নামছিলো। ক্যাঁচ-ক্যোঁচ্ শব্দ হচ্ছিলো। কতগুলো শালিক জানালার পাশে বসে কিচির-মিচির করছিল।

এমন সময় অতসী ভেজানো দরজা ঠেলে সমীরের ঘরে ঢুকলো।

অতসী আগের থেকে অনেকই সুন্দরী হয়েছে। জল-পাওয়া মাধবীলতার মত ওর মধ্যে একটা ফুল-ফলন্ত ভাব এসেছে। এমনিতে সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা অতসী নয়। কিন্তু সমীরের চোখে পৃথিবীতে অত সুন্দর আর কিছুই ছিলো না। কোনো হলুদ-বসন্ত পাখি, কোনো বসন্তের সকাল, কোনো উড়ন্ত প্রজাপতি, কিছুর সঙ্গেই ও অতসীর তুলনা খুঁজে পেতো না। ওর হাঁটা, চলা, ওর কথা বলা, অতসীর হাসি, অতসীর সাজগোজ, অতসীর মিষ্টি ব্যবহার সবকিছু সমীরের চোখে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা বলেই মনে হতো। চিরদিন। চিরদিন।

অতসী বললো, কি করছিলে ? ঘাড় গুঁজে ?

এই একটা বই দেখছিলাম।

সমীর বললো।

তুমি কেমন আছো ?

অতসী বলল।

ভালোই আছি। তুমি কেমন আছো ?

দেখে কি মনে হচ্ছে ?

সমীর জবাব দিলো না।

অতসীর চোখে মুখে একধরনের অবজ্ঞা, একটা তাচ্ছিল্য ; ফুটে উঠেছিলো সমীরের প্রতি। অতসী দারুণ ভাল আছে এ কথাটা যে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখে এ কথাটি ভেবেই অতসী যেন বিরক্ত হচ্ছিলো।

অতসী বললো, কি ? দেখে কি খারাপ মনে হচ্ছে ?

সমীর হাসলো। বললো, তা তো বলিনি। দু বছর পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো। তুমি কি ঝগড়া করবে বলেই মনস্থির করে এসেছো ?

কিসের ঝগড়া তোমার সঙ্গে ? সে বারে যখন এলাম তখন তো তুমি এখানে ছিলেই না। ওর সঙ্গে আলাপ হতো।

সমীর মুখ নীচু করে হাসলো। বললো, আলাপ না হলেও তোমার স্বামীর সম্বন্ধে সব কিছুই শুনেছি। তোমার মত মেয়েকে যে পেয়েছে সে ত ভালো হবেই। তার প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ।

এই আর কী ? প্রশংসো-ফ্রশংসা বাজে। তবে, ভালই। বলে, বাঁকা চোখে সমীরের দিকে একবার তাকালো।

তারপর হঠাৎ ওর হাত-ব্যাগ খুলে সমীরকে একটা খাম দিলো।

এটা কি ?

এতে তোমার চিঠি আছে। সত্যি, সমীরদা। তোমার কি কোনো সেন্স নেই ? বিয়ের পরও তুমি কী বলে আমাকে চিঠি লিখতে গেলে ? আমি ত লজ্জায় মরি ! একটা চিঠি তো ও খুলেই ফেলেছিলো। পড়লও। তবে ও খুবই মডার্ন। তাই কোনোরকমে ম্যানেজ করেছি। যদি ও না বুঝতো তাহলে আমার কতখানি ক্ষতি হতো বলতো ?

সমীর বললো, বোকার মত, তোমার কোনোই ক্ষতি করতে চাইনি আমি অতসী। তাছাড়া কারো বিয়ে হলেই যে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক, সমস্ত যোগাযোগ শেষ হয়ে যায় ; এ কথাটা তখনও আমি নিজেকে বোঝাতে পারিনি।

অতসী বেড়ালনির মত ফুঁসে উঠে বললো, তুমি নিজেকে কোনোদিনও তা বোঝাতে পারবে না। কিন্তু আমারই সব কথা বলতে হলো ওকে।

সমীর চমকে উঠলো। বললো, কি কথা ?

সে নাই বা শুনলে।

না, না বলোই না, কি কথা ?

সব কথাই। তুমি কি ধরনের পারভার্টেড লোক, তুমি কী করো, বিয়ের আগে তুমি কতভাবে কতদিন আমাকে বিরক্ত করেছো। তুমি নিজেকে কি মনে করো, সত্যিই আমি জানি না। তুমি কি করে কল্পনা করতে পারলে যে, তোমাকে আমি ভুলে যাবো না ? সত্যি সমীরদা ! তোমার মতো নাছোড়বান্দা আত্মসম্মানজ্ঞানহীন লোক আমি দেখিনি। তোমার মাথায় কি আছে তা তুমিই জানো !

বাধো বাধো গলায় সমীর বললো, তোমার বিয়ের পর তোমাকে মাত্র দুটো চিঠি পাঠিয়েছিলাম অতসী। তারপর তো আর লিখিনি ! আর হয়ত পাঠাবোও না কোনোদিন। হয়ত চেষ্টা করলেও পারবো না। ঐ দুটোও পাঠাতাম না। তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না কত চিঠি আমি লিখে ছিঁড়ে ফেলেছি। কত চিঠি এখনও লিখি এবং ছিঁড়ে ফেলি। রোজ রোজ। তোমার কথা ভাবলেই, তোমার কথা মনে পড়লেই আমার ভিতরে যে যন্ত্রণা হয়, তার একটা প্রকাশ না থাকলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতাম। তুমি কিছু মনে কোরো না। তোমাকে বিয়ের পর কোনো ভাবেই বিব্রত করতে চাইনি আমি। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি সব সময় ভুলেই যেতে চাই, নিজেকে সব সময় আমি কত বকি, কত মারি ; ভুলে যাবার চেষ্টা করি, তবু...... ।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সমীর। আগের কথা শেষ করতে পারলো না।

সমীর ওর টেবলের ড্রয়ার টেনে বের করে, ভিতর থেকে একটি খাম বের করলো। তার মধ্যে অতসীর দুটি ছবি ছিলো। একটি রাঁচির স্টুডিওতে তোলা। অন্যটি সিস্‌রামা ফলস্-এর পাশে একটি গাছের নীচে দাঁড়ানো ছবি। ওরা পিক্‌নিকে গিয়ে তুলেছিলো। তখন অতসী কলেজে পড়তো। চোখে সান-গ্লাস পরে ছিল অতসী। সমীর বলেছিলো, সবসময়ই বলতো, তুমি সান-গ্লাস পরো না, তোমার চোখ দেখতে পাই না তাহলে।

অতসী হাসতো। বলতো, থাক, বেশী দ্যাখে না।

সমীর বললো, আমি তোমার এই ছবি দুটো দেখি মাঝে মাঝে, যখন একা থাকি। একাই তো থাকি। মনে মনে তোমার সঙ্গে কথা বলি। তোমাকে চিঠি লিখি। তোমাকে আমি শুধু এইভাবেই বিব্রত করি।

দেখি, দেখি। অতসী বললো, ছবিগুলো দেখি একবার। বলেই, হাত বাড়িয়ে ছবিদুটো নিয়েই হঠাৎ কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেললো। ছিঁড়ে, জানালা গলিয়ে ফেলে দিলো বাইরে।

সমীর ফ্যাকাসে মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো, এর কি খুব দরকার ছিল ?

ছবিগুলো ছিড়ে তোমার কি লাভ হলো ? তোমার এই ছবি দুটো ছাড়া আমার কাছে তোমার তো আর কোনো চিহ্ন ছিলো না।

অতসী জানালা থেকে সরে এসে খাটটায় বসলো। বললো, ঢং। এই সব ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না।

ন্যাকামি বা ঢঙ বলতে কী বোঝাতে চায় অতসী, সমীর তা বুঝলো না। সমীরের চোখে, সমীরের মনে, অতসী বরাবরের মত আঁকা হয়ে গেছিলো। তাকে কিছুতেই মুছে ফেলা সম্ভব ছিলো না তার পরে। ছোটবেলার মহুয়ার গন্ধ, ভোরের রোদ্দুর, খুশীর দুপুরের শালপাতা-ওড়া হাওয়ার স্মৃতির সঙ্গে অতসীর স্মৃতি একাত্ম হয়ে গেছিল চিরকালেরই জন্য।

সমীরের মনে আছে, অতসী যখন কলেজে পড়তো এখানে, তখন সমীরকে প্রায় রোজই ভোরবেলা সাইকেল চালিয়ে মহিলা সমিতির সেক্রেটারীর বাড়ি মায়ের হাতের-কাজ পৌঁছে দিতে যেতে হতো। অতসীদের বাড়ির পাশ দিয়ে কতগুলো মেহগিনি গাছের সারির মধ্যে মধ্যে পথ ছিলো। ও যখন ভোরে ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতো তখন অতসী ঘুমিয়ে থাকতো। সমীর মনে মনে অতসীকে রোজ দেখতে পেতো, গুঁড়ি সুঁড়ি হয়ে সে ঘুমিয়ে আছে। ওর মিষ্টি ঘুমন্ত মুখটিতে পৃথিবীর সমস্ত শান্তি বাসা বেঁধেছে। সাইকেল চালাতে চালাতে ভোরের বাতাস লাগতো গায়ে, আর সমীরের মনে হতো, ওর দুটি হাতে যত শক্তি আছে ওর মস্তিষ্কে যতটুকু মেধা আছে, ওর বুকে যতটুকু ভালোত্ব আছে সব দিয়ে ও অতসীকে পৃথিবীর সমস্ত রোদ, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অশান্তি থেকে আড়াল করে রাখবে এ জীবনে। ওকে চিরদিন এমনি করেই ও আবেশে, আরামে ও আশ্লেষে ঘুমোতে দেবে। সেই সব সকালে, অতসীব মুখ, তার হাসি, তার গলার স্বর, শরতের হাওয়ার মতো এসে সমীরের সমস্ত সত্তাকে একটি ভোরের শিউলি গাছের মত নাড়া দিয়ে যেত। ভালো লাগার ফুল ঝরত ঝরঝরিয়ে। ভালোলাগায় সমীর কেঁপে কেঁপে উঠত। অথচ, এ জীবনে সমীরের হাত দুটো অতসীর জন্যে কিছুই করতে পারলো না। তার বুকের সমস্তটুকু ভালোত্ব বিফলেই ও বয়ে বেড়ালো।

অতসীর এই ছবি-দুটি বুকে করে রেখেছিলো ও এতদিন। ওর দারিদ্র, ওর দোকানের দৈন্য, ওর সামান্যতার কালি, ওর সমস্ত কিছু দুঃখ, ও ভুলো যেতো। মাঝে মাঝে, এই ছবি দুটির দিকে চেয়ে ও সেই ছোটবেলার শিউলি ফুলের গন্ধভরা কমলা-রঙা ভালো-লাগা দিয়ে ভরিয়ে দিত।

সমীর কী বলবে, ভেবে পেলো না।

জানালার কাছে গিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়ালো।

অতসীও অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না।

সমীর চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলো।

বেলা পড়ে আসছিলো। লাল ধুলোর রাস্তায় মাঝে মাঝে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শোনা যাচ্ছিলো। রিফর্মেটরীর মাঠ থেকে তিতিরগুলো সব একসঙ্গে টিউ টিউ টিউ করে ডাকছিলো। সিঁদুর গাঁয়ের দেঁহাতি মেয়েদের হাট-ফিরতি গলা শোনা যাচ্ছিলো ছায়া-ঢাকা পথে। শীতের বিকেলের বিষণ্ণ শীতার্ত শান্তিতে সমীরের ঘর এবং বাইরের প্রকৃতি ভরে ছিলো। রবিদের বাড়ির কুঁয়োর লাটাখাম্বা উঠছিলো নামছিলো। শব্দ হচ্ছিলো ক্যাঁচোর-ক্যোঁচোর ,ক্যোঁচোর-ক্যাঁচোর। ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে বাইরের ছায়ার অন্ধকার এগিয়ে আসছিলো।

সমীর হঠাৎ বলে উঠলো, অতসী, একবার আমার কাছে এসো, কতদিন তোমাকে কাছ

থেকে দেখিনি।

সমীর অনেক চেষ্টা করে কথাকটি বলল।

অতসী রূঢ় গলায় বলল, না।

না, কেন ?

সমীর শুধোল।

ওর গলায় মিনতির সুর বাজলো। কেন, না ?

অতসী বললো, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।

সমীর মুখ নিচু করে ভারী গলায় বললো, এতদিনে তুমি আমাকে এই চিনলে ?

অতসী বললো, তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি। হাড়ে হাড়ে চিনি। এক নিষ্ঠুর হিমেল হাসি অতসীর মুখে লেগে রইলো। ওর চোখের দৃষ্টি সমীরের মুখের উপর স্থির হয়ে রইলো।

একটু পরেই অতসী বললো, আমি এবার যাবো।

বলেই, আর কথা না বলে, ঘর থেকে উঠে চলে গেলো।

কাছে এলো, তবু তাকে মন ভরে, চোখ ভরে দেখা হলো না। তাই যতক্ষণ তাকে দেখা যায়, দেখবে ভেবে, সমীর জানালায় দাঁড়িয়ে রইলো।

অতসী বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে আসছিলো। জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে জানালাটা প্রায় অতিক্রম করে যাবার সময় হঠাৎই অতসীর চোখ পড়ল সমীরের দিকে। অতসী দাঁড়িয়ে পড়লো। সেই সায়াহ্নকারে অতসীর পাশ-ফেরানো মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো সমীর। অতসী কি যেন ভেবে একেবারে জানালার কাছে চলে এলো। তারপর নিচু গলায় বললো, একটা কথা বলবো ? মনোযোগ দিয়ে শুনবে ?

চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে সমীর বললো, বলো ?

অতসী ঘৃণার মুখে বললো, বাজারের যে-গলিতে মেয়েরা পয়সা-নিয়ে ভালোবাসা বিকোয় তাদের কাছে যাও না কেন ? গেলেই পারো ?

বলেই অতসী চলে গেল।

চশমাটা খুলে ফেলেছিলো। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলো না। সব ঝাপসা। সব অন্ধকার। সামনে, পেছনে চতুর্দিকে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, ঘরের বাইরে অন্ধকার ; সব অন্ধকার।

দোকান থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে আসছিলো সমীর। সায়াহ্নকার, পাখি-ওড়া আকাশে, সার্কিট হাউসের রাস্তার পত্রশূন্য বড় বড় গাছগুলো আকাশের দিকে প্রচণ্ড প্রাচীন হাত তুলে কি যেন ভিক্ষা চাইছিলো। এক জোড়া বাদুড় ডানা ঝটপটিয়ে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো। সমীর হাঁটতে হাঁটতে হাসলো একবার। ওর হঠাৎ মনে হলো ও যেন বুঝতে পেলো একজন পুরুষ কিসে বাঁচে।

টাটিঝামা পাহাড়ের নীচে অন্ধকার ছম্‌ছম্‌ করছিল। সমীর আস্তে আস্তে সেই জায়গাটিতে গিয়ে পৌঁছলো যেখানে একদিন অতসীকে এক মুহূর্তের জন্যে বুকে পেয়েছিল। এক লহমার জন্যে তার ঠোঁট নিজের ঠোঁটে শুষে নিয়েছিলো। তার চোখের পাতায় ; তার গলায় চুমু খেয়েছিল। সমীর অনেকক্ষণ চুপ করে পাহাড়তলির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলো। মাথাটা খুব পরিষ্কার করে ভাবার চেষ্টা করলো। অতসীকে ক্ষমা করার চেষ্টা করলো। যেখানে দাঁড়িয়ে, একজনকে একদিন বুকের মধ্যে আদরে জড়িয়ে ধরতে

পেরে ওর শরীরের সমস্ত অণুপরমাণু ভালোলাগায় শিরশির করে উঠেছিলো, ওর মনের মণিহারী দোকানের সবকটি ফ্লুরোসেন্ট আলো যে মুহূর্তে একসঙ্গে দপদপ্ করে জ্বলে উঠেছিলো, সেখানে দাঁড়িয়ে ও অতসীকে ক্ষমা করে দিলো। সমীর মনে মনে বললো, অতসী। একজনকে তুমি বাঁচাতে পারতে। তুমি যাকে বাঁচতে দাওনি তার জন্য বাজারের গলি নয়। সেখানে শুধুই তার-ছেঁড়া তানপুরা আর ফেঁসে-যাওয়া তবলার ভীড়। সেখানে কোনো সুর নেই, সেখানে কোনো বাঁচার অনুপ্রেরণা নেই। তোমার মত কোনো সুরেলা দিলরুবা সেখানে তার জন্যে কেউ সাজিয়ে রাখেনি।

সমীর অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়কে শুনিয়ে স্পষ্ট গলায় জোরে জোরে বলল, অতসী, তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যে বাঁচতে দিয়েছিলে, এইখানে। সে জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আছি। এবং থাকবো। একদিন, এক সময়, এক মুহূর্তের জন্যেও আমি বেঁচেছিলাম এইখানে। গাছটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বিড় বিড় করে বলতে লাগল, আমি বেঁচেছিলাম এখানে। আমি এক মুহূর্তের জন্যে হলেও বেঁচেছিলাম।

অনেকক্ষণ পর একা একা টাটিঝামা পাহাড়ের নিচে থেকে ডি-এস-পি'র বাড়ির পাশের নির্জন রাস্তা ধরে সমীর বাড়ি ফেরে এসেছিলো।

বাড়ি ফিরতেই মা বললেন, অতসী একটা চিঠি পাঠিয়েছে।

সমীর চিঠিটা খুললো। দেখল, খামের মধ্যে চিঠির সঙ্গে অতসী একটা ছবি পাঠিয়েছে। লিখেছে, তোমার জন্যে আমার একটি ছবি পাঠালাম। ছবিটি পোস্ট-কার্ড সাইজের। কোলকাতার কোনো ভাল স্টুডিওতে তোলা। অতসী ও অতসীর বর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। একটু চালিয়াৎ চালিয়াৎ হলেও বেশ ভাল দেখতে ভদ্রলোককে।

লণ্ঠনের আলোয় অনেকক্ষণ একদৃষ্টে ছবিটা দেখল সমীর। কিছুক্ষণ পর আবার একবার দেখলো। তারপর কাঁচি দিয়ে অতসীর নিজের ছবিটা আলাদা করে কেটে ফেলল, এবং ওর সর্বগুণসম্পন্ন সুরূপ বরের ছবিটা কুচি কুচি করে ছিড়ে বাইরে ফেলে দিলো। বাইরে তখন গাছ পাতা থেকে হিম পড়ছে, ফিস্ ফিস্। বোবা অন্ধকারে গোঙানীর মত ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে—ঝিঝির, ঝিঝির, গাছে, গাছে, পথের পাশে, ঝিঁঝি ডাকছে কুঁয়োতলায়, তখন ঝিঁঝি ডাকছে মনের মধ্যে। তখন মনের মধ্যে শিশির পড়ছে, দারুণ শীত ; ফিস্-ফিস্, ফিস্-ফিস্।

সেদিন দোকানে যেতে দেরী হয়ে গেছিলো সমীরের।

কাল সন্ধ্যেবেলায় পাহাড়ের নীচে সেই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে যেমন ভালো লেগেছিলো ওর, আজ সকাল হবার পর থেকে তেমনি খারাপ লাগছে। ও যেন এতদিন জানতো না যে ও বেঁচে নেই। কাল সন্ধ্যেবেলা অতসীর নিষ্ঠুর শীতলতায় তাড়িত হয়ে যদি না সেই গাছের কাছে যেতো, যদি না ওর মনে পড়তো ও এক সময় একদিন, একটি উষ্ণ জীবন্ত মুহূর্তে ভীষণ জীবন্ত ভাবে বেঁচেছিলো, তবে হয়ত ও ওর প্রতিমুহূর্তের বিফল মৃত্যু সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠত না।

ও এতদিন ভাবতো, বোঝবার চেষ্টা করতো যে, মানুষ কিসে বাঁচে ? কখন বাঁচে ? কেন বাঁচে ? কি নিয়ে বাঁচে ? কতটুকু বাঁচে ? কিন্তু এর আগে ওর কখনোই মনে হয়নি যে, ও নিজে অমন নিশ্চিতভাবে মরে আছে।

কলেজের সময় হয়েছে। ছেলেমেয়েরা কলেজের দিকে চলেছে। কেউ সাইকেলে, কেউ রিক্সায়, কেউ হেঁটে। কোর্ট-কাছারীর ভীড়ও শুরু হয়েছে। পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে ওর শীত-শীত করতে লাগল। ইচ্ছে হলো, এক কাপ চা খায়। পাণ্ডেজীর দোকানের ছেলেটিকে চায়ের জন্যে হাঁক দিল।

একটু পরেই, ছেলেটি যখন চা নিয়ে ওর দোকানের দিকে আসছিলো ঠিক সেই সময়ই কাণ্ডটা ঘটলো। মেয়ে দুটি কলেজের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলো। একটু আগেই ওরা ওর দোকানের সামনে দিয়ে গেছে। দুজনেই সাদা শাড়ি পরা, নীল পাড়। নীল ব্লাউজ গায়ে। দুজনেরই বেণী-ঝোলানো।

চার পাঁচটা ছেলে সাইকেলে চড়ে ওদের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে আসছিল হাসতে হাসতে। সাইকেলের বেল বাজাতে বাজাতে ক্রিং ক্রিং করে। হঠাৎ মেয়ে দুটি দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হলো, মেয়ে দুটি ভয় পেয়েছে। ওদের চোখে আশংকার ছায়া পড়লো। ছেলেগুলো ওদের বাঁদরামির বৃত্তটা ছোট করে আনতে লাগলো।

সাইকেলগুলো ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ওদের কাছে চলে এসো।

একটি মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, জংলী।

বলতেই, একটি ছেলে তার বেণী ধরে টান লাগালো।

বেণী ধরে টানতেই মেয়েটি তার হাতের মোটা বই দিয়ে সাইকেল-চড়া ছেলেটির মুখে এক ঘা লাগালো। আঘাত লাগতেই ছেলেটি সাইকেল শুদ্ধ পড়ে গেলো। পড়তে পড়তে এগিয়ে যেতেই অন্য দুটি ছেলেও সাইকেলের ধাক্কায় পড়ে গেলো। এবং পাণ্ডেজীর দোকানের সামনে ঠেসান দিয়ে দাঁড়-করানো সাইকেলের স্তূপে ধাক্কা লাগাতে দোকানের খরিদ্দারদের অনেকগুলো সাইকেল ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে মাটিতে পড়ে গেলে।

তারপরই ব্যাপারটা ঘটলো। ছেলেগুলো শকুনের মতো মেয়ে দুটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একজন একটি মেয়ের শাড়ির কোণা চেপে ধরল। মেয়েটি দৌড়ে পালাতে গেলো এবং পালাতে গিয়ে তার শাড়ি ছিঁড়ে এলো। তারপর খুলে গেলো। সেই বাজারের রাস্তায় শায়া পরা উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়েটিকে ভীষণ ভীত ও অসহায় মনে হলো সমীরের। ততক্ষণে অন্য মেয়েটিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছেলেগুলো উদ্দাম পাশব চীৎকার শুরু করেছে।

আশ-পাশের দোকানের দোকানদার, পথচলতি লোকেরা সকলেই ব্যাপারটার অভাবনীয়তায় একেবারে হতবাক হয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

ছেলেগুলোকে আজকাল সকলেই ভয় করেন। সকলেই জানেন যে, ওদের ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই। ওদের অভিধানে "সম্মান" বলে কোনো শব্দ লেখা নেই। ওরা করতে পারে না, এমন কোনো কাজ নেই এবং যা ওরা করবে সেটাই ন্যায্য বলে মানতে হবে। আজকের ভারতবর্ষ ঐ যদুবংশরাই শাসন করছে। ওদের দিকে সাহস করে কেউই এগোল না।

কী হল, কেমন করে হল ; সমীর জানে না। সমীরের শুধু মনে আছে যে, এক লাফে ও ওর দোকানের কাউন্টার টপ্‌কে ছেলেগুলোর দিকে এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে গেলো। দৌড়ে গিয়েই যে-মেয়েটিকে ওরা মাটিতে শুইয়ে ফেলেছিলো তাকে টেনে তুললো। দৃপ্ত চকিত চিতাবাঘের মতো ও এক একটা ছেলেকে এক এক ঘুষিতে এদিকে ওদিকে ফেলে দিলো। ছেলেগুলোকে ওর পাটকাঠির মত হালকা ও ভার-শূন্য বলে মনে হলো। ওর মনে হলো, অন্যায়ের নিজস্ব জোর থাকে না কণামাত্রও। অন্যায় শুধু ছুরির ফলায় আর বোমার আওয়াজে মাঝে মাঝে ঝল্‌সে উঠে আলেয়ার মতো ভয় দেখায়।

মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দিতেই, মেয়েটি দৌড়ে পাণ্ডেজীর দোকানে গিয়ে ঢুকলো। মেয়েটির শাড়ি খুলে গেছিলো, ব্লাউজ ছিঁড়ে গেছিলো ; বইগুলো সব রাস্তায় লুটোচ্ছিল। মেয়েটি হাপুস-নয়নে কাঁদছিলো।

দ্বিতীয় মেয়েটির দিকে এগোতেই সমীর বুঝতে পেলো যে আজ ওর বিষম বিপদ। ছেলেগুলো সকলে মিলে সমীরকে ঘিরে ফেললো।

আকাশে তখন সূর্যটা ঠিক মাথার উপর। রোদ ঝক্-ঝক্ করছে। ঐ সূর্যের আলোর আশীর্বাদে দাঁড়িয়ে এক রাস্তা লোকের সামনে শ'য়ে শ'য়ে মানুষের মুগ্ধ ও আতঙ্কগ্রস্ত মুখে তাকিয়ে সমীরের হঠাৎ মনে হলো, জীবনে এই প্রথম মৃত্যুর শীতল, রঙ-চটা খোলস ছেড়ে ও জীবনের উষ্ণ রোদ্দুরের স্বাদ পেয়েছে। এই প্রথম। ও যে বেঁচে আছে এটা প্রমাণ করার মতো কিছু একটা ওর জীবনে ঘটলো। এবং সেটা ঘটালো ও নিজেই।

কিন্তু সমীর একা। ছেলেগুলো প্রথমে শুধু চারজন ছিলো। কিন্তু সমীর ওদের মারার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে আরো অনেক ছেলে দৌড়ে এলো ওদের সাহায্যে। অন্যায়ের দল সহজে ভারী হয়। ভারী হলো। যূথবদ্ধ জানোয়ারেরা ঘিরে ফেললো ওকে। ন্যায়ের দলে তখন ও একা।

দেখতে দেখতে ওরা সকলে একসঙ্গে সমীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সমীর দু হাত দিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে সমানে ঘুষি চালাতে লাগলো। এর আগে সমীর কখনো কারো সঙ্গেই মারামারি করেনি—। মারামারি করতে পারতেন পাণ্ডেজী। পালোয়ান। কিন্তু তাঁর বড় দোকান, তাঁর দোকানের বিখ্যাত বালুসাহীর গুডউইল, তাঁর ফার্ণিচার, তার ক্যাশের টাকা, তার কাঁচের শো-কেস এতো কিছু বিসর্জন দিয়ে ন্যায়ের জন্যে দাঁড়ানো তার পক্ষে অসম্ভব ছিলো। শুধু তাঁর পক্ষে কেন, হয়তো কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলোনা। মানুষের বিত্ত ও সম্পত্তি যত বাড়ে মানুষের ভয় ঠিক সেই অনুপাতেই বাড়ে। এই নিয়ম। এবং ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকবোধও কমে।

সমীর প্রচণ্ড মার খাচ্ছিলো। ওর ঠোঁটের কোণা বেয়ে রক্ত পড়ছিলো। ডান চোখের পাশটা কেটে গেছিলো একটা ঘুষিতে। তবুও সমীর পাগলের মতো হাত চালাচ্ছিলো। কপালের উপর, কানের পাশে, ও যখন ঘুষির পর ঘুষি খাচ্ছিলো, ওর স্নায়ুগুলো যখন ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠছিলো তখন সেই ছোটবেলার দিনগুলো ওর ভীষণই মনে পড়ছিলো। যখন ও অতসীর বাড়ির পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতো, যখন মনে মনে ঘুমন্ত অতসীকে বলতো, 'আমার মস্তিষ্কে যতটুকু মেধা আছে, আমার বুকে যতটুকু ভালোবাসা আছে ; আমার দু হাতে যতটুকু শক্তি আছে সব দিয়ে আমি তোমাকে সমস্ত রোদ, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অশান্তি থেকে আড়াল করে রাখবো।"

সেই কথাগুলোই মনে পড়ছিলো এই মুহূর্তে বারেবার। এই মেয়ে দুটির মধ্যে ও কি অতসীকেই হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল ? নইলে ও ঐ অচেনা মেয়ে দুটির জন্যে এমন ভাবে মার খেয়ে মরতে যাবে কেন ?

ওরা মারতে মারতে সমীরকে মাটিতে ফেলে দিলো। সমীরের মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। ছেলেগুলো কতগুলো নেকড়ের মত ওকে ঘিরে নাচতে লাগল। একজন কোমর থেকে একটি ছোরা বের করে ওর বুকে বসিয়ে দিলো আমূল।

সমীরের খুব ক্লান্তি লাগতে লাগলো। খুব ঘুম পেতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, ঐ ছেলেগুলোর মায়েরা বোধ হয় হায়েনা, কি নেকড়ে, কি কাঁকড়াবিছেদের সঙ্গে কোনোদিন এক বিছানায় শুয়েছিলেন। মানুষের বাচ্চাদের চোখমুখ কখনো এমন হতে পারে না।

কখনো না।

যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে পাশ ফিরতে গেলো সমীর, যেন, পাশ ফিরে পথের ধুলোর বিছানায় শুলে ও আরাম পাবে। সমীর পাশ ফিরে শুতে শুতে তার দোকানের কাউন্টারের উপরে রাখা তার গরম চায়ের গ্লাসটা দেখতে পেল। সমীরের খুব ইচ্ছে হলো ওকে যারা মারছে তাদের মধ্যে একটি ছেলেকে বলে, ভাই আমার চায়ের কাপটা একটু এনে দেবে? পরমুহূর্তেই ওর দোকান থেকে ওর রক্তমাখা চোখের দৃষ্টি সরতেই ও দেখতে পেলো পাণ্ডেজীকে। সে দৃশ্যের জন্যে ও মনে মনে প্রস্তুত ছিলো না। দেখতে পেলো একটা তেল-মাখানো বাঁশের লাঠি হাতে করে ফিন্‌ফিনে ধুতী ও সিল্কের পাঞ্জাবী-পরা, ভুঁড়িওয়ালা পাণ্ডেজী দৌড়ে এদিকে এগিয়ে আসছেন। আনন্দে সমীরের কপাল-চোঁয়ানো রক্ত চোখের জলের সঙ্গে মিশে গেল। চোখের জল, বুকের রক্তের সঙ্গে মিলে গেলো। ও চোখ বুঁজতে বুঁজতে দেখতে পেলো পাণ্ডেজী লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতে পরম বিক্রমে এসে ঐ কাঁকড়াবিছের বাচ্চাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চতুর্দিকে প্রচণ্ড চীৎকার শোনা গেলো।

তারপর সমীরের আর মনে নেই। সমীরের খুব ঘুম পেয়েছিলো।

ওর জ্ঞান ফিরলো তিনদিন পর। সমীরের জ্ঞান ফিরলো, কিন্তু পাণ্ডেজীর জ্ঞান আর ফিরলো না। পাণ্ডেজীর বুকে ছোরা দিয়ে বহুবার আঘাত করা হয়েছিলো। পাণ্ডেজীর দোকান লুট হয়ে গেছিলো। তবু ঘটনার শেষ সেখানেই নয়।

সমস্ত শহরে হৈ-হৈ পড়ে গেছিলো। হাজার হাজার লোক হাসপাতালে এসেছিলো। পাণ্ডেজীর শব নিয়ে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিলো, তাতে সব কলেজের ছেলে মেয়েরা তো বটেই, তাদের কলেজের অধ্যক্ষরা, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এস-পি সকলেই যোগ দিয়েছিলেন খালি পায়ে। শহরের সব কিছু বন্ধ ছিল সেদিন।

আরো সাতদিন পর সমীর বিছানায় শুয়ে কথা বলতে পারলো। চোখ মেলতে পারলো। মাথায় যন্ত্রণা না-ঘটিয়ে প্রথম কিছু ভাবতে পারলো। অনেকদিন পর।

সেই ছোট্ট শহরের শান্ত একঘেয়ে জীবনের জলে যে হঠাৎ ঢেউ উঠেছিল তা এখন আবার শান্ত হয়ে গেছে।

হাসপাতালের জানালা দিয়ে রোদ এসে পায়ের কম্বলের উপর পড়েছে। সমীরের শরীরে যদিও অনেক উদ্বেগ ছিল, তবুও অনেক কিছু ভাবতে ইচ্ছা করছিলো ওর।

শুয়ে শুয়ে ও ভাবছিলো, আমরা কেউই অনুক্ষণ বেঁচে থাকি না। আমরা কখনো সখনো প্রতিদিনের মৃত্যুর একঘেয়ে স্যাঁতস্যাতে বিষণ্ণ অন্ধকারে জোনাকিরই মত হঠাৎ হঠাৎ বেঁচে উঠি, জ্বলে উঠি; আবার পরক্ষণেই নিবে যাই।

ব্যাঙডাকির মেয়ে

কী হলো অরোরা ? আমার রেসিডেন্সের ফোনেব লাইন পাওয়া গেলো না এখনও ? একটু উষ্মার সঙ্গেই বললো শ্রাবণ।

অরোরা ঘাবড়ে গিয়ে টেলিফোন অপারেটর মিস মালপানিকে রাগেব গলায় বললো, সঙ্গীতা, রায় সাহাবকো রেসিডেন্সকা লাইনে কি ক্যা হুয়া ?

আই অ্যাম ট্রাইং স্যার।

হোয়াট ট্রাইং ? গেট ইট বাই ওল মীনস গেট ইট অন ডিম্যান্ড অব লাইটনিং।

তুম্হারা দেল্লী, কলকাত্তাকি ববাবব হো গাযী। টেলিফোনকি বাবেমে।

শ্রাবণ বললো।

নেহী সাব। মিল্ তো যাতা লাইন। ইযে সঙ্গীতাকি বদনসীবী।

এবারে ফোনটা বাজলো।

অরোরা রিসিভাব তুলেই বললো, লিজিয়ে সাব ' মিলা।

হ্যালো। কে ?

আমি। ভাতি

বাড়িতে আর কেউ নেই ?

বাড়িতে আর কেউই নাই !

শ্যাম কোথায় ?

শ্যাম কাল চইল্যা গেছেগিয়া। বৌদি চইল্যা যাইতে কইছিলো।

কেন ?

আমার সাথে খুবই ঝগড়া করতাছিলো। জলের বোতল নিয়া মাবতে আইছিলো আমারে। ডাকাইত একডা ! বুড়া, তায়,আবার কলপ কইব্যা হিরো বনবার চায় '

থাক ও সব কথা। বৌদি কোথায় ?

বৌদি বাইরাইছে। কইতাছিলো বুনের বাড়ি যাইবো।

বুন্টা কে ?

আঃ। বুইন।

কী যে বলিস তুই !

আরে ! চাঁপাদিদি। বুন্না ?

ও চাঁপা। বোন বলবিতো। কী বুন-বুইন করছিস ! বৌদি এলে বলিস যে, ফোন করেছিলাম।

তুমি আসবা কবে দিল্লী থিক্যা ?
শনিবার। বলে দিস। ছোট দাদাবাবু আর বৌদি কোথায় ?
ও মা। অফিসে আর স্কুলে। জানো না য্যান তুমি ?
জানি।
আর কি কইবা, কও।
তোরা সকলে ভালো আছিস তো ?
হুঁ।
বৌদিকে বলিস। ওদেরও।
শনিবার কখন আসবা ?
দুপুরে।
কী মাছ খাবা কও। বৌদির কম্যু। ভালো কইর‍্যা রাঁইধ্যা রাখুম।
যা খুশি।
কও না। না জাইন্যা নিলে বৌদি আবার রাগ করবো। বাড়িতে তো খাওনা কত্তদিন।
ঠিক আছে। ছাড়ছি। বলে দিস। ফোন করেছিলাম।

বলেই, শ্রাবণ ফোনটা ছেড়ে দিলো।

ইজ ইট ওভার স্যার ?

মিস মালপানি শুধোলেন।

ইয়েস। থ্যাঙ্ক উ্য ভেরী মাচ।

ফোন ছেড়ে দিয়েই ওর চিন্তা হচ্ছিলো। ভাতি, ওদের বাড়ির রান্নার মেয়েটি ন'তলার মালহোত্রার ফ্ল্যাটের চাকর পাঁচুর সঙ্গে প্রেম করছে। উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে। সুযোগ পেলেই সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে চলে যায। কখন যে কী ঘটে যাবে।

যূথী বলেছিলো, আজকাল অল্পবয়সী কাজের মেয়ে ফ্ল্যাটবাড়িতে রাখার অনেকই নাকি বিপদ। তাছাড়া, একদল নাকি বাবুদের ব্ল্যাকমেইল করতেই আসে। নিজের প্রেমিকের বা স্বামীর সঙ্গে শুয়ে, প্রেগন্যান্ট হয়ে, বাবুদের নামে দোষ চাপিয়ে টাকা আদায় করে, স্ক্যান্ডাল রটানোর ভয় দেখিয়ে।

বন্ধ জানলার কাঁচ দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলো শ্রাবণ। আঁধি বইছে দুপুরের দিল্লীর বুকে। ঘোড়দৌড়ের দলবদ্ধ মেটে-লাল রঙা ঘোড়াদের মতো হুহু করে দৌড়ে যাচ্ছে মেটে-রঙা ধুলো তাড়িয়ে নিয়ে হাওয়াটা। তারপর আকাশ, গাছপালা সব লাল ধুলোর মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে।

ভাতি বাড়িতে একলা আছে এ কথাটা ভেবেই আতঙ্ক উপস্থিত হলো শ্রাবণের। শ্যামটা অনেকই পুরোনো লোক ছিলো। কিন্তু যতই পুরোনো হচ্ছে ততই ছিঁচকে চোর আর লোভী হচ্ছে। তাছাড়া প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচিও করে। চরম উত্ত্যক্ত হয়েই হয়তো ছাড়িয়ে দিয়েছে যূথী।

কিন্তু…

॥ ২ ॥

দিল্লী থেকে কলকাতায় আসার সকালের ফ্লাইটটা দশটা দশ-এ। কিন্তু ছাড়লো এক ঘণ্টা দেরীতে। দমদমে নামলো সাড়ে বারোটা নাগাদ।

লিফটে উঠে ফ্ল্যাটের দরজাতে পৌঁছেই কলিংবেল টিপে টিপে হাত ব্যথা হয়ে গেলো কিন্তু কেউই খুললো না। বিরক্ত, ক্রুদ্ধ এবং অবাক হয়ে পাশের ফ্ল্যাটে খোঁজ নেবে কিনা ভাবছে এমন সময় একমুখ হেসে দরজা খুললো ভাতি।

রাগের গলায় শ্রাবণ বললো, ছিলি কোথায় ?

আর কন্ ক্যান দাদা ? একটা পাগল কোকিল কাল রাত থিক্যা এমনই ডাকতাছে যে কী কমু !

কোকিল ?

আকাশ থেকে পড়ে বললো শ্রাবণ। এগারোতলার ফ্ল্যাটে কোকিল !

হ্যাঁ। কোকিলের ডাক, গাছে গাছে নতুন চিকন পাতা। রোদ পইড়্যা কী দারুণ চমকাইতেছে তারা। বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলাম আর ঐ বাঁ দিকের ভাঙা বাড়িটায় একটা কাঞ্চন গাছ আছে, দ্যাখছো দাদাবাবু ? কী ফুলই না ফুটছে ! আইস্যো আইস্যো, দেইখ্যা যাও একবার !

হাতের ওভারনাইটারটা নামিয়ে রেখে শ্রাবণ ওর কথাতে ওর সঙ্গে হেঁটে গিয়ে বারান্দাতে দাঁড়ালো। ওরই ঘরের বারান্দাতে। কলকাতায় এগারোতলা ফ্ল্যাটবাড়িতে থেকে, সারাদিন কী কলকাতা, কী দিল্লী, কী বম্বে সবসময়ই এয়ারকণ্ডিশনড্ অফিসে কাজ করে, কোকিল, গাছেদের নতুন কচি-কলাপাতা রঙা পাতা, আর কাঞ্চন ফুলের জগৎ যে এখনও আছে তা সে ভুলেই বসেছিলো। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ভাতিকে বকতেই ভুলে গেলো। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দুপুর একটার সময় আবহাওয়া বদলে-যাওয়া পৃথিবীর এক কোণে এগারোতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে ভাতির চোখ দিয়ে সে কলকাতার এই অঞ্চলকে সে একেবারে নতুন চোখে দেখলো।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালে সত্যিই তো ভেতরের কোনো শব্দই কানে আসে না ! মনের বারান্দাতে দাঁড়ানোরই মতো। কলিংবেল-এর আওয়াজ না শোনাতে ভাতির কোনো দোষ ছিলো না সে কথাও বুঝলো।

ঐ দ্যাখো। দ্যাখছো ? কী ফুলই না আইছে কাঞ্চন গাছটায় !

হুঁ।

বললো, শ্রাবণ,

তারপরই ভাবলো, ফুলের গাছ নিয়ে ভাতির সঙ্গে কাব্য করেছে জানলে যূথী ভীষণ রেগে যাবে। পুরুষ হয়ে জন্মেছে। ষোলো বছরের বেশি বয়সী নারীমাত্রকেই লোডেড রিভলবারের মতো হ্যাণ্ডল্ করতে হয় যে, তা ও শিখেছে। বড় বিপদ !

চান করবা না ?

করবা। বৌদি কোথায় ?

নি মার্কেটে।

নিউ মার্কেট। বুঝলো শ্রাবণ।

কখন আসবে ?

আইস্যা যাইবোনে। খাবার কি গরম করুম ?

না। বৌদি আসুক। আমি চান করতে যাচ্ছি বৌদি বেল দিলে খুলিস যেন আমি তো দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম।

খুলুম। খুলুম। বসন্তকাল আইলো তো ! সেই লগ্যে তো। মনটা হুড়দুম্-সুরগুম্ করে।

চান করতে করতে শ্রাবণ ভাবছিলো ভাতি যে চোখ দিয়ে এই পৃথিবীকে দেখে বা শোনে

সেই চোখ দিয়ে ও কেন দেখতে পারে না ! শহরে শহরে ঘুরে, জীবিকার ঘানিতে নিরুপায়ভাবে জুড়ে গিয়ে ওর মনের মধ্যের অনেক ভালো জিনিসই মরে গেছে। নষ্ট হয়েছে কিছু অঙ্কুর ; কিছু বীজ। যেসব বীজ আর কোনোদিনও অঙ্কুরিত হবে না।

ভাতিদের বাড়ি কুচবিহারে। শহরে নয়। গ্রামে। ওর নাকি মা বাবা কেউই নেই। দাদারা আছে। কিন্তু বৌদিরা একদিন খারাপ ব্যবহার করাতে ও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে। শ্রাবণের বেকার খুড়তুতো ভাই কমলের শ্বশুরবাড়ি কুচবিহারে। কাজের লোকজনের বড় অসুবিধা একথা যূথীর কাছে শুনেছিলো কমল। শ্বশুরবাড়ি থেকে আসার সময় সোজা স্টেশন থেকে নেমে ভাতিকে এক রবিবারের দুপুরে শ্রাবণদের বাড়িতে তুলে দিয়ে চলে যায়। তারপরই কমল চাকরি পেয়ে চলে যায় পারাদ্বীপে।

শ্রাবণ খুব রাগ করেছিলো, কমলের কাছ থেকে যূথী ভাতির দেশের বাড়ির ঠিকানাটাও সে রাখেনি বলে। কমলকে চিঠি লেখা হয়েছে পারাদ্বীপে। কিন্তু উত্তর আসেনি। কমলের বউ, ধানি বলেছে, তেমন কিছু হলে ওকে জানালেই হবে। কুচবিহারে ভাতিকে পৌঁছে দেবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু শ্রাবন চিন্তায় মরে যায়। যদি কিছু ঘটে যায়।

যূথীর সঙ্গে মনোমালিন্য হলে, টিভি দেখতে না দিলে ; ভাতি এমন জংলী পশুর মতো রেগে ওঠে যে, ভয় হয় কোনোদিন না দশতলার বারান্দা থেকে লাফিয়েই পড়ে। পাঁচুর সঙ্গে প্রেমটাও ওর পাশবিক। তোর্ষা নদীর গন্ধ এখনও ভাতির গায়ে লেগে আছে।তোর্ষারিই মতো ওর চালচলন। ব্যাঙডাকি জঙ্গলের কটুগন্ধী ফুলেরা ওর মস্তিষ্ক প্রভাবিত করে রেখেছে। পুরোপুরিই জংলী মেয়ে এই ভাতি। এই মালটি-স্টোরিড বাড়ির ছোট্ট ফ্ল্যাটের সীমার মধ্যে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। বুঝতে পারে শ্রাবণ। গ্রাম বাংলার ছেলে ও। ওরও প্রথম প্রথম দম বন্ধ হয়ে আসতো। শ্রাবণ কি আছে ছোট্ট ফ্ল্যাটে ! কিন্তু যূথী কলকাতার মেয়ে। এসব কথা ও বোঝে না। যারা গ্রাম দেখেনি, গ্রামে থাকেনি তাদের এসব কথা বলাও মিছিমিছি। দিগন্তমেলা আকাশ, তোর্ষার বান, ব্যাঙডাকি জঙ্গলের আলোছায়ার, গাছপালার গভীর রহস্য ভাতির চোখের মণিতে যেন মালটি-কালারড বৈদ্যুতিক বাল্ব-এর মতো খেলা করে। বুঝতে পারে শ্রাবণ। কিন্তু ও একা। ঐ প্রবল-যৌবনা বাড়ন্ত গড়নের জংলী মেয়েকে তার চাপল্য ও দুঃখকে বোঝে এমন আর কেউ এই ফ্ল্যাটে ছিলো না।

তাই, ভারী ভয় করে ভাতির জন্যে।

যূথী অনেকদিন বুঝিয়েছে ওকে। ফ্ল্যাটবাড়িতে পঞ্চাশটি ফ্ল্যাট। কতরকম লোক বাস করে এই ফ্ল্যাটে। তোর মতো অল্পবয়সী মেয়েদের পক্ষে নষ্ট হয়ে যাওয়াটা কোনো ব্যাপারই নয়। তারপর কোনো নরকে নিয়ে গিয়ে তুলবে তোকে। তখন আমাদের দোষ দিস না।

ভাতি রাগে বেড়ালনির মতো ফুলে ওঠে এসব কথা শুনলে। বলে, ঈসস্। অত্ব সোজা। চুল ছিঁইড়া দিম্যু না। নাক কামড়াইয়া দিম্যু।

যূথী হতাশ হয়ে দু হাতের পাতা উপরে তুলে, মেলে, কিছু বলতে চায় ওকে, এই মহানগরীর ভয়াবহতা সম্বন্ধে বোঝাতে চায় ; কন্তু নিরুপায়ে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

চান সেরে উঠে শ্রাবণ বললো, খাবার লাগা ভাতি। দিতে দিতে বৌদি এসে যাবে।

ওমা ! দাঁড়াও। আমি চান কইর‍্যা লই। এক মিনিট।

এই চান করা নিয়েও অনেকই সমস্যা।

সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের যে বাথরুম, তার দরজাতে অনেক ফুটো। নীচটাও ফাঁকা। বিহারী, উত্তরপ্রদেশীয় হিন্দু, কাজের লোকেরা ও দক্ষিণ বাংলার কিছু নানা-পেশার

মুসলমানের বাস এই সব সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে। অনেকের আত্মীয়-স্বজনও এসে থাকে। প্রতি তলার মেজানিন্ ফ্লোরে ওদের কোয়ার্টার। প্রথম দিন ভাতি চান করতে গিয়ে কেঁদে ফিরে এসে বলেছিলো, মেলা চোখ। দরজার ফুটার মধ্যে দিয়া চক্ষুগুলান্ আমারে গিইল্যা ফ্যালাইতে চায়। বাঁদর কতগুলান্।

তারপর থেকে যূথী বলেছিলো, রান্নাঘরের লাগোয়া কাভারড্ বারান্দাতে চান করতে।

প্রথম দিনই ভাতি রান্নাঘরের লাগোয়া বারান্দা ভেতর থেকে বন্ধ করে চান করে এসে বললো, সামনের আর পাশের বাড়ির দ্বারোয়ানগুলা আমারে হাতছানি দিয়া ডাক্‌তাছিলো বৌদি। আমিও লাথ্থি দেখাইয়া দিছি ?

করিস কি ভাতি ?

যূথী বলেছিলো! আতঙ্কিত গলায়।

তা, এতোদূর থিক্যা আর কি করুম ? কাছে পাইলে তো কান কামড়াইয়া ছিঁড়্যা থুইতামানে।

যূথী বারান্দাটা এখন কাঁচ দিয়ে পুরো ঢেকে দিয়েছে ওর চানের জন্যে। যাতে আব্রু রক্ষা হয়।

কিছুক্ষণ পর ভাতি চান করে এলো। শ্রাবণ "দেশ"-এর পাতা উল্টোচ্ছিলো বসবার ঘরে বসে বসে।

একটা কচি-কলাপাতারঙা সস্তা, পুরোনো, তাঁতের শাড়ি পরেছে ভাতি। তেল দিয়েছে মাথায়। যত্ন করে চুল আঁচড়েছে। মুগ্ধ চোখে তাকালো শ্রাবণ। এ মুগ্ধতা প্রেমের মুগ্ধতা নয়, কামের মুগ্ধতাও নয়। মুগ্ধতার অনেক রকম হয়!

ভাতি বললো, শ্রাবণের চোখ পড়ে বললো, কি ? বল্‌বা কিছু বুঝি আমারে ?

নাঃ।

তবে ? তাকাইয়া আছো ক্যান্ ?

শ্রাবণ হেসে বললো, এমনিই!

এই হীন, কুচক্রী, নীচ, কংক্রিটের জঙ্গলের মধ্যে ভাতি, শ্রাবণদের জন্যে এক দারুণ পৃথিবী নিয়ে এসে এই এগারোতলার ছোট্ট ফ্ল্যাটে ছেড়ে দিয়েছে। ফ্ল্যাটের মধ্যে নিয়ে তোর্ষা বয়ে যাচ্ছে। দূরের রায়ডাক আর তিস্তার গন্ধ আসছে নাকে। কাঞ্চন ফুলের নরম বেগুনি আলো আর কোকিলের ডাক, ব্যাঙডাকি জঙ্গলের অপার সব রঙ-বেরঙা-রহস্য বন্দী হয়েছে এখানে ভাতিরই কল্যাণে। শ্রাবণ একথা জেনে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করে। তাই...

দিমু খাবার ?

দাঁড়া।

তাইলে আমি বারান্দায় যাই ? কোকিলের ডাক শুনি গিয়া ?

যা।

দরজাটা খুইল্যা দিও বৌদি আইলে, নইলে আমি বকা খামু।

দেবো।

ভাতি বসবার ঘরে কচি-কলাপাতা রঙ ছড়িয়ে ওর চুলের তেলের গন্ধ উড়িয়ে বারান্দায় চলে গেলো।

যূথী এবং শ্রাবণের ছোট ভাই ভাদ্রর স্ত্রী জিনি, মাথায় কখনওই কোনো তেল দেয় না। শ্যাম্পু করার দিন ছাড়া। সিঁদুর পরে না সিঁথিতে। ভাতি এই ফ্ল্যাটের জীবনে এক অন্য

জীবনকে মিশিয়ে দিয়েছে। সেই মিশ্রণ ক্রমশই ঘন হচ্ছে। শ্রাবণ বুঝতে পারে। শ্রাবণ ভাবে, কোনোদিন একটি কাঞ্চন ফুলের গাছের জন্য, কাঞ্চন ফুলের জন্যে ; ওদের এই মেকী অভ্যেসের জীবনে, ক্লান্তিকর জীবনে, ভাঙন না ধরে যায় ! আস্ত ব্যাঙডাকি জঙ্গলটাই উঠে এসে বসতে পারে ফ্ল্যাটের মধ্যে কোনোদিন। তোর্ষা নদীর জলও বয়ে যেতে পারে।

শ্রাবণ এ কথাটা মনে করেই ভীত হয়ে ওঠে।

যূথী আর জিনি ভাতিকে 'বাঙাল' বলে ক্ষ্যাপায়।

ভাতিকে ওরা আন্ডারএস্টিমেট করছে। ভাতিকে এখান থেকে তাড়াতে হবে এমন কথা যূথী আর জিনি প্রায়ই বলে।

মেয়েরা তাদের ঘরের মধ্যে তাদের মনোনীত গন্ধ ছাড়া অন্য কোনো গন্ধই পছন্দ করে না। তাদের যুক্তি মানে না শ্রাবণ। কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলেও না। ভাতি সত্যিই হয়তো চলে যাবে কোনোদিন। যূথী আর জিনিই ছাড়িয়ে দেবে। তাড়িয়ে দেবে। তখন এই ফ্ল্যাটে কোকিলের ডাক, কাঞ্চন ফুলের শোভা, তোর্ষার জলের গন্ধ আর ব্যাঙডাকি জঙ্গলের মিশ্র শব্দ ;. বনজ্যোৎস্নার আর সবুজ অন্ধকারের আভাস কিছুই আর থাকবে না।

শ্রাবণ জানে, ভাতিকে ওরা শিগগিরিই ছাড়িয়ে দেবে।পঞ্চুর সঙ্গে প্রেম করছে বলে নয়। সম্পূর্ণ অন্য এক মেয়েলি কারণে।

ভাতি বললো ; খাবা. আইস্যো।

শ্রাবণ বললো, হুঁ।